মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে।)

জগৎশেঠ।

(শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে।)

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুর্শিদাবাদ কাহিনী

যন্ত্রস্থ

ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে হইয়াছে। ফলতঃ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসরচনার জ গ্রন্থকার যাহা কিছু পরিশ্রম করিয়াছেন, সাধারণে ইহা পাঠ কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিলে গ্রন্থকার আপনার সেই সার্থক বিবেচনা করিবেন। সেই পরিশ্র াবাদ-কাহিনীতে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার হইয়াছে তাহা দেখিয়া গ্রন্থকারের আশা আছে তহাসও সাধারণের নিকটে অনাদৃত হইবেনা শিদাবাদের ইতিহাসসম্বন্ধে গ্রন্থকারের দুই ছে। ইংরাজীতে যাহাকে প্রকৃত ইতিহাস ইতিহাসকে সাধারণে সেরূপ মনে না করিলে হইবেন। কোন স্থানবিশেষের বা কোন সময়- ইতিহাস লিখিতে গেলে ইংরাজী ইতিহাসের অভিমত প্রথার করিয়া তাহা লেখা দুরূহ হইয়া উঠে। সেই জন্য মুর্শিদা- তহাসে সেরূপ প্রথার যথাযথ অনুসরণ করা হয় নাই। প্রাচীন মুর্শিদাবাদের বিবরণসম্বন্ধে তাহা এক রূপ অসম্ভব বোধ হয়। কারণ সে সময়ের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়ার । যে সময় হইতে মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস আরব্ধ সেই সময় হইতে গ্রন্থকার ইংরাজী প্রথার অনুসরণেরও চেষ্টা । কিন্তু সম্যক্‌রূপে সে প্রথার অনুবর্ত্তন করিতে পারিয়া- বোধ হয় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে রাজা, সম্ভ্রান্ত শ্রেণী জনগণের চিরদিন যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, এবং উক্ত যেরূপ ধারাবাহিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে ঐ ইংরাজী প্রথানুযায়ী ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। রাজনৈতিক ঘটনা প্রভৃতি সমস্তই আকস্মিক, সুতরাং

এদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা যে সুকঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে ও বাঙ্গলায় ইতিহাস সংজ্ঞা ব্যাপকরূপে ব্যবহৃত হয়, ইংরাজীর ন্যায় তাহা ব্যাপক নহে। সেই জন্য গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" দিয়াছেন। তিনি ইহাকে ইংরাজী প্রথানুযায়ী ইতিহাসরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এই গ্রন্থে মুসল্মান রাজত্বের রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে এদেশের যৎসামান্য ব্যক্তিগণের যৎসামান্য কার্য্য ও কীর্ত্তি যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল, যথাসাধ্য তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার তৎসমুদয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের আশঙ্কা ছিল যে, সাধারণের নিকট হয়ত সে সমস্ত বিষয় প্রীতিপ্রদ হইবে না। কিন্তু সে দিবস বঙ্গের সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া গ্রন্থকারের সে আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুসল্মান রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের বিবরণের সহিত তাঁহাদিগের যৎ-সামান্য উদ্যমকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে ইচ্ছা করেন। গ্রন্থকার সেই বিষয়ে একটু সামান্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তিনি আজ যার পরনাই আনন্দিত। বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত সুখী। ফারসী গ্রন্থ ও দলিলাদি পাঠ ও অনু-বাদের জন্য গ্রন্থকার বহরমপুর কলেজের আরবীর ও ফারসীর অধ্যা-পক মৌলবী মহম্মদ মফীজুদ্দীনের নিকট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগৎশেঠ, বঙ্গাধিকারী, কুঞ্জঘাটা প্রভৃতি প্রাচীন বংশের বংশধরগণ তাঁহাদের কাগজ পত্র পরিদর্শন করার অনুমতি দিয়া গ্রন্থ-কারকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। গণকরের বাবু দুর্গাদাস রায়

জগন্নাথ ও রাজারামের ভাষা ও ভাষোত্তর পত্র প্রেরণ করায়·গ্রন্থকার উদয়নারায়ণের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রিয়বন্ধু জানকীনাথ সিংহ সীতারামের বংশপত্র এবং সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্রনারায়ণ বাগচী বি, এল, ও অঘোরনাথ চৌধুরী হোসেন-সাহী মুদ্রা প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। মান্যবর দেওয়ান ফজলরব্বী খাঁ বাহাদুরের অনুগ্রহে নবাব নাজিমগণের চিত্র প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থকার যারপর নাই অনুগৃহীত হইয়াছেন। তিনি ঐরূপ অনুগ্রহ না করিলে নবাব নাজিমগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করা গ্রন্থ-কারের পক্ষে দুর্ঘট হইত। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ রায় যদুনাথ মজুম-দার বাহাদুর মহম্মদপুরের চিত্র আনয়নের সাহায্য করিয়া গ্রন্থকারকে উপকৃত করিয়াছেন। চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত জি, এন্ মুখার্জি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের মহিলা প্রেসে মুদ্রিত করিয়াছেন। সপার্ষদ চৈতন্যদেবের চিত্রের জন্য সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট গ্রন্থকার কৃতজ্ঞ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার মানচিত্র খানি মেজর রেনেলের মানচিত্র অবলম্বনেই অঙ্কিত হইয়াছে। রেনেলের মানচিত্র কাশীমবাজার রাজপুস্তকালয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত ডি, এন্ ধর উক্ত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পরিশেষে গ্রন্থকারের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি, এলের নিকট গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না। তিনি ইতিহাসের অধিকাংশ ফর্ম্মার প্রুফ দেখিয়া না দিলে ইতহাসে ভূরি ভূরি ভ্রম দৃষ্ট হইত। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড আপাততঃ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ইতিহাস ও গ্রন্থকারের

যৎসামান্য গ্রন্থ মুর্শিদাবাদ-কাহিনী পাঠ করিয়া সাধারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস যদি তাহার কিছু সাহায্য করে তাহা হইলে গ্রন্থকার স্বীয় পরিশ্রমকে সার্থক বিবেচনা করিবেন। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া অনেক সময়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, সেই কারণে যদি গ্রন্থের কোন স্থানে ত্রুটি লক্ষিত হয়, সাধারণে তাহা ক্ষমা করিলে গ্রন্থকার আপনাকে যারপর নাই অনুগৃহীত মনে করিবেন, এবং পরবর্ত্তী কালে তাহার সংশোধনের যথোচিত চেষ্টাও হইবে। নানা কারণে সুচারু রূপে প্রুফ দেখা হয় নাই বলিয়া স্থানে স্থানে দুই চারিটী ভ্রম দৃষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সাধারণের নিকট যৎকিঞ্চিৎ আদর পাইলে গ্রন্থকার অন্যান্য খণ্ড প্রকাশে সাহসী হইতে পারিবেন। ইতি—

কলিকাতা
দেওয়ানবাটী } গ্রন্থকার
৮ই আশ্বিন, ১৩০৯ সাল।

সূচীপত্র।

অবতারণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ - হিন্দু ও বৌদ্ধকাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাঠান রাজত্বকাল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মোগল রাজত্বকাল।

চতুর্থ অধ্যায়।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

পঞ্চম অধ্যায়।

মুর্শিদকুলী খাঁ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুর্শিদকুলী খাঁ।

সপ্তম অধ্যায়।

মুর্শিদকুলী খাঁ।

অষ্টম অধ্যায়।

মুর্শিদকুলী খাঁ।

নবম অধ্যায়।

সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ।

দশম অধ্যায়।

সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ।

একাদশ অধ্যায়।

আল্লা উদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থা।

চিত্রসূচী।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

অবতারণিকা

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসল্মান-রাজধানী। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রশান্তসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী শস্যশ্যামল মখসুদাবাদ গগনস্পর্শিনী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া বাঙ্গলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে পরিণত হয়। অর্দ্ধ শতাব্দীর কিছু অধিক কালমাত্র মুর্শিদাবাদ রাজলক্ষ্মীর প্রসাদভাজন হইয়াছিল, কিন্তু এই অত্যল্প কাল মধ্যে ইহার গৌরব যেরূপ বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া উঠে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াও অনেক স্থান সেরূপ গৌরবান্বিত হইতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদের নবশক্তিসঞ্চারে দিল্লীর মোগলরাজশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বিজয়িনী মহারাষ্ট্রীয় শক্তি তাহার সংঘর্ষণে প্রত্যাহত হইয়া দূর দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, এবং ভারতাগত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সেই শক্তির প্রভাবে পুনঃপুনঃ বিচলিত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, অল্পকাল পরেই সেই নবশক্তি চিরদিনের জন্য নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বিশ্বব্যাপিনী ব্রিটিশ মহাশক্তি তাহাকে একে-বারে অভিভূত করিয়া ফেলে। মুর্শিদাবাদের যে গৌরব একদিন

সূচনা।

বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, অধিক দিনের জন্য তাহা এ জগতে স্থায়ী হইতে পারে নাই, শত বৎসরের মধ্যেই মুর্শিদাবাদের সমস্ত কীর্ত্তি ধীরে ধীরে ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসল্মান-রাজধানী এক্ষণে একটী ভগ্নস্তূপ সমাধিক্ষেত্রের ন্যায় তাহার প্রাচীন কথামাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের স্থান অতি উচ্চ। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে বিরাট্ রাজনৈতিক বিপ্লবের অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদ তাহার একটী রঙ্গভূমি। এইখানে বাঙ্গলার মুসল্মান-স্বাধীনতার সমাধি হয়, এবং যে মহীয়সী শক্তি আসমুদ্র হিমালয় পরিকম্পিত করিয়া কত নব নব লীলার অবতারণা করিয়াছে, সেই ব্রিটিশ রাজশক্তি মুর্শিদাবাদেই প্রথমে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে। মুর্শিদাবাদের সহিত বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙ্গালীর উন্নতির যেরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাদের সমগ্র জাতীয় ইতিহাসের অল্প স্থানেই সেইরূপ চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণে মুর্শিদাবাদের বিবরণ ইতিহাসপাঠকের নিকট যারপরনাই আদরের সামগ্রী। মুর্শিদাবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার শেষ রাজধানী, কাজেই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত বাঙ্গলারই ইতিহাস বুঝিতে হয়। আমরা সেই মুর্শিদাবাদের বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিবৃত্ত যথাসাধ্য প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি। ন্যায় ও সত্য আশ্রয় করিয়া নিরপেক্ষ বিচারে যাহা প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া বিশ্বাস হইবে, তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে যত্ন পাইব।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক রাজনৈতিক মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়। মুর্শিদাবাদের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, সেই বিপ্লবের সামান্য চিত্র মাত্র প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই মোগলগৌরব-চন্দ্রমা ধীরে ধীরে অস্তোন্মুখ হইতেছিল। কাবুল, কান্দাহার, আসাম, আরাকান, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্য ব্যাপিয়া যে বিশাল রাজ্য মোগলের বিজয় ঘোষণা করিত, ক্রমে ক্রমে তাহা ভিন্ন ভিন্ন জনপদে পরিণত হইয়া দিল্লীর অধীনতা ছেদন করিতে আরম্ভ করে। বৈদেশিক পারসীক ও আফগানগণের আক্রমণে মোগলরাজ্যের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, এবং তাহার রাজধানী লুণ্ঠিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অধিবাসিগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। আকবর ও আরঙ্গজেবের বংশধরগণ কর্ম্মচারিগণের প্রসাদভিখারী হইয়া ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কেহ কেহ আবার সে প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইয়া ঘাতকের শাণিত অস্ত্রের নিকট মস্তক বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা পরস্পর বিবাদে উন্মত্ত হইয়া আপনাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলেন। রণোন্মত্ত মহারাষ্ট্রীয় ও জাঠগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দিল্লীসাম্রাজ্যের প্রজাগণ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে। কি হিন্দুস্থান, কি দাক্ষিণাত্য, সর্ব্বত্রই নূতন নূতন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, অবশেষে মোগলসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ প্রাপ্ত হয়। হিন্দুস্থানে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন জনপদের ন্যায় হইয়া উঠে। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব, নামে মোগলের অধীন থাকিলেও, কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য্য পরিচালন

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপ্লব।

করিতেন। পঞ্জাব ধর্ম্মপ্রাণ শিখজাতিকর্ত্তৃক মোগল-হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। শিখগণের উপর মোগলের পাশবিক অত্যাচারে তাহারা যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হয়, অবশেষে এক বীরজাতিতে পরিণত হইয়া সমগ্র পঞ্জাব, হিন্দুস্থানের কিয়দংশ, কাশ্মীর, এমন কি আফগানিস্থানের অনেক ভূভাগ আপনাদের করায়ত্ত করিয়া তুলে। রাজপুতগণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু হীনবল হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারা আপনাদের জাতিগত বীরত্বের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মিবার, জয়পুর, ও মাড়বারের অধিপতিত্রয়ের অসিক্রীড়ায় মোগলসম্রাটগণকে যারপর-নাই শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। জাঠ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ বীরজাতি এই সময়ে রাজপুতানা হইতে বহির্গত হইয়া দিল্লীসাম্রাজ্যের অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া প্রজাবর্গকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলে। দক্ষিণে মহাপ্রাণ শিবাজীর গঠিত সেই রণপিপাসু মহারাষ্ট্রীয় জাতি দিন দিন আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। কি দাক্ষিণাত্যে, কি হিন্দুস্থানে, সর্ব্বত্রই তাহাদের শক্তি বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হয়। দাক্ষিণাত্যের সমগ্র জনপদে, হিন্দুস্থানের বাঙ্গলা, অযোধ্যা, দিল্লী, রাজপুতানা, পঞ্জাবপ্রভৃতি সমস্ত প্রদেশই ইহাদের রণক্রীড়ার রঙ্গভূমি হইয়া উঠে। এক কথায় মোগলের পর মহারাষ্ট্রীয়েরাই ভারতের একরূপ প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। ভারত-বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদ ইহাদের শক্তিপ্রভাবে আপনাদের তাদৃশী ক্ষমতা বিস্তার করিতে সাহসী হয় নাই। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই মহারাষ্ট্রীয়গণের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। কিন্তু এই বীরজাতির মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে, এবং

আফগানগণের আক্রমণে ও অবশেষে ব্রিটিশরাজশক্তির অমোঘ প্রভাবে তাহাদের সমস্ত পরাক্রম ও গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই সময়ে হায়দরাবাদ, কর্ণাট, মহীসুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের জনপদে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজা শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্রমে হতবীর্য্য হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণের ও বৈদেশিক ইংরাজ, ফরাসীর শিকারের দ্রব্য হইয়া উঠেন। যে সময়ে মোগলরাজশক্তি ক্ষীণবল হইতেছিল, এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রভুতা আসমুদ্র হিমালয় পরিব্যাপ্ত হয়, সেই সময়ে ভারতে দুই ইউরোপীয় শক্তি পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহার একটী ব্রিটিশশক্তি ও অপরটী ফরাসীশক্তি। দাক্ষিণাত্যের নীলসাগরের তরঙ্গলহরী বিক্ষোভিত করিয়া এবং তাহার প্রধান প্রধান জনপদ বিকম্পিত করিয়া এই দুই শক্তির অমানুষী লীলা অবশেষে বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের কোন কোন জনপদ আশ্রয় করিয়া এই দুই শক্তি আপনাদের অত্যাশ্চর্য্য রণক্রীড়ার অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে, পরে ক্রমে ক্রমে ভারতের সমগ্র জাতিকে তাহারা চমকিত করিয়া তুলে। এই দুই শক্তির সংঘর্ষণে ভারতে অনেক নব নব রণলীলার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া অবশেষে ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর ফরাসীশক্তি বিজয়িনী ব্রিটিশ শক্তির প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। ফরাসীশক্তিকে জলে স্থলে হীনবল করিয়া দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গলায় ব্রিটিশপতাকা উড্ডীন হইতে থাকে। কর্ণাট, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে অনেক অভাবনীয় ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া সেই মহীয়সী ব্রিটিশশক্তি

অবশেষে মুর্শিদাবাদে আসিয়া কেন্দ্রস্থ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আসমুদ্র হিমালয় সমস্ত ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরী শক্তি হইয়া উঠে। তাই এক্ষণে সিন্ধুধৌতচরণা, তুষারকিরীটিনী, শ্যামলাঞ্চলা ভারতভূমি অস্থিমজ্জায় ব্রিটিশবিজয়ের শত শত চিহ্ন ধারণ করিয়া জগতে ইংরাজের অক্ষয় গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই রাজনৈতিক মহা বিপ্লব ঘটিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিবরণ হইতে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

দিল্লী।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শিবিরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে জ্যেষ্ঠ মোয়াজেম কাবুলের, দ্বিতীয় আজিম গুজরাটের, এবং কনিষ্ঠ কামবক্স বিজাপুরের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দ্বিতীয় আজিম পিতৃশিবির অধিকার করিয়া বসেন ও আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। আজিম কামবক্সকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা প্রদেশ ও তাঁহার নিজ নামে মুদ্রাঙ্কনের ক্ষমতা প্রদান করায় কামবক্স কোনরূপ গোলযোগ করেন নাই। কিন্তু জ্যেষ্ঠ মোয়াজেম কাবুল হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া আপনার দুই পুত্র মুলতানের ও বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মৈজুদ্দীন ও আজিম্ ওশ্বানকে সসৈন্যে আগরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া দেন ও ভ্রাতা আজিমের নিকট সাম্রাজ্যবিভাগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু আজিম তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় আগরায় উভয় ভ্রাতার মধ্যে

যুদ্ধ উপস্থিত হয় ; এই যুদ্ধে আজিম ও তাঁহার দুই পুত্র নিহত হইলে মোয়াজেম বাহাদুর সাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাহাদুর সাহ বা প্রথম সাহ আলম ৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামবক্স বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে হায়দরাবাদের নিকট সম্রাটসেনার নিকট পরাজিত হন, এবং বন্দী-অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। বাহাদুর সাহের রাজত্বকালে রাজপুত ও শিখগণ দিল্লীর অধীনতা ছেদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সন্নিকটে বাহাদুর সাহ পরলোকগত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম ওশ্বান প্রথমতঃ আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই সময়ে জুল্‌ফকর খাঁ সাম্রাজ্যমধ্যে এক জন ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বাহাদুর সাহের নিকট হইতে আমীর উল্ ওমরা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। জুল্‌ফকর আজিম ওশ্বানের উপর অসন্তুষ্ট থাকায় জ্যেষ্ঠ মৈজুদ্দীন ও অপর দুই ভ্রাতা রফে ওশ্বান ও খোজেস্ত আক্তরের সহিত মিলিত হইয়া ইরাবতীতীরে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে আজিম ওশ্বান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া হস্তীসহ নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ করীম বন্দী ও অবশেষে মৈজুদ্দীনের আদেশে নিহত হন। মৈজুদ্দীন জাহান্দর সাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা স্ব স্ব অভিলাষপূরণের সুযোগ লাভ করিতে না পারায় জাহান্দরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে জুল্‌ফকরের সংগ্রাম পারদর্শিতায় পরাজিত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জাহান্দর সাহ অতি অল্প দিন সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। চরিত্রহীন

হওয়ায় ও কতকগুলি ইতরশ্রেণীর লোকের প্রতি অযথা ক্ষমতা প্রদান করায় তাঁহার রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ক্রমে জুল্‌ফকরও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই সময়ে জাহান্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী, আজিম ওশ্বানের দ্বিতীয় পুত্র ফরখ্‌সের সিংহাসনলাভেরআশায় বাঙ্গলা হইতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে সময়ে আজিম ওশ্বান তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির সাহায্য করিতে বাঙ্গলা হইতে যাত্রা করেন, সেই সময়ে ফরখ্‌সেরের উপর তিনি বাঙ্গলাশাসনের ভার অর্পণ করিয়া আসেন। ফরখ্‌সের এক্ষণে পিতার দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া সিংহাসনলাভের জন্য সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ, হোসেন খাঁ নামক দুই ভ্রাতার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। সৈয়দদ্বয় প্রথমতঃ আজিম সাহের অধীনে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া আজিম ওশ্বানের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হওয়ায় আজিম ওশ্বান এক জনকে প্রয়াগের ও অপরকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা ফরখ্‌সেরকে সঙ্গে লইয়া জাহান্দরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে জাহান্দর তাঁহার এক কর্ম্মচারীর সহিত স্বীয় পুত্র এজুদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন। কোড়া প্রদেশের কেজবা নামক স্থানে উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইলে এজুদ্দীন রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। ফরখ্‌সের সৈয়দদিগের পরামর্শক্রমে তথায় কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। জাহান্দর নিজের জীবন ও সাম্রাজ্য-রক্ষার নিমিত্ত জুলফকরের সমভিব্যাহারে আগরায় উপস্থিত হইলেন। ফরখ্‌সেরও সসৈন্যে নদীর অপর পারে পৌঁছিয়া রাত্রিযোগে সহসা সম্রাটসৈন্য আক্রমণ করিলেন। জুল্‌ফকর সাধ্যানুসারে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু

জাহান্দর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করায় তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। জাহান্দর দিল্লীতে উপস্থিত হইলে জুল্‌ফকরের পিতা আসদ খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। জুল্‌ফকর দাক্ষিণাত্যে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও তাঁহার প্রভুর সহিত ফরখ্‌সেরের আদেশে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। এইরূপে সমস্ত নিষ্কণ্টক করিয়া ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফরখ্‌সের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈয়দ হোসেন ...ীর পদ এবং সৈয়দ আবদুল্লা উজীরের পদ প্রাপ্ত হন। তুর্কানী মোগল-গণের অধিপতি চীনকুলিজ খাঁ আরঙ্গজেবের সময় দাক্ষিণাত্যে স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জুল্‌ফকরের সহিত তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না, তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী প্রাপ্ত হইয়া নিজাম-উল্‌-মুল্ক উপাধি লাভ করেন। এই নিজাম-উল্‌-মুল্কই হায়দারাবাদের নিজামবংশের আদিপুরুষ। ফরখ্‌সেরের রাজত্বসময়ে মাড়বারের অজিত সিংহ বিদ্রোহী হইলে হোসেন খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অজিত সিংহের কন্যার সহিত অবশেষে সম্রাট ফরখ্‌সেরের পরিণয়-ব্যাপার সংসাধিত হয়। দিন দিন সৈয়দগণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হওয়ায়, ও সম্রাট ফরখ্‌সেরের উপর অযথা আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করায় সম্রাট তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সৈয়দেরাও যে বাদসাহের মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই, এমন নহে। এই সময়ে সৈয়দ হোসেন খাঁ দাক্ষি-ণাত্যে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে গমন করেন। বাদসাহ তাঁহাকে গোপনে হত্যা করার জন্য গুজরাটের শাসনকর্ত্তার উপর আদেশ দেন, কিন্তু উক্ত শাসনকর্ত্তা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই

সময়ে শিখগণ মোগলসাম্রাজ্য বারম্বার আক্রমণ করিয়া পরিশেষে আপনারাই পরাজিত হয়। তাহাদের অধিপতি বন্ধু ধৃত ও নিহত হন। হোসেন খাঁ দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন, এবং তাহাদিগকে চৌথ ও দশমুখী নামক করগ্রহণের অনুমতি দিয়া দিল্লী আগমন করেন। এ দিকে সম্রাট সৈয়দদিগের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যতা স্থির করার জন্য মুরদাবাদ হইতে নিজাম-উল্-মুল্ককে, পাটনা হইতে সরবুলন্দ খাঁকে, অম্বর হইতে জয় সিংহকে, ও মাড়বার হইতে স্বীয় শ্বশুর অজিত সিংহকে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারা সম্রাটকে অপদার্থবোধ করিয়া উজীরের পক্ষাবলম্বী হন। কেবল জয়সিংহ তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরখ্‌সের অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ হওয়ায় সাহস অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যখন তিনি শুনিলেন যে, হোসেন আরঙ্গজেবের পৌত্র ও আকবরের একটী পুত্রকে লইয়া দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি সৈয়দদিগের শরণাপন্ন হইয়া পড়েন, সেই সময়ে নগরমধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ফরখ্‌সের অন্তঃপুরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।* কিন্তু পরিশেষে বলপূর্ব্বক বহিরানীত হইয়া কারারুদ্ধ হন। সৈয়দেরা রফে-উল্-কাদেরের পুত্র রফে-উল্-দার্জৎকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন, ইনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিমধ্যে ফরখ্‌সেরেরও আয়ুঃ পূর্ণ হয়। রফে-উল-দার্জতের ভ্রাতা রফে-উদ্দৌলা অতি অল্প দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে

খোজেস্ত আক্তরের পুত্র রোসেন আক্তর সৈয়দগণকর্ত্তৃক সম্রাটের পদে বৃত হন। ইনি মহম্মদ সাহ উপাধি ধারণ করিয়া ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মহম্মদ সাহের রাজত্বের প্রারম্ভে প্রয়াগের শাসনকর্ত্তা অসম্মান প্রকাশ করায় হোসেন খাঁ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই উক্ত শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অধীনতা স্বীকার করায় তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হয়। মহম্মদ আমীন খাঁ নামক জনৈক তুরানী অমাত্য সৈয়দদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিজাম-উল্-মুল্ককে তাঁহারা আপনাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন। নিজাম মালবের শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্বাধীন জমীদার ও দস্যুগণকে দমন করার জন্য অধিক পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহে যত্নবান হন। সৈয়দেরা তাঁহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মুল্তান, খান্দেশ, আগরা ও প্রয়াগের মধ্যে কোন একটীর শাসনকর্ত্তৃত্বগ্রহণে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজাম তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। নিজাম সমস্ত দাক্ষিণাত্য আপনার বশে আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি নর্ম্মদা পার হইয়া আসার দুর্গ ও বুরহানপুর অধিকার করিয়া বসেন। বেরারের সুবাদার জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার ও কতিপয় জমীদার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করায় নিজাম সৈয়দদিগের প্রেরিত সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন। আরঙ্গাবাদের শাসনকর্ত্তা নিজামের সহিত যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। হায়দারাবাদের শাসনকর্ত্তা সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগ দেন। এতদ্ব্যতীত

আমীন খাঁ ও সম্রাট নিজে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ সম্রাটকে লইয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করেন, আমীন খাঁ, সাদৎ খাঁ এবং হায়দর খাঁ প্রভৃতি তাঁহাদের অনুগামী হন। ইঁহাদিগের ষড়যন্ত্রে অবশেষে হায়দরকর্ত্তৃক হোসেন খাঁর হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। আবদুল্লা এই সংবাদ পাইয়া মোগলবংশের অপর এক জনকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া মহম্মদ সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং সাহাপুর নামক স্থানে পরাজিত ও ধৃত হন। মহম্মদ সাহের রাজত্বসময়ে মাড়বারের অজিত সিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, এবং আফগানেরা অস্ত্র ধারণ করিয়া পেশওয়ারের শাসনকর্ত্তার পুত্রকে বন্দী করে। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় নিজামকে উজীরের পদ প্রদান করার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আহ্বান করা হয়। নিজাম সম্রাটকে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় দেখিয়া বাদসাহের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃত্বলাভের ইচ্ছায় দিল্লী হইতে প্রস্থান করেন, এবং মালব ও গুজরাট অধিকার করিয়া বসেন। সম্রাট নিজামের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালব ও গুজরাট বিচ্ছিন্ন করিয়া লন, এবং নিজামকে হত্যা করার জন্য হায়দারাবাদের শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ প্রদান করেন। নিজামের পরামর্শক্রমে বাজীরাওয়ের অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্রাটের কর্ম্মচারীদিগকে পরাজিত করিয়া ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মালব ও গুজরাট অধিকার করে, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা আগরা ও এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, ও ঐ সকল প্রদেশে লুটপাট করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু পরিশেষে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সাদৎ খাঁ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত

হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ই...র অপরপারস্থ নিজে সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, এ... করিয়া নিকটস্থ স্থানসকল অগ্নিদাহে ভস্মীভূত করিয়া তৎসমস্ত ...আক্র- করেন, ও সম্রাটসেনা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে মালবাভিমু... ধাবিত হন। সম্রাট স্বীয় অমাত্যগণের পরামর্শে মহারাষ্ট্রীয়গণকে চৌথ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব নিবৃত্ত হইতে না হইতে পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ নাদির সাহ প্রবল ঝটিকার ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। নাদির খোরাসানের জনৈক মেষপালের পুত্র, তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার তরবারিপরিচালনে আফগানিস্থানে শোণিত-নদী প্রবাহিত হয়, সেই নদীর প্রবল ধারা অবশেষে ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। নাদিরের প্রথমতঃ ভারতবর্ষবিজয়ের অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তাঁহার প্রেরিত দূত ও তাহার রক্ষকগণ জেলালাবাদের অধিবাসীবর্গকর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় এবং সম্রাটের অমাত্যগণ তাহার সমর্থন করায় নাদিরের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি প্রথমতঃ জেলালাবাদের অধিবাসীদিগের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিয়া পেশওয়ার ও লাহোর আপনার করায়ত্ত করেন, পরিশেষে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলে সম্রাট মহম্মদ সাহ তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য কর্ণালে শিবির সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হন। নাদির সহসা সম্রাটসৈন্য আক্রমণ করিয়া আমীর-উল্-ওমরাকে আহত ও সাদৎ খাঁকে বন্দী করিয়া ফেলেন। সাদৎ খাঁ আমীর-উল্-ওমরা পদপ্রাপ্তির জন্য নাদিরের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। নাদির দুই কোটি টাকা পাইলে

আমীন খাঁ ও স৲করিতে পারেন, এইরূপ প্রকাশ করেন, এবং হোসেন খাঁ ‥ ফলাভ করিতে সক্ষম হন। সম্রাট এই সংবাদ আমীন.নিজামকে নাদিরের নিকট প্রেরণ করিলে নিজাম সাদৎ হন, প্রস্তাবিত বিষয় স্থির করিয়া সম্রাটের নিকট ফিরিয়া আসেন, ও আমীর-উল্-ওমরা পদ লাভ করেন। সাদৎ খাঁ হতাশ হইয়া নিজামের বিরুদ্ধে অনেক কথা প্রকাশ করিয়া নাদিরকে এইরূপ বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুস্থানের সম্রাটের পক্ষে দুই কোটি টাকা সামান্ত মাত্র, এমন কি, তাঁহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিও উক্ত টাকা প্রদান করিতে পারেন। এই কথায় নাদিরসাহের অর্থলালসা বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি বাদসাহ ও নিজামকে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন, পরে সসৈন্যে দিল্লী-অভিমুখে ধাবিত হন। নাদিরের দিল্লীতে অবস্থানের দ্বিতীয় রাত্রিতে তিনি হত হইয়াছেন বলিয়া এক জনরব প্রচারিত হওয়ায় দিল্লীবাসিগণ পারসীকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। পর দিন প্রাতঃকালে নাদির নিজে বহির্গত হইয়া সমস্ত নগরবাসীকে বিনাশ করিতে আদেশ দেন, তাহাতে প্রায় আট সহস্র অধিবাসীর রক্তে দিল্লীনগরী রঞ্জিত হইয়া উঠে। ইহার কিছু দিন পরে নাদির দুই কোটি টাকার জন্য সাদৎ খাঁর নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সাদৎ খাঁর মৃত্যু হয়, সাদতের ভ্রাতুষ্পুত্র উক্ত টাকা প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন। নাদির দিল্লীর রাজকোষ এবং অধিবাসী ও ব্যবসায়ীবর্গের নিকট হইতে অপর্য্যাপ্ত অর্থ, জহরত ও অন্যান্য সামগ্রী লাভ করিয়া সাজাহাননির্ম্মিত ময়ুর-সিংহাসন হস্তগত করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত মোগলবংশের এক রাজকুমারীর পরিণয় সংঘটিত

হয়। অবশেষে নাদির সম্রাটের সহিত সিন্ধুনদের অপরপারস্থ কাবুল, টাটা ও মুলতানের কিয়দংশ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল পারস্য যাত্রা করেন। এই আক্রমণে দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় প্রবল হইয়া অধিবাসীদিগকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। এরূপ ভয়াবহ কাণ্ড তৈমুরের ভারতাক্রমণের পর আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইহার পর মহম্মদ সাহ কামার উদ্দীন খাঁকে উজীরের ও নিজামের অনুরোধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী উদ্দীনকে আমীর-উল্-ওম্‌রার পদ প্রদান করেন। নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাজীর জঙ্গ বিদ্রোহী হওয়ায় নিজাম তাহাকে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে বাধ্য হন। সাদৎ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সফদর জঙ্গ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া উঠেন। এই সময়ে আলি মহম্মদ খাঁ নামক রোহিল্লাসর্দ্দার সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করায় উজীর এক ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, রোহিল্লাগণ তাহাকে নিহত করিয়া ফেলে। অযোধ্যার নবাব ইহাদিগের অত্যাচারে [illegible] হইয়া বাদসাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাট [illegible] তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আলি মহম্মদ পরিশে[illegible] স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, ইহার পর আমেদ আবদা[illegible] আক্রমণ করেন। আমেদ আবদালীনামক [illegible] সম্ভূত। তিনি বাল্যকালে নাদিরসাহ কর্তৃক [illegible] বাহকের পদে নিযুক্ত হন। নাদিরের ভার[illegible] তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে আগমন ক[illegible] সৈন্যের মধ্যে আমেদের যথেষ্ট প্র[illegible] নাদিরের মৃত্যুর পর তিনি আফ[illegible]কে

রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন, ও ভারতাক্রমণে অগ্রসর হন। দুরানী উপাধি গ্রহণ করিয়া আমেদ কান্দাহার, কাবুল ও লাহোর অধিকারের পর দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইলে সম্রাট মহম্মদ সাহ উজীরের সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা শতদ্রু পর্য্যন্ত গমন করিলে, আমেদ চতুরতাপূর্ব্বক তাঁহাদের পাশ কাটাইয়া সরহিন্দ নগরে উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন, সম্রাটসেনা তাঁহার আক্রমণের জন্য ধাবিত হইলে কয়েক দিন সামান্য সংগ্রামের পর উজীর প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে সম্রাটসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। রাজপুত-সৈন্যগণ স্বদেশাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মচারী ও উজীরের পুত্রগণ স্থিরভাবে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে আমেদের শিবিরস্থ বারুদে আগুন লাগায় এবং তাহাতে অনেক লোক হত ও আহত হওয়ায় আমেদ বাধ্য হইয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কাবুলাভিমুখে প্রস্থান করেন। ইহার অব্যবহিত পরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট মহম্মদ সাহ পরলোকগত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমেদ সাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। নিজাম-উল্‌মুল্ককে উজীরের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাহা লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। নিজাম ইহার অল্পকাল পরে ১০৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। আমেদ সাহের রাজত্বকালে রোহিল্লা ও আফগানগণ উপদ্রব আরম্ভ করে। আমেদ আবদালীর ভারতাক্রমণের সময় রোহিল্লাসর্দ্দার আলি মহম্মদ আফগানদিগের সহিত যোগ দিয়া নিজের অধিকৃত রোহিল-

খণ্ড হস্তগত করেন, কিন্তু অল্প দিন পরে প্রাণ বিসর্জ্জন করায় সফদর জঙ্গ জনৈক আফগানসর্দ্দারকে হস্তগত করিয়া রোহিল্লা-দিগকে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত সর্দ্দার নিহত হওয়ায় সফদর জঙ্গ তাহার অধিকৃত প্রদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে তদ্বংশীয়গণ অন্যান্য আফগানগণের সাহায্যে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। সফদর জঙ্গ অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে পর্ব্বতগহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য করান। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আমেদ আবদালী কাবুল হইতে লাহোরে উপস্থিত হইয়া লাহোর ও মুল্‌তান দিল্লীসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন, এবং মুল্‌তানের শাসনকর্ত্তা মীর মন্নুর প্রতি উক্ত দুই প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। এই সময়ে নিজামের পৌত্র অর্থাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী উদ্দীনের পুত্র স্বীয় পিতার গাজী উদ্দীন উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আমীর-উল্‌-ওমরার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই ষড়যন্ত্রে সম্রাট ও উজীর সফদর জঙ্গের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সফদর বিরক্ত হইয়া অযোধ্যাগমনে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহাকে যাইতে না দেওয়ায় তিনি জাঠরাজ সুরজমল্লের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। কিছুকাল পরে উভয় পক্ষের গোলযোগ নিবৃত্ত হইলে সফদর অযোধ্যাযাত্রার অনুমতি পান, কিন্তু তাঁহাকে উজীরের পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। কামার উদ্দীন খাঁর পুত্র ইন্তিজাম উদ্দৌলা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। এ দিকে সুরজ-মল্ল আগরাপ্রদেশে অত্যাচার আরম্ভ করেন। আমীর-উল্‌-ওমরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে জাঠদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। আমীর-উল্‌-ওমরার ক্ষমতা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিলে, সম্রাট ও উজীর তাঁহার ক্ষমতাহ্রাসের জন্য সুরজ মল্লের সহিত যোগ

দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে সেকেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করিলে মহারাষ্ট্রীয়সর্দ্দার মলহর রাওকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করেন। আমীর-উল্-ওমরা পরিশেষে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সম্রাটকে ধৃত করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলেন, এবং জাহান্দারের পুত্র এজুদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। এজুদ্দীন দ্বিতীয় আলম্ গীর উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীসাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে বিঘোষিত হন। ঐ সময়ে উজীর সফদর জঙ্গের মৃত্যু হওয়ায় আমীর-উল্-ওমরা নিজেই উজীরের পদ গ্রহণ করেন। সফদরের পুত্র সুজা-উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হন। আবদালীর কর্ম্মচারী মীর মন্নুর মৃত্যু হইলে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে সেই পদ প্রদান করা হয়। মীর মন্নুর স্ত্রী প্রকৃত প্রস্তাবে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। গাজী উদ্দীন মীর মন্নুর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তিনি আবদালীর অধিকার হইতে লাহোর ও মুলতান পুনর্গ্রহণের ইচ্ছা করিয়া স্বীয় শ্বশ্রূর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক উক্ত প্রদেশদ্বয় কাড়িয়া লন। আমেদ তাহা অবগত হইয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলে উজীর তাঁহার শ্বশ্রূর দ্বারা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, আমেদ অনেক অর্থ প্রার্থনা করিয়া দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হন। সম্রাট আলম্ গীর রাজধানীর সমস্ত তোরণদ্বারই উন্মুক্ত করিয়া দেন। উজীর অর্থ-সংগ্রহের জন্য দোয়াবাঞ্চলে যাত্রা করেন। আবদালী সুরজ মল্লের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য-মধ্যে মারীভয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনে বাধ্য হন। আলম্ গীর আমেদের সম্মতিক্রমে উজীরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি

লাভের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নজীব উদ্দৌলা নামক জনৈক রোহিল্লাসর্দ্দারকে আমীর-উল্-ওমরা পদ প্রদান করায় উজীর কতিপয় আফগান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে দিল্লী আক্রমণ করিয়া বসেন। সম্রাটও অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। নজীব উদ্দৌলা রোহিলখণ্ডাভিমুখে প্রস্থান করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ সমগ্র হিন্দুস্থান অধিকার করার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকে। তাহারা রোহিলখণ্ড অধিকার করিলে পর অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলাকর্ত্তৃক পরাজিত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আমেদ সা দুরানী পুনর্ব্বার ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় উজীর গাজী উদ্দীন মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং কৌশলক্রমে সম্রাট আলম্ গীরের হত্যা সম্পাদন করাইয়া আমেদের ভয়ে একটী দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা আমেদের পুত্রের নিকট হইতে লাহোর ও মুল্তান অধিকার করিয়া তাঁহাকে আটক নদীর পারে বিতাড়িত করিয়া দেয়। আমেদ খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করার জন্য পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লাহোর ও মুল্তান পুনরধিকার করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হন। মহারাষ্ট্রীয়সর্দ্দার সিন্ধিয়া তাঁহার আক্রমণে বিচলিত হইয়া উঠেন, অবশেষে দত্তজী সিন্ধিয়াকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ সদাশিব রাও দাক্ষিণাত্য ... সম্রাট উপস্থিত হন, এবং সুরজমল্ল ও গাজী উদ্দীনের সহিত মি... । নাদির দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া আলম্ গীরের পৌত্র ... ধৃত হন, পরে পুত্র জোয়ানবক্তকে সিংহাসন প্রদান করেন ... ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সাদতের ব্দের জানুয়ারি মাসে পানিপথক্ষেত্রে ... অযোধ্যার শাসনকর্ত্তৃত্ব

গণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে সদাশিব রাওপ্রমুখ মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অত্যদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া আফগানদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সদাশিব রাও নিহত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা অবশেষে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। আফগানেরা তাহাদের প্রতি যারপরনাই অত্যাচার করিয়াছিল। ইহার পর আমেদ সা দিল্লী গমন করিয়া আলম্ গীরের পুত্র আলি গহরকে সিংহাসন প্রদান করেন, ও অবশেষে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হন। আলি গহর সাহ আলম্ উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলাকে উজীরের পদ প্রদান করা হয়। সুজা উদ্দৌলা ও সাহ আলম্ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া তাহাদিগের বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হন। অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হইলে, সম্রাট সাহ আলম্ কোড়া ও এলাহাবাদ প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি ইংরাজদিগকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন, এবং নিজে ইংরাজদিগের এক প্রকার বৃত্তিভোগী হইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। সাহ আলম্ পরিশেষে কোড়া ও এলাহাবাদের অধিকার পরিত্যাগ করিলে ইংরাজেরা উক্ত দুই প্রদেশ সুজা উদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করেন। প্রায় সমস্ত প্রদেশ তাঁহার অধিকারে ছিল, তাহাদের মধ্যেও প্রায় রাজধানী বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে অশান্তিময় সংগ্রহের জ। সম্রাট সাহ আলম্ পরিশেষে অন্ধ হইয়া শেষ জীবনে মল্লের নিকট গর্ম্মভোগ করেন। সাহ আলমের পর হইতে দিল্লীর মধ্যে মারীভয় উপাস্থিপ বিলোপপ্রাপ্ত হয়। দিল্লীর মোগলসম্রাটের হন। আলম্ গীর আমেদের-ত ইংরাজদিগের বৃত্তিভোগীমাত্র হইয়া

উঠেন। মোগলের শেষ বংশধর বাহাদুর সাহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীগণের সহিত মিলিত হওয়ায় ইংরাজ সেনাপতি হড্‌সন কর্ত্তৃক ধৃত ও রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হন, এবং তাঁহার দুই পুত্রকে নির্দ্দয়ভাবে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। এইরূপে মোগলবংশের নাম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহারা এক দিন সমগ্র ভারতের সম্রাট বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন, তাঁহাদের বংশধরগণের শেষ দশা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। কে জানিত যে, আকবর ও আরঙ্গজেবের বংশ একেবারে পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে! অথবা তাঁহাদের বংশধরগণকে জীবিকার জন্য সামান্য দরিদ্রের ন্যায় লোকের দ্বারস্থ হইতে হইবে!

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে অযোধ্যারাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের অধীন থাকিলেও কতকগুলি হিন্দুরাজাকর্ত্তৃক প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত। অযোধ্যা। এলাহাবাদের মোগল শাসনকর্ত্তা তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিয়া নামমাত্র দিল্লীর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। উক্ত হিন্দুরাজগণ সকল সময়ে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে নৈশাপুরের পারসীক ব্যবসায়ী সাদৎ আলি খাঁ অযোধ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। হিন্দুরাজগণ প্রথমতঃ তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধা প্রদান করিলেও অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাদৎ খাঁ সম্রাট মহম্মদ সাহের সময় স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নাদির সাহের ভারতাক্রমণে সাদৎ পারসীকগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন, পরে নাদিরের অনুকম্পায় মুক্তিলাভ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সাদতের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সফদর জঙ্গ অযোধ্যার শাসনকর্তৃত্ব

প্রাপ্ত হন। সফদর সম্রাট আমেদ সাহের সময়ে উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তারা নবাব-উজীর নামে অভিহিত হন। সফদরের প্রতিবেশী রোহিল্লাগণের সহিত তাঁহার প্রতিনিয়ত বিবাদ উপস্থিত হইত, এবং তাঁহাদের নিকট তিনি দুই একবার পরাস্তও হইয়াছিলেন। সফদরের রাজ্য অনেকবার মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সফদরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুজা উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাবী ও সম্রাট সাহ আলমের উজীরী প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলার নবাব মীর কাসেম ইংরাজদিগের ভয়ে সুজার শরণাপন্ন হইলে নবাব-উজীর সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সরের যুদ্ধে সুজা উদ্দৌলা ইংরাজদিগের নিকট পরাস্ত হন, ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি-অনুসারে অযোধ্যা রাজ্যের কোড়া ও এলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাট সাহ আলমের অধিকারে আইসে, এবং অযোধ্যা রাজ্যের অন্যান্য অংশ সুজা উদ্দৌলার অধীন থাকে। সুজা উদ্দৌলা পুনর্ব্বার উক্ত দুই প্রদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সাহ আলম্ মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হন। পরে তাহারা যখন উক্ত দুই প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করে, তখন সাহ আলম্ কোড়া ও এলাহাবাদের অধিকার পরিত্যাগ করিলে, ইংরাজেরা ৫০ লক্ষ টাকায় সুজা উদ্দৌলার নিকট উক্ত প্রদেশদ্বয় বিক্রয় করেন, এবং সুজা উদ্দৌলা আপনার সাহায্যের জন্য ইংরাজসৈন্যরক্ষায় ব্যয়ভারবহনে স্বীকৃত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সাহায্যে সুজা উদ্দৌলা রোহিল্লাদিগকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে রোহিলাসর্দ্দার হাফেজ রহমৎ নিহত হন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আসফ উদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত পুনর্ব্বার সন্ধি স্থাপিত হইয়া সৈন্যরক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি ও অযোধ্যারাজ্যের বারাণসী, জৌনপুর ও গাজীপুর-প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। আসফ উদ্দৌলা অর্থাভাবের জন্য তাঁহার মাতা বহু বেগমের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলে ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। ইহাতে জায়গীরগুলি বেগমের হস্তে আইসে। আসফ উদ্দৌলা ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস চুনারে উপস্থিত হইয়া নবাবের সহিত পুনর্ব্বার সন্ধি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অধিকাংশ সৈন্য উঠাইয়া আনেন, ও বেগমের হস্ত হইতে জায়গীরগুলি লইয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। বিদ্রোহী কাশীরাজ চেতসিংহের সহায়তার ছল ধরিয়া আসফ উদ্দৌলার মাতা ও পিতামহীর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া হেষ্টিংস তাঁহাদের প্রতি যারপরনাই অত্যাচার করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আসফ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদৎ আলি খাঁ অযোধ্যারাজ্যের অধীশ্বর হন। সিন্ধিয়া তাঁহার রাজ্যাক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিতে সাদৎ আলির রোহিলখণ্ডপ্রভৃতি অর্দ্ধেক রাজ্য ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হয়। সাদৎ আলির পুত্র গাজী-উদ্দীন হায়দর অযোধ্যার প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ক্রমে অযোধ্যারাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, উহার শেষ রাজা ওয়াজিদ আলি সা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের দ্বারা আনীত হইয়া কলিকাতায় বাস করেন, ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অযোধ্যা ব্রিটিশরাজ্যের একটী প্রধান প্রদেশ হইয়া উঠে।

অযোধ্যার ন্যায় রোহিলখণ্ডও মোগল শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হইত। বরেলী ও মোরাদাবাদ রোহিলখণ্ডের দুইটী রোহিল প্রধান স্থান ছিল। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উক্ত খণ্ড। প্রদেশের হিন্দুরাজগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে মোগলশাসন-কর্ত্তা কনোজে পলাইয়া আসেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহ রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া মোরাদাবাদে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহার পরও হিন্দুরাজগণের প্রাদুর্ভাবের হ্রাস হয় নাই, এবং বরেলীপ্রভৃতি স্থানে তাহাদের আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল হিন্দুরাজারা অবশেষে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করায় তাহাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। ঐ সময়ে রোহিলখণ্ড প্রদেশে বহুসংখ্যক রোহিল্লা পাঠান বাস করিত। তাহাদের সর্দ্দার আলি মহম্মদ সুযোগ পাইয়া বরেলী ও মোরাদাবাদের শাসনকর্ত্তাদিগকে পরাজিত করিয়া, সমস্ত রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া বসেন। পরে আলি মহম্মদ কমায়ুন প্রদেশ অধিকার করিলে, সম্রাট মহম্মদ সাহকর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। আলি মহম্মদ অবশেষে মুক্তিলাভ করেন। আমেদ আবদালীর ভারতাক্রমণের সময় আলি মহম্মদ আফগানদিগের সহিত যোগ দিয়া রোহিলখণ্ড পুনর্ব্বার হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হাফেজ রহমৎ রোহিল্লাদিগের সর্দ্দার হন, এবং রোহিলখণ্ডে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গের সহিত হাফেজ রহমতের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হাফেজ সফদর জঙ্গকে পরাজিত করিয়া অযোধ্যার কিয়দংশ

অধিকার করিলে সফদর জঙ্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে অবশেষে রোহিল্লাদিগকে পরাস্ত করেন। সফদর জঙ্গের পর সুজা-উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হন, তাঁহারও সহিত রোহিল্লাদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্রাট সাহ আলমের সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া হাফেজ রহমৎকে পরাস্ত করায় হাফেজ সুজা-উদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। সুজা-উদ্দৌলা রোহিল্লাদিগের পক্ষে ৪০ লক্ষ টাকার জামিন হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করে। সেই টাকা রোহিল্লারা পরিশোধ করিতে না পারায় সুজা-উদ্দৌলার সহিত অবশেষে তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। সুজা-উদ্দৌলা ইংরাজ গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হাফেজ রহমৎকে যুদ্ধে নিহত করিয়া রোহিলখণ্ড অধিকার করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড ইংরাজাধিকার-ভুক্ত হয়।

পঞ্জাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন মোগলকর্ম্মচারীদ্বারা শাসিত হইত, লাহোর, মুল্‌তান্‌ প্রভৃতি স্থান বিভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। পঞ্জাব অনেকবার আফগানগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সময়ে পঞ্জাবে এক নব বীরজাতির অভ্যুদয় হইতেছিল। গুরু নানকের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়া যাহারা শিখসম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়, সেই ধর্ম্মপ্রাণ বীর জাতির কথাই উল্লিখিত হইতেছে। শিখগণ প্রথমে অত্যন্ত নিরীহপ্রকৃতি ছিল, কিন্তু মুসলমানগণের অত্যাচারে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারা আপনাদিগের অসামান্য শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করে, এবং অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে অত্যদ্ভুত

রণক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া ব্রিটিশকেশরীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। নানক হইতে দশমগুরু গুরুগোবিন্দ শিখদিগের অধিপতি হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ শিখদিগকে বীরজাতি করিয়া তুলেন। মোগলদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি আপন অনুচরগণকে বীরমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার অধীনস্থ সুরক্ষিত স্থানসকল মোগলেরা অধিকার করে, এবং তাঁহার মাতা ও পুত্রকন্যাগণের রক্তে তাহাদের তরবারি রঞ্জিত হইয়া উঠে। গুরুগোবিন্দ নিজে অবশেষে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের নান্দির নামক স্থানে কোন গুপ্ত শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হন। গুরুগোবিন্দের পর তাঁহার শিষ্য বন্দু শিখগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাহাদুর সাহের রাজত্ব কালে মোগলসাম্রাজ্যের অনেক স্থান শিখগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। বন্দু সরহিন্দ প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া সাহারণপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, ও এক দিকে লাহোর ও অন্য দিকে দিল্লী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। মুসল্মানদিগের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য শিখগণ তাহাদিগের মোল্লাগণের প্রাণনাশ, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি অত্যাচার ও অধিবাসীবর্গের রক্তে নগর ও গ্রাম রঞ্জিত করিয়া, তাহাদের মৃতদেহ পশুপক্ষীর আহারার্থ নিক্ষেপ করে। সম্রাট বাহাদুর সাহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, বন্দু তাঁহার অনুচরগণের সহিত একটী দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। মোগলেরা উক্ত দুর্গ অবরোধ করে। ক্রমে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হওয়ায় শিখগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া মোগলব্যূহ ভেদ করিতে যত্নবান্ হয়। তাহাদের অনেকে মোগলের হস্তে নিহত হইলে বন্দু কোন ক্রমে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। সম্রাট বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর দিল্লীতে গোল-যোগ উপস্থিত হইলে শিখগণ পুনর্ব্বার বল সঞ্চয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসে। সম্রাট ফরখ্‌সেরের রাজত্বসময়ে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুল সমদ খাঁ শিখদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া কয়েকটী যুদ্ধের পর শিখদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, এবং বন্ধু ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বন্দী করেন। বন্ধু ৭৪০ জন শিখসহ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে, তথায় তাঁহাদিগকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করা হয়। নাদির সাহের আক্রমণসময়ে শিখেরা আর এক বার মোগলসাম্রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সেবারেও তাহারা পরাজিত হয়। তাহার পর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আমেদ খাঁ দুরানী শিখদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করেন। তাহাদিগের প্রধান স্থান অমৃতসহর আক্রমণের পর তাহাদের ধর্ম্মমন্দির ভঙ্গ, পুষ্করিণী ও অন্যান্য স্থান কর্দ্দম ও গোরক্তে কলুষিত, এবং বহু সংখ্যক শিখযোদ্ধার প্রাণনাশ করিয়া শিখজাতিকে হীন-বীর্য্য করিয়া ফেলেন। ইহার পর পুনর্ব্বার শিখগণ ক্রমে ক্রমে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, ও পরিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজা রণজিত সিংহের সময়ে তাহারা ভারতবর্ষে অজেয় হইয়া উঠে। রণজিত সিংহ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের নিকট হইতে লাহোর বন্দোবস্ত করিয়া লন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পঞ্জাব, পেশওয়ার ও কাশ্মীর প্রভৃতি আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া ফেলেন। রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় শিখসর্দ্দারগণ দরবারের কর্ত্তা হইয়া উঠেন, এবং সেই সময়ে ইংরাজের সহিত শিখগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনেরাল

হার্ডিঞ্জের সময়ে প্রথম শিখযুদ্ধে মুদ্‌কী, ফেরোজসাহ্‌, আলি-ওয়াল ও সেব্রাওনপ্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে অত্যদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শন, ও লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ-দর্প চূর্ণ করিয়া, অবশেষে গুজরাটের শেষ যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হইলে, ইংরাজেরা রণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহের নিকট হইতে স্বহস্তে পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করেন।

রাজপুতানা

সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুসময়ে মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা রাজসিংহের পৌত্র ও জগতসিংহের পুত্র দ্বিতীয় অমর সিংহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে বাহাদুর সাহের সহিত রাণা অমর সিংহের এক সন্ধি স্থাপিত হয়, এই সন্ধিতে চিতোরের পুনর্গঠন, গোবধনিবারণ ও হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ থাকার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সম্রাট আরঙ্গজেব রাজপুতগণের উপর জিজিয়াকর স্থাপন ও রাণার প্রতি অত্যাচার করায়, রাণা মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর বাহাদুর সাহ রাজপুতদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি নিজে রাজপুতকন্যাসম্ভূত হইয়াও রাজপুতদিগের মন হইতে মোগল বিদ্বেষ দূর করিতে সমর্থ হন নাই। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে রাণা অমর সিংহ, মাড়বারের অধিপতি অজিত সিংহ ও অম্বরের জ্যোতির্ব্বিৎ শোবে জয় সিংহ এই তিন জনে বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মোগলদিগের বিরুদ্ধে এক পবিত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই শক্তিত্রয়ের সম্মিলনে মোগলদিগকে যারপরনাই শঙ্কিত হইতে

হইয়াছিল। সম্রাট ফরখ্‌সেরের রাজত্বসময়ে মাড়বারের অজিত সিংহ তাঁহার অধিকার হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। সৈয়দ হোসেন খাঁ অজিতের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে অজিত তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, সম্রাটকে নিয়মিত কর ও আপনার একটী কন্যা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরখ্‌সেরের সহিত অজিতের কন্যার বিবাহ হয়, এই বিবাহ মহাধূমধামে সম্পন্ন হইয়াছিল। যখন রাজস্থানের শক্তিত্রয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই সময়ে মাড়বার ও অম্বরাধিপতি আর কখনও মোগলবংশে কন্যা প্রদান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে অজিত সিংহ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায়, রাণা অমর সিংহ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। ফরখ্‌সেরকর্ত্তৃক জিজিয়াকর পুনঃপ্রচলিত হওয়ায় রাণাকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়। অবশেষে সম্রাট বাধ্য হইয়া জিজিয়ার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন, ও রাণার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার অল্পকাল পরে রাণা অমর সিংহের মৃত্যু হয়। অজিত সিংহ ও জয় সিংহ সৈয়দদিগের সহিত সম্রাট ফরখ্‌সেরের বিবাদের সময় দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। ফরখ্‌সেরের হত্যার পর দিল্লীতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে মহম্মদ সাহের রাজত্ব সময়ে সৈয়দেরা নিহত হইলে অজিত সিংহ পুনর্ব্বার আপনার আধিপত্য বিস্তারে যত্নবান্ হন। মোগলেরা অজিতের দমনের জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অজিত আজমীরপ্রভৃতি মোগলরাজ্যের স্থান অধিকার করিয়া বসেন, পরে জয় সিংহের মধ্যস্থতায় মোগলেরা আজমীর পুনঃপ্রাপ্ত হন। স্বীয় পুত্র অভয় সিংহের চক্রান্তে অজিতের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। অভয় সিংহও

পিতার স্থায় প্রতাপশালী ছিলেন। মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মিবারের রাণা দ্বিতীয় জগৎ সিংহ, মাড়বাররাজ অভয় সিংহ ও জয়পুরাধিপতি শোবে জয় সিংহের মধ্যে পুনর্ব্বার সন্ধি স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। রাণা জগৎ সিংহ জয় সিংহের পুত্র ঈশ্বরী সিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ঈশ্বরী সিংহ আফগানদিগের বিরুদ্ধে শতদ্রু পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ইহার পর রাজপুতানা মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হীনপ্রতাপ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে রাজপুতানার প্রদেশসকল করদ ও মিত্র রাজ্যমধ্যে পরিগণিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুতানা হইতে আর একটী বীরজাতি অভ্যুত্থিত হইয়া মোগলরাজ্যমধ্যে অপরিসীম ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ইহারা ইতিহাসে জাঠ নামে প্রসিদ্ধ। জাঠদিগের সর্দ্দার বদন সিংহ ডিগ্‌নগরে প্রথমে রাজোপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র স্থরজ মল্ল হইতে জাঠগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভরতপুর তাহাদিগের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। দিল্লী, আগরাপ্রভৃতি স্থান অনেকবার জাঠদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থরজ মল্ল উজীর গাজী-উদ্দীন ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। তিনি সদাশিব রাওয়ের সহিত আফগানদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়াছিলেন। পানিপথের যুদ্ধের পর স্থরজ মল্ল আগরা অধিকার করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হইলে তাঁহার পুত্র নাবল সিংহের নিকট হইতে দিল্লীর তাৎকালিক সেনাপতি নজফ খাঁ স্থরজ মল্লের অপর পুত্র রণজিতের সহিত মিলিত হইয়া আগরাপ্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। নজফ খাঁর মৃত্যুর পর ভরতপুর সিন্ধিয়াকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রণজিত সিংহ ইংরাজ-

দিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করেন। ইহার পর জাঠদিগের সহিত ইংরাজগণের গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় লর্ড লেক ও অবশেষে লর্ড কম্বরমিয়ার ভরতপুর আক্রমণ করিয়া জাঠদর্প চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন। ভরতপুর এক্ষণে রাজপুতানার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় করদ ও মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য।

আরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে দাক্ষিণাত্য * মোগলসাম্রাজ্যের অধীন ছিল, কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিয়া দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান মোগলরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বীরজাতি ভারতে যে অত্যদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার গৌরবকাহিনী ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আরঙ্গজেব বাদসাহের হিন্দুর প্রতি অবৈধ অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারেচ্ছায় ধর্ম্মপ্রাণ শিবাজীকর্তৃক এই বীরজাতি গঠিত হয়। বাজীর অমানুষিক সাহস, অদম্য অধ্যবসায়, অপরিসীম বীরত্ব, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কূট রাজনীতিবলে সম্রাট আরঙ্গজেব কিরূপ সন্ত্রাসিত হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মোগলদিগের সহিত অনেক দিন সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ধৃত ও আরঙ্গজেবের আদেশে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিহত হন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র দ্বিতীয় শিবাজী বা সাহু রায়গড়ে মোগলগণকর্তৃক বন্দী হইলে শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম মহারাষ্ট্রীয়গণের নেতা হন। রাজারাম মোগলগণের নিকট হইতে রায়গড়ের পুনরুদ্ধার

দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়।

করেন, এবং খান্দেশ, বেরারপ্রভৃতি স্থানের চৌথ আদায় করিয়া লন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী তারাবাই আপনাকে রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সাহু আরঙ্গজেবের অনুগ্রহে অকুলকোটপ্রভৃতি স্থানের জায়গীর প্রাপ্ত হন ও পরে আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আজিম সাহের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাহু সেতারা অধিকার করিয়া তথায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, ও তারাবাইর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তারাবাইর প্রধান কর্ম্মচারী ধনজী যাদব সাহুর সহিত যোগ দেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের বিবাদ চলিয়াছিল। অবশেষে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তারাবাই পানালা দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার নিকটস্থ কোলাপুরে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে শিবাজীর বংশ দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পরে ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় প্রধান-বর্গের মধ্যে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও অসূয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা দিন দিন হীন হইতে থাকে, ও তাহাদিগের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। ধনজী যাদবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র চন্দ্রসেন যাদব ও কারকুন বালাজী বিশ্বনাথের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তারাবাইর পুত্র বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করায়, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী রামচন্দ্র পন্ত তাঁহার সপত্নীপুত্র শম্ভুজীকে কোলাপুরের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তারাবাই ও তাঁহার পুত্রবধূকে কারারুদ্ধ করেন। চন্দ্রসেন যাদব সাহুর সেনা-পতি নিযুক্ত হইয়া চৌথপ্রভৃতি আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হন। বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হওয়ায়, এবং সাহু বিশ্বনাথের পক্ষসমর্থন করায়, চন্দ্রসেন কোলাপুরে গমন

করেন, পরে তথা হইতে মোগলদিগের সহিত যোগ দেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্ মুল্ক দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। মোগলদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের বিবাদ পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হয়। বিশ্বনাথ আপনার ক্ষমতাবলে মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠেন। তিনি সাহুর মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অচিরাৎ পেশওয়া বা সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদে অভিষিক্ত হন। পেশওয়াপদ পরে বংশগত হইয়া পড়ে। শিবাজীর বংশীয় রাজগণের তাদৃশ ক্ষমতা না থাকায় পেশওয়াগণই মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃত নেতা হইয়া উঠেন। নিজামের স্থলে সৈয়দ হোসেন খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া আসিলে তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সাহুর সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া দিল্লী প্রস্থান করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশওয়ার পদ প্রাপ্ত হন। নিজাম-উল্-মুল্ক, হায়দরাবাদের নিকটস্থ স্থানের চৌথ গ্রহণ না করার জন্য প্রতিনিধি শ্রীপতরাওএর দ্বারা সাহুর সহিত বন্দোবস্তের চেষ্টা করেন, কিন্তু পেশওয়া বাজীরাও তাহা করিতে দেন নাই। ইহার পর নিজাম কোলাপুর ও সেতারার মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভুত্বহ্রাসের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাজীরাওএর কার্য্যতৎপরতায় তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। নিজাম অবশেষে সেতারাপক্ষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। পরে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে সেতারা ও কোলাপুরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার পর বাজীরাও মালব ও গুর্জ্জর অধিকার করিয়া বসেন। এই সময়ে রঘুজী ভোঁসেলা ও মলহররাও হোলকার প্রভৃতি কয়েকজন মহা-

রাষ্ট্রীয়প্রধান আপনাদিগের ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মলহররাও আগরাপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া বসেন। বাজীরাওএর প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় সম্রাট মহম্মদ সাহ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য-প্রেরণের চেষ্টা করেন। সেই সময়ে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা অযোধ্যার নবাব সাদৎ খাঁকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় বাজীরাও একেবারে দিল্লীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। কয়েকটী যুদ্ধের পর যখন তিনি শুনিতে পান যে, সম্রাটের বিপুল সৈন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তিনি গোয়ালিয়রাভিমুখে প্রস্থান করেন, অবশেষে মালব ও ১৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া কঙ্কনপ্রদেশে উপস্থিত হন। নিজামকে দমন করিতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে মালবে আগমন করিতে হয়। ইহার পর রঘুজী ভোঁসেলার সহিত পেশওয়ার বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে নাদির সাহা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রঘুজী ভোঁসেলা বালাজী বাজী-রাওএর বিপক্ষতাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নাগপুর রঘুজীর রাজধানী হওয়ায়, তিনি সহজে বাঙ্গালা আক্রমণে কৃতকার্য্য হইবেন এই ভরসায়, স্বীয় দেওয়ান ভাস্কর পন্তকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। ভাস্কর ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে নিজে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর রঘুজী নিজেই বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই সময়ে বালাজী বাজীরাও বিহারে উপস্থিত হওয়ায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার সাহায্যে রঘুজীকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পন্ত পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে আলিবর্দ্দি খাঁর

বিশ্বাসঘাতকায় আপনার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীসহ নিহত হন। সাহুর একমাত্র পুত্র প্রাণত্যাগ করায় পেশওয়া ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সাহুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে এক নিয়োগপত্র লিখাইয়া লন। তাহাতে তারাবাইএর পৌত্র, শিবাজীর পুত্র রামরাজাকে ভাবী উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ, পেশওয়ার উপর সমস্ত রাজ্যশাসনের ভারার্পণ, এবং কোলাপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। সাহুর জীবনাবসান হইতে না হইতে পেশওয়ার প্রেরিত এক দল অশ্বারোহী সেতারায় উপস্থিত হইয়া পেশওয়ার প্রতিদ্বন্দী প্রতিনিধিকে বন্দী করিয়া একটী দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য দুর্গে প্রেরণ করেন। সাহুর মৃত্যুর পর রঘুজী ভোঁসেলার সহিত পেশওয়ার মিলন সংঘটিত হয়, এবং সেই সময়ে পেশওয়ার আদেশানুসারে পুনা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী হইয়া উঠে। এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বিষম রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। আমেদ আবদালী ভারতাক্রমণ করিয়া বসেন। রোহিল্লারা যারপরনাই উপদ্রব আরম্ভ করে, তাহাদের দমনের জন্য অযোধ্যার নবাবের সাহায্যার্থে হোলকার ও সিন্ধিয়া যাত্রা করেন। এ দিকে হায়দরাবাদ ও কর্ণাটে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। সেই সময় হইতে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের ক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে দিন দিন প্রবল হইতে থাকে। পেশওয়া ইংরাজদিগের সাহায্যে আঙ্গ্রিয়ারাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পুনর্ব্বার এক সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে ওলন্দাজদিগকে মহারাষ্ট্ররাজ্যে বাণিজ্য করিতে বাধা দেওয়া হয়। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের প্রধান মুসল্মান্ বীর হায়দর আলির প্রাদুর্ভাব হয়। হায়দর মহীশূরের হিন্দুরাজবংশের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সিংহাসন

কাড়িয়া লন। মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। সদাশিবরাও ভাও নামক এক জন প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় বীর পেশওয়ার মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার অসীম প্রতাপ ও কার্য্যদক্ষতা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলে। বালাজী বাজীরাওএর ভ্রাতা রঘুনাথরাও বা রাঘব হোলকার ও সিন্ধিয়ার সাহায্যে উজীর গাজী উদ্দীন, বাদসাহ আলম্‌গীর ও আমীর-উল্‌-ওমরা নজীব উদ্দৌলাকে পরাভব করিতে চেষ্টা করেন। রঘুনাথরাও আফগানদিগের হস্ত হইতে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মুল্‌তান ও লাহোর কাড়িয়া লন। আমেদ আবদালী সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া মুল্‌তান ও লাহোর পুনরাধিকারের পর সিন্ধিয়ারাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত করেন; দত্তজী ও জুতেবা সিন্ধিয়া নিহত হন। হোলকারের সৈন্যও আফগানগণকর্ত্তৃক পরাভূত হয়। আফগানগণের অত্যাচার দমন করার জন্য সদাশিবরাও ভাও দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থানে যাত্রা করেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর অধিকার করিয়া বসেন। গাজী উদ্দীনের ষড়যন্ত্রে সম্রাট আলম্‌গীর নিহত হওয়ায়, তাঁহার পৌত্র জোয়ানবক্তকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করা হয়। দিল্লীর সিংহাসন মহারাষ্ট্রীয়দিগের করায়ত্ত হইয়া উঠে, এবং দিল্লী নগরীতে মহারাষ্ট্রীয়-পতাকা উড্ডীন হয়। ইহার পর পানিপথ ক্ষেত্রে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমেদ আবদালীর অধীন আফগানদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের অনেক সর্দ্দার আফগানদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুজাউদ্দৌলা ও নজীব উদ্দৌলা প্রভৃতি প্রধান। আমেদ সার অধীন ৪০,০০০ আফগান

ও পারসীক, ১৩,০০০ ভারতবর্ষীয় অশ্বারোহী, ৩৮,০০০ ভারতবর্ষীয় পদাতিক সৈন্য ও ৩০টী এবং কাহারও কাহারও মতে ৭০টী কামান ছিল। সদাশিবরাওএর অধীন ৭০,০০০ অশ্বারোহী ১৫,০০০ পদাতিক ও অন্যান্য সৈন্য ও অনুচরাদি সহ প্রায় ৩ লক্ষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ২০০ কামান থাকার উল্লেখ দেখা যায়। যুদ্ধারম্ভের প্রথমে মহারাষ্ট্রীয় সেনা-পতি গোবিন্দ পন্ত আবদালীর কর্ম্মচারী আতাই খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাহার পর উভয় পক্ষের কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত উৎসাহসহকারে তিন বার আফগানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাব হয়, কিন্তু আমেদের সাহায্যকারী ভারতবর্ষীয় সর্দ্দারগণ সম্মত না হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ৬ই জানুয়ারি উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ম্মচারী ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দি প্রথমতঃ যুদ্ধারম্ভ করেন। তাঁহার আক্রমণে আবদালীর অধীনস্থ রোহিল্লাগণের অনেকে নিহত হয়। আবদালীর উজীর সদাশিবরাও ও বিশ্বাসরাওকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। আতাই খাঁ এই আক্রমণে জীবন বিসর্জ্জন দেন, এবং উজীরের সৈন্যেরা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে; তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ও সুজা-উদ্দৌলার সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কিন্তু সুজা-উদ্দৌলা অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। সেই সময়ে আমেদ সা আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া সবেগে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপর নিপতিত হন। মহরাষ্ট্রীয়গণ তাঁহার আক্রমণ অসহ্য বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। সদাশিবরাও ও বিশ্বাসরাও ঘোরতর

যুদ্ধ করিয়া অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। আফগানেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে প্রায় দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের মৃতদেহে বসুন্ধরা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ২ লক্ষ লোক নিহত হয়। জনকজী সিন্ধিয়া ও ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দি আহত হইয়া বন্দী হন, অবশেষে তাঁহাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। মলহররাও হোলকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। মহাজী সিন্ধিয়া চিরজীবনের জন্য পদহীন হন, এবং নানা ফড়নবিস পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় জাতির ভাগ্যে যে অশনিপতন হয়, তাহার ভীষণ আঘাতে ক্রমে তাহারা হীনবল হইয়া পড়ে। ইহার অল্পকাল পরেই বালাজী বাজীরাও সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মধুরাও পেশওয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। মধুরাওএর সহিত তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও বা রাঘবের ও রঘুজী ভোঁসেলার পুত্র জনজী ভোঁসেলার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে হায়দর আলির আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়, মধুজীর সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠে, অবশেষে হায়দর মধুজীকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। হায়দরাবাদের নিজামের সহিতও মধুজীর বিবাদ ঘটিয়াছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মলহররাও হোলকারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রবধূ অহল্যা বাই তুকাজী হোলকারকে তাঁহার সৈন্য পরিচালনের ভার প্রদান করেন। মধুরাও পেশওয়া স্বীয় কর্ম্মচারী বিশ্বজী কৃষ্ণকে হিন্দুস্থান অধিকার করিতে প্রেরণ

করেন। বিশ্বজী কৃষ্ণ রাজপুত ও জাঠদিগকে পরাজিত করিয়া হিন্দুস্থানে অনেক প্রকার উপদ্রব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিলখণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সম্রাট সাহ আলম তাহাদের উপদ্রবে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মধুরাওএর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশওয়ার পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে পেশওয়ার ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় ভোঁসেলা, সিন্ধিয়া, হোলকার এবং গায়কোয়াড় প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ক্রমে আপনারা ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, ও নামমাত্র পেশওয়ার বশ্যতা স্বীকার করিতেন। নানা ফড়নবিশ নারায়ণ রাওএর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। নারায়ণরাও ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে নিহত হইলে রঘুনাথরাও কিছুকালের জন্য পেশওয়ার পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে হোলকার ও সিন্ধিয়া অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন, তাঁহারা পঞ্জাব ও অযোধ্যা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নারায়ণরাওএর বিধবা পত্নী এক পুত্র প্রসব করিলে, উক্ত পুত্র মধুরাও নারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া নানা ফড়নবিশ প্রভৃতির চেষ্টায় পেশওয়া পদে অভিষিক্ত হয়। রঘুনাথরাওকে তদবধি পেশওয়াপদ ত্যাগ করিতে হয়। রাঘব পুনর্ব্বার পেশওয়াপদপ্রার্থী হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রার্থনা করিলে, নানা ফড়নবিশ মধুরাও নারায়ণের পক্ষ সমর্থন করিয়া ফরাসীদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ইহাই গবর্ণর জেনেরাল

ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ের প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইয়ের সন্ধিতে তাহা শেষ হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মধুরাও আত্মহত্যা করিলে রঘুনাথরাওএর পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও পেশওয়া-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি হোলকারকর্ত্তৃক উত্যক্ত হইলে, ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়, এই সন্ধিতে বাজীরাও স্বীয় রাজ্যে এক দল ইংরাজ সৈন্য রাখিতে স্বীকৃত হন। তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করায় দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনেরাল মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লির সময় ১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে জেনেরাল ওয়েলেস্‌লি, যিনি পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে অভিহিত হন, অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আসাই ও আরগাঁয়ের যুদ্ধে সিন্ধিয়ার ও নাগপুরের সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়গণ লর্ড লেক কর্ত্তৃক লাসোয়ারী ও দিল্লীর যুদ্ধে পরাজিত হয়। তাহার পর তের বৎসর ব্যাপিয়া ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে কতিপয় সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পেশওয়া, হোলকার, ও ভোঁসেলার সহিত তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া হীনবল হইয়া পড়ে। পেশওয়া ইংরাজদিগের বৃত্তিভোগী হইয়া বিঠুরে বাস করেন। শিবাজীবংশীয় এক জন সেতারায় রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। সেতারারাজকুলের বংশধরের অভাব হওয়ায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সেতারা ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হয়। কোলাপুর অদ্যাপি করদ মিত্ররাজ্যরূপে বিদ্যমান আছে। ভোঁসেলার রাজ্যও ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। সিন্ধিয়া, হোল-

কার ও গায়কোয়াড়ের রাজ্য এক্ষণে করদ ও মিত্ররাজ্য বলিয়া পরিগণিত। যে মহারাষ্ট্রীয়গণ এক সময়ে ভারতের একাধীশ্বর হইবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল, ইংরাজের প্রবল প্রতাপে বীর্য্যহীন হইয়া এক্ষণে তাহারা ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।

মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়কালে মহীশূররাজ্য রাজ-উদেয়ার বংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণকর্ত্তৃক শাসিত হইত, তাঁহারা দ্বারকার যাদববংশ বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতেন। মহীশূর। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংশের বিখ্যাত রাজা চিক্কা দেবরাজের মৃত্যু হইলে, তাহার পর তদ্বংশীয় দুই জনমাত্র রাজা মহীশূরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহাদের রাজত্বাবসানে উক্ত বংশের কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায়, চামরাজ নামে তাঁহাদের কোন নিকট আত্মীয় ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের রাজত্ব লাভ করেন। চামরাজ দেওয়ান ও সেনাপতিকর্ত্তৃক বন্দী হইলে উদেয়ার বংশের দূরসম্পর্কীয় চিক্কা কৃষ্ণরাজ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মহীশূররাজ্যের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইঁহারই রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত মুসল্মান্‌বীর হায়দর আলি মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করেন। হায়দরের পূর্ব্বপুরুষ ফকিরী অবস্থায় পঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। হায়দ-রের পিতা ফতে মহম্মদ সামান্য কর্ম্ম হইতে ক্রমে ফৌজদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ফতে মহম্মদ যুদ্ধে নিহত হইলে হায়দর ও তাঁহার ভ্রাতাভগিনীদিগকে লইয়া হায়দরের মাতা, তাঁহার ভ্রাতা বাঙ্গালোরের কেল্লাদার ইব্রাহিম সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথা হইতে হায়দর তাঁহার ভ্রাতার সহিত মিলিত

হইয়া যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হন, ও আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দাক্ষিণাত্যে ক্রমে ক্রমে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া হায়দর অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন, এবং বেদনোরপ্রভৃতি স্থান হইতে বহু অর্থ লাভ করিয়া, তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন। হায়দরের প্রভুত্ব বৃদ্ধি দেখিয়া ইংরাজেরা নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দের সাহায্যে তাঁহাকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের পর হায়দরকে সন্ধি করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহার পর হায়দরের রাজ্য মধুজী পেশওয়ার সৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, হায়দর মহারাষ্ট্রীয়গণকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ছাড়িয়া দেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলি কর্ণাটপ্রদেশ আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কর্ণেল বেলির অধীনস্থ একদল ইংরাজ সৈন্য নিহত হইলে গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে সার আয়ার কুট হায়দরের দমনের জন্য প্রেরিত হন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র টিপু-সুল্‌তান অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ কার্য্য পরিচালন করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপুর সহিত ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়, তাহাতে পরস্পরের অধিকৃত স্থান পরস্পরকে প্রদান করা হয়। ১৭৯০-৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার টিপুর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটে, ইহাকেই দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ কহে। এই যুদ্ধে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে টিপু পুনর্ব্বার সন্ধি

করিতে বাধ্য হন। তাহাতে তাঁহার রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ ইংরাজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়; তদ্ব্যতীত যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ টিপুকে আরও দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে টিপু ফরাসীদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধপরিচালনের জন্য গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্‌লি মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। একদল ইংরাজসৈন্য মান্দ্রাজ হইতে ও আর এক দল পশ্চিম উপকূল হইতে মহীশূরাভিমুখে অগ্রসর হয়। টিপু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে পলায়ন করেন। জেনেরাল হেরিস শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণে অগ্রসর হইলে টিপু রাজধানী রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হন। পরে তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণ বিভাগ করিয়া লন। কেবল মধ্যস্থলে মহীশূরপ্রদেশ পুরাতন হিন্দুরাজবংশীয় কৃষ্ণরাজকে প্রদত্ত হয়। তদবধি মহীশূর হিন্দুরাজবংশের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। উহা এক্ষণে করদ ও মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য। টিপুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বৃত্তি লাভ করিয়া প্রথমে বেলোরে, পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরেরা কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

হায়দরাবাদ কর্ণাট প্রভৃতি।

যৎকালে নিজাম-উল্-মুল্ক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে তিনি দিল্লীর অধীনতা ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীনরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। হায়দরাবাদ তাঁহার রাজধানী হইয়া উঠে। কর্ণাট নিজামের অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত। উক্ত কর্ম্মচারী সাধারণতঃ কর্ণাটের রাজধানী আর্কটে বাস করিতেন,

ও আর্কটের নবাব বলিয়া অভিহিত হইতেন। এতদ্ভিন্ন ত্রিচিন্না-পল্লী ও তাঞ্জোরপ্রভৃতি রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজার অধীনস্থ ছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ও পর্টুগীজপ্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্যপ্রভাব বিস্তীর্ণ হইতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের ক্ষমতা প্রবল হওয়ায়, উক্ত জাতিদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। তাহারা সর্ব্বদাই আপনাপন ক্ষমতা বিস্তার করিয়া নানাপ্রকার বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িত, এবং সেই সময় হইতে ফরাসী ও ইংরাজের ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্বাঞ্চলে ইংরাজদিগের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কতকগুলি জাহাজ প্রেরিত হয়। ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য লাবার্দ্দনেসের কর্ত্তৃত্বে কতকগুলি জাহাজও আগমন করে। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডল উপকূলে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লাবার্দ্দ-নেস তদানীন্তন ফরাসী শাসনকর্ত্তা ডিউপ্লের সাহায্য চাহিয়া বঞ্চিত হইলে, তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজদিগের মান্দ্রাজ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া বসেন। তাহার পর লাবার্দ্দনেস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান। ডিউপ্লে লাবার্দ্দনেসকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন। লাবার্দ্দনেসের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর ডিউপ্লে ফরাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ফরাসী-দিগের পণ্ডিচেরী আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহা অধিকার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আয়েলাসাপেলের সন্ধিতে ইউ-

রোপে ফরাসী ও ইংরাজের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায়, ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজ প্রত্যর্পণ করা হয়। নিজাম সদতুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাবী প্রদান করেন। সদতুল্লা নিঃসন্তান হওয়ায়, দোস্ত আলি ও বকীর আলি নামক ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত-আলি কর্ণাটের নবাবী প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জামাতা চাঁদ সাহেব রাজস্বসচিবের পদ প্রাপ্ত হন। চাঁদ সাহেব ত্রিচিন্নাপল্লীর হিন্দুরাজাকে বন্দী করিয়া স্বীয় শ্বশুরের অনুমতিক্রমে উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। এই সমস্ত ব্যাপারে নিকটস্থ হিন্দু রাজগণ ভীত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসেলা কর্ণাটে আসিয়া দোস্ত আলিকে বধ করেন, এবং চাঁদ সাহেব মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক বন্দী হইয়া সেতারায় প্রেরিত হন। মুরারিপন্ত নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয়ের উপর ত্রিচিন্নাপল্লীর শাসনভার অর্পিত হয়। দোস্ত আলির পুত্র সফদর আলি অনেক অর্থ দিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হন, কিন্তু আর্কটে থাকিতে সাহসী না হওয়ায়, বেলোরে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার পিতৃব্যপুত্রের প্ররোচনায় তাঁহাকে নিহত হইতে হয়। এই সময়ে নিজাম দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া খোজা আবছুল্লাকে কর্ণাটের নবাবী প্রদান করেন, কিন্তু অল্প কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, আনোয়ার উদ্দীন নিজাম কর্ত্তৃক আর্কটের নবাব নিযুক্ত হন। নিজাম মুরারিপন্তকে ত্রিচিন্নাপল্লী হইতে বিতাড়িত করেন। আনোয়ার উদ্দীন কর্ণাটের নবাব হইলেও সকলে তাঁহাকে বা তদ্বংশীয়দিগকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করিত না। কর্ণাটে তৎকালে সদতুল্লার বংশেরই অধিক সম্মান

ছিল। সদতের বংশে এক মাত্র চাঁদ সাহেব জীবিত ছিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হয়। ডিউপ্লে আপন প্রভুত্ব বিস্তারের ইচ্ছায় চাঁদ সাহেবকে কর্ণাটের সিংহাসনে স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের সময় দোস্ত আলির পরিবারবর্গ জীবন ও সম্মানরক্ষার্থ পণ্ডিচেরীতে প্রেরিত হন। ডিউপ্লে চাঁদ সাহেবের স্ত্রী ও পুত্রকে অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে তিনি বহু অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে চাঁদ সাহেবকে মুক্ত করিয়া লন। নিজামের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাজিরজঙ্গ ও দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। নিজাম স্বীয় দৌহিত্রকে নাকি উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া যান। নাজিরজঙ্গ আপনাকে সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করিলে, মজঃফরজঙ্গ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া চাঁদ সাহেব ও ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রথমতঃ কর্ণাট আক্রমণ করিয়া আনোয়ার উদ্দীনকে হত্যা ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বন্দী করিলে, আনোয়ারের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিন্নাপল্লীতে পলাইয়া যান। মহম্মদ আলি পূর্ব্বে ত্রিচিন্নাপল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার পর মজঃফরজঙ্গপ্রভৃতি তাঞ্জোর আক্রমণ করেন। তাঁহাদিগকে দমন করার জন্য নাজিরজঙ্গকে প্রস্তুত হইতে হয়। ডিউপ্লে চাঁদ সাহেব ও মজঃফরজঙ্গকে সাহায্য করিলেও নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের পরামর্শক্রমে নাজির তাহাতে সম্মত হন নাই। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজেরা নিজাম ও নাজিরের সহিত ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে পরামর্শ

করিতে আরম্ভ করেন, এবং নিজামের আদেশে আনোয়ার উদ্দীন ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। নাজিরজঙ্গ ত্রিচিন্না-পল্লী হইতে মহম্মদ আলিকে আহ্বান করেন, ও ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে মেজর লরেন্স সুবাদারের সাহায্যার্থে প্রেরিত হন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ফরাসীসেনাপতি কোন কারণবশতঃ চাঁদ সাহেব ও মজঃফরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে মজঃফর বন্দী হইলে চাঁদ সাহেব পণ্ডিচেরীতে পলায়ন করেন। ইহার পর ডিউপ্লে পুনর্ব্বার নাজিরের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিয়া পাঠান। সেই সময়ে সুবাদার আর্কটে উপস্থিত হন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মছলীপত্তন অধিকার করিয়া জিন্‌জী দুর্গ গ্রহণের চেষ্টা করে। ফরাসীদিগের প্রস্তাবিত সন্ধিতে স্বীকৃত না হইয়া নাজিরজঙ্গ জিন্‌জী রক্ষার্থ অগ্রসর হন। কিছু দিন যুদ্ধের পর আবার সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সেই সময়ে নাজিরজঙ্গ শিবিরমধ্যে জনৈক বিশ্বাসঘাতককর্ত্তৃক নিহত হইলে, মজঃফরজঙ্গ সুবাদারী লাভ করেন। ডিউপ্লে, কৃষ্ণা হইতে কুমারিকাপর্য্যন্ত সমস্ত করমণ্ডল উপকূলের একমাত্র কর্ত্তা হইয়া উঠেন, ও চাঁদ সাহেবকে তাঁহার সহকারীরূপে আর্কটের নবাব নিযুক্ত করেন। ইহার পর মজঃফরজঙ্গ জনৈক পাঠানকর্ত্তৃক নিহত হইলে ফরাসী সেনাপতি বুসী নিজামের অপর পুত্র সালাবৎ জঙ্গকে সুবাদারী প্রদান করেন। মহম্মদ-আলি ত্রিচিন্নাপল্লীতে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করার চেষ্টা করিলে চাঁদ সাহেব তাহাকে দমন করার জন্য আর্কট হইতে ধাবিত হন। পথিমধ্যে ইংরাজদিগের সহিত একটী যুদ্ধ উপস্থিত

হয়, তাহাতে ইংরাজেরা পিছু হটিয়া ত্রিচিন্নাপল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে চাঁদ সাহেব ও ফরাসীরা মহম্মদ আলিকে কর্ণাট হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। ইংরাজেরা মহম্মদ আলির সাহায্যের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। যৎকালে চাঁদ সাহেব ত্রিচিন্নাপল্লী আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে কাপ্তেন ক্লাইব মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার অনুমতিক্রমে চাঁদ সাহেবের রাজধানী আর্কট আক্রমণে গমন করেন। তিনি বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া বীরদর্পে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আর্কট দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। চাঁদ সাহেব তাঁহার পুত্র রাজা সাহেবকে কতকগুলি সৈন্যসহিত আর্কট পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দেন। রাজা সাহেব পণ্ডিচেরী হইতে কতিপয় ফরাসীর সহিত আর্কটের নিকটে উপস্থিত হইলে ক্লাইব এক দল মহারাষ্ট্রীয়ের সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া অবশেষে পরাজিত করেন। এইরূপে পঞ্চাশ দিন আক্রমণের পর আর্কটদুর্গ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ইহার পর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা সাহেব ও ফরাসীগণ ক্লাইবকর্ত্তৃক কাভ্রীপাক নামক স্থানে পরাজিত হন। এ দিকে মহম্মদ আলি চাঁদ সাহেবের ভয়ে ভীত হইয়া মহীশূর ও তাঞ্জোররাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে মেজর লরেন্স ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহম্মদ আলির সাহায্যার্থে প্রেরিত হন। চাঁদ সাহেব ও ফরাসীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে ফরাসীসেনাপতি ডাউতে উইল বন্দী ও চাঁদ সাহেব তাঞ্জোরসেনাপতির হস্তে পতিত হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। মহীশূরসৈন্য ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ত্রিচিন্নাপল্লী অধিকার করিয়া বসে। ইংরাজদিগের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও

তাহারা ত্রিচিন্নাপল্লী পরিত্যাগ করে নাই। ইহার পর ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিবাদ চলিতে থাকে। মেজর লরেন্স ফরাসীদিগকে বাহুর নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। অনেক দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। মহম্মদ আলি কর্ণাটের নবাবী প্রাপ্ত হন। ফরাসী সেনাপতি বুসী সুবাদার সলাবৎজঙ্গের পরামর্শদাতারূপে তাঁহার নিকটে ছিলেন। নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজীউদ্দীন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে সলাবৎজঙ্গ ও বুসীকে আক্রমণ করিবার জন্য দিল্লী হইতে দাক্ষি-ণাত্যে আগমন করেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহা-রাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধ চালাইতে থাকে, অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। বুসী সুবাদারের নিকট হইতে ফরাসীদিগের জন্য সমগ্র উত্তর সরকার প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতে ফরাসীদিগকে করমণ্ডল উপকূলে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করিয়া তুলে। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডিউপ্লে ইউরোপ যাত্রা করিলে বুসী ফরাসীদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি সলাবৎজঙ্গের সহিত দাক্ষিণাত্যবিজয়ে প্রবৃত্ত হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, লালী নামক জনৈক ফরাসী সেনাপতি ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং ভারতবর্ষেও ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বুসী ও লালী উভয়ে মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে লালী ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ ও আর্কটপ্রভৃতি অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বোম্বাই হইতে আড্মিরাল পোকরের অধীন কতকগুলি

ব্রিটিশ জাহাজ মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়, এবং ফরাসী ও ইংরাজের মধ্যে জলযুদ্ধ চলিতে থাকে। তাহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বুন্দীবাসের সংগ্রামে ফরাসীরা ইংরাজকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে কর্ণেল কূট অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা আর্কট অধিকারের পর পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিলে, পণ্ডিচেরীবাসিগণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। ইহার পর হইতে ফরাসীরা ভারতবর্ষে হতবীর্য্য হইতে আরব্ধ হয়, এবং ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতের একেশ্বর হইয়া উঠেন। এক্ষণে চন্দননগর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র নগর ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। কিন্তু ইংরাজেরা আসমুদ্র হিমালয়ের সম্রাটরূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন।

বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা।

বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার সুবাদারের অধীন ছিল, বিহার কোন কোন সময়ে স্বতন্ত্র সুবাদারের অধীন থাকিত। বাঙ্গলার সুবাদারের অধীন, বিহার ও উড়িষ্যায় দুই জন নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হইতেন। সাধারণতঃ পাটনা ও কটক উক্ত প্রদেশদ্বয়ের রাজধানী ছিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার সুবাদারের রাজধানী হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যায় যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে তৎসমস্তই প্রদত্ত হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ পরিত্যক্ত হইল।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ—হিন্দু ও বৌদ্ধ কাল।

মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক কাল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ যে সময়ে মোগল গৌরবচন্দ্রমা ধীরে ধীরে অস্তোন্মুখ হইতেছিল, এবং মহারাষ্ট্রীয়, ইংরাজ ও ফরাসী প্রতাপালোকে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় হইতে মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গলারাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়া, উক্ত প্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে উপস্থিত হন, পরে তথা হইতে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী মখসুসাবাদ বা মখসুদাবাদে আপনার আবাস স্থান স্থাপন করেন। উক্ত মখসুদাবাদ ক্রমে বাঙ্গলার রাজধানী হইয়া মুর্শিদকুলির নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হইয়া উঠে, ও ক্রমে ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করে। তদবধি মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস আরব্ধ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার রাজধানী হওয়ায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সহিত সমগ্র বঙ্গরাজ্যের ইতিবৃত্ত বিজড়িত হইয়া জগতের সমক্ষে তাহাকে গৌরবময় করিয়া তুলে। মুর্শিদাবাদের উক্ত প্রকৃত ইতিহাস প্রদান করার পূর্ব্বে আমরা একবার তাহার প্রাচীন সময়ের বিবরণাবলী আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদের বিবরণ প্রদান করার পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী একটী বিস্তৃত নগররূপে বিদ্যমান ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমতঃ ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরেই রাজধানী স্থাপন করেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ জনপদ, মুর্শিদাবাদপ্রদেশ নামে অভিহিত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে যে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ তাহার অন্যতম। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাও ভাগীরথীর উভয় তীর অতিক্রম করিয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। এই সমস্ত কারণে আমরা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী বিস্তৃত মুর্শিদাবাদপ্রদেশেরই প্রাচীন অবস্থান প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রাচীন মুর্শিদাবাদের অবস্থান স্থির করিতে হইলে, প্রাচ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যক হইয়া উঠে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, সুহ্ম, উৎকলপ্রভৃতি প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, এমন কি, বৈদিক গ্রন্থে পর্য্যন্ত উক্ত অঙ্গ, বঙ্গপ্রভৃতির উল্লেখ আছে।* মুর্শিদাবাদ প্রাচীনকালে

* "গন্ধারিভ্যো মুজবন্তোহঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ" (অথর্ব্ব সংহিতা ৫।২২।১৪)

"অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেহন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮)

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের-পাদান্যন্যা অর্কমভিতো নিবিশ্র" ইতি (ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১)

ঐ সকল রাজ্যের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়। উক্ত বিষয় স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ গঙ্গা ও ভাগীরথীর অবস্থান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত অঙ্গ, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতিকে তত্তৎদেশবাসী বুঝাইতেছে।

অঙ্গের নামকরণসম্বন্ধে রামায়ণে রামের প্রতি বিশ্বামিত্রের উক্তিতে এই রূপ লিখিত আছে যে, মহাদেবের ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিপাতে যে স্থানে কন্দর্পের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই স্থানের নাম অঙ্গ হইয়াছে, এবং তদবধি কন্দর্পের নামও অনঙ্গ হয়।

"তত্র গাত্রং হৃতং তস্য নির্দ্দগ্ধস্য মহাত্মনা।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ॥
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদাপ্রভৃতি রাঘব!।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ॥"

রাঃ বালকাণ্ড ২৩শ স।

দশরথের বন্ধু রাজা লোমপাদ অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। বঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও রামায়ণে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। রামের রাজ্যাভিষেক শুনিয়া কৈকেয়ী অভিমানপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল এই সমুদায়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন, ধান্য, পশু প্রভৃতি যা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়ই আমার। ইহাদের মধ্যে যাহা তোমার লইতে ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশীকোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততোবৃণীষ্ব কৈকেয়ি! যদ্যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥

রাঃ অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম স।

ভাগীরথী ও পদ্মা।

গঙ্গা ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নদী। বৈদিক কাল হইতে তাহার অস্তিত্বের উল্লেখ দেখা যায়।* রামায়ণের সময় হইতে উক্ত গঙ্গা ভাগীরথী নামেও অভিহিত হয়। ভগীরথকর্ত্তৃক গঙ্গাদেবী ভূতলে আনীত হন বলিয়া, তিনি ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।+ বর্ত্তমান কালে ভাগীরথীকে গঙ্গার একটী শাখারূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে এই ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল; পরে পদ্মা প্রধান প্রবাহ হইয়া উঠিলে, ভাগীরথী

মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণাদিতে চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার পঞ্চ পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ প্রদেশের নাম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে।

অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"

মহা। আদি পর্ব্ব, ১০৪ম অধ্যায়।

"হেমাৎ সুতপাঃ, তস্মাদ্বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ। ১৮ অধ্যায়।

বলিঃ সুতপসো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ।
সুহ্মপৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া অনপানস্তথাঙ্গতঃ॥

গারুড়ে ১৪৪ অধ্যায়, শব্দকল্পদ্রুমধৃতবচনং।

মৎস্য পুরাণেও "অঙ্গ বঙ্গ মদ্‌গুরকা অন্তর্গিরির্বহির্গির" ইত্যাদি জনপদের উল্লেখ আছে।

* ঋগ্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ দেখা যায়।

\+ ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিতেছেন যে, তোমাকর্ত্তৃক গঙ্গা ভূতলে আনীত হইয়া সগরের পুত্রগণের উদ্ধার করায় গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে ভাগীরথী নামে অভিহিতা হইবেন।

সঙ্কীর্ণকায় হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, গঙ্গা তাহার প্রাচীন প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী হইতে পূর্ব্ব মুখে সরিয়া ক্রমে পদ্মাকে আপনার প্রধান প্রবাহ করিয়া তুলিয়াছে।* তাঁহাদের মতে পদ্মা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে যে স্থানে পদ্মা অবস্থিত, পূর্ব্বে তাহা যে সমুদ্রগর্ভে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণের সময়ে নিম্ন বঙ্গের অনেক স্থান সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং বর্ত্তমান পদ্মা যে

"ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা॥
গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।"

রাঃ বালকাণ্ড ৪৪শ সর্গ।

* "Evident traces exist of the Bhagirutti having at this spot [Rangamutty] been formerly the main bed of the Ganges, before it changed its course towards Baulea and Pubna." Captain Layard, Asiatic Society's Journal, Vol. XXII. Page 281.

"There can hardly be a doubt that the present Bhagirathi represents the old channel of the Ganges, by which the greater part of the waters of the sacred river were formerly brought down to the sea. The most ancient traditions, the traces of ruined cities, and the indelible record of names, all lead to this conclusion. The geological evidence just adduced proves to demonstration that the nature of the soil could never have permitted the Ganges to have flowed farther to the east than the present course of the Bhagirathi,

স্থানে অবস্থিত, তাহাও যে রামায়ণের সময়ে সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল; এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু রামায়ণের সময়ে পদ্মার অস্তিত্ব যে একেবারেই ছিল না, এমন নহে। সে সময়ে

which is thus fixed as the limit of the Bengal delta, and the ancient means of communication with the interior. The above suggestions are chiefly taken from captain Sherwill's Report on the Rivers of Bengal, dated February 1857, in which that officer pointed out the historical importance and the practical teaching to be derived from a proper consideration of the geology of Murshidabad District." Hunter's Statistical Account of Murshidabad—pp 22—23.

"Yet the strange phenomenon in river development is only a repetition of great change, which by the formation of the Padma cut off Nadia and Jessore from the great district of Rajshahi, and reduced the Bhagirathi from a vast river, on which grew up nearly all the capitals of early Hindu Bengal, to a petty stream, barred every few miles by sand banks, and which only European science now keeps sufficiently open to carry country boats of a few tons burthen. * * * Before the Padma channel of the Ganges was formed, South Eastern Bengal must have extended up to the Bhagirathi, but it has since then receded, century by century, the district of Nadia being first withdrawn, as the rivers to use the vernacular expression, "died," and then the western half of Jessore." O'Donnell's Census of India, 1891, Vol III (The Report pp. 39-40)

পদ্মা, বর্ত্তমান পদ্মা হইতে আরও উত্তরে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ভাগীরথী বা গঙ্গার সহিত তখন তাহার যোগ হয় নাই, বরঞ্চ তাহা বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। পরে সমুদ্রে দ্বীপসৃজন আরব্ধ হইলে সমুদ্রের একাংশ প্রাচীন পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া নদীর আকার ধারণ করে ও বর্ত্তমান পদ্মা হইয়া উঠে। প্রাচীন পদ্মা রামায়ণে নলিনী নামে অভিহিত হইয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ শঙ্কর মহারাজ ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে স্বীয় জটাটবী হইতে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করেন, তথা হইতে গঙ্গা সপ্তধারে প্রবাহিত হন। তাঁহার হ্লাদিনী, পাবনী, ও নলিনী নামে তিন স্রোত পূর্ব্ব দিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে এবং অবশিষ্ট আর একটী স্রোত মহারাজ ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। * এই স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী। সুতরাং ভাগীরথী ও নলিনী যে দুইটী বিভিন্ন নদী, তাহা রামায়ণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত নলিনী যে পদ্মার নামান্তর মাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবীভাগবতে

* "বিসসর্জ্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্তস্রোতাংসি জজ্ঞিরে॥
হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গা শিবজলাঃ শুভাঃ॥
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ॥
সপ্তমী চান্বগাৎ তাসাং ভগীরথরথং তদা।"

রা। বালকাণ্ড। ৪৩শ স।

ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও * গঙ্গা ও পদ্মা দুইটী বিভিন্ন নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে লিখিত আছে যে, বৈকুণ্ঠ-ধামে শ্রীহরির তিন ভার্য্যা গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী বা পদ্মা বিবাদ করিয়া পরস্পরে পরস্পরকে নদীরূপে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য শাপ প্রদান করেন। পরে ভগবানের আদেশে তিন জনেই ভারতে নদীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক আনীত হন, এবং লক্ষ্মী পদ্মাবতীনদী ও তুলসীবৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন।† সুতরাং দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে ভাগী-রথী ও পদ্মা যে স্বতন্ত্র নদী তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই পদ্মা এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত, তাহা হইতে যে আরও উত্তরে প্রবাহিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রমে সমুদ্রগর্ভে

* দেবীভাগবতের নবম স্কন্ধ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ড একরূপ। একটী হইতে অপরটী গৃহীত বলিয়া বোধ হয়।

† "শ্রীভগবানুবাচ।

*　　*　　*

ভারতী যাতু কলয়া সরিদ্রূপা চ ভারতে।
অর্দ্ধা সা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্গৃহে॥
ভগীরথেন সা নীতা গঙ্গা যাস্যতি ভারতে।
পূতং কর্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্গৃহে॥

*　　*　　*

কলাংশাংশেন গচ্ছ ত্বং ভারতে বামলোচনে।
পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী॥"

দেবীভাগবত। ৯ম স্কন্ধ। ৬ষ্ঠ অ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতিখণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়েও ঐরূপ লিখিত আছে। এদেশীয় গ্রন্থে দুই একটী কথার পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

বর্ত্তমান পদ্মার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং গঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথী হইতে ক্রমে পূর্ব্ব মুখে বর্ত্তমান পদ্মাপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই গঙ্গা বা ভাগীরথী পূর্ব্বকালে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা আলোচনার প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এক্ষণে যে স্থানে মুর্শিদাবাদ প্রদেশ অবস্থিত, রামায়ণের সময় সেই পর্য্যন্ত অথবা নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গা বা ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছিল।* আমাদের বিবেচনায় রামায়ণের সময় নবদ্বীপ পর্য্যন্তই সমুদ্রগর্ভ থাকার সম্ভব, কারণ গঙ্গার ভাগীরথীনাম কেবল বর্ত্তমান ভাগীরথী নদী ও তাহার সংলগ্ন গঙ্গার কতকাংশ দ্বারা বুঝা গিয়া থাকে। সুতরাং রামায়ণের সময় হইতে গঙ্গার ভাগীরথী নাম হইতে আরব্ধ হওয়ায়, ও বর্ত্তমান ভাগীরথী নদীর কেবল উক্ত নাম থাকায় রামায়ণের সময়ে যে তাহার কতকাংশ বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ ভগীরথকর্ত্তৃক আনীত গঙ্গা যে স্থানে সমুদ্রে পতিত হইয়া ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষ সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটে ভগীরথের নামানুসারে তাঁহার ভাগীরথী নাম প্রসিদ্ধ থাকা সম্ভব। এই জন্য বর্ত্তমান ভাগীরথী নদীর কতকাংশ যে, সে সময়ে বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মহাভারতের সময়ে নিম্নবঙ্গের যে স্থান সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল, তথায় দ্বীপসৃজন আরব্ধ হইয়া, সমুদ্রকে শত শত নদীর

* Babu Nabinchandra Das in his "A Note on the Ancient Geography of Asia, compiled from Valmiki Ramayana." pp 20-21.

আকার করিয়া তুলিয়াছিল, এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমের নিকট ঐরূপ শত শত নদীর আকার দৃষ্ট হইত। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা * ও কৌশিকী তীর্থে স্নানাদি করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হন, ও তথায় পঞ্চশত নদীমধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন।† ইহাতে বুঝা যায় যে, মহাভারতের সময় হইতে সমুদ্রগর্ভস্থ নিম্নবঙ্গে দ্বীপসৃজন আরব্ধ হইয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তমান নিম্নবঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তুলে। / কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ভাগীরথীর মোহানার নিকটে প্রতারিত হওয়ায় পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছিলেন, পরে পুনর্ব্বার উজানে প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীরূপে

* এই নন্দা সম্ভবতঃ রামায়ণের হ্লাদিনী ও বর্ত্তমান মহানন্দা।

† "ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়!।
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ!।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত! ॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব। ১১৪ অ।

কালিদাসও রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে গঙ্গাস্রোতের মধ্যস্থিত দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন।

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥"

সমুদ্রে পতিত হন।* ইহাতে এইরূপ অনুমান হয় যে, পদ্মাই গঙ্গার প্রথম প্রবাহ ছিল, পরে ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাগীরথী পূর্ব্বে যে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী আধুনিক গ্রন্থ হওয়ায় তাহাদের উক্ত বিবরণে আস্থা স্থাপন করা যায় না। ফলতঃ গঙ্গা তাহার প্রাচীন প্রবাহ ভাগীরথী হইতে পূর্ব্ব মুখে সরিয়া ক্রমে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। ভাগী-

* "পদ্মনামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়॥
যোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিগ যাইতে আমার নহে পথ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

"আসিতে হুতির কাছে, ভগীরথ পড়ে পাছে,
শঙ্খাসুর করিল মোহিত।
আগে শঙ্খ বাজাইয়া, চলিল গঙ্গারে নিয়া।

* * *

রাজা বলে নিবেদন, আছে দিক্ নিরূপণ,
যাইতে যে হবে মা দক্ষিণে!
এ যে পূর্ব্ব বহু দূর, ভুলাইল শঙ্খাসুর,
ফিরে চল, দয়া করি দীনে॥

* * *

হুতির নিকটে গঙ্গা আইল ফিরিয়া।
চলিল কিরীটকোণা দক্ষিণে রাখিয়া॥

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রথীর পশ্চিমতীরস্থ বন্ধুর, ঈষৎ পীতবর্ণাভ ও কঙ্করময় কঠিন মৃত্তিকা দেখিয়া পশ্চিম মুর্শিদাবাদের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠে, এবং ভাগীরথী তাহার বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে আরও পশ্চিমে যে প্রবাহিত ছিল না তাহাও প্রতিপন্ন হয়। আবার ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ পললময়, আর্দ্র, সমতল ভূভাগ দেখিয়া তাহা যে ক্রমে ক্রমে চরভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও বেশ বুঝা যায়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ প্রাচীন হিন্দু রাজধানীগুলির চিহ্ন তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, এবং ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত অসংখ্য বিল ও নদী তাহাদের স্থানপরিবর্ত্তনের প্রমাণ-স্বরূপে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে নদীধর্ম্মানুসারে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহেরও পূর্ব্বে ও পশ্চিমে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে।

বিভিন্ন বিভাগ কালে মুর্শিদাবাদের অবস্থান।

ভাগীরথী গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ হইলে মুর্শিদাবাদপ্রদেশ প্রাচীন কোন্ কোন্ জনপদের অন্তর্গত ছিল, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন কাল হইতে প্রাচ্য ভারতবর্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রন্থাদির বর্ণনায় এইরূপ অনুমান হয় যে, গঙ্গা বা ভাগীরথীর পশ্চিমে অঙ্গ ও পূর্ব্বে পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই দুই রাজ্য অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান মালদহপ্রদেশ পুণ্ড্র বলিয়া স্থির হয়, বঙ্গ তাহার দক্ষিণপূর্ব্ব ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মুর্শিদাবাদপ্রদেশের পশ্চিম ভাগ প্রাচীন কালে অঙ্গরাজ্যের ও পূর্ব্ব ভাগ বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। রাঙ্গামাটী পশ্চিম মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন স্থান। তথায়

দাতাকর্ণের আবাস স্থান ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কর্ণ যে অঙ্গদেশাধিপতি ছিলেন, তাহা মহাভারতপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং উক্ত প্রবাদ হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, পশ্চিম মুর্শিদাবাদ অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই অঙ্গ, বঙ্গ বিভাগের পর ভাগীরথীর পশ্চিম ও পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী প্রদেশ গৌড় ও বঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, এবং গৌড় ও বঙ্গ উভয়েই সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত।* কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড় ও বঙ্গ দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বঙ্গের, ও বঙ্গ হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত গৌড়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।† ইহাতে বুঝা যায় যে, গৌড় অনেক পরিমাণে প্রাচীন অঙ্গ ও পুণ্ড্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্ত্তমান ভাগীরথীপ্রবাহ বঙ্গ ও গৌড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেন। গৌড় ও বঙ্গ যে দুইটী

* ভারতে অনেক গৌড় ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পঞ্চগৌড় একটী প্রসিদ্ধ কথা। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের কথা এই রূপ লিখিত আছে—"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে। গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ইহাদের মধ্যে বঙ্গের নিকটস্থ গৌড়ই প্রসিদ্ধ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পাণিনির "অরিষ্টগৌড় পূর্ব্বে চ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহার প্রমাণ হয়, গৌড় ও বঙ্গ এককালে সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত।

† "রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশোময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥"

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র। ৭ পটল।

পৃথক্ প্রদেশ তাহা পরবর্ত্তী কোন কোনও গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। বরাহমিহির বঙ্গ ও গৌড়কে দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। * কবিকঙ্কণের বর্ণনা হইতেও গৌড় ও বঙ্গের পার্থক্য বুঝা যায়। † ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গৌড় প্রদেশ হইলে মুর্শিদাবাদের পশ্চিম ভাগ গৌড়ের ও পূর্ব্ব ভাগ বঙ্গের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ যে সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন ‡ সে সময়ে তিনি গৌড়, বঙ্গ ইত্যাদি বিভাগের উল্লেখ না করিয়া কামরূপ, পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, উড়িষ্যা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি গৌড়ের অন্তর্গত ও সমতট বঙ্গের নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। চীনপরিব্রাজক যাহাকে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতে গৌড়াধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বাণভট্ট ও হিউয়েন সিয়াঙ্গ উভয়ে যে প্রায়

* "উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক পৌণ্ড্রোৎকলকাশি-মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রালিপ্তিক-কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ॥
আগ্নেয্যাং দিশি কোশল-কলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ১৪।৭-৮।)

উপবঙ্গ পরবর্ত্তী বাগড়ি বিভাগের নামান্তর বলিয়া বোধ হয়।

† "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ,
গৌড়বঙ্গউৎকল অধিপ।"

‡ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে তাঁহার উপস্থিতির অনুমান হয়। পরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

সমসাময়িক, সে বিষয়ে মতভেদ নাই। পশ্চিম মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী কর্ণসুবর্ণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম মুর্শিদাবাদ যে গৌড়দেশস্থ কর্ণসুবর্ণবিভাগের অন্তর্গত ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, এবং পূর্ব্ব মুর্শিদাবাদ সমতট বা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল, ইহাও অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। গৌড়, বঙ্গ বিভাগের পর আমরা মিথিলা, রাঢ়, উপবঙ্গ বা বাগড়ি, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই পাঁচ বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, বল্লালসেন দেব বঙ্গ বা গৌড় রাজ্যকে এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত পাঁচ ভাগের মধ্যে রাঢ় প্রদেশ অনেক পরিমাণে অঙ্গ বা গৌড়ের স্থান অধিকার করে, এবং তাহা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে বিভক্ত হয়।* ভাগীরথী, পদ্মা ও সমুদ্রের মধ্যস্থিত বদ্বীপ উপবঙ্গ বা বাগড়ি নামে অভিহিত হয়, সুতরাং এই বাগড়ি যে প্রাচীন বঙ্গের একাংশমাত্র তাহা বুঝা যাইতেছে। † রাঢ় বিভাগ সেন

* দিগ্বিজয়প্রকাশে রাঢ়ের যে সীমানির্দ্দেশ আছে তাহা আংশিক বলিয়া বোধ হয়, যথা——

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

এখানে গৌড়কে বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী বুঝাইতেছে, ও বীরদেশ বীরভূমির নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিথিলার পর হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিম উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই রাঢ় বলিয়া বিখ্যাত।

† এই বাগড়ি বরাহমিহিরপ্রভৃতির উল্লিখিত উপবঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। বরাহমিহির বঙ্গ ও উপবঙ্গের পার্থক্য করিয়াছেন। দিগ্বিজয়প্রকাশে উপবঙ্গের যে সীমানির্দ্দেশ আছে তাহাতে তাহাকে বাগড়ির একাংশ বলিয়া বোধ হয়। যথা—

বংশের সময় হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেও, বহুপূর্ব্ব হইতে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস গ্যাঙ্গ্যারিডি (Gangaridai) নামে এক জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণ-বাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্বসীমা। ইহাতে তাহাকে রাঢ়দেশই বুঝাইতেছে, এবং তাঁহার গ্যাঙ্গ্যারিডি যে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারাষ্ট্রের অপভ্রংশ তাহাও অনুমান করা অসঙ্গত নহে।* গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্ত বর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, ইহা প্রস্তরফলকে লিখিত আছে। মন্দ-সরের শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে লাড় দেশ হইতে একদল তন্তুবায় দশপুর নগরে গিয়া বাস করে। সিংহলের প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ মহাবংশে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত লাঢ় নামক স্থানের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরু-মলয়ের শিলালিপিতে বঙ্গাল দেশ নামের সহিত তক্কণ লাড়ম ও উত্তির লাড়ম জনপদের উল্লেখ আছে। উক্ত লাঢ় রাঢ়, ও তক্কন লাড়ম ও উত্তির লাড়ম, দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে অনুত্তম গৌড়রাজ্যে নিরুপমা রাঢ়াপুরীর কথা লিখিত আছে।† সুতরাং রাঢ় প্রদেশ

ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যপবঙ্গো হি ভূমিপ॥
উপবঙ্গে যশোরাদি দেশাঃ কাননসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাস্থ নদীষু চ॥"

কিন্তু বাগড়ি ভাগীরথীর পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সম্ভবতঃ সমস্ত বাগড়িই পূর্ব্বে উপবঙ্গ নামেই অভিহিত ছিল।

* প্রচার, ১ম। ৯পৃ। † "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"

বহুপূর্ব্ব হইতে যে বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ সেনবংশের সময়ে তাহা একটী প্রসিদ্ধ বিভাগ হইয়া উঠে, এবং অদ্যাবধি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ সমগ্র ভূভাগই রাঢ় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরস্থ ভূভাগ অদ্যাপি বাগড়ি নামে প্রসিদ্ধ, সুতরাং মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ উত্তর রাঢ়ের ও পূর্ব্বাংশ উপবঙ্গ বা বাগড়ির অন্তর্গত। মুসল্মান-বিজয়ের পর মুর্শিদাবাদ গৌড়ের পাঠান নরপতিগণের অধীনে ছিল। কিন্তু সে সময়ে বঙ্গরাজ্য কিরূপভাবে বিভক্ত হইয়াছিল. তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোগলকেশরী আকবর বাদসাহের রাজত্বসময়ে বঙ্গবিজয়ের পর তোড়রমল সুবা বাঙ্গলাকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের কতকাংশ সরকার উদম্বর বা টাঁড়ার ও কতকাংশ সরকার সেরিফাবাদের অধীন হয়। উক্ত সরকার উদম্বরের অন্তর্গত চুনাখালী পরগণায় মুর্শিদাবাদ নগর স্থাপিত হয়। সরকার সেরিফাবাদের অন্তর্গত ফতেসিংহ মুর্শিদাবাদের একটী প্রসিদ্ধ পরগণা। এই সরকার ও পরগণা বিভাগের সময়, ভাগীরথীকে প্রাকৃতিক সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, এই জন্য তাহারা ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পারেই বিস্তৃত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গলা দেশকে যে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। কোম্পানীর রাজত্বারম্ভেও মুর্শিদাবাদ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদ একটী জেলারূপে অবস্থিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভূত।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন অবস্থাননির্ণয়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থিত প্রদেশই মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। পূর্ব্ব পারের কতকাংশ বিদ্যমান থাকিলেও ভাগীরথী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে সরিয়া যাওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই জন্য মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব তীরে তাহার কোনও প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, কেবল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই তাহার প্রাচীন চিহ্নের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ মুর্শিদাবাদ প্রদেশের মধ্যে কিরীটেশ্বরী একটী পুরাতন স্থান। ইহার প্রকৃত নাম কিরীট-কণা।* কিরীটকণার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাধারণতঃ কিরীটেশ্বরী নামে অভিহিত হন বলিয়া তাহারও সাধারণ নাম কিরীটেশ্বরী হইয়া উঠিয়াছে। এই কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের পরপারস্থিত ডাহাপাড়া গ্রাম হইতে প্রায় সার্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে কিরীটেশ্বরী বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিয়া উল্লিখিত হয়। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে তাহাদের পতন হইয়াছিল, সেই সেই স্থান মহাপীঠ নামে চিরপূজিত হইয়া আসিতেছে। তান্ত্রিক মতে ৫১ স্থান উক্ত মহাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিরীটকণাও তাহাদের অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হয়। তন্ত্রচূড়ামণির মতে দেবীর কিরীটপাত হওয়ায় কিরীটকণা মহাপীঠরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

* রিয়াজুস্ সালাতীন্ গ্রন্থে ও রেনেলের কাশীমবাজার-দ্বীপের মানচিত্রে কিরীটকণাকে তীরতকোণা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।



কিরীটেশ্বরীর মন্দির।

তথায় দেবী বিমলা নামে ও ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে অভিহিত হন।* মহানীলতন্ত্রে কিরীটতীর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথায় দেবীও কিরীটেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। † দেবীভাগবতের অন্তর্গত দেবীগীতায় কিরীটেশ্বরীর স্থলে মুকুটেশ্বরী লিখিত আছে, এবং মাকোট তাঁহার স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ‡ উক্ত মাকোট কিরীটতীর্থের নামান্তর কি না বুঝা যায় না, তবে যদি মুকুট হইতে তাহার নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কিরীটের নামান্তর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পুরাণ, তন্ত্রাদিতে সমস্ত পীঠস্থানের সামঞ্জস্য নাই, কাজেই মাকোট ও কিরীটের অভেদত্ব প্রমাণ করা নিতান্ত সহজ নহে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে পীঠস্থানের বহু প্রাচীনত্ব স্বীকার করিলেও পীঠমালার মধ্যে নূতন কোন কোন স্থান সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রাচীন কালে যে সমস্ত স্থানের অস্তিত্ব থাকার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, এমন কোন কোন স্থান পীঠমালার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ¶ কিন্তু কিরীটেশ্বরীর

* "ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলানাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা॥"
তন্ত্রচূড়ামণৌ পীঠনির্ণয়ঃ।

† "কালীঘট্টে গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাখ্যে লিঙ্গবাহিনী॥"
মহানীলতন্ত্রে পঞ্চম পটল।

‡ "কুরণ্ডলে ত্রিসন্ধ্যা স্যান্মাকোটে মুকুটেশ্বরী।"
দেবীগীতা। ৮ম অ।

¶ এই সমস্ত গোলযোগের কারণ এই যে, পুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন কোন পুরাণ ও তন্ত্র পরিশেষে রচিত, এবং কোন

অবস্থান দেখিয়া বহু দিন হইতে তাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থিত মুর্শিদাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত হওয়ায় প্রাচীন কাল হইতে তাহা বিদ্যমান আছে বলিয়াই বোধ হয়।

কিরীটেশ্বরীর ঐতিহাসিক কাল।

প্রাচীন কাল হইতে কিরীটেশ্বরীর অস্তিত্ব থাকিলেও কোন্ সময় হইতে তাহার প্রসিদ্ধি প্রকাশিত হয় তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। পীঠস্থান সমূহের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিলেও, কোন্ সময় হইতে তাহারা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, ইহা অবধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। বৈদিক পন্থা কষ্টসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ক্রমে ভারতবর্ষে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মত প্রচলিত হইতে আরব্ধ হয়, এবং বৌদ্ধ-বিপ্লবে প্রাচীন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়ায়, ভারতবর্ষ ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য দেশসমূহে বৌদ্ধমত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহার পর ভগবান্

কোন পুরাণ ও তন্ত্রে অনেক বিষয় প্রক্ষিপ্তও হইয়াছে। এরূপ স্থলে সকল পুরাণ ও তন্ত্রের প্রাচীনত্ব স্থির করা কঠিন হইয়া উঠে। কাজেই পুরাণ ও তন্ত্রের লিখিত অনেক বিষয় সতর্কতার সহিত বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রায় সমস্ত পুরাণ ও তন্ত্রাদিই আধুনিক মনে করিয়া তাহাদের কোন বিষয়ের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই। তন্ত্রের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু তন্ত্র ছিল, তাহা হইতে কতকগুলি বৌদ্ধ তন্ত্রের সৃষ্টি হয়। পরে প্রাচীন হিন্দু তন্ত্রের সহিত পরবর্ত্তী বৌদ্ধ তন্ত্র মিশ্রিত হইয়া আধুনিক অনেক তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ হিন্দু তন্ত্র বলিয়া কোন গ্রন্থ স্থির করা কঠিন হইয়া উঠে, এবং প্রচলিত তন্ত্র হইতে কোন বিষয়ের প্রাচীনত্ব স্থির করাও তাদৃশ সহজ হয় না।

শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় ভারতে পুনর্ব্বার বৈদিক মত ও সাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। কিন্তু বৈদিক মতের তাদৃশ প্রচলন না হওয়ায় বৈদিক মতানুযায়ী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। শঙ্করাচার্য্যের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও কিছু কিছু অস্তিত্ব ছিল, পরে তাহা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের সহিত মিশিয়া যায়। এক্ষণে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মে বৈদিক মতের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মতের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও তান্ত্রিক মতের প্রচলন ছিল, কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই আমরা ইহার প্রাধান্য বিস্তারের প্রমাণ পাই। সেই জন্য ভগবানের সময় হইতে তান্ত্রিক মতের ঐতিহাসিক কাল স্থির করা যাইতে পারে। ভগবান্ তাঁহার লিখিত মঠাম্নায় নামক গ্রন্থে তাঁহার স্থাপিত মঠ চতুষ্টয়ে তন্ত্রের পীঠমালানুরূপ দেবদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। * ইহা

* "প্রথমঃ পশ্চিমাম্নায়ঃ শারদামঠ উচ্যতে।
দ্বারকাখ্যং হি ক্ষেত্রং স্যাদ্দেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃস্মৃতঃ॥
ভদ্রকালী তু দেবী স্যাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ।
পূর্ব্বাম্নায়ো দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্গোবর্দ্ধন মঠঃ স্মৃতঃ॥
পুরুষোত্তমং তু ক্ষেত্রং স্যাজ্জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যা হি দেবী স্যাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ॥
তৃতীয় স্তূত্তরাম্নায়ো জ্যোতির্মান্ হি মঠোভবেৎ।
বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবতা চ স এব হি॥
দেবী পুন্নাগিরী জ্ঞেয়া আচার্য্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ।
চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠোভবেৎ॥
রামেশ্বরাভয়ং ক্ষেত্রমাদিবারাহ দেবতা।
কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সর্ব্বকামফলপ্রদা॥"

হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানের পূর্ব্বেও পীঠ স্থানাদির প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সময় হইতে তাহাদের ঐতিহাসিক কাল আরব্ধ হয় বলিয়া স্থির করাই সঙ্গত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, কিন্তু বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে, খৃঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। * সুতরাং খৃষ্ট জন্মের কিঞ্চিদূন ৪৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে পীঠস্থান সমূহের মাহাত্ম্য-প্রকাশের ঐতিহাসিক কাল স্থির করা যাইতে পারে। তবে কিরীটেশ্বরীর ঐতিহাসিক কাল কোন্ সময় হইতে স্থির হয়, তাহাও বিবেচনার বিষয়। কারণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই যে সমস্ত পীঠস্থানেরই প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। ভগবান্ শঙ্করা-চার্য্যের অব্যবহিত পরে গুপ্তবংশীয়গণ ভারতের সম্রাট হন। † পাটলীপুত্র তাঁহাদের রাজধানী ছিল, ভারতের চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়, রাঢ়, বঙ্গও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে তাঁহাদের এক শাখা উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণে রাজ-ধানী স্থাপন করেন। উক্ত কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী হইতে অভিন্ন। গুপ্তসম্রাটগণ শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের

* সাহিত্য ১৩০৬ চৈত্র, "শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ভিন্ন ভিন্ন সময় গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ বলিয়া স্থির হয়। আমাদের মতে খৃষ্ট জন্মের কিঞ্চিদূন ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ হয়। এই গুপ্তবংশীয় ১ম চন্দ্র-গুপ্তের সময় আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সাহিত্য ১৩০৫ সাল, মাঘ, "যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দারা উহাই স্থির হয়। কোন কোন মুদ্রায় কমলাত্মিকা, কোন কোন মুদ্রায় সিংহবাহিনী মূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটী হইতেও ঐরূপ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাঢ়প্রদেশ গুপ্তরাজগণের অধিকারভুক্ত থাকায় সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীর প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে আরব্ধ হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। গুপ্তবংশীয়গণ খৃঃ পূঃ প্রায় ৪০০ বৎসর হইতে খৃষ্টজন্মের পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসরের পর হইতে কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইতে আরব্ধ হয় বলিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সমগ্র রাঢ়প্রদেশে সেই সময় হইতেই শক্তি-উপাসনা প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে, অদ্যাপি রাঢ়প্রদেশে শক্তি-উপাসনার যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। গুপ্তবংশের অব্যবহিত পরে গৌড়দেশে প্রবলপরাক্রান্ত কোন রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহার অনেক পরে শূরবংশ, পালবংশ ও অবশেষে সেনবংশের রাজত্বের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের সময়েও কিরীটেশ্বরীর অস্তিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। পালবংশীয়গণ সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল না, এবং তাঁহাদের সময়েই হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতমিশ্রিত তান্ত্রিক ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করে।

মুসলমান রাজত্বকালেও কিরীটেশ্বরী একটী প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়ের পাঠানরাজগণের সময়েও কিরীটেশ্বরীর গৌরবের কথা অবগত হওয়া যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল

মুসলমান রাজত্বকাল।

বৈষ্ণব * ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। মঙ্গল বৈষ্ণবের সময় সুপ্রসিদ্ধ হোসেন সা গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হিন্দুদেবদ্বেষী কালাপাহাড়কর্ত্তৃক কিরীটেশ্বরীর বিশেষ কোন অনিষ্ট হইয়াছিল কি না তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোগল রাজত্বকালে কিরীটেশ্বরীর গৌরব যে অক্ষুণ্ণ ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যে সময়ে মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যার রাজধানী হইয়া মহিমাশালী হইয়া উঠে, সেই সময়ে কিরীটেশ্বরীর গৌরব প্রোজ্জ্বলভাবে দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

বঙ্গাধিকারী মহাশয়গণের যত্নে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিরীটেশ্বরীর মহিমা বিস্তৃত হয়। বঙ্গাধিকারিগণ বাঙ্গলার রাজস্ববিভাগের প্রধান কাননগো পদে নিযুক্ত হইতেন। নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খাঁর সময়ে বঙ্গাধিকারিবংশীয় দর্পনারায়ণ প্রধান কাননগো পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানী অবস্থায় তাঁহার সহিত ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন, ও তাহার অপর পারে ডাহাপাড়ায় অবস্থিতি করেন। উক্ত ডাহাপাড়া হইতে কিরীটেশ্বরী সার্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ডাহাপাড়ায় অবস্থান করিয়া দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। বঙ্গাধিকারিগণ পূর্ব্ব হইতেই কিরীটেশ্বরীর সেবার ভারপ্রাপ্ত

* মঙ্গল বৈষ্ণব নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর গদাধরপ্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা নামক গ্রামে বাস করেন, তাঁহার পৌত্র বদনচাদ ঠাকুর প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক।

হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রায় মোগল বাদসাহদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তি জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে কিরীটেশ্বরীও অন্যতম। উহা "ভবানী থান" নামে তাঁহাদের সনন্দমধ্যে লিখিত ছিল। বঙ্গাধিকারিগণের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরডিহি গ্রাম। ভগবান্ রায় সম্ভবতঃ সা সুজার সময়ে কাননগোপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।* সা সুজার সময় রাজমহল বাঙ্গলার রাজধানী থাকায় ও কাটোয়ার নিকটে বঙ্গাধিকারিগণের বাস হওয়ায়, কিরীটেশ্বরী তাঁহাদের জায়গীরান্তর্গত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিরীটেশ্বরী অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গাধিকারিগণের সম্পত্তির অন্তর্ভূত ছিল, ক্রমে তাহা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। দর্পনারায়ণের পূর্ব্বে কিরীটেশ্বরীর অবস্থা তত ভাল ছিল না। মন্দিরাদি জীর্ণ হইতে আরব্ধ হয়, চতুর্দ্দিক বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া পড়ে। দর্পনারায়ণ বন জঙ্গলাদি কাটাইয়া গুপ্তমঠ † নামে দক্ষিণদ্বারী প্রাচীন আদি মন্দিরের সংস্কার করাইয়া বর্ত্তমান পশ্চিমদ্বারী মন্দির ও কতিপয় শিবমন্দির ও ভৈরবমন্দির নির্ম্মাণ করান। 'কালী সাগর' নামে একটী পুষ্করিণীও খনিত হইয়া প্রস্তরময় সোপান দ্বারা ভূষিত হয়। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরী মেলা নামে তথায় এক মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি পৌষ মাসের মঙ্গল-

* মৎপ্রণীত মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর বঙ্গাধিকারী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† গুপ্ত মঠের নাম দেবীর গুপ্ত কিরীট হইতে বা গুপ্ত বংশের নাম হইতে হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ দেবীর গুপ্ত কিরীট হইতে উহার ঐরূপ নাম হইয়া থাকিবে।

বারে সে মেলা বসিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে তাহা নামমাত্র হইয়া উঠিয়াছে। দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ লোকের যাতায়াতের অসুবিধা নিবারণের জন্য কিরীটেশ্বরীর পথে এক সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান পথের বৃহত্তর সেতুর নিকটে উত্তর দিকে বনজঙ্গলাবৃত হইয়া সেই সেতু অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। শিবনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণও কিরীটেশ্বরীর সেবার অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী হওয়ায় বঙ্গদেশের রাজা মহারাজা ও জমীদারবর্গকে নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে হইত। অনেক রাজা মহারাজা ডাহাপাড়ায় আপনাদিগের অবস্থানোপযোগী ভবনাদিও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভূমিসংক্রান্ত ও রাজস্বসংক্রান্ত বিচারের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বঙ্গাধিকারিগণের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। সেই সমস্ত কারণে ও কিরীটেশ্বরী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান হওয়ায়, বাঙ্গলার সম্ভ্রান্তবংশীয়গণও তাহার গৌরববৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। এই জন্য রাজা রাজবল্লভ ও রাজা রামকৃষ্ণপ্রভৃতির চিহ্ন অদ্যাপি কিরীটেশ্বরীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা রাজবল্লভ ইহাতে তিনটী শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা হীন হইতে আরব্ধ হওয়ায় রাজা রামকৃষ্ণ একবার কিরীটেশ্বরীর মন্দিরাদির সংস্কার করাইয়াছিলেন। কিরীটেশ্বরী তাঁহার সাধনার প্রিয় স্থান ছিল। অদ্যাপি দুইখানি প্রস্তর খণ্ড তাঁহার আসন বলিয়া সকলে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ভৈরবমন্দিরের সম্মুখস্থ শিবমন্দিরে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ১৬৮৭ শাকে

সভারামের পুত্র রঘুনাথ এই শুভ মঠ নির্ম্মাণ করেন।* ১৬৮৭ শাক বা ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ কোম্পানীর দেওয়ানীগ্রহণের বৎসর। মুর্শিদাবাদ রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহবঞ্চিত হওয়ায় ও ক্রমে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় কিরীটেশ্বরীরও অবস্থা দিন দিন হীন হইতে আরব্ধ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার গৌরব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, বহুদূরদেশ হইতে সাধুসন্ন্যাসিগণ এখানে তীর্থপর্য্যটনে আগমন করিতেন। পাণ্ডাগণের নিকট দলে দলে যাত্রী উপস্থিত হইত। বাঙ্গলার প্রায় সমুদায় সম্ভ্রান্ত বংশের ও অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও নাম কিরীটেশ্বরীর পাণ্ডাগণের খাতায় অদ্যাপি লিখিত আছে। মুর্শিদাবাদের নবাবগণও কিরীটেশ্বরীর মহিমার সম্মান করিতেন। নবাব জাফর আলি খাঁ বা মীর জাফর তাঁহার দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে অন্তিম সময়ে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। †

* শ্লোকটী এইরূপ অশুদ্ধ ভাবে লিখিত আছে,—

"সাকে সপ্তাষ্টকালেন্দু
সংখ্যে সম্ভুপ্রিয়ে পুরে
সভারাম সুতোঽকার্ষী
দ্রঘুনাথ মঠং শুভং।"

কাল শব্দের 'ল' 'ণ'র আকারে লিখিত আছে। সে কালে 'ল' ঐরূপ আকারে লিখিত হইত। শ্লোকটী শুদ্ধ করিয়া লইলে এইরূপ পাঠ হয়।

শাকে সপ্তাষ্টকালেন্দুসংখ্যে শম্ভুপ্রিয়াপুরে।
সভারামসুতোঽকার্ষীদ্রঘুনাথো মঠং শুভং॥

সপ্তাষ্টকালেন্দু ৭৮৬১, অঙ্কের বামাগতি অনুসারে ১৬৮৭ শাক হয়।

† Seir Mutaqherin (English Translation) Vol. II. P. 342.

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপে কিরীটেশ্বরীর মহিমা বিস্তৃত হইয়াছিল। কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তনান অবস্থা কিন্তু এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে কিরীটেশ্বরীর প্রায় সমস্ত মন্দিরাদি ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তাহার যে যে চিহ্ন বিদ্যমান আছে, আমরা তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির পশ্চিমদ্বারী, উহা দর্পনারায়ণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং রাজা রামকৃষ্ণ একবার তাহার সংস্কার করাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত বারান্দা, মন্দিরমধ্যে কোন দেবীমূর্ত্তি নাই, কেবল একটী উচ্চ প্রস্তর বেদী আছে। তাহার পশ্চাতে নানা শিল্পকার্য্যসমন্বিত একটী প্রস্তরভিত্তি বেদীসংলগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান। উচ্চ বেদীর উপর কারুকার্য্যভূষিত আর একটী ক্ষুদ্র বেদী অবস্থিত। সাধারণ লোকে তাহাকেই কিরীট বলিয়া থাকে। এই ছোট বেদীর ও বড় বেদীরই উপরিভাগে একটী কুণ্ড। বড় বেদীর নিম্নস্থ মন্দিরের তলভাগ ও মন্দিরভিত্তির কতকদূর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-মর্ম্মর প্রস্তরমণ্ডিত। মন্দিরের পশ্চাতে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দির যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে অধিক দিন তাহার অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন মন্দির দক্ষিণমুখে অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তরেও নূতন মন্দিরের ন্যায় উচ্চ বেদীর উপর ক্ষুদ্র বেদী ও শিল্পকার্য্যমণ্ডিত প্রস্তরভিত্তি। উচ্চ বেদীর উপর কুণ্ড দৃষ্ট হয় না। গৃহ ভগ্ন হওয়ায় সম্ভবতঃ তাহা আচ্ছাদিত হইয়া

পড়িয়াছে। ছাদ, ভিত্তি প্রভৃতি প্রায় সমস্তই পতিত হওয়ায় ইহা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই প্রাচীন মন্দিরের দ্বারের নিকট একখানি প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত আছে, তাহা রামকৃষ্ণের আসন বলিয়া প্রসিদ্ধ। নূতন মন্দির প্রাচীন মন্দির অপেক্ষা বৃহত্তর, উভয় মন্দিরের একই প্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে আর একখানি প্রস্তর প্রোথিত আছে, তাহাও রাজা রামকৃষ্ণের আসন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মন্দিরপ্রাঙ্গনের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বমুখে অবস্থিত, প্রবেশদ্বারটী আজিও দণ্ডায়মান আছে, আর অধিক দিন থাকিবে কি না সন্দেহ। মন্দিরপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দ্বারের দক্ষিণে ও বামে দুইটী ভগ্নাবস্থ শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে দক্ষিণ ভাগের মন্দিরটী রাজনগরাধিপ বৈদ্য-রাজ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। মন্দিরমধ্যে শিব বর্ত্তমান আছেন। তাহারই নিকটে আর একটী দক্ষিণদ্বারী বৃহত্তর শিবমন্দির, মন্দিরাভ্যন্তরেও একটী বৃহৎকায় বিদীর্ণ শিব লিঙ্গ অবস্থিত। উক্ত মন্দিরও রাজা রাজবল্লভের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাজা রাজবল্লভের পুত্র নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলে, এই বৃহৎ মন্দিরমধ্যস্থ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যান। তাহার অব্যবহিত পরে রাজার গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনা নবাব কাশেম আলি খাঁ বা মীরকাশেমের আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।* কিরীটেশ্বরী গ্রামের মধ্যেও রাজা রাজবল্লভের

* সাধারণ লোকে তাহাকে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ের ঘটনা বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইতিহাসে রাজা ও তাঁহার সকল পুত্রগণ একসঙ্গেই

প্রতিষ্ঠিত আর একটী শিবমন্দির আছে। কালীসাগর পুষ্করিণী পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ, উত্তরদিকে মন্দিরপ্রাঙ্গনসংলগ্ন একটী বাঁধা-ঘাটের সোপানাবলীর কতক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ সোপানই অদৃশ্য. কেবল ৫।৬ টী মাত্র অবশিষ্ট আছে, সে গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। কয়েকটী সোপানের নিম্নে ঘাটের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুটী শিবমন্দির। পূর্ব্বদিকের মন্দিরটী আজিও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। মধ্যে ভগ্ন শিবলিঙ্গ; পশ্চিমদিকের মন্দিরের ভিত্তিমাত্র অবশেষ, শিবলিঙ্গটীও বিদ্যমান আছে। সোপানাবলীর উপরিস্থিত চাতালের পশ্চিমদিকে পূর্ব্বোল্লিখিত রঘুনাথনির্ম্মিত মঠ, মন্দিরটী জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরদ্বারের মস্তকে প্রস্তরফলকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে আর একটী শিব মন্দির। চাতালের পূর্ব্বদিকে একটী নাতিবৃহৎ মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি অবস্থিত, তাহা ভৈরবমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তি।

ভৈরবরূপী বুদ্ধমূর্ত্তি।

উক্ত মূর্ত্তি যে ভৈরব মূর্ত্তি নহে এবং স্পষ্টতঃ বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধের যে পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি * সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই মূর্ত্তিটী তন্মধ্যস্থ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। পদ্মাসনস্থ, একহস্ত ক্রোড়স্থ, অপর হস্ত

মীর কাশেমের আদেশে মুঙ্গেরে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

* বুদ্ধের পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি যথা—১ ধ্যানী বুদ্ধ, ২ সমাধিস্থ বুদ্ধ, ৩ প্রচারক বুদ্ধ, ৪ যাত্রী বুদ্ধ, ৫ মুমূর্ষু বুদ্ধ। তন্মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। (Mitras Buddha Gaya P. 130.)



কিরীটেশ্বরীর ভৈরবরূপী বুদ্ধমূর্ত্তি।

পাদসংলগ্ন, মস্তকে টোপর ও বিলম্বিত যজ্ঞোপবীত * দেখিয়া ইহাকে স্পষ্টই বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভৈরবমূর্ত্তির সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য নাই। সাধারণতঃ ভৈরব দ্বিহস্ত নহেন, কোন কোন ভৈরবের ধ্যানে দ্বিহস্তের কথা থাকিলেও তাহাতে শূল ও দণ্ড ধারণের উল্লেখ আছে, † এবং সমস্ত ভৈরবের ধ্যানেই ত্রিনেত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ মূর্ত্তিতে ত্রিনেত্রের কোনই নিদর্শন নাই। মূর্ত্তিটী একটী আসনের উপর উপবিষ্ট। আসনসমেত মূর্ত্তিটী প্রায় স্বার্দ্ধ দ্বিহস্ত, আসনটী অর্দ্ধ হস্ত ও মূর্ত্তিটী প্রায় দ্বিহস্ত হইবে। উক্ত আসন একটী প্রস্তর-বেদীর উপর অবস্থিত। বেদীটীও উচ্চে প্রায় এক হস্ত; আসন ও বেদী উভয়ই কারুকার্য্যভূষিত। এই বুদ্ধমূর্ত্তি এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা অন্য কোন স্থান হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সময়ে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অথবা উত্তর রাঢ়ে পালবংশীয়দের রাজত্বসময়ে এই কিরীটকণাতেই উক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা রাঢ়প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যসময়ে অন্য কোন স্থানে স্থাপিত এই মূর্ত্তি অবশেষে

* বুদ্ধ জাতিভেদপ্রথা একেবারে যে অস্বীকার করিতেন এরূপ নহে। বৌদ্ধগণও আপনাপন জাতীয় চিহ্ন কখনও পরিত্যাগ করিতেন না, এই জন্য বুদ্ধমূর্ত্তিতে ক্ষত্রিয়ের ব্যবহারোপযোগী যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"That the Buddhists of India never gave up their caste symbols." (Mitra's Buddha Gaya P.131.)

† তন্ত্রসারোক্ত বটুকভৈরবের সাত্ত্বিক ধ্যান দ্রষ্টব্য।

এখানে আনীত হইয়াছিল, ইহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ভৈরবরূপী বুদ্ধের মন্দিরটী অধিক দিনের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। উহা দর্পনারায়ণের নির্ম্মিত বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সম্ভব হইতে পারে। তাহার পূর্ব্বে উক্ত মন্দির ভগ্নাবস্থায় ছিল, কিম্বা উহা নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও বুঝা যায় না। তবে তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় পূর্ব্বে তথায় কোন একটী মন্দির ছিল, কিন্তু সেই মন্দিরে এই ভৈরবরূপী বুদ্ধমূর্ত্তি, কি অন্য কোন মূর্ত্তি ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মন্দিরগাত্রে কালভৈরবের সহচর কুক্কুরাদিরও মূর্ত্তি আছে।

অন্যান্য চিহ্ন।

এই ভৈরবমন্দির ব্যতীত মন্দিরপ্রাঙ্গনে আর কোন বিশেষ চিহ্নাদি নাই। একটী প্রশস্ত ভিত্তির উপর কতকগুলি ভগ্ন শিবলিঙ্গ আছে, পূর্ব্বে তথায়ও কোন মন্দির ছিল বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম দিকে, কতকগুলি ঘরের ভগ্নাবশেষ আছে, সম্ভবতঃ তাহা মন্দিরপরিচারকগণের বাসস্থান ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গনে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে কতকগুলি ভগ্ন দেবমূর্ত্তি মূল দ্বারা আবৃত হইয়া আছে। প্রাঙ্গনের বাহিরেও কতকগুলি শিবমন্দির ও ভগ্ন গৃহাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীটেশ্বরীর এই বৃহৎ মন্দিরে নিত্য পূজা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু গ্রামের মধ্যস্থ আর একটী নবনির্ম্মিত মন্দিরে বিশেষরূপে পূজা ভোগাদি সম্পন্ন হয়। উক্ত মন্দির এক্ষণে গুপ্তমঠ নামে প্রসিদ্ধ, এবং সেইখানেই দেবীর কিরীট বিদ্যমান আছে। উক্ত কিরীট প্রথমে আদি মন্দিরে, পরে পশ্চিমদ্বারী নূতন মন্দিরে ছিল, অবশেষে উহা তথা হইতে গ্রামমধ্যস্থ নূতন মন্দিরে আনীত হইয়াছে।

পূজকেরা গ্রামমধ্যে বাস করেন বলিয়া তথায় উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কিরীট স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কিরীট একখানি রক্ত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাহা দেখা নিষিদ্ধ। কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে কিছু দূরে পূর্ব্বদিকে একটী পুষ্করিণীর উপরস্থিত আর একটী ভগ্নপ্রায় মন্দির দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ তাহাকে বাঁকা ভবানীর মন্দির বলিয়া থাকে। তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত এক মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ছিল, এক্ষণে তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিরীটেশ্বরী পীঠস্থান হওয়ায়, উহা সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের পরম তীর্থস্বরূপ। পূর্ব্বে অনেক সাধুসন্ন্যাসী কিরীটেশ্বরীতে সমাগত হইয়া সাধনাদি করিতেন। ব্রহ্মানন্দগিরিপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণ এখান হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজা রামকৃষ্ণ তাঁহার মুর্শিদাবাদস্থ রাজধানী বড়নগর হইতে প্রত্যহ কিরীটেশ্বরীতে সাধনার্থে আগমন করিতেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়, এবং অদ্যাপি লোকে তাঁহার আসনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ যে সময়ে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল, সেই সময়ে কিরীটেশ্বরীর গৌরব দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দেবী কিরীটেশ্বরী তৎকালে মুর্শিদাবাদের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। মুর্শিদাবাদের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটকণারও গৌরবের হ্রাস হইতে আরদ্ধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে তাহা ভগ্নস্তূপে ও ঘোর জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। পুষ্করিণী শৈবাল ও জঙ্গলপূর্ণ হইয়া জলহীনপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে কিরীটেশ্বরীর সংস্কার না হইলে অধিক দিন তাহার অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা নাই। সুখের বিষয়, কাশীমবাজারের দানশীল ও দেশহিতব্রত মহারাজ ইহার সংস্কারে উদ্যোগী

হইয়াছেন, সেই জন্য ভরসা করা যায় যে, কিরীটেশ্বরী পুনর্ব্বার উজ্জ্বল-কিরীটভূষিত হইয়া মুর্শিদাবাদকেও গৌরবময় করিয়া তুলিবেন।

রাঙ্গামাটী বা কর্ণসুবর্ণ। প্রাকৃতিক অবস্থা।

কিরীটেশ্বরীর বিবরণের পর মুর্শিদাবাদের আর একটী প্রাচীন স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ ও বহরমপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গঙ্গাস্রোতোধ্বস্ত একটী পল্লীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার রক্তবর্ণাভ, পর্ব্বতাকার উচ্চ ভূভাগ শুষ্ক নদীগর্ভ হইতে যেন একটী বিস্তৃত দুর্গপ্রাকার বলিয়া বোধ হয়। এই পল্লীর সাধারণ নাম রাঙ্গামাটী। রাঙ্গামাটী পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ভূমিসংলগ্ন অসংখ্য ইষ্টকখণ্ড ও মৃৎপাত্রচূর্ণ তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভাগীরথীতরঙ্গবিধৌত হওয়ায় যদিও ইহার উপরিভাগে পললময় মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তথাপি রাঙ্গামাটীর স্বাভাবিক ভূমি যে কঠিন ও ঈষৎ রক্তবর্ণাভ, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহার উপরিভাগে সামান্যমাত্র খনন করিলে কঠিন রক্তবর্ণাভ ভূভাগ বহির্গত হয়, এবং যে স্থানে ইহার ভূমি ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে, সেইখানেই তাহার প্রকৃত আকার আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রাঙ্গামাটী পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী বিস্তৃত পল্লী ছিল। ক্রমে ভাগীরথী তাহাকে গর্ভস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে নিজেই তাহার নীচে শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য রাঙ্গামাটীর নিম্নে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ, এক্ষণে একটী বিল বা বাঁওড় রূপে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর বর্ত্তমান প্রবাহ তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ

ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এবং উক্ত বাঁওড় ও ভাগীরথীর মধ্যে এক বিশাল চর মস্তকোত্তলন করিয়া নবোৎসাহে বিরাজ করিতেছে। বর্ষাকালে ভাগীরথীর সহিত উক্ত বাঁওড়ের যোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঙ্গামাটী একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে ইহাকে একটী বিস্তৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ডাঙ্গাভূমির ইষ্টকস্তূপ. পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণ এবং স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভিত্তি দেখিয়া অনুমান হয়, যেন পূর্ব্বে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী-রূপে বিদ্যমান ছিল। ইহার নিকটস্থ তিন চারিখানি গ্রামে ঐ সমস্ত চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাঙ্গামাটীর এমন স্থান নাই, যেখানে দুই চারিখানি ইষ্টক বা মৃৎপাত্রচূর্ণ পড়িয়া নাই। আবার এই সমস্ত ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অঙ্গুরী ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদিও মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যে সময়ে রাঙ্গামাটী ভাগীরথী-প্রবাহধ্বস্ত হইতেছিল. সেই সময়ে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গৃহের ছাদ, খিলান, ভিত্তি, স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা, শঙ্খ, এবং ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ভাগীরথীগর্ভস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। যেখানে ইহার যমুনানাম্নী প্রাচীন পুষ্করিণী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইখানে অদ্যাপি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পতিত রহিয়াছে। এই সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিয়া ইহাকে একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া স্বতঃই মনে হইয়া থাকে। ইহা যে কোন প্রসিদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল, প্রবাদমুখে তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহার রাজপ্রাসাদের চিহ্ন আজিও সাধারণের নিকট

সুপরিচিত রহিয়াছে। প্রবাদ ও ইতিহাসের সাহায্যে আমরা রাঙ্গামাটীসম্বন্ধে যতদূর বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি।

রাঙ্গামাটীর ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ।

রাঙ্গামাটীসম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তাহা দাতাকর্ণ বা কর্ণসেনের * রাজধানী ছিল। দাতাকর্ণ যে কুন্তী পুত্র ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ তাহা সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন। কর্ণ স্বীয় পুত্র বৃষসেনের অন্ন-প্রাশনের সময় লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণবৃষ্টি করায়,

* রাঙ্গামাটী সাধারণতঃ কর্ণসেনের রাজধানী বলিয়া কথিত, এবং দাতাকর্ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময়ে বিভীষণকর্তৃক স্বর্ণবৃষ্টি হয়, এ প্রবাদও প্রচলিত। সুতরাং কর্ণসেন ও দাতাকর্ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রবাদের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কর্ণের পূর্ব্ব নাম বসুষেণ। ইন্দ্র অর্জ্জুনের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণবেশে বসুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া কবচ প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বীয় গাত্র হইতে ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে উক্ত কবচ প্রদান করেন। সেই জন্য তিনি কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হন।

"প্রাঙ্ নাম তস্য কথিতং বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।
কর্ণোবৈকর্ত্তনশ্চৈব কর্ম্মণা তেন সোঽভবৎ॥"

মহা, আদি, ১১১ অ।

কর্ণের পুত্রের নাম বৃষসেন, সুতরাং বৃষসেনের পিতা বসুষেণ, কর্ণসেন নামে যে অভিহিত হইবেন, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব কর্ণসেনকে গৌড়ের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়ে কর্ণসেন নামে কোন রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু অজয়ের নিকট তাঁহার বাসস্থান ছিল।

উক্ত স্থানের ভূমি রক্তবর্ণাভ হয়, সেই জন্য উহার নাম রাঙ্গামাটী হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বিভীষণ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ স্বর্ণবৃষ্টি করেন। আবার এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, ভূদেব নামে কোন ব্যক্তির তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবগণ স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু দাতাকর্ণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিভীষণের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক স্বর্ণবৃষ্টি হওয়ার প্রবাদই সমধিক প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন আর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, চাঁদ সদাগর চম্পা-নগর হইতে আসিয়া রাঙ্গামাটীতে বাস করায়, তাহার নিকটস্থ গ্রামের নাম চাঁদপাড়া হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের বিবরণ মনসার ভাসানে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চম্পা বা চম্পকনগরে বাস করিতেন। উক্ত চম্পানগর সম্ভবতঃ ভাগল-পুরের নিকটস্থ, ও প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। * এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটী প্রবাদ রাঙ্গামাটীতে প্রচলিত আছে। সর্ব্বা-পেক্ষা দাতাকর্ণেরই প্রবাদ সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক রাঙ্গামাটী অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্পা-নগর যে তাঁহার রাজধানী ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তই হইয়া থাকে। তবে রাঙ্গামাটী অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভূত হওয়ায় তাহাকে দাতাকর্ণের

* ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্পানগর ব্যতীত আরও দুই একটী চম্পক নগরের উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলায় ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমে চম্পক নামক গ্রাম আছে, কিন্তু রাঙ্গামাটীর প্রবাদ অঙ্গরাজ্যের চম্পানগরের সহিতই জড়িত।

সাময়িক বাসস্থান বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। * রাঙ্গামাটীর নিকট গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণরাজার গোশালা ছিল বলিয়া কথিত হয়।

প্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাঙ্গামাটীর ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। উহা প্রাচীন কালে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া স্থির হয়। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ যৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া কী-লো-না-সু-ফা-লা-না বা কর্ণসুবর্ণ † রাজ্যে উপস্থিত হন। কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নাম হওয়ায় সমস্ত রাজ্যও কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। কর্ণসুবর্ণের স্থাননির্দ্দেশসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ‡ কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটীকেই উক্ত কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঙ্গামাটীর সহিত দাতাকর্ণের

রাঙ্গামাটীই কর্ণসুবর্ণ।

* মেদিনীপুরের নিকট কর্ণগড় নামক স্থান দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। মেদিনীপুর প্রদেশও অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভূত হওয়ায় কর্ণগড়ও দাতাকর্ণের সাময়িক বাসস্থান হইতে পারে।

† চীন কী-লো-না-সু-ফা-লা-না সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণের রূপান্তর মাত্র।

‡ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সুবর্ণরেখা নদীতীরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল, কাহারও কাহারও মতে বীরভূম ও কাহারও কাহারও মতে সিংহভূমে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। ডাক্তার ওয়াডেল বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগরকে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু বহুতর প্রমাণ দ্বারা মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটীই যে কর্ণসুবর্ণ ছিল, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রমাণ যথাযথরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রবাদটী কিছু অধিক পরিমাণে বিজড়িত, এবং বৃষসেনের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ যে স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে। কর্ণরাজার স্থানে স্বর্ণবৃষ্টি হওয়ায় আমরা তাহা হইতে কর্ণসুবর্ণ নামের উৎপত্তি বুঝিতে পারিতেছি। * এই কর্ণসুবর্ণ বঙ্গভাষায় ক্রমে কাণসোনা হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজী-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাণসোনার দেবেরা প্রসিদ্ধ ছিলেন † এবং উক্ত কাণসোনা যে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ তাহাও কুলজী-গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। রাঙ্গামাটী যে উক্ত কাণসোনা বলিয়া পূর্ব্বে অভিহিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে। যদিও এক্ষণে সাধারণ লোকে তাহার কাণসোনা নামের বিষয় অবগত নহে, তথাপি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রাঙ্গামাটীর অপর নাম যে কাণসোনা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব রাঙ্গামাটীর বিবরণপ্রসঙ্গে তাহাকে রাঙ্গামাটী বা কাণসোনাপুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার

* হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্ব হইতে কর্ণসুবর্ণ নাম যে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে, কিন্তু কি প্রকারে উক্ত নামের সৃষ্টি হয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে দাতাকর্ণের স্থানে সুবর্ণবৃষ্টি হওয়ায় উক্ত প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, কর্ণ ও সুবর্ণযোগে কর্ণসুবর্ণের উৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে। যেথানে কর্ণের নিমন্ত্রণে বিভীষণ সুবর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার নাম কর্ণসুবর্ণ হইয়াছে।

† "শুন সবে দেববংশ করি নিবেদন,
কাণসোনার দেব হইল বারেন্দ্রে গণন।"

বারেন্দ্র ঢাকুর।

সময় পর্য্যন্ত রাঙ্গামাটী যে কাণসোনা নামে অভিহিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কাণসোনা সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণের অপভ্রংশ। উক্ত বিষয়েরও প্রমাণের অভাব নাই। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে আপনাদিগের বংশবর্ণনোপলক্ষে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের আদিপুরুষ শ্রীহরিদেব মুর্শিদাবাদনগরের নিকট কর্ণস্বর্ণসমাজে * বাস করিতেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজী-গ্রন্থানুযায়ী দেববংশের সমাজ কাণসোনা যে উক্ত কর্ণস্বর্ণ হইতে অভিন্ন তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ ক্রমে ক্রমে যে বাঙ্গলায় কাণসোনা হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রাঙ্গামাটী বা কাণসোনা যে হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত সিওকীগ্রন্থে + লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকট লো-টো-বী-চী বা রক্তভিত্তি নামে সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবন-

* "আসীৎ শ্রীহরিদেবাখ্যঃ শ্রীহরেরংশরূপকঃ।
কায়স্থানাং কুলে দেববংশস্তোদ্ভবহেতুকঃ॥
মুর্শিদাবাদনগরাসন্নে স্বজনপালকঃ।
কর্ণস্বর্ণনামধেয়সমাজে বাসকারকঃ॥

\+ হিউয়েন সিয়াঙ্গসম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, একখানির নাম সিওকী বা পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত। উক্ত গ্রন্থ হিউয়েন সিয়াঙ্গের প্রদত্ত উপাদান লইয়া পীন্কী রচনা করেন। জুলিয়ান অনুমান করেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ বহুদিন বিদেশে বাস করায় চীন ভাষার পারিপাট্য বিস্মৃত হওয়ায় নিজে গ্রন্থ লিখিতে সাহসী হন নাই। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হিউলী ও ইয়েন সাঙ্গ লিখিত হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবন বৃত্তান্ত।

বৃত্তান্তে উক্ত লো-টো-বী-চী কী-টো-মো-চী বা রক্তমৃত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। জুলিয়ান, বীল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উক্ত লো-টো-বী-চী ও কী-টো-মো-চীর রক্তমৃত্তি * অর্থ করিয়া থাকেন। রাঙ্গামাটী যে উক্ত রক্তমৃত্তির অপভ্রংশ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং কাণসোনা বা কর্ণসুবর্ণের সহিত রক্তমৃত্তি বা রাঙ্গামাটীর যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। হিউয়েন সিয়াঙ্গের বিবরণ হইতে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া দেখিলে রাঙ্গামাটীকে প্রাচীন কর্ণ-সুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। সিওকী ও হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার কর্ণসুবর্ণে উপস্থিতিসম্বন্ধে কিছু কিছু অনৈক্য আছে বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থানসম্বন্ধে কোন অনৈক্যের উপলব্ধি হয় না। সিওকীতে লিখিত আছে যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন। তথা হইতে সমতট অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তিপ্রদেশে উপস্থিত হন। তাম্র-লিপ্তি হইতে ৭০০লী † উত্তরপশ্চিমে কর্ণসুবর্ণরাজ্যে আগমন করেন। বর্ত্তমান মালদহপ্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া কথিত হয়, এবং তাম্রলিপ্তি বর্ত্তমান তমলুকের প্রাচীন নামমাত্র।

* Redmud (Buddhist Records of the Western World, Vol II P. 202. and Life of Hiuan Tsiang by S Beal P. 131)

† ১লী = ১/৫ মাইল।

রাঙ্গামাটী বা কাণসোনা তাম্রলিপ্তি হইতে ঠিক উত্তরপশ্চিমে না হইলেও তাম্রলিপ্তিপ্রদেশ হইতে কর্ণসুবর্ণরাজ্য যে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গ তাম্রলিপ্তিপ্রদেশ হইতে কর্ণসুবর্ণরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্ণসুবর্ণ হইতে দক্ষিণপশ্চিমে উড়িষ্যাপ্রদেশে গমন করায়, রাঙ্গামাটী কর্ণসুবর্ণের রাজধানী হওয়ার পক্ষে কোন গোলযোগেরই সম্ভাবনা নাই। আবার জীবনবৃত্তান্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতেই কর্ণসুবর্ণে গমন করিয়াছিলেন। মালদহপ্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইলে তাহার নিকটস্থ কর্ণসুবর্ণের রাজধানী রাঙ্গামাটী হওয়ারই অধিকতর সম্ভাবনা। সুতরাং সিওকী ও জীবনবৃত্তান্তে হিউয়েন সিয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণে উপস্থিতিসম্বন্ধে কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলেও কর্ণসুবর্ণের অবস্থানসম্বন্ধে যে কোনই অনৈক্য নাই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে রাঙ্গামাটীর অবস্থানানুসারে তাহাকে কর্ণসুবর্ণরাজ্যের রাজধানী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

হিউয়েন সিয়াঙ্গকথিত কর্ণসুবর্ণের বিবরণ।

এক্ষণে হিউয়েন সিয়াঙ্গ কর্ণসুবর্ণসম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সিওকীতে লিখিত আছে যে, কর্ণসুবর্ণরাজ্যের পরিধি প্রায় ১৫০ ক্রোশ ও রাজধানী প্রায় ২ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ইহাতে অনেক লোক বাস করিত। গৃহস্থেরা ধনশালী ও স্বচ্ছন্দচিত্ত ছিল। ভূমি নিম্ন ও চিক্কণ, এবং তাহা রীতিমত কর্ষিত হইয়া নানাপ্রকার ফুলফল উৎপাদন করিত। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও লোকের আচার ব্যবহার বিনয়-

পূর্ণ ও মনোরম ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিত, ও আগ্রহসহকারে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইত, তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে ১০টী সঙ্ঘারাম ও ২০০০ আচার্য্য * ছিল, তাহারা সম্মতীয় মতাবলম্বী। উক্ত রাজ্যে ৫০টী দেবমন্দির দৃষ্ট হইত, এবং অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত আরও ৩টী সঙ্ঘারাম ছিল। উক্ত সঙ্ঘারামের লোকেরা দেবদত্তের † মতানুসারে নবনীত ব্যবহার করিত না। রাজধানীর পার্শ্বে লো-টো-বী-চী ‡ বা রক্তভিত্তি নামে সঙ্ঘারাম, তাহার গৃহগুলি প্রশস্ত ও আলোকময়, চূড়া অত্যন্ত উচ্চ। এই মঠে রাজ্যের যাবতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ জনগণের সম্মিলন হইত, এবং তাঁহারা পরস্পরের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল না। এক সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে একজন হিন্দু পণ্ডিত কর্ণসুবর্ণরাজ্যে উপস্থিত হন। উদর তাম্রপত্রমণ্ডিত করিয়া ও মস্তকে এক প্রজ্বালিত মশাল লইয়া দণ্ডহস্তে সগর্ব্বপদবিক্ষেপে তিনি কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করেন, ও আপনার সহিত বিচার করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া একজন প্রতিপক্ষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত

* জীবনবৃত্তান্তে ৩০০ আচার্য্যের কথা আছে। (Beal's Life of Hiuen Tsiang. P. 131.)

† দেবদত্ত বুদ্ধের আত্মীয় ও শিষ্য ছিলেন, পরে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠেন, তিনিও এক দল শিষ্যের নেতা হন। বুদ্ধের মতের সহিত দেবদত্তের মতের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

‡ জীবনবৃত্তান্তে লো-টো-বী-চীর স্থলে কী-টো-মো-চী বা রক্তমৃত্তি লিখিত আছে (Beal's Life of Hiuen Tsiang P. 131.)

হন। লোকে তাঁহার অদ্ভুত সজ্জার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ উত্তর করিতেন যে, অত্যধিক বিদ্যার প্রভাবে তাঁহার উদর বিদীর্ণ হওয়ার আশঙ্কায়, তিনি তাহাকে তাম্রপত্রাবৃত করিয়াছেন, ও অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগের দুঃখে কাতর হইয়া মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছেন। দশ দিন পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অবতীর্ণ হয় নাই। রাজ্যের বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। রাজা ইহাতে দুঃখিত হইয়া এইরূপ প্রকাশ করেন যে, রাজ্যমধ্যে কি এতদূর অজ্ঞতা বিস্তৃত হইয়াছে যে, কেহই এই ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছে না? ইহা রাজ্যের পক্ষে বড়ই দুর্ণামের কথা। রাজ্যের নির্জ্জন প্রদেশপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহার পর এক ব্যক্তি রাজার নিকট প্রকাশ করে যে, বনমধ্যে একটী অদ্ভুত লোক বাস করেন, তিনি আপনাকে শ্রমণ বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রমণ অত্যন্ত বিদ্বান্, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এই অধার্ম্মিক লোকের নিকট সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে পারিবেন। রাজা এই কথা শুনিয়া নিজেই তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রমণ উত্তর দেন যে, আমি একজন দাক্ষিণাত্যবাসী, দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া এখানে পথিকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি। আমার ক্ষমতা যৎসামান্য, তথাপি আমি আপনার ইচ্ছানুসারে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কিরূপ ভাবে বিচার হইবে আমি তাহার কিছুই অবগত নহি। যদি আমি পরাজিত না হই, তাহা হইলে আমার অনুরোধক্রমে আপনাকে একটী সঙ্ঘারাম স্থাপন করিতে হইবে, এবং উক্ত সঙ্ঘারামে বৌদ্ধনীতির গৌরব ঘোষণার

জন্য বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণ আহূত হইবেন। রাজা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে শ্রমণ রাজার আহ্বানানুসারে বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার সম্প্রদায়ের ৩০ সহস্র কথা উচ্চারণ করেন, তাঁহার গভীর যুক্তি ও রাশি রাশি দৃষ্টান্ত সমস্ত বিচারপদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রমণ তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করেন। কয়েকশত কথায় সকল আপত্তির উত্তর দেন। পরে তিনি উক্ত পণ্ডিতকে তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার উত্তরসকল বিক্ষিপ্ত ও যুক্তি বলহীন হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে মুখরোধ উপস্থিত হওয়ায়, উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। রাজা শ্রমণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন।* তদবধি কর্ণসুবর্ণরাজ্যে বৌদ্ধনীতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘারামের পার্শ্বে এবং তাহার অদূরেই রাজা অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ। যে সময়ে তথাগত † জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এইখানে ৭ দিন ব্যাপিয়া বৌদ্ধনীতি প্রচার করেন। ইহার পার্শ্বে একটী বিহার, তথায় গত ৪ জন বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি স্তূপের স্থলে বুদ্ধ আপনার মনোহারিণী নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত স্তূপগুলিও অশোক রাজার নির্ম্মিত।

* কেহ কেহ হিউয়েন সিয়াঙ্গকে উক্ত শ্রমণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে তাহা বোধ হয় না।

† তথাগত বুদ্ধের নামান্তর। "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ" (অমর)। তথা সত্যং গতং জ্ঞাতং যস্য। বুদ্ধ আপনাকে তথাগত বলিয়া অভিহিত করিতেন।

হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনা হইতে কর্ণসুবর্ণের তদানীন্তন অবস্থা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তথায় কোন্ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন তাহা জানিতে হইলে আরও আলোচনার প্রয়োজন হয়। হিউয়েনসিয়াঙ্গের কান্যকুব্জের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার আগমনের কিছু পূর্ব্বে কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্ক নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। উক্ত শশাঙ্ক কান্যকুব্জের তদানীন্তন অধীশ্বর হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনাশ করায়, নিজে হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক পরাস্ত হন। হর্ষবর্দ্ধনের বিবরণ বাণভট্টরচিত হর্ষচরিত ও হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপিপ্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। রাজা হর্ষবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠ জনপদের অন্তর্গত স্থাম্বীশ্বর (থানেশ্বর) প্রদেশের অধিপতি রাজা পুষ্পভূতির বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মে। প্রভাকরবর্দ্ধন হূন, গান্ধার, সিন্ধু, লাট, গুর্জ্জর ও মালব দেশের নরপতিদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার অধিকার বিস্তার করেন। কান্যকুব্জরাজ মৌখরীবংশীয় গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। প্রভাকরবর্দ্ধন দাহজ্বরে শয্যাশায়ী হইলে তাঁহার রাজ্ঞী অনলপ্রবেশে জীবন বিসর্জ্জন দেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মালবরাজ বিদ্রোহী হইয়া গ্রহবর্ম্মাকে নিহত ও রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মালবরাজকে যুদ্ধে নিহত করিলে, মালবরাজের বন্ধু গৌড়াধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া, গোপনে তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেন।* তাহার

হর্ষবর্দ্ধন ও শশাঙ্ক।

* তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারো-

পর কান্যকুব্জ (গৌড়াধিপতি) গুপ্তকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, ও রাজ্যশ্রী মুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রস্থান করেন। হর্ষবর্দ্ধন সে সময়ে দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। পথিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের অনুচর ভণ্ডির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, হর্ষবর্দ্ধন গৌড়াভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দিয়া, নিজের ভগিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিন্ধ্যারণ্যে দিবাকরমিত্র নামে গ্রহবর্ম্মার পরিচিত এক বৌদ্ধ যতির নিকট রাজ্যশ্রীর সংবাদ পাইয়া, তাহার উদ্ধারসাধন করেন, এবং ভগিনীকে উক্ত যতির আশ্রমে রাখিয়া, গঙ্গাতীরে নিজ সৈন্যের সহিত মিলিত হন। হর্ষচরিতে রাজা হর্ষের বিবরণ এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, তিনি তৎপরে গৌড়াধিপতিকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের পঞ্চপ্রদেশ * তাঁহার করায়ত্ত হয়; উক্ত পঞ্চপ্রদেশের মধ্যে গৌড় অন্যতম। হিউয়েন সিয়াঙ্গ এই গৌড়ের অধিপতিকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কান্যকুব্জপ্রসঙ্গে

পচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রং একাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্ শ্রৌষীৎ ॥ (হর্ষচরিত ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।)

মধুবনের শিলালিপিতেও ঐরূপ ভাবের কথা আছে, যথা—

—"উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্ঝি্তবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ ॥"

* হিউয়েন সিয়াঙ্গ Five Indies বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, Five Indies সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড় হইবে।

এইরূপ লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জের তদানীন্তন রাজা জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। * তাঁহার নাম হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষবর্দ্ধনের পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন ও ভ্রাতার নাম রাজ্যবর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজ্যবর্দ্ধন অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব ভারতের কর্ণসুবর্ণরাজ্যে শশাঙ্ক নামে নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিতেন যে, প্রত্যন্ত প্রদেশে ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে অত্যন্ত অসুখের বিষয় হয়। পরে অমাত্যগণের পরামর্শক্রমে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের অমাত্যবর্গ হর্ষবর্দ্ধনকে রাজত্ব করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি গঙ্গাতীরস্থ অবলোকিতেশ্বর নামক বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইয়া রাজত্বসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, বোধিসত্ত্ব এইরূপ উত্তর প্রদান করেন যে, "পূর্ব্ব জন্মে তুমি এই বনের একজন সন্ন্যাসী ছিলে, তপস্যাপ্রভাবে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তুমি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। কর্ণসুবর্ণের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। তুমি রাজত্ব লাভ করিলে তাহার অনেক উন্নতিসাধন করিতে পারিবে। যদি তুমি বিপন্নের সহায় হও, তাহা হইলে পঞ্চভারত তোমার করায়ত্ত হইবে। আমার উপদেশানুসারে চলিলে আমার গুপ্তক্ষমতাবলে তোমার প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ তোমার উপর বিজয়লাভ করিতে পারিবে না। তুমি কখনও সিংহাসনে উপবেশন ও আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিও না।" বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে

* বীল সাহেব বৈশ্যকে রাজপুত জাতির বাইশ সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় স্থলে বৈশ্য লিখিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকারের ভ্রম আরও দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

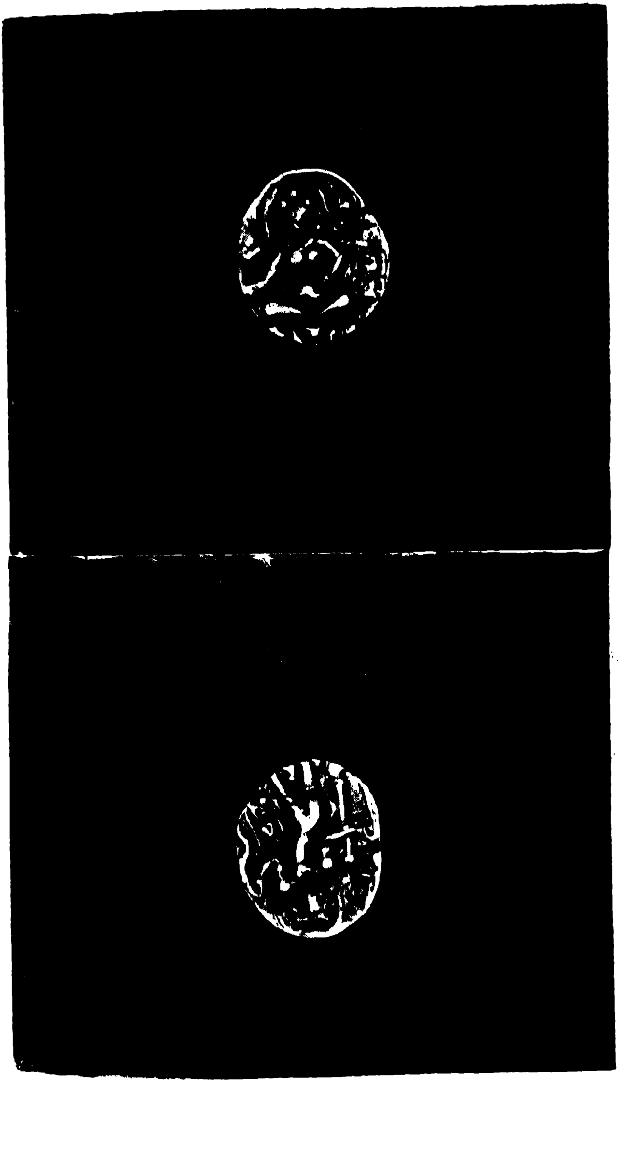
হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন, তিনি আপনাকে কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেন। শীলাদিত্য তাঁহার উপাধি ছিল। হর্ষবর্দ্ধন ৫ সহস্র হস্তী, ২ সহস্র অশ্বারোহী ও ৫০ সহস্র পদাতিক সেনার সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন ও ক্রমে ক্রমে পঞ্চভারত আপনার করায়ত্ত করেন। কর্ণসুবর্ণ উক্ত পঞ্চভারতের অন্যতম। হিউ-য়েন সিয়াঙ্গের সময় রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ৬০ সহস্র রণহস্তী ও লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ৩০ বৎসর হইতে তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম মাত্র ছিল না। হিউয়েন সিয়াঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনকে বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার বর্ণনায় হর্ষবর্দ্ধনের নির্ম্মিত অনেক স্তূপ ও সঙ্ঘারামের কথা উল্লিখিত হই-য়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা উল্লেখ করিতে হিউয়েন সিয়াঙ্গ বিস্মৃত হন নাই। হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপি হইতে তাঁহাকে "পরম মহেশ্বর" রাজ্যবর্দ্ধনকে "পরম সৌগত" ও প্রভাকরবর্দ্ধনকে "সৌর", বলিয়া জানিতে পারা যায়। হর্ষচরিত হইতেও হর্ষবর্দ্ধনকে হিন্দু বলিয়া অনুমান হয়, এবং দিবাকরমিত্রের প্রসঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শেষ দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। ফলতঃ হর্ষবর্দ্ধন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মেরই প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

রাজা হর্ষবর্দ্ধনের বিবরণ হইতে কর্ণসুবর্ণ বা গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিষয় জানিতে পারা যায়, কিন্তু তিনি কোন্ বংশসম্ভূত ছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইলে, বিশেষরূপে আলোচনার আবশ্যক হইয়া উঠে নানারূপ প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে, রাঙ্গামাটী বা

শশাঙ্ক গুপ্তবংশজ।

কর্ণসুবর্ণ গুপ্তবংশের কোন একটী শাখার রাজধানী ছিল, এবং শশাঙ্ক উক্ত গুপ্তবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক তাঁহার উপাধি ছিল, কিন্তু শশাঙ্কের প্রকৃত নাম কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। রাঙ্গামাটী যে গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল, মুদ্রাদির আবিষ্কার দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটীতে যে সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই গুপ্তমুদ্রা বলিয়া স্থির হয়। আমরা ঐ জাতীয় দুইটী মুদ্রার আবিষ্কার করিয়াছি। উক্ত মুদ্রাদ্বয়ের এক দিকে কমলাত্মিকা মূর্ত্তি ও অপর দিকে ধনুর্দ্ধর রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। গুপ্তবংশের অনেক মুদ্রায় ঐরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের একটীতে "রবিগুপ্তস্য" ও অপরটীতে "জয় মহারাজ" লিখিত আছে। শেষোক্তটীর সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই।*

* উক্ত দুইটী মুদ্রার মধ্যে একটী রাঙ্গামাটীর নিকটস্থ যদুপুর গ্রামের জনৈক কৃষকরমণীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। যদুপুরের নিকটস্থ রাজবাড়ীডাঙ্গার ভূমিকর্ষণকালে উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজবাড়ীডাঙ্গা দাতাকর্ণ বা কর্ণসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুদ্রাটীর একদিকে রাজমূর্ত্তি, তাঁহার বাম হস্তে ধনুক, ও দক্ষিণ হস্তে তীর, রাজার মুকুট অস্পষ্ট, অঙ্গাবরণ দুই পার্শ্বে লম্বমান, তীরের উপর ধ্বজচিহ্ন আছে। তীরের পার্শ্বে দক্ষিণভাগের পেটীর লম্বমান অংশের সহিত "র", অক্ষর বাম হস্তের নিম্নে 'বি', তীরের সর্ব্বনিম্নদেশে 'গু', উভয় পদের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে 'প', এবং ধনুকের নিম্নে 'স্য' ইহাতে 'রবিগুপ্তস্য' এই পাঠ বুঝাইতেছে। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। গুপ্তবংশের যতগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটীতে রবিগুপ্তের নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকট উহা যে একটী নূতন পদার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নগেন্দ্র বাবু রবিগুপ্তকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের পূর্ব্ব



অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, রাঙ্গামাটী হইতে ঐ জাতীয় অনেক স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা যে গুপ্তবংশীয়গণের একটী প্রধান স্থান ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। প্রধানতঃ পাটলিপুত্র গুপ্ত সম্রাটগণের রাজধানী ছিল, ক্রমে গুপ্তবংশীয়গণ, বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতের নানাস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রাঙ্গামাটী ঐরূপে তাঁহাদের কোন একটী শাখার রাজধানী হইয়া উঠে, এবং উক্ত শাখা হইতে শশাঙ্ক উদ্ভূত হন বলিয়া অনুমান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভারতবর্ষে আগমন করার সময়ে, গুপ্তবংশীয়গণ যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মালবরাজপুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত

পুরুষ বলিয়া অনুমান করেন, আমাদের বিবেচনায় এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দ্বিতীয় মুদ্রাটী রাঙ্গামাটীর নায়েব ৺ উমাশঙ্কর ঘোষের পুত্রের নিকট হইতে পাওয়া যায়, উক্ত মুদ্রাটী ঘোষজ হস্তান্তর করেন নাই। মুদ্রাটী পাওয়ার পর হইতে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হওয়ায় তাঁহারা উক্ত মুদ্রা হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক। আমরা উক্ত মুদ্রার ছাপ ও ফটো লইয়াছি। উক্ত মুদ্রারও একদিকে ধনুর্দ্ধর রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে কমলাত্মিকা মূর্ত্তি, তাহাতে "জয় মহারাজ" এই কয়টী অক্ষর পড়া যায়। এই মুদ্রায় কমলাত্মিকার হস্তীদ্বয় যেরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, কোনও গুপ্তমুদ্রায় তাহা দৃষ্ট হয় না। স্মিথ হোরন্লী প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ জাতীয় গুপ্তমুদ্রার দেবীকে কেবল লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা কমলাত্মিকা মূর্ত্তি। কোনও কোনও গুপ্তমুদ্রায় সিংহবাহিনী মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, গুপ্তরাজগণ শক্তি-উপাসক ছিলেন। প্রথম মুদ্রাটী ওজনে ৸/॰ আনা বা ১৪৬ গ্রেণ, তাহাতে স্বর্ণের ভাগ সামান্ত পরিমাণে আছে। দ্বিতীয়টীর ওজন ৸১॰ আনা, তাহা রৌপ্য নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের অনুচর ছিলেন। স্কন্দগুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগের প্রধান অমাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে, রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্ত প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। * গৌড়াধিপতি বা কর্ণসুবর্ণ-রাজ যে উক্ত গুপ্তবংশীয় ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে লিখিত আছে যে, মালবরাজকর্ত্তৃক কান্যকুব্জাধিপ নিহত ও রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হইলে রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে নিহত করেন, অবশেষে তিনিও গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে কান্যকুব্জ গৌড়াধিপতি গুপ্তকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। † রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আনীত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে গুপ্তনামক কুলপুত্রের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি

* "রাজানো যুধি দুষ্ট বাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারং বিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ।"

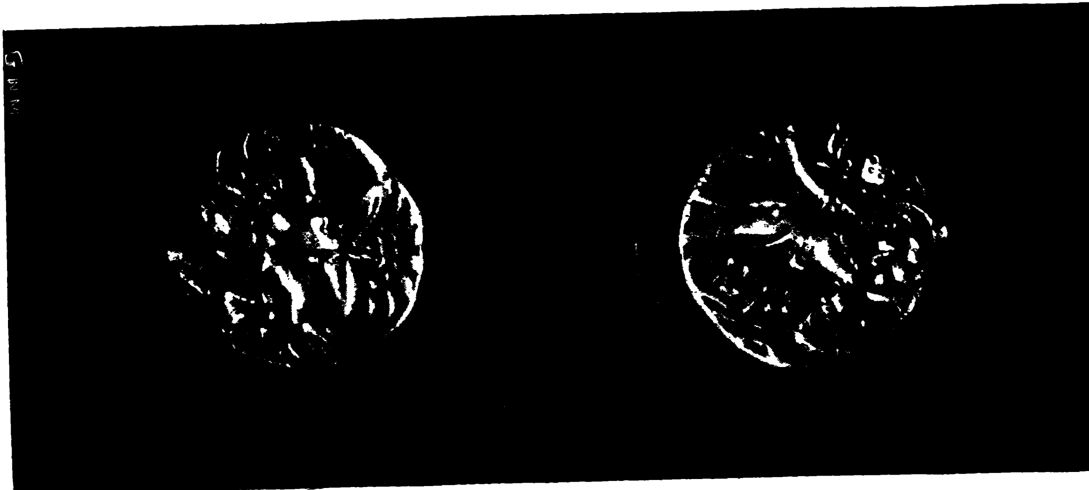
† দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিভ্রশ্য বন্ধনাৎ বিন্ধ্যাটবীং সপরিবারা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্ত্তা-মশৃণবম্।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসম্পাদিত হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস।)

দেবভূয়ং গতে রাজ্যবর্দ্ধনে গৌড়ৈঃ গৃহীতে চ কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রী পরিভ্রষ্টা বন্ধনাদ্বিন্ধ্যাটবীং সপরিজনা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্ত্তামশৃণবম্।

(জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিতে ৭ম উচ্ছ্বাস।)

কুশস্থল কান্যকুব্জের নামান্তর। উপরোক্ত পাঠদ্বয় হইতে 'গুপ্তনাম্না' ও 'গৌড়ৈঃ' একার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং গৌড়াধিপতি যে গুপ্তনামীয় ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।



সুস্পষ্ট কমলাত্মিকামূর্ত্তি অঙ্কিত গুপ্ত মুদ্রা (বৃহত্তর আকারে)
রাঙ্গামাটী।

PRINTED AT THE "MOHILA PRESS" 41-A, PATALDANGA ST

বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করেন। * গৌড়াধিপ গুপ্তকর্ত্তৃক কান্যকুব্জ গৃহীত হওয়ায়, এবং কুলপুত্র গুপ্তকর্ত্তৃক রাজ্যশ্রী মুক্তিলাভ করায়, গৌড়ের তদানীন্তন অধিপতি যে গুপ্তবংশজ ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, এবং উক্ত গৌড়াধিপ যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক, তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ শশাঙ্ককে নরেন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। নরেন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার দ্বারা তাঁহার যে সময় স্থির হয়, হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন ও শশাঙ্কের রাজত্ব তাঁহাদের মতে সেই সময়ে হওয়ায়, তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায়, আমরা নরেন্দ্রগুপ্তকে শশাঙ্ক বলিয়া স্থির করিতে সাহসী হইতে পারি না, এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গ ও শশাঙ্কের সময় সম্বন্ধেও আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। যাহা হউক শশাঙ্ক যে গুপ্তবংশীয় কোন নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শশাঙ্কের বিষয় আলোচনা করিয়া এইরূপ মনে হয় যে, উহা কোন রাজার নাম নহে, একটী উপাধিমাত্র। হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কামরূপের রাজা সুস্থিরবর্ম্মা 'মৃগাঙ্ক' উপাধিতে অভিহিত

ভিন্ন ভিন্ন শশাঙ্ক।

* ভুক্তবাংশ্চ বন্ধনাৎপ্রভৃতি বিস্তরতঃ স্বসুঃ কান্যকুব্জাৎ গৌড়সম্ভ্রমং গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেন নিষ্কাশনং।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসম্পাদিত হর্ষচরিত ৮ম উচ্ছ্বাস।)

ভুক্তাবাংশ্চ বন্ধনাৎ প্রভৃতি বিস্তরতঃ স্বসু কান্যকুব্জাৎ গৌড়ভূমিগমনং গৌড়ভূমে গুপ্তিগমনং গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেন নিষ্কাশনং।

(জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৮ম উচ্ছ্বাস।)

এখানেও গৌড়রাজবংশীয় গুপ্তনামীয় কুলপুত্রের উল্লেখ আছে।

হইতেন। মৃগাঙ্কের ন্যায় শশাঙ্ক যে একটী উপাধি ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পরাক্রমশালী ভিন্ন ভিন্ন শশাঙ্কের বিবরণ হইতে উহা আরও বিশদীকৃত হয়। আমরা প্রথমতঃ দুই জন পরাক্রান্ত শশাঙ্কের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে এক জন গয়ায় বোধিদ্রুমের শত্রু, এবং আর এক জন আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণসুবর্ণরাজ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু উক্ত দুই জনকে এক ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে কদাচ উক্ত দুই জনকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা কেবল একটীমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বোধিদ্রুম-শত্রু শশাঙ্ক যে ঘোরতর বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ককেও যে বৌদ্ধদ্বেষী বলিয়া স্থির করেন, সে বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে, এবং কেবল উক্ত প্রমাণের বলেই তাঁহারা উভয়কে এক ব্যক্তি বলিতে বাধ্য হন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধ-দ্বেষের কথা কেবল একটী স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। যৎকালে রাজা হর্ষবর্দ্ধন অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তির নিকট গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উক্ত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধদ্বেষের কথা প্রকাশ করেন। বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত এই অলৌকিক ঘটনা কতদূর বিশ্বাস্য, প্রথমে

* পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিরস্থিতেঃ স্থিতিবর্ম্মণঃ সুস্থিরবর্ম্মা নাম মহারাজাধিরাজো জজ্ঞে তেজসাং রাশিঃ মৃগাঙ্ক ইতি যং জনা জগুঃ।

(হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস।)

তাহাই বিবেচনা করা উচিত। উক্ত বর্ণনা বিশ্বাস করিলেও এবং তাহাতে উল্লিখিত কর্ণস্থবর্ণরাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধদ্বেষের কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বোধিদ্রুমের শত্রু শশাঙ্কের বর্ণনার সহিত কর্ণস্থবর্ণরাজ শশাঙ্কের বিবরণের সামঞ্জস্য হয় না। আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। বোধিদ্রুমের শত্রু শশাঙ্কের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায়, বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছিলেন, এবং ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদিরও বিনাশসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন; তিনি বোধিদ্রুম ছেদন ও খনন করিয়া তাহার মূলপর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলেন, কিন্তু তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করিতে পারেন নাই, অবশেষে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ইক্ষুরস প্রক্ষেপ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে মগধাধিপতি অশোকবংশীয় পূর্ণবর্ম্মাকর্ত্তৃক সহস্র গাভীর দুগ্ধে স্নাত হইয়া সেই নিঃশেষপ্রায় বোধিমূল একরাত্রিমধ্যে ১০ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে। পূর্ণবর্ম্মা অবশেষে তাহাকে ২৪ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ উক্ত প্রাচীরকে ২০ ফুট উচ্চ দেখিয়াছিলেন। বোধিদ্রুমধ্বংসের পর শশাঙ্করাজ তাহার নিকটস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি অপসারণ করিয়া তাহার স্থানে এক মহেশ্বরমূর্ত্তিস্থাপনের জন্য তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত কর্ম্মচারী বৌদ্ধ হওয়ায়, বুদ্ধমূর্ত্তি অপসারণে সাহসী না হইয়া, তাহার চারিপার্শ্বে ইষ্টকপ্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া বুদ্ধমূর্ত্তিকে আবৃত করিয়া ফেলেন, এবং তাহার বাহিরে এক মহেশ্বরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাজাকে তাহার সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা উক্ত সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হন, তাঁহার

সমস্ত অঙ্গ ক্ষতপরিপূর্ণ হইয়া উঠে, মাংস গলিত হইতে আরব্ধ হয়, অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তাহার পর উক্ত কর্ম্মচারী ইষ্টকপ্রাচীর ভঙ্গ করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির প্রকাশ করেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্কের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কদাচ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয় না। বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতে পূর্ণবর্ম্মা অশোকবংশের শেষ রাজা। অশোকবংশ হর্ষবর্দ্ধনের বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত হয়। পৌরাণিক মতে খৃষ্টজন্মের ১১৯৫ বা ১১৬০ বৎসর পূর্ব্বে * এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে খৃষ্টের জন্মের ১৮৩ বৎসর পূর্ব্বে † অশোকবংশের রাজত্ব শেষ হয়। তাহার পর শুঙ্গ, কন্ব, অন্ধ্র বংশ মগধে রাজত্ব করেন। অবশেষে গুপ্তসম্রাটগণ মগধের অধীশ্বর হইয়া ভারতের বহুপ্রদেশে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই গুপ্তবংশের রাজত্বসময়েই হিউয়েন সিয়াঙ্গ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ তাঁহার উপস্থিতির সময় বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। যদিও আমরা তাঁহাদের সহিত সে বিষয়ে একমত নহি। সুতরাং পূর্ণবর্ম্মা অশোকবংশের শেষ রাজা হইলে বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক হইতে পারেন না ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তবে যদি হিউয়েন

* বিষ্ণুপুরাণের মতে খৃষ্টের জন্মের ১১৯৫ বৎসর পূর্ব্বে, এবং বায়ু ও মৎস্যপুরাণের মতে খৃষ্টের জন্মের ১১৬০ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশের রাজত্ব শেষ হয়।

† R. C. Dutta's Ancient India, Book IV. P. 490.

সিয়াঙ্গ পূর্ণবর্ম্মাকে অশোকবংশীয় বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত লইয়া কতকটা আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ণবর্ম্মা কোন্ বংশীয় রাজা তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইলে তাঁহার সময় লইয়া আলোচনা করা কঠিন হইয়া উঠে, এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনা হইতে তাঁহার আগমনের অল্পকাল পূর্ব্বেই যে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাও বুঝা যায় না। * বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণরাজ হইলে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে কর্ণসুবর্ণরাজ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা তিনি কদাচ বোধিদ্রুম বিনাশ করিতে সাহসী হইতেন না। † কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বসময়ে কর্ণসুবর্ণরাজের স্বাধীনতা অবলম্বন করা দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হর্ষচরিত পাঠে জানা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধন ভণ্ডিকে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিয়া নিজে বিন্ধ্যারণ্যে রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে গমন করেন। পরে তথা হইতে গঙ্গাতীরে নিজ সৈন্যের সহিত মিলিত হন। ইহার পর তিনি যে গৌড়বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন সিয়াঙ্গের

* বেভারিজ সাহেব লিখিতেছেন যে, "But it seems clear that Sasanka had done this long before and in the time of Siladitya's predecessor,"

† "Lassen holds that Sasanka must have retained his independence during Siladitya's reign, or otherwise he never would have ventured to cut down the sacred tree." (Beveridge)

মতেও হর্ষবর্দ্ধন অবলোকিতেশ্বরের উপদেশানুসারে সসৈন্যে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, এবং প্রথমেই যে কর্ণসুবর্ণে গমন করিয়াছিলেন ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে। কর্ণসুবর্ণ বিজয় করিয়া হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তাকে যে জীবিত রাখিয়াছিলেন, তাহা কদাচ মনে হয় না। ভ্রাতৃহন্তাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলে তাঁহার যশ প্রবাদবাক্যের ন্যায় গীত হইত। কিন্তু কোনও স্থলে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে শশাঙ্ক জীবিত থাকিলেও, তিনি যে নিতান্ত হীনবল হইয়াছিলেন, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পঞ্চগৌড় বা পঞ্চভারতেশ্বর হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বসময়ে তাঁহার অধীনস্থ রাজগণের মধ্যে কাহারও স্বাধীনতা অবলম্বনের ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে, কদাচ তাঁহার অধীনস্থ রাজা বোধিদ্রুম নষ্ট করিতে সাহসী হইতেন না, এবং শশাঙ্ক বিজিত হওয়ার পূর্ব্বে যে বোধিদ্রুম নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাও বলা যায় না। কারণ বোধিদ্রুমনাশের পরেই যে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইলে, তিনি যে তাহার প্রতীকারে যত্নবান হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতে তিনি যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, এবং যেরূপ অসংখ্য স্তূপ ও সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন, বোধিদ্রুমরক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার যত্ন যে অপরিসীম হইত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বোধিদ্রুমধ্বংসরূপ এই প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত হর্ষবর্দ্ধনের সম্বন্ধ থাকার কোনও উল্লেখ না থাকায়, তাঁহার সময়ে যে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাস করা যায় না। এই সমস্ত বিষয়

আলোচনা করিলে, বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক যে একব্যক্তি নহেন ইহাই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে, বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্কের ন্যায় কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কও বৌদ্ধবিদ্বেষ্টা ছিলেন, এইমাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ককে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু বলিয়া স্বীকার করি না। একমাত্র অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির কথা ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ হিউয়েন সিয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণের বিবরণ হইতে তাহার বিপরীত প্রমাণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্কের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অবমাননা ও সঙ্ঘারামাদির বিনাশ সাধন করিয়া বোধিদ্রুমের উৎপাটনে প্রবৃত্ত হন। কর্ণসুবর্ণের বিবরণে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ উক্ত রাজ্যে আসিয়া রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত সঙ্ঘারাম যে শশাঙ্কের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়, এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ১০টী সঙ্ঘারাম ও অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু হইলে নিজ রাজ্যে এই সমস্ত বৌদ্ধচিহ্ন অটুট রাখিয়া রাজ্যান্তরে সঙ্ঘারামাদির বিনাশের জন্য যে যত্নবান্ হইয়াছিলেন ইহা কদাচ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তবংশীয়েরা হিন্দু ও শক্তি-উপাসক হওয়ায়, শশাঙ্ককে যদি কেহ বুদ্ধবিদ্বেষ্টা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ কর্ণসুবর্ণরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা শশাঙ্ককে

কদাচ বুদ্ধবিদ্বেষ্টা বলিয়া মনে করা যায় না। সুতরাং অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কথা যে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক কদাচ একব্যক্তি নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শশাঙ্ক কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা উপাধি মাত্র। সম্ভবতঃ বোধিদ্রুমবিনাশকের 'শশাঙ্ক' উপাধি কর্ণসুবর্ণ রাজ গ্রহণ করায়, এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বোধিদ্রুম-বিনাশক শশাঙ্ক, বিহারপ্রদেশের কোনও রাজা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রোটাসের শিলালিপিতে যে শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্ক হইতে পারেন, এবং তাহার মোহরাদিরও আবিষ্কার হইয়াছে। উক্ত দুই শশাঙ্ক ব্যতীত আরও কোন কোন শশাঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায়। বগুড়াতে শশাঙ্কনামে একটী পুষ্করিণী আছে। কেহ কেহ তাহাকে কোনও শশাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। খরকপুরে শশাঙ্কনামে ক্ষেত্তরীবংশীয় একরাজা ১৫০২ খৃষ্টাব্দে (৯১০ ফশলী) নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং শশাঙ্কনামে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেভারিজ সাহেব আদিশূরবংশীয় শশধরকে, কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের নামান্তর স্থির করিয়া, তাঁহার সময়নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আদিশূর হিউয়েন সিয়াঙ্গের যে বহুকাল পরে আবির্ভূত হন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শশধর আদিশূর হইতে নবম পুরুষ। সুতরাং তিনি যে বহু পূর্ব্বের লোক নহেন তাহাও বুঝা যাইতেছে, এবং তাঁহার প্রকৃত নাম শশধর কি সৃষ্টিধর অথবা অন্য কিছু তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

হিউয়েন সিয়াঙ্গ ও শশাঙ্কের সময়।

এক্ষণে আমরা হিউয়েন সিয়াঙ্গের ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের সময়নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু দেশীয় গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে তাহার বহুপূর্ব্বে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মালবের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার মালবের উপস্থিতির ৬০ বৎসর পূর্ব্বে শীলাদিত্য রাজা মালবে রাজত্ব করিতেন, এবং তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায় যে, উক্ত শীলাদিত্য সুবিখ্যাত শকারি বিক্রমাদিত্যের পুত্র, তাঁহার অপর নাম প্রতাপ-শীল। * তিনি কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় প্রবরসেনের সমসাময়িক। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে প্রবরসেন ৪৭ শকাব্দ হইতে ১০৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণীর মতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভারতবর্ষে আগমন স্থির হয়। † হিউয়েন সিয়াঙ্গের নেপালের বর্ণনায় রাজা অংশুবর্ম্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুবর্ম্মা হিউয়েন

* বৈরীনির্ব্বাসিতং পিত্রো বিক্রমাদিত্যজং সুধাৎ।
রাজ্যে প্রতাপশীলং স শীলাদিত্যাপরাভিধং॥
(রাজতরঙ্গিণী ৩য় তরঙ্গ)

† প্রবর সেন ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, শীলাদিত্যও ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শীলাদিত্যের রাজত্ব প্রায় ১০০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ধরিলে হিউয়েন সিয়াঙ্গ ১৬০ শকাব্দ বা ২৩৮ খৃষ্টাব্দে মালবে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। নেপালের বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঠাকুরীবংশীয় প্রথম রাজা অংশুবর্ম্মার পূর্ব্বে সূর্য্যস্বামীবংশীয় শেষ রাজা তাঁহার শ্বশুর বিশ্বদেববর্ম্মা রাজত্ব করিতেন, উক্ত বিশ্বদেববর্ম্মার রাজত্বসময়ে নেপালে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ প্রচলিত হয়। * অংশুবর্ম্মা ৩ হাজার কলিযুগে বা খৃষ্টপূর্ব্বে ১০১ অব্দে রাজা হন। † অশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপি হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে নেপালে বিক্রম সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল ‡ সুতরাং অংশুবর্ম্মার পর হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন

* সম্বৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য ও শকাব্দপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য দুইজনে বিভিন্ন ব্যক্তি। শেষোক্ত বিক্রমাদিত্যই উজ্জয়িনীর বিদ্যোৎসাহী রাজা। সম্বৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য তাঁহার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

† Indian Antiquary Vol XIII. P. 413.

‡ অংশুবর্ম্মার সময়ের ৪ খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১ম খানিতে ৩৪, ২য় খানিতে ৩৯, ৩য় খানিতে ৪৫, ৪র্থ খানিতে ৪৮ সম্বৎ লিখিত আছে। (Indian Antiquary Vol IX) এই সম্বৎকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শ্রীহর্ষ সম্বৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। কারণ হিউয়েন সিয়াঙ্গ যে সময়ে নেপালে উপস্থিত হন তাহার বহুপূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হয়, এবং রাজা হর্ষবর্দ্ধন সেই সময়ে কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রচলিত শ্রীহর্ষাব্দের কথা অংশুবর্ম্মার শিলালিপিতে থাকিতে পারে না। আলবেরুণী যে শ্রীহর্ষাব্দের কথা লিখিয়াছেন তাহা বিক্রম সম্বৎ হইতে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন, সুতরাং উক্ত শ্রীহর্ষাব্দের কথা থাকাও অসম্ভব। বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে শিবদেববর্ম্মা ও অংশুবর্ম্মার যে শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে ৩১৮ সম্বৎ পড়িয়াছেন। উহাকে তিনি গুপ্তবল্লভী অব্দ বলিতে চাহেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই অংশুবর্ম্মা যে চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত অংশুবর্ম্মা

হইলে দেশীয় গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনায় খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে তাঁহার ভারতবর্ষে উপস্থিতি স্থির হয়। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন স্থির হইলে, কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় রাজা। গুপ্তবংশের রাজত্বসময় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

নহেন, তাহারও কতকটা অনুমান হইয়া থাকে। বৌদ্ধপার্ব্বতীয় বংশাবলীতে যে অংশুবর্ম্মার উল্লেখ আছে, তিনি যে হিউয়েন সিয়াঙ্গের কথিত অংশুবর্ম্মা ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। উক্ত প্রসিদ্ধ অংশুবর্ম্মা নেপালের ঠাকুরীবংশের স্থাপয়িতা। তিনি সূর্য্যস্বামীবংশীয় শেষ রাজা বিশ্বদেববর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিশ্বদেববর্ম্মার রাজত্বসময়েই নেপালে বিক্রম সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল। বেণ্ডাল সাহেবের উল্লিখিত শিবদেববর্ম্মা উক্ত সূর্য্যস্বামীবংশী হইলে তিনি অংশুবর্ম্মার শ্বশুর বিশ্বদেব বর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইয়া উঠেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে অংশুবর্ম্মার জীবিত থাকা ও অধীন রাজারূপে রাজত্ব করা অসম্ভব। উক্ত অংশুবর্ম্মা প্রসিদ্ধ অংশুবর্ম্মা হইতে পৃথক ব্যক্তি হইবেন। তিনি শিবদেবের মহাসামন্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত ৩১৮ সম্বৎ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম নহি। শ্রীযুক্ত বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয় অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপির অঙ্কগুলিকে গুপ্তসম্বৎ ও বেণ্ডাল সাহেবের ৩১৮ সম্বৎকে শকাব্দ বলিতে চাহেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। গুপ্তকাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিয়া গুপ্তকালসম্বন্ধে আমাদের নানারূপ তর্ক উপস্থিত হয়। বৌদ্ধপার্ব্বতীয় বংশাবলী হইতে যখন অংশুবর্ম্মার সময় ও বিক্রমসম্বৎ প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন অনর্থক কষ্ট কল্পনা করিয়া অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপির সম্বদ্‌গুলিকে অন্য কোন অব্দ স্থির করিতে যাওয়া সঙ্গত মনে করি না। বেণ্ডাল সাহেবের সংগৃহীত শিলালিপির সম্বৎ নেপালের পূর্ব্ব প্রচলিত অন্য কোনও সম্বৎ হইতে পারে।

গুপ্তবংশের প্রকৃত সময় অদ্যাপি স্থির হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে গুপ্তরাজগণ খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি। *

রাঙ্গামাটী ধ্বংসের প্রবাদ

রাজা শশাঙ্কের বিবরণের পর আমরা কর্ণসুবর্ণ বা রাঙ্গামাটীর বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত নহি। কতদিন পর্য্যন্ত রাঙ্গামাটীতে গুপ্তবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। গুপ্তবংশের পর আর কোন বংশ রাঙ্গামাটীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানা যায় না। গুপ্তবংশের পর গৌড় বা বাঙ্গলায় শূরবংশ, পালবংশ ও অবশেষে সেনবংশ রাজত্ব করেন। সাধারণতঃ গৌড় তাঁহাদের রাজধানী ছিল। আদিশূরের পুত্র ভূশূর, মগধাধিপ ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন, কিন্তু তিনি তথায় পুণ্ড্র নামে নূতন রাজধানী † স্থাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং রাঢ়ের প্রসিদ্ধ নগর

* গুপ্তরাজগণের সময় লইয়া নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে। বিশ্বকোষে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের অনুমান হয় যে, গুপ্তবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষবিজয়ে আগমন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে গুপ্তবংশের রাজত্ব, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২১ বৎসরের পূর্ব্বেও ঘটিয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমরা ১৩০৫ সালের পৌষ ও মাঘ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় 'যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীক বিজয়' নামক প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি।

† এই পুণ্ড্রকে কেহ কেহ হুগলী জেলার বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো বলিয়া অনুমান করেন।

রাঙ্গামাটীর সহিত শূরবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। পালবংশ যৎকালে উত্তর রাঢ়ে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করেন, সে সময়ে মহীপাল তাঁহাদের রাজধানী হইয়া উঠে। সেনবংশের সময় গৌড় ও নবদ্বীপ প্রভৃতি রাজধানীর কথা অবগত হওয়া যায়। গুপ্তবংশের পরবর্ত্তী এই সমস্ত রাজবংশের সহিত রাঙ্গামাটীর কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। তবে রাঙ্গামাটী অনেক দিন পর্য্যন্ত রাঢ়প্রদেশের যে একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। * কিরূপে রাঙ্গামাটীর গৌরবহ্রাস বা তাহার ধ্বংস হয়, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উইলফোর্ড সাহেব রাঙ্গামাটীধ্বংসের একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকেন। যবদ্বীপ অথবা সিংহলের রাজা কতকগুলি রণতরী লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তৎকালে রাঙ্গামাটী বাঙ্গলার একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, ও তাহা কুসুমপুরী নামে অভিহিত হইত। বাঙ্গলার মহারাজ প্রায়ই তথায় বাস করিতেন। আক্রমণকারীরা দেশ লুণ্ঠন করিয়া নগরের ধ্বংস সম্পাদন করে। উইলফোর্ড সাহেবের মতে তাহা বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। † বেভারিজ সাহেব বঙ্গ-বিজয়ের

* কর্ণেল রেভার্টি তাঁহার তবকত-নাসিরির অনুবাদে এক স্থানের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বাঙ্গলার দুইটী বিস্তৃত প্রদেশ ছিল। সাধারণতঃ ঢাকা ও রাঙ্গামাটী তাহাদের প্রধান নগর বলিয়া অভিহিত হইত। এই রাঙ্গামাটী সম্ভবতঃ রাঢ়ের রাঙ্গামাটীই হইবে। মুসলমান রাজত্বসময়েও রাঙ্গামাটীর প্রাধান্য ছিল।

† Asiatic Researches Vol. IX. P. 39.

অল্পপূর্ব্বেই রাঙ্গামাটীধ্বংসের অনুমান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার মতে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর সময়ে রাঙ্গামাটী আক্রান্ত হয়। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সিংহাসনে উপবেশন করেন, এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দিগ্বিজয় আরব্ধ হয়। তাঁহার কয়েকখানি জাহাজ আরামা বা রামামার কুস্নমী বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। উইলফোর্ড সাহেবের মতে রাঙ্গামাটীর নাম কুসুমপুরী হওয়ায় এবং কুস্নমীবন্দরের সহিত তাহার নামের কথঞ্চিৎ ঐক্য থাকায়, বেভারিজ সাহেব ঐরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু রামামার অবস্থানসম্বন্ধে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায় ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থার যেরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে কদাচ রাঙ্গামাটীপ্রদেশ বলিয়া স্থির করা যায় না।* সুতরাং বেভারিজ সাহেবের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। লঙ্কার রাজা কর্ত্তৃক রাঙ্গামাটীধ্বংসের প্রবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, লেয়ার্ড সাহেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার শ্রুত প্রবাদ, উইলফোর্ড সাহেবের প্রবাদ হইতে

* Wijesinha রামামাকে আরাকান ও শ্যামদেশের মধ্যস্থিত মনে করেন। Cluverius রামামাকে উড়িষ্যার রাজধানী মনে করেন। Gastaldis এর পুরাতন মানচিত্রে উড়িষ্যার পূর্ব্বে হিজলীর নিকট রামামা নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার কোনটীর অবস্থান রাঙ্গামাটীর সহিত ঐক্য হয় না। আবার রামামা দেশে অপর্য্যাপ্ত নারিকেলবৃক্ষের উল্লেখ দেখা যায়। রাঙ্গামাটীতে কদাচ নারিকেল বৃক্ষ অধিক পরিমাণে জন্মে না। কারণ রাঢ় প্রদেশের মৃত্তিকায় নারিকেল বৃক্ষ জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং রামামার অবস্থান ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যে তাহাকে রাঙ্গামাটী হইতে স্পষ্টই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

বিভিন্ন। এক্ষণে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাঙ্গামাটীর শেষ রাজা তাহার নিকটস্থ চৌটীর বিলে সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই সমস্ত প্রবাদের কোনও মূল আছে কি না, বলা যায় না, এবং এই সকল রাজা মহারাজেরও কোনই পরিচয় পাওয়ার উপায় নাই। রাঙ্গামাটীধ্বংসের কোনও রাজনৈতিক কারণ ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না, তবে প্রাকৃতিক কারণে তাহার যে ধ্বংস হইয়াছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। যে কারণে গুপ্তবংশীয়দের প্রধান রাজধানী পাটলিপুত্রের ধ্বংস হইয়াছিল, সেই জলপ্লাবনে তাঁহাদের অন্যতম রাজধানী রাঙ্গামাটীর ধ্বংস হয় বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটীর কঠিন রক্তবর্ণাভ ভূমি পললময় মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া উক্ত অনুমান দৃঢ় হইয়া উঠে।

রাঙ্গামাটীর প্রাচীন চিহ্ন।

রাঙ্গামাটীর প্রাচীন বিবরণ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে তথায় প্রাচীন সময়ের যে সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান আছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। উইলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে রাঙ্গামাটীর একটী স্থান মহাদেবের পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, এবং অনেক ভূভাগ তাঁহার সেবার জন্য অর্পিত হয়। উক্ত উৎসর্গীকৃত ভূভাগকে হরার্পণ ভূমি বলিত। তাহা গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে আর একটী স্থান পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতি লোকের আর তাদৃশ যত্ন নাই, এবং শিবলিঙ্গও স্থানান্তরিত হইয়াছে, এই শিবমন্দির কোন্ স্থানে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, রাঙ্গামাটীর অধিকাংশই এখন ভাগীরথীগর্ভস্থ। ঠাকুরবাড়ীডাঙ্গা নামে একটী উচ্চ

স্থান আছে, তথায় কিম্বা যমুনানাম্নী তাহার প্রাচীন পুষ্করিণীর নিকটস্থ কোন স্থানে উক্ত শিবমন্দির ছিল, তাহা বুঝা যায় না। যমুনা পুষ্করিণী হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার নিকটে কোন একটী দেবমন্দির ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দির তথায় কিম্বা ঠাকুরডাঙ্গায় ছিল, তাহা অবগত হওয়া কঠিন। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটীতে যে সমস্ত প্রাচীন চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণেও প্রায় সে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উল্লিখিত রাক্ষসীডাঙ্গা ও রাজবাড়ীডাঙ্গা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই রাক্ষসীডাঙ্গা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ, ও অসংখ্য ইষ্টকখণ্ডে পরিপূর্ণ। তাহার নীচে একটী বটবৃক্ষ। বৃক্ষের তলে পীর তুর্কান সাহেব নামে একজন মুসল্মান ফকীরের সমাধি। রাক্ষসীডাঙ্গাসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, লঙ্কা হইতে একটী রাক্ষসী আসিয়া তথায় বাস করে। রাজা প্রতিদিন তাহার সহিত তর্ক করিবার জন্য একজন করিয়া পণ্ডিত পাঠাইতেন। পণ্ডিতেরা তর্কে পরাজিত হইলে, রাক্ষসী তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। পীর তুর্কান সাহেব রাক্ষসীকে পরাজয় ও বধ করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন, অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তথায় তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিতে ইষ্টকসংযোগের আদেশ নাই, সেইজন্য তাহা একটী খড়ের চালার মধ্যে অবস্থিত। সমাধির নিকটে অসম্পূর্ণ ইষ্টকপ্রাচীর বেষ্টিত একটী ভিত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ তথায় একটী মসজীদনির্ম্মিত হইতেছিল। রাক্ষসীডাঙ্গার উত্তরে পীরপুকুর নামে একটী পুষ্করিণী আছে।



এই রাক্ষসীডাঙ্গাকে একটী বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহা হিউয়েন সিয়াঙ্গবর্ণিত অশোক রাজার স্তূপ হইবে। বৌদ্ধস্থপতিকার্য্যে নানারূপ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি থাকায়, এবং পূর্ব্বে উক্ত স্থানে সেই প্রকারের মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায় তাহার নাম রাক্ষসীডাঙ্গা হইয়া থাকিবে। * এই রাক্ষসীডাঙ্গার নিকটেই রাজবাড়ীডাঙ্গা, তাহাও একটী নাত্যুচ্চ ভূভাগ ও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই স্থানে রাজা কর্ণসেনের প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। প্রাসাদের চারিদিক গভীর পরিখা-বেষ্টিত ছিল, পরিখার চিহ্ন তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে, চতুর্থ দিকের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তাহার অধিকাংশ ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরিখা এক্ষণে কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই রাজবাড়ীডাঙ্গাকে লোকে অন্দর ও সদর দুই ভাগে বিভক্ত করে। কাজলা নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী রাজবাড়ীডাঙ্গায় অবস্থিত। তাহার নিকটে সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যাবাস করার প্রস্তাবসময়ে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক একটী বৃহৎ কূপ খনিত হইয়াছে। রাজবাড়ীর পূর্ব্বে একটী সুবৃহৎ তোরণদ্বারের চিহ্ন অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। লোকে তাহাকে বুরুজ বলিত, কয়েক বৎসর হইল তাহা ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে। ইহার নিকটে যদুপুর গ্রামে

* মহীপালদেবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের মহীপাল গ্রামে এক খণ্ড প্রস্তরে শৃঙ্গযুক্ত হস্তীর ন্যায় জন্তুবিশেষের মূর্ত্তি আছে। লোকে তাহাকে রাক্ষসের দেহ বলে। রাঙ্গামাটীর রেশম কুঠীর প্রাঙ্গনস্থিত প্রস্তরখণ্ডকেও লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রস্তরের অবস্থানের জন্য বৌদ্ধস্তূপ রাক্ষসীডাঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

বিল্বপুষ্করিণী নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, তাহার উপর রাজা কর্ণসেনের বিচারালয় ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। রাজ-বাড়ীডাঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কিঞ্চিৎ দূরে ঠাকুরবাড়ীডাঙ্গা, উহার অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। এইখানে রাজবংশের ঠাকুরবাড়ী ছিল বলিয়া লোকমুখে শুনা যায়। ঠাকুরবাড়ীডাঙ্গার ভূমি ভাগীরথীগর্ভস্থ হওয়ার সময় একখানি স্বর্ণপ্রতিমা একজন লোকের হস্তগত হয়, অনেকে তাহাকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল।* এতদ্ভিন্ন অনেক শঙ্খ ও বহুপরিমাণে সিন্দুর ভাগীরথীগর্ভে পতিত হইয়াছিল। রাজবাড়ীডাঙ্গার পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রাচীন গঙ্গাতীরে একটী অত্যুচ্চ ভূভাগ আছে। রাঙ্গামাটীর রেশম কুঠীর নিকটবর্ত্তী ডাঙ্গা ব্যতীত উক্ত ভূভাগের ন্যায় উচ্চ ডাঙ্গা আর দ্বিতীয় নাই, ইহার নাম সন্ন্যাসী ডাঙ্গা। এই সন্ন্যাসীডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া সমস্ত রাঙ্গামাটীর দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহার উপরে ও নিম্নে ভাঙ্গনের মুখে বাবলা, নিম্ব ও তালপ্রভৃতি বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাসী-ডাঙ্গার উচ্চতা, তাহার নাম ও অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়া ইহাকে রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামের স্থান বলিয়া অনুমান হয়। সঙ্ঘারাম বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সম্মিলন স্থান হওয়ায়. তাহার নাম সন্ন্যাসীডাঙ্গা হওয়া অসম্ভব নহে। রাজবাড়ীডাঙ্গার দক্ষিণ ও বর্ত্তমান রেশম কুঠীর পশ্চিম, প্রাচীন গঙ্গা বা বাঁওড়ের উপর একটী পুষ্করিণীর গর্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার গভীরতা প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই পুষ্করিণীর নাম যমুনাপুষ্করিণী, লেয়ার্ড সাহেব এইখানে

* অনেক গুপ্তবংশের মুদ্রায় কমলাত্মিকা মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায় উক্ত প্রতিমাকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না।



ভগ্ন মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি

রাঙ্গামাটী ।

পূর্ব্বে পাথরগড় ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি পাথর ব্যতীত, পাথরগড়ের কোনও চিহ্ন এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভ ও তাহার নিকটস্থ স্থান হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোনও কোনও প্রস্তরখণ্ডে দেবদেবী মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। একখানি বৃহৎ অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি * উক্ত যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভ হইতে আনীত হইয়া রাঙ্গামাটীর রেশমকুঠীর বিশাল বটবৃক্ষতলে স্থাপিত করা হইয়াছে। উক্ত মূর্ত্তির কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হওয়ায়, তাহাকে সহসা কোন দেবীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা কঠিন হয়। মূর্ত্তিখানি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত, উচ্চে দুই হস্তের অধিক হইবে। অষ্টভুজের দুই একটী ভুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বামদিকের উপরের হস্তে চক্র ও নিম্ন হস্তে ধনুক, দক্ষিণদিকের উপরের হস্তে খড়্গ বা খড়্গের কিয়দংশ ও নিম্ন হস্তে একটী সর্প আছে বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য হস্তের কোন কোন অংশ ভগ্ন হওয়ায়, আর কি কি অস্ত্র ছিল বুঝা যায় না। কটিবন্ধ ও কোন কোন হস্তে অলঙ্কার দৃষ্ট হয়, পায়ে নূপুর বিদ্যমান। দেবীর মুখের সম্মুখভাগ ভগ্ন হওয়ায় মুখমণ্ডলের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, দেবীর পদতলস্থ মহিষটী পূর্ণদেহে বিদ্যমান আছে। তাহার চক্ষু ও শৃঙ্গ সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রে মহিষমর্দ্দিনীর যেরূপ ধ্যান লিখিত আছে, এই মূর্ত্তির সহিত তাহার প্রায়ই ঐক্য

* লেয়ার্ড সাহেব তাহাকে ষড়ভুজমূর্ত্তি বলিয়াছেন, ও তাহাকে কালীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। তন্ত্রসারোক্ত মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যানের সহিত ইহার অনেক ঐক্য আছে।

হয়। প্রায় ১৫ ইঞ্চ উচ্চ আর এক খণ্ড প্রস্তর যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একটী শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। শিবমূর্ত্তির মুখের কতকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মস্তকস্থ জটা ও স্ফীতোদর দেখিয়া শিবমূর্ত্তি বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই শিবমূর্ত্তির উপরে আর একটী কি মূর্ত্তি আছে, তাহা বুঝা যায় না। উক্ত প্রস্তরখণ্ড পূর্ব্বে কোন মন্দিরে সংলগ্ন ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর একখানি ঐরূপ মন্দির-সংলগ্ন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উক্ত যমুনা পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। তাহা দীর্ঘে ২ হস্ত, ও প্রস্থে ১০ ইঞ্চ হইবে, এবং তাহার বেধও ১০ ইঞ্চ। উক্ত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থলে একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সহসা তাহাকে বুদ্ধ বা শিবমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা কোন দেবমূর্ত্তি কি না সন্দেহ। মূর্ত্তির দুই পার্শ্ব কারুকার্য্যভূষিত। শিল্পকার্য্যমণ্ডিত আরও কয়েকখানি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত বৃহৎ বৃহৎ আরও দুই চারিখানি প্রস্তরখণ্ড যমুনাগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, এক্ষণেও কয়েক খণ্ড তথায় পড়িয়া আছে। রাঙ্গামাটীর নিকট সংস্কারনামক গ্রামে একটী নিম্নভূমির মধ্যে একটী বাটীর চিহ্ন দেখা যায়। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তথায় পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড দীঘী ছিল, সেই দীঘীর মধ্যে রাজার ভাগিনেয় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। রাজবাড়ীডাঙ্গার অর্দ্ধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আমলাবাড়ী পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে রাজার কর্ম্মচারিগণের আবাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটী হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে গোকর্ণ গ্রামে রাজা কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেদার রায়



ভগ্ন শিবমূর্ত্তি।

নামে এক জন সিদ্ধপুরুষ বহুক্রোশব্যাপী এক জাঙ্গাল ও একটী দীঘী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। * উক্ত জাঙ্গাল ও দীঘী এক্ষণে তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঙ্গামাটী প্রাচীন কাল হইতে একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরীরূপে বিদ্যমান ছিল। রাঙ্গামাটীর নিকট পূর্ব্বে হরিনগর নামে এক প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল, তথায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি বাস করিত। ভাগীরথীপ্লাবনে উক্ত গ্রামের ধ্বংস হওয়ায়, তাহার অধিবাসিগণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কতক অধিবাসী রাঙ্গামাটীর নিকটস্থ যদুপুর প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বাস করে। মুসল্মান্‌রাজত্ব সময়েও রাঙ্গামাটী একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া কথিত হইত। কেহ কেহ ইহাকে ফৌজদারী রাঙ্গামাটী বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। উক্ত ফৌজদারী রাঙ্গামাটী আসামের অন্তর্গত। বঙ্গদেশে অনেকগুলি রাঙ্গামাটী আছে, তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। কর্ণেল রেভার্টি তাঁহার তবকৎ-নাসিরির অনুবাদে গঙ্গার পশ্চিম ও পূর্ব্বপারস্থ বিস্তৃত প্রদেশদ্বয়ের রাঙ্গামাটী ও ঢাকা নামে যে নগরীদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার উল্লিখিত রাঙ্গামাটী, মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গলার দ্বিতীয় ওলন্দাজ গবর্ণর ম্যাথিউ ভ্যাণ্ডেল ব্রুক তাঁহার ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে রাঙ্গা-

* এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কেদার রায় প্রত্যহ রাত্রিতে সেই বহুদূর-ব্যাপী জাঙ্গাল দিয়া যাতায়াত করিতেন, সেই জন্য লোকে বলিয়া থাকে—

"বাপের ঠাকুর কেদার রায়,
রেতে আসে রেতে যায়।"

মাটীকে রাঢ়প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রেও রাঙ্গামাটীকে একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। পলাশীযুদ্ধের পর রাঙ্গা-মাটীতে সৈন্যাবাস করার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে রাঙ্গামাটীর রাজবাড়ীডাঙ্গাতে সৈনিকদিগের একটী স্বাস্থ্যনিবাস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। রাঙ্গামাটী মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ফতেসিংহ পরগণার অন্তর্গত। ফতেসিংহ এক্ষণে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও জেমুয়ার রাজগণের জমিদারী। রাঙ্গামাটীর রেশম কুঠী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পা-নীর বাণিজ্যবিস্তারের সময় স্থাপিত হয়, বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী এক্ষণে উহার অধিকারী। রাঙ্গামাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে উক্ত রেশম কুঠী অবস্থিত। কুঠীর প্রাঙ্গনে ৪টী সমাধিস্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে একটীতে এডওয়ার্ড ক্লোস্ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে একটী বন্য মহিষকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। এই রেশম কুঠীতে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মহীপাল ও সাগরদীঘী।

রাঙ্গামাটীর বিবরণে আমরা দেখাইয়াছি যে, গুপ্তবংশীয়গণ পশ্চিম মুর্শিদাবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অব্যবহিত পরে এতৎপ্রদেশে কোন পরাক্রান্ত রাজবংশের রাজত্বের বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে শূরবংশীয়গণ গৌড়-রাজ্যে রাজত্ব আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহাদের

রাজধানী ছিল, পরে মগধের পরাক্রান্ত পালবংশীয়েরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে, শূরবংশীয়েরা রাঢ় প্রদেশে আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে উত্তর-রাঢ় তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে তথায়ও পালবংশীয়গণের রাজত্ব আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তররাঢ়ে মহীপাল নামে এক পালবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন, উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত মহীপাল নগর তাঁহার রাজধানী ছিল, এবং উক্ত নগর তাঁহারই নামানুসারে স্থাপিত হয়। মহীপাল নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাহা মহীপাল নামে প্রসিদ্ধ। মহীপাল পশ্চিম মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা রেলওয়ের বাড়ালা ষ্টেশন হইতে সার্দ্ধক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে এবং মুর্শিদাবাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান গয়সাবাদ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই মহীপাল নগর হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরদীঘী নামে এক প্রকাণ্ড দীঘী আছে। সাগরদীঘীর নামানুসারে তথায় একটী রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। উক্ত সাগরদীঘী রাজা মহীপালের খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহীপাল নগর ও সাগরদীঘী অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। আমরা রাজা মহীপালসম্বন্ধে যতদূর বিবরণ জানিতে পারিয়াছি, তাহারই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

উত্তররাঢ়ে মহীপাল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পালবংশীয়গণ প্রথমে মগধে রাজত্ব করিতেন, পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহাদের করায়ত্ত হইলে, রাঢ়বঙ্গেও তাঁহাদের রাজত্ব পরিব্যাপ্ত হয়। পালবংশীয়দিগের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট

হওয়ার অব্যবহিত পরেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে শূরবংশীয় আদিশূর বা জয়ন্তের পুত্র ভূশূর রাজত্ব করিতেন। আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে গৌড় দেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন হয়। ধর্ম্মপাল ভূশূরের নিকট হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিলে, ভূশূর রাঢ়দেশে নূতন পুণ্ড্রনগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। উক্ত পুণ্ড্রনগর দক্ষিণরাঢ়ে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। * প্রথমে সমগ্র রাঢ়প্রদেশই শূরবংশীয়দিগের অধীন ছিল। ক্রমে উত্তররাঢ় তাঁহাদের হস্তচ্যুত হওয়ায় পালংশীয়েরা তাহা অধিকার করিয়া বসেন, এবং মহীপালদেবের উক্ত উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করার বিষয় অবগত হওয়া যায়। মহীপাল উত্তররাঢ়ে নিজের নামানুসারে যে নগর স্থাপন করেন, তাহা ক্রমে ৩। ৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বহু সংখ্যক অট্টালিকা ও মন্দিরাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া উঠে। মহীপালদেবের প্রাসাদের ও অন্যান্য অনেক সৌধাদির চিহ্ন মহীপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপাল যে পালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ মহীপালও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, বুঝা যায় না। ধর্ম্মপালের পর যে সমস্ত পালরাজগণ গৌড়ের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পাল হইতে উদ্ভূত হন। পালবংশীয়দের তাম্রশাসনাদিতে

* কেহ কেহ হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াকে ভূশূরস্থাপিত নূতন পুণ্ড্র বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম খণ্ড ১ম ভাগ ১১৩ পৃষ্ঠা।)

এই মহীপালের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ সাগর-দীঘীর প্রস্তরফলকে লিখিত প্রচলিত শ্লোক হইতে তাঁহাকে পালবংশীয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। শ্লোকে মহীপালদেবের নাম নাই, তাহাতে সাগরদীঘী পালবংশকৃত খাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণে তাহাকে মহীপালের খনিত দীঘী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই প্রবাদ পুরুষপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। মহীপালের রাজধানী মহীপাল নগরের নিকটে হওয়ায় সাগরদীঘী মহীপালের খনিত বলিয়াই প্রতীত হয়। সুতরাং সাগরদীঘীর শ্লোকানুসারে মহীপালদেব পালবংশীয় হইতেছেন। আবার ধর্ম্মপাল ও মহীপাল সমসাময়িক বলিয়া জানিতে পারা যায়। দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্রদেব বা কোপ্পরকেশরীর দিগ্বিজয়জ্ঞাপক তিরুমলয়ের গিরিলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজেন্দ্র চোল, বিহার, রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডবিহারে (বর্ত্তমান বিহারে) ধর্ম্মপাল, উত্তররাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণরাঢ়ে * রণশূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। উক্ত নৃপতিগণ রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন। তাহা হইলে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মগধ বা বিহারেরই অধীশ্বর হইতেছেন। পালবংশীয়দের বিবরণ

* গিরিলিপির মূলে তক্কন্লাঢ়ম্ ও উত্তিরলাঢ়ম্ শব্দ দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ তাহাকে গুজরাটের অন্তর্গত লাট বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু 'বঙ্গাল' দেশের সহিত তাহাদের উল্লেখ থাকায় তাহাদিগকে দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় বলিয়া স্থির করাই সঙ্গত।

হইতে কেবল এক জন মাত্র ধর্ম্মপালের বিবরণ অবগত হওয়া যায় এবং রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়সময়ে মগধে সেই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালের রাজত্ব স্থির হওয়ায় উত্তররাঢ়ের মহীপাল তাঁহারই সমসাময়িক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই মহীপাল ব্যতীত আরও অনেক মহীপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। * তন্মধ্যে দুই জন মহীপাল ধর্ম্মপালের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মদনপালাদির তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত মহীপাল দ্বয় ধর্ম্মপালের অনেক পুরুষ পরবর্ত্তী। রাজেন্দ্রচোলদেবের গিরি লিপিতে উত্তররাঢ়ের মহীপালকে ধর্ম্মপালের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করায় এবং সাগরদীঘীর শ্লোকোক্ত সময়ের সহিত ধর্ম্মপালের সময়ের সামঞ্জস্য হওয়ায় উত্তররাঢ়ের মহীপাল ধর্ম্মপালবংশীয় মহীপালদ্বয়ের অন্যতর হইতে যে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। † উত্তররাঢ়ের মহীপাল ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ও পালবংশীয় হইতেছেন, অথচ ধর্ম্মপালবংশের তালিকায় তাঁহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এমত স্থলে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে প্রসিদ্ধ পালবংশে

† গোয়ালিয়ার, কনোজ প্রভৃতির রাজবংশেও মহীপাল নামে রাজার নাম দৃষ্ট হয়।

* বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে পালরাজবংশপ্রস্তাবে উত্তররাঢ়ের মহীপালকে ধর্ম্মপালবংশীয় প্রথম মহীপাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রাজেন্দ্রচোলের গিরিলিপি হইতে যখন ধর্ম্মপাল ও মহীপালকে সমসাময়িক বলিয়া বুঝা যাইতেছে এবং সাগরদীঘীর শ্লোকোক্ত সময়ের সহিত ধর্ম্মপালের সময়েরও যখন ঐক্য হইতেছে, তখন উত্তররাঢ়ের মহীপালকে পালরাজবংশের প্রথম মহীপাল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্থির করাই সঙ্গত।

ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহীপাল তাহারই অন্য এক শাখা হইতে উদ্ভূত হন, * এবং ধর্ম্মপালের গৌড়বিজয়ের পর তাঁহারই সাহায্যে উত্তররাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রচোলের গিরিলিপি হইতে জানা যায় যে, যে সময়ে ধর্ম্মপাল বিহারে, মহীপাল উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতেন, সে সময়ে দক্ষিণরাঢ রণশূর নামে রাজার অধীন ছিল। এই রণশূর যে আদিশূরবংশীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুলজী গ্রন্থ হইতে আদিশূর তৎপুত্র ভূশূর, ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর, ও ক্ষিতিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূরের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রণশূরের কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় না। ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া যখন দক্ষিণরাঢ়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন, তখন রণশূর যে তাঁহার পরবর্ত্তী তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, এবং তিনি যে ক্ষিতিশূরেরও পরবর্ত্তী তাহাও আলোচনার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে। রাঢ়ীয় কুলজীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ৫৬খানি গ্রাম দান করেন এবং সেই সেই গ্রাম হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গাঞির উৎপত্তি হয়। † উক্ত

* কাপ্তেন লেয়ার্ড উত্তররাঢ়ের মহীপালকে সমুদ্রপালের বংশধর বলিয়া অনুমান করেন। (Asiatic Society's Journal, 1853, P. 518) এই সমুদ্রপাল এক জন যোগী ছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্যের ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া ৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের ১৪৫ বৎসর রাজত্ব হয়। (Asiatic Researches. Vol, IX. P. 135) এই প্রবাদ ব্যতীত সমুদ্রপালের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

† "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেনচ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ॥"

(৺ বংশী বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ১১৬ পৃ।)

৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে কতকগুলি উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত হওয়ায়, * তৎকালে উত্তররাঢ় যে শূরবংশীয়দের অধীন ছিল, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মহীপালদেবকে উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতে দেখায়, এইরূপ অনুমান হয় যে, উত্তররাঢ় পরে শূরবংশীয়দিগের হস্তচ্যুত হয়, এবং রণশূরকে কেবল দক্ষিণরাঢ়ের রাজা বলিয়া উল্লেখ করায়, উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ব্রাহ্মণগণের স্থাপয়িতা ক্ষিতিশূর রণশূরের পূর্ব্ববর্ত্তীই হইবেন। সুতরাং রণশূরকে ক্ষিতিশূরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রণশূরের রাজত্বের প্রথমে অথবা ক্ষিতিশূরের রাজত্বের শেষভাগে উত্তর-রাঢ় মহীপালদেবের হস্তগত হয়। তিনি পালবংশীয় হওয়ায় তাঁহাদের অপর শাখা হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মপালদেব যে তাঁহাকে

* উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত উক্ত গ্রামসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রামগুলি মুর্শিদাবাদ-প্রদেশের অন্তর্ভূত—সেউ, জঙ্গীপুর হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত, এই গ্রাম হইতে সেউ গাঞি হইয়াছে। ঝিক বা ঝিকরা, বহরমপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব, ইহা হইতে ঝিকরাঢ়ি গাঞির উৎপত্তি। গুড়, মুর্শিদাবাদ সহর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে, ইহা হইতে গুড়ী গাঞির উৎপত্তি। পূর্ব্ব, মুর্শিদাবাদ সহর হইতে ৩॥০ ক্রোশ পশ্চিমে, ইহা হইতে পূর্ব্ব গাঞি হইয়াছে। পুতিতুণ্ড (এক্ষণে চলিত নাম পুতুণ্ডা বা পাতুণ্ড)—জেমুয়া কান্দী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে, ইহা হইতে পতিতুণ্ড গাঞি হয়। মহন্ত ফতেসিংহ পরগণার অন্তর্গত, পলাশী গ্রাম হইতে ২॥০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম, ইহা হইতে মহান্তী বা মহিন্ত্যা গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ ১১৮—১২৪ পৃষ্ঠা) ইহাদের মধ্যে ২। ১ খানি গ্রাম এক্ষণে বাগড়ির মধ্যেও পড়িয়াছে। নগেন্দ্র বাবু মুর্শিদাবাদ জেলার বালিগ্রাম হইতে বালিগাঞির উৎপত্তি মনে করেন। আমাদের বিবেচনায় উহা হাবড়ার নিকটস্থ প্রসিদ্ধ বালিই হইবে।

উত্তররাঢ়ের অধিকারে সাহায্য করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

মহীপাল ও ধর্ম্মপালের সময়।

এক্ষণে আমরা মহীপাল ও ধর্ম্মপালের সময়নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাগরদীঘী মহীপালের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত সাগরদীঘীর যে শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৭৪০ শাকে * সাগরদীঘী খনিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে যে মহীপাল উত্তররাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজেন্দ্র চোলের গিরি-লিপি অনুসারে ধর্ম্মপাল ও মহীপাল সমসাময়িক হওয়ায়, ধর্ম্মপালের সময় অবধারণ করিতে পারিলে, সাগরদীঘীর শ্লোকোক্ত সময়ে মহীপাল বর্ত্তমান ছিলেন কি না, তাহা অনায়াসে বুঝা

* সাগরদীঘীর শ্লোকে লিখিত আছে যে,—

"শাকে সপ্তদশাব্দীকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহামুক্তিহেতুনা॥"

'সপ্তদশাব্দী' শব্দের পূর্ব্বে যখন 'শাক' শব্দ আছে, তখন 'অব্দ' শব্দের বৎসর অর্থ করা সঙ্গত নহে, এবং সেরূপ অর্থ করিলে 'সপ্তদশাব্দীর' ৭০ অর্থ হয়। ৭০ শাকে মহীপালের বর্ত্তমান থাকা কদাচ সম্ভবযোগ্য নহে, সুতরাং 'অব্দ' শব্দের ভিন্ন অর্থই হইবে। 'অব্দ' শব্দে মেঘও বুঝায়, যথা—"অব্দঃ সম্বৎসরে মেঘে গিরিভেদে চ মুস্তকে" (বিশ্বপ্রকাশ)। জ্যোতিস্তত্ত্বানুযায়ী আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণভেদে মেঘ চারি প্রকার। সুতরাং 'অব্দ' অর্থে ৪ সংখ্যা বুঝিতে হইবে। 'শতাব্দী' পদটী সমাহারে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অর্থ ৪০। তাহা হইলে 'সপ্তদশাব্দীকের অর্থ ৭৪০ হইতেছে। উক্ত শ্লোকের আর একরূপ পাঠ পাওয়া যায়, তাহাতে 'শাকেসপ্তদশাধিকে' দৃষ্ট হয়। 'শাকেসপ্তদশাধিকে' পাঠে ছন্দোরক্ষা হয় না। সুতরাং 'শাকেসপ্তদশাব্দীকে' পাঠই সঙ্গত বলিয়া

যাইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদিশূরের পুত্র ভূশূরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ধর্ম্মপাল গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। বারেন্দ্র কুলজীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, রাজা ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। * এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশ আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। ভট্টনারায়ণ নিজে কান্যকুব্জ হইতে না আসিলেও তিনি যে আদিশূর ও ভূশূরের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং আদিশূরের কয়েক বৎসর পরে যে ধর্ম্মপালের রাজত্ব আরব্ধ হয় তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে আদিশূরের সময় নির্ণয় করিতে পারিলে ধর্ম্মপালের সময়ও অনায়াসে স্থির হইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন,

বোধ হয়। 'সপ্তদশাধিকের' অর্থে ৭১০ শাক বুঝায়। যদি 'সপ্তদশাবদীকে' পাঠকে 'সপ্তদশাব্ধিকে' পড়া যায় তাহাতেও ছন্দোরক্ষা হয় না, সুতরাং 'সপ্তদশাব্ধীকে' পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। 'সপ্তদশাব্ধীকে' পাঠেও ৭৪০ অর্থ বুঝায়, কারণ সংখ্যা বুঝাইতে 'অব্ধি' শব্দ প্রায়ই ৪ অর্থে প্রযুক্ত হয়। ক্বচিৎ ৭ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৭ অর্থ ধরিয়া লইলেও ৭৭০ অর্থ বুঝায়। ফলতঃ উক্ত শ্লোকের যেরূপ পাঠ হউক না কেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, সাগরদীঘী ৮ম শকাব্দে খনিত হইয়াছিল।

* "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুথমমরধূনীতীরদেশে বিধাতুং,
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুতত্নয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ।"
(লাহোড়ীবংশাবলীঃ। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম খ, ১ম ভাগ ৯৮ পৃঃ)

এবং তাঁহারই সাহায্যে জয়ন্ত পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হন। এই জয়ন্ত যে আদিশূর, তাহারও প্রমাণ আছে। কুলজীগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ভূশূর আদিশূরের পুত্র। * কোন কোন কুলজী গ্রন্থে তিনি জয়ন্তের পুত্র বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। † সুতরাং জয়ন্ত যে আদিশূরের নামান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজ-তরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, জয়াপীড় ৬৬৭ শাক হইতে ৬৯৮ শাক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আদিশূর তাঁহার সমসাময়িক হইলে, তাঁহার পর ভূশূর ও ধর্ম্মপালের সময় স্থির করা কর্ত্তব্য। ৬৯০ শাকে ভূশূরের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লইলে তাহার কয়েক বৎসর পরে যে, ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক গৌড়বিজয় হয়, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। যদি আমরা ৭১০ শাকে ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক গৌড়-বিজয়ের সময় নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ৭১০ শাকে গৌড়বিজয় হইলে তাহার কিছু পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল যে, মগধে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ৭০৭ শাক বা ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আমরা ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভের কাল বলিয়া স্বীকার করিতে

* "ভূশূরনামক পুত্র আদি নৃপতির
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির।"

(রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা। সম্বন্ধনির্ণয় ৩৩১ পৃঃ)

† "ভূশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেনচ"

(ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺ বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা)

"আদিশূরসুতেণচ" এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১ম খ, ১১৪ পৃঃ।)

পারি। * ধর্ম্মপালের সময়সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধ নামে রাজাকে কান্যকুব্জ প্রদান করিয়াছিলেন। † কান্যকুব্জের রাজবংশে চক্রায়ুধ নামে রাজার কোন উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্ররাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত ইন্দ্ররাজ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট বা রাঠোরবংশীয় ছিলেন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয়েরা পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করিতেন। এক সময়ে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় ৪ জন ইন্দ্ররাজের নাম দৃষ্ট হয়। ‡ নারায়ণপালের তাম্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজকে আমরা ৩য় ইন্দ্ররাজ মনে করিয়া

* বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে পালরাজবংশে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দেই ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীমুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"

(নারায়ণপালের তাম্রশাসন ৩য় শ্লোক।)

'মহোদয়শ্রী' শব্দের অর্থ কান্যকুব্জের রাজলক্ষ্মী। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, তিনি কান্যকুব্জপতিকে স্বরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

"ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত কনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃসললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥"

(ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ১২শ শ্লোক।)

‡ Indian Antiquary Vol XI. P. 109.

থাকি। কারণ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত ধর্ম্মপালের সময়ের সহিত অপরাপর ইন্দ্ররাজের সময়ের অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে। ৩য় ইন্দ্ররাজের পর আমরা ২য় কর্করাজকে রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় দেখিতে পাই। রাষ্ট্রকূট-বংশের ৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশাখের একখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে, গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবপতি কর্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। * এই গৌড়েশ্বর যে ধর্ম্মপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কর্করাজের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় ইন্দ্ররাজ যে ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে যে, ৭০৫ শকাব্দে উত্তর প্রদেশে কৃষ্ণনৃপজ ইন্দ্রায়ুধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন; † রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় ২য় কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ৩য় ইন্দ্ররাজের উল্লেখ আছে। ‡ উক্ত তালিকা দ্বারা রাজগণের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু কাহার পর কাহার রাজত্বকালের সম্ভব হইতে পারে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ইন্দ্ররাজের নাম দৃষ্ট হওয়ায় ৩য় ইন্দ্ররাজকে কৃষ্ণনৃপজ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইন্দ্রায়ুধকে ইন্দ্ররাজ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ৭০৫ শকাব্দ ইন্দ্ররাজের রাজত্বকাল হইলে তাঁহার

* সাহিত্য ১৩০১, অগ্রহায়ণ ৫১৭ পৃঃ।

† "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।"
(জৈনহরিবংশ ৬৬ সর্গ।)

‡ Indian Antiquary Vol XI. P. 109.

সমসাময়িক ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ অনায়াসে ৭০৭ শাকে হইতে পারে। ধর্ম্মপালের সময়সম্বন্ধে আরও দুই একটী বিশিষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। প্রভাবকচরিতপ্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে শূরপাল বা বপ্পভট্টির বিবরণ অবগত হওয়া যায়। প্রভাবকচরিতে লিখিত আছে যে, ৮০৭ সম্বতে বা ৬৭৩ শাকে শূরপাল বা বপ্পভট্টির দীক্ষা হয়, সেই সময়ে কনোজে যশোবর্ম্মা নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের অধীশ্বর হন, আমরাজের সহিত গৌড়াধিপতি ধর্ম্মের শত্রুতা ছিল। শূরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন, পরে ধর্ম্মের সভায় গমন করেন। সেই সময়ে বাক্‌পতি ধর্ম্মের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শূরপাল অবশেষে পুনর্ব্বার আমরাজার সভায় উপস্থিত হন, ইহার পর ধর্ম্ম ও আমরাজের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। ৮৯০ সম্বতে বা ৭৫৬ শাকে মগধতীর্থে আমরাজের মৃত্যু ঘটে। তাহা হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহার সমসাময়িক হওয়ায়, ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ ও গৌড়বিজয়ের বিষয় স্বীকার করিতে হয়। যে সময়ে আমরাজের রাজত্বকাল দেখা যাইতেছে, সেই সময়ে চক্রায়ুধকে কানকুব্জে রাজত্ব করিতে দেখায় আমরাজকেই চক্রায়ুধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমরাজ বা চক্রায়ুধের সহিত ধর্ম্মের শত্রুতা ছিল, পরে মিত্রতা স্থাপিত হয়, এবং চক্রায়ুধ বা আমরাজ রাষ্ট্রকূটবংশীয় ইন্দ্ররাজকর্ত্তৃক কান্যকুব্জচ্যুত হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আমরাজ বা চক্রায়ুধকে উক্ত রাজ্য অর্পণ করেন।

* বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে লিখিত পালরাজবংশে আমরাজের পুত্র পিতৃদ্বেষী দন্দুককে ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সুতরাং জৈন গ্রন্থানুযায়ী ৬৭৩ শাকে যশোবর্ম্মদেবের অবস্থান ও ৭৫৬ শাক পর্য্যন্ত আমরাজের রাজত্বকাল হইলে, আমরা যে সময়ে ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জৈনগ্রন্থে দেখা যায় যে, বাক্‌পতি ধর্ম্মপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া বাক্‌পতি, ভবভূতিপ্রভৃতি কবিগণকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়াছিলেন। * ৬১৯ শাক হইতে ৬৫৫ শাক

কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ইন্দ্ররাজকে ধর্ম্মপালের অরাতি বলিয়া উল্লেখ করায়, তাঁহার মিত্র আমরাজ বা চক্রায়ুধের বিদ্রোহী পুত্রকে তাহা বলা যাইতে পারে না। জৈন হরিবংশে ইন্দ্রায়ুধকে কৃষ্ণনৃপজ বলা হইয়াছে, এবং আমরা যখন রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তালিকায় ইন্দ্রের অল্প পূর্ব্বেই কৃষ্ণরাজের নাম পাইতেছি, তখন তাঁহাকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় বলিয়া স্থির করাই কর্ত্তব্য। তিনি পালরাজের তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল পিতা চক্রায়ুধকে পুনরায় কান্যকুব্জ রাজ্য দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্চালবাসিগণ হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। ইহার মূল উদ্ধৃত করেন নাই। বাস্তবিক যদি মূলের অনুবাদ এইরূপ হয়, তাহা হইলেও বিশেষ দোষ ঘটে না। পিতা অর্থে পঞ্চালবাসি-গণের পিতা বা পালয়িতা বলিলে কোন দোষ হয় না, অথবা চক্রায়ুধ অবশেষে তাঁহার পুত্রকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার রাজ্যচ্যুত হওয়ায় ধর্ম্মপাল পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।

* অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ বা ৬৭৫ শাক যশোবর্ম্মার মৃত্যুর সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে তাহার অনেক পরে যশোবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নগেন্দ্র বাবু ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বা ৬৯৭ শাক যে আমরাজের রাজ্যারোহণের কাল অনুমান করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পর্য্যন্ত ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল স্থির হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর ৭১০ শাকে গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের সভায় বাক্‌পতির বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বারম্বার যে রাজেন্দ্র চোলদেবের দিগ্বিজয়ের কথা বলিয়াছি, তাঁহারও সময় হইতে ধর্ম্মপাল ও মহীপালের সময় নির্ণীত হয়। রাজেন্দ্র চোল বা কোপ্পরকেশরী তামিল কবি কম্বনের প্রধান সহায় ছিলেন। কম্বন তাঁহার রামায়ণের একটী শ্লোকে ৮০৮ শাকে রাজেন্দ্র চোলদেবের বর্ত্তমান থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। * আমাদের বিবেচনায় উক্ত সময় রাজেন্দ্র চোলদেবের রাজত্বের শেষ ভাগ হইবে। সাধারণতঃ নৃপতিগণের দিগ্বিজয়ের প্রথানুসারে রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহারও দিগ্বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ৭৫৮ শাকে তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মপাল মহীপালপ্রভৃতি যে পরাজিত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মপাল যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ আলোচনা করিলে তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ৭০৭ শাকে তাঁহার রাজত্বারম্ভ ও ৭১০ শাকে তৎকর্ত্তৃক গৌড়বিজয় হইলে ৭৫৮ শাক বা ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ও মহীপাল যে রাজেন্দ্র চোলকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে। † এই সমস্ত প্রমাণ আলোচনা করিলে ৭৫০ শাকেই সাগরদীঘী

* Indian Antiquary Vol. VII. P. 172.

† বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ৪৫ বৎসর ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, কিন্তু সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল আরও কিছু দীর্ঘ করা আবশ্যক।



খনিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। ৭৪০ শাকে সাগরদীঘী খনিত হইলে, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে, মহীপাল উত্তর-রাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা ৭৩৫ শাকে বা ৮১৩ খৃষ্টাব্দে উত্তররাঢ়ে মহীপালের রাজত্বারম্ভ ও মহীপাল নগরনির্ম্মাণ এবং ৭৬৫ শাক বা ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বশেষ অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং ৭৫৮ শাক বা ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলকর্তৃক তাঁহার পরাজয় অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। রণশূরকে ক্ষিতিশূরের পুত্র স্বীকার করিলে ৭৩২ শাক বা ৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বারম্ভ অনুমান করা যাইতে পারে, এবং ৭৩৫ শাক বা ৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যে মহীপালকর্তৃক উত্তররাঢ়চ্যুত হন তাহাও স্বীকার করা যায়।

মহীপাল-নগরের বর্ত্তমান অবস্থা।

আমরা মহীপালের সময়নির্দ্দেশসম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। এক্ষণে তাঁহার রাজধানী মহীপাল-নগরের বর্ত্তমান অবস্থার যথাযথ বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহীপালনগর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৩। ৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও অগণ্য সৌধমালায় বিভূষিত হয়। অদ্যাপি সেই বিস্তৃত নগরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। নলহাটী-আজিমগঞ্জ রেলওয়ের বাড়ালা বা সাহাপুর ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীতীরস্থ গয়সাবাদ পর্য্যন্ত প্রায় ৪ ক্রোশ স্থানে উক্ত মহীপালনগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং যে স্থানে মহীপালের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা মহীপাল নামে প্রসিদ্ধ। রাজা মহীপালদেবের প্রাসাদ এক্ষণে কতকগুলি

ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্তূপ খনন করিলে প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ডসমূহ বহির্গত হয়। ঐ সমস্ত স্তূপের মধ্যে দুইটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটী গোলাকার। উক্ত গোল পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বেই প্রস্তর ও ইষ্টকস্তূপ। তন্মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বের স্তূপই সর্ব্বোচ্চ। উক্ত সর্ব্বোচ্চ স্তূপের উত্তর-পশ্চিম কোণে আর একটী পুষ্করিণী, তাহার নিকটে দুইটী খাদ আছে। এইরূপ প্রবাদ যে, তথা হইতে বড় বড় প্রস্তর উত্তোলিত হইয়া স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। পুষ্করিণী দুইটী আজিও সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু তাহারা এরূপ জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের জল ব্যবহার করা যারপরনাই দুষ্কর। স্তূপগুলির উপর বেল, কপিত্থ, তেঁতুলপ্রভৃতি বৃক্ষ ও নানাপ্রকার জঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অগম্য করিয়া তুলিয়াছে। স্তূপগুলির চারিপার্শ্বের জমি কর্ষিত হইয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু সেই সমস্ত জমি হইতে কর্ষণকালে ইষ্টকচূর্ণ বহির্গত হইয়া থাকে। স্তূপের নিকটস্থ ভূমিতে একখানি প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে, তাহার আকার হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। * দন্ত ও কর্ণ হস্তীর ন্যায় বটে, কিন্তু দুইটী শৃঙ্গও বিদ্যমান আছে। এই অস্বাভাবিক প্রতিমূর্ত্তিকে সাধারণ লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া থাকে। † সম্ভবতঃ তাহা কোনও বৌদ্ধদেবমন্দিরসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ড হইবে। এতদ্ভিন্ন স্তূপগুলিতেও অনেক প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়। মহীপাল গ্রামে এক্ষণে কয়েক ঘর কৃষক ও সাঁওতালের বাস। ইহার নিকটে

* প্রস্তরখানি দৈর্ঘ্যে ৩ হাত, প্রস্থে ১৩। ১৪ ইঞ্চ ও বেধ ৭। ৮ ইঞ্চ হইবে।

† রাঙ্গামাটীর বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের নাম ও রাক্ষসের দেহ।

আমলাবাড়ী নামক একখানি গ্রামে প্রাচীন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উক্ত গ্রামকে মহীপাল রাজার কর্ম্মচারীবর্গের আবাসস্থান বলিয়া অভিহিত করে।

মহীপালের দ্বাদশ হস্তযুক্ত মূর্ত্তি।

মহীপালের নিকটস্থ একটী পুরাতন পুষ্করিণীর গর্ভ হইতে একটী অদ্ভুত প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়।† মূর্ত্তিটী দেখিয়া তাহা কিরূপ প্রতিমূর্ত্তি সহসা স্থির করা যায় না। মূর্ত্তিটী দেখিয়া দ্বাদশহস্তযুক্ত পুরুষমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। দুই পার্শ্বে দুইটী সহচরও আছে, সহচরদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি উপবিষ্ট। স্ত্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের দক্ষিণ হস্ত জানুসংলগ্ন, বামহস্তে এক একটী পদ্ম। সহচর দুইটী দণ্ডায়মান, তাহাদের কর্ণে গোলাকার অলঙ্কার। মূর্ত্তির দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ হস্ত উত্তোলিত ও একটী পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। তাহার নিম্ন হস্তেও একটী পদ্ম। দক্ষিণদিকের তৃতীয় হস্তস্থ পদ্মের উপর একটী বৃষ অঙ্কিত। চতুর্থ হস্তের পদ্মের উপর হংসের ন্যায় পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি। পঞ্চম বা সর্ব্ব নিম্ন হস্ত একটী সহচরের মস্তকে ন্যস্ত, এবং তাহার অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে একটী পদ্মকোরক। ষষ্ঠ বা সম্মুখভাগের হস্তেও একটী পদ্ম। বামপার্শ্বের সর্ব্বোচ্চ হস্ত ভগ্ন। দ্বিতীয় হস্তে পদ্মোপরি মনুষ্যের ন্যায় মুখ ও পক্ষীর ন্যায় পদবিশিষ্ট একটী মূর্ত্তি, তাহাকে গরুড় বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয় হস্তের পদ্মের উপর একটী জন্তুর মূর্ত্তি, তাহা বরাহ, মহিষ,

† কাপ্তেন লেয়ার্ড এই মূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়া এসিয়াটিক মিউজিয়মে প্রেরণ করেন। আমরা তথা হইতে তাহার ফটো গ্রহণ করিয়াছি। ইহার বিবরণ Asiatic Society's Journal 1853. P. 518 দ্রষ্টব্য। মূর্ত্তিটী ৪২॥০ ইঞ্চ × ৩০ ইঞ্চ হইবে।

বা সিংহ হইতে পারে। চতুর্থ হস্তে পরশু বা লাঙ্গলের ন্যায় অস্ত্র। পঞ্চম বা সর্ব্বনিম্ন হস্ত বামপার্শ্বের সহচরের মস্তকে ন্যস্ত। ষষ্ঠ বা সম্মুখ ভাগের হস্তে শঙ্খ। মূর্ত্তির মস্তক ভগ্ন, কণ্ঠালঙ্কার ছুইটীর নিম্নভাগের চিহ্ন দেখা যায়। কণ্ঠস্থ অলঙ্কারের মধ্যে হীরকের ন্যায় একটী পদার্থ বোধ হয়। বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রও আছে। পরিহিত বস্ত্রও বিদ্যমান আছে। গলার দুই পার্শ্বে সর্পের ফণা বা কুঞ্চিত কুন্তল দেখা যায়। হস্তগুলিতেও অলঙ্কার আছে। মূর্ত্তিটী একটী পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান। পদ্মের দুই দিকে দুইটী হস্তীর মূর্ত্তি ছিল, বাম দিকের হস্তীমূর্ত্তিটী বিদ্যমান আছে, দক্ষিণদিকের মূর্ত্তিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটী বৃক্ষের চিত্র অঙ্কিত আছে। এরূপ মূর্ত্তি কোন হিন্দু দেবদেবীর আকারের সহিত ঐক্য হয় না। দ্বাদশভুজ মূর্ত্তি প্রায় হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। শক্তির কোন কোন মূর্ত্তি দ্বাদশ হস্তযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু তাহার সহিত এ মূর্ত্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। লেয়ার্ড সাহেব প্রভৃতি উক্ত মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা বিষ্ণুমূর্ত্তি কি না সন্দেহ। বিষ্ণুর দ্বাদশ হস্তযুক্ত মূর্ত্তি কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত ইহার অন্যান্য বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য আছে। হস্তস্থিত পদ্মগুলিতে হিন্দুদেবদেবীর বাহনের চিত্রও রহিয়াছে। তদ্দ্বারা তাহাকে বিষ্ণু বিরাট্ মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। গলায় অলঙ্কার কৌস্তুভজড়িত বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ এ মূর্ত্তিটী কোন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির ন্যায় অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বাদশ হস্তযুক্ত মূর্ত্তি কোন



মহীপালের দ্বাদশহস্তযুক্ত মূর্ত্তি।

বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি হইতেও পারে। গলায় উপবীতের ন্যায় চিহ্ন দেখিয়া বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তিতে যখন উপবীতের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তখন বৌদ্ধদেবমূর্ত্তিতেও উপবীত থাকার সম্ভব। পালবংশীয়েরা সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পালবংশীয়দের সময়ে বঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, এবং প্রাচীন হিন্দু তান্ত্রিক মতের সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত মিশ্রিত হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মের মধ্যে অনেক বৌদ্ধ মতের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবমূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা হিন্দু কি বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। তবে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। মহীপালের স্তূপ খনন করিলে এক্ষণেও নানারূপ প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হইতে পারে। লেয়ার্ড সাহেব আরও দুইখানি প্রস্তরখণ্ড গয়সাবাদের দরগার নিকট হইতে লইয়া মিউজিয়মে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দুই প্রস্তরখণ্ডে যে অক্ষর খোদিত ছিল, তাহা তিনি পালি অক্ষর বলিয়া অনুমান করেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকটী স্বর্ণ মুদ্রাও প্রেরিত হয়।

মহীপালনগর ব্যতীত সাগরদীঘী আজিও মহীপালদেবের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সাগরদীঘী মহীপাল হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিনক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তাহার নিকটে সাগরদীঘী নামে নলহাটী-আজিমগঞ্জ রেলপথের একটী ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৭৪৭ শাকে মহীপালদেবকর্ত্তৃক সাগরদীঘী খনিত হয়।

সাগরদীঘী।

সাগরদীঘীর খননসম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। এক সময়ে রাজা মহীপাল, তাঁহার মহিষী, অন্যান্য পরিজন ও অনুচরবর্গসহ রাজধানী মহীপাল হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। এক্ষণে যে স্থানে সাগরদীঘী খনিত হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য শিবির সন্নিবেশ করেন। বহু অনুচরসহ রাজাকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া দুইটী ভয়বিহ্বল ব্রাহ্মণতনয় একটী বৃক্ষের উপর আশ্রয়গ্রহণ করে। তাহারা এতদূর ভীত হইয়া পড়ে যে, বহুক্ষণপর্য্যন্ত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে সাহসী হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একটী ভয়ে ও কষ্টে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। রাজার অনুচরগণ দ্বিতীয়টীকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহচরের মৃতদেহসহ তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইয়া রাজাকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করিলে, রাজা অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার জন্য ব্রহ্মহত্যা সংসাধিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করেন। পণ্ডিতগণকর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় যে, রাজা ও রাণী পদব্রজে যতদূর গমন করিতে পারিবেন, ততদূরপর্য্যন্ত সাধারণের হিতার্থে একটী জলাশয় খনন করাইয়া দিলে তাঁহার পাপমোচন হইতে পারে। রাজা ও রাণী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই জন্য সাগরদীঘী দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ খনিত হয়। এই গল্প কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না, তবে সাগরদীঘীর প্রস্তরফলকে লিখিত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মহত্যার মুক্তির জন্য উক্ত দীঘী খনিত হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত প্রবাদের কিছু মূল থাকিলেও থাকিতে পারে। পালবংশীয়েরা সাধারণতঃ



সাগরদীঘী।

(পূর্ব্ব-দিক্ হইতে)

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের অভাব ছিল না। ধর্ম্মপালপ্রভৃতির বিবরণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাগরদীঘীর নাম লইয়া এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উক্ত দীঘী খনিত হইলেও তাহার গর্ভ হইতে জল বহির্গত হয় নাই। রাজা মহীপালের প্রতি এইরূপ স্বপ্নাদেশ হয় যে, সাগরনামে কুম্ভকার দীঘীর মৃত্তিকা খনন করিলে জল উঠিবে।* রাজা সাগরকে আহ্বান করাইয়া সেইরূপ করিতে বলিলে, সাগর রাজাদেশ পালন করে, এবং দীঘীও জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই জন্য সাগরের নামানুসারে তাহা সাগরদীঘী নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই প্রবাদের কোন মূল আছে বলিয়া জানা যায় না, সাগরদীঘীর শ্লোকে ইহার কোন উল্লেখ নাই। উক্ত শ্লোকে সাগরদীঘীসম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত বিষয়েরই উল্লেখ আছে, অথচ এইরূপ একটী গুরুতর ঘটনার উল্লেখ না থাকায় উক্ত প্রবাদে বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না। সাগরের ন্যায় বিশাল আকারের জন্য উক্ত দীঘী সাগরদীঘী নামে অভিহিত হয়। গৌড়ে লক্ষ্মণসেনের খনিত এক বিশাল দীঘীও সাগরদীঘী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সাগরদীঘীর বিশালত্বের জন্য যে উহার উক্ত নাম হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাগরদীঘীর যে শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মহত্যার

* কুম্ভকারদের মধ্যে সাধারণতঃ পাল উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরপাল নামে মহীপালের কোন আত্মীয় পরে সাগর কুম্ভকার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন কিনা বুঝা যায় না। সাগরদীঘীর শ্লোকে সাগরপাল বা সাগর কুম্ভকারের কোনই উল্লেখ না থাকায় উক্ত প্রবাদের আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

মুক্তির জন্য ৭৪০ শাকে পালবংশকৃত এই খাত খনিত হয়। উহার খননকার্য্যে ১০ সহস্র বর্ব্বর (কুলী), ৬ সহস্র খনক, ১০ লক্ষ ইষ্টক, দুই দুই লক্ষ তৃণকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং শত সহস্র গো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ষট্‌পলাধিক সুবর্ণ, অসংখ্য শীতবস্ত্র ও ধৌত বস্ত্র এবং ব্রাহ্মণদিগকে শালগ্রামের নিকটে সশস্য ভূমি ও দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। * শ্লোকে রাজা মহীপালের স্পষ্ট নামোল্লেখ নাই, কিন্তু সাগরদীঘীকে পালবংশকৃত খাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরুষানুক্রমিক প্রবাদ, কিন্তু অদ্যাপি সাগরদীঘীকে মহীপালের খনিত জলাশয় বলিয়া প্রচার করিতেছে। মহীপালদেবের রাজধানী মহীপালনগরের নিকটবর্ত্তী এবং তাঁহার রাজত্বসময়ে উহা খনিত হওয়ায়, তাহাকে নিঃসন্দেহে মহীপালকৃত দীঘী বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সাগরদীঘীখননে এক বিরাট্ ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় ১০। ১২ রশি একটী বৃহদাকার জলাশয় ও ১০টী

"শাকে সপ্তদশাব্দীকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহামুক্তিহেতুনা॥
বর্ব্বরাদশসাহস্রাঃ যট্‌ সহস্রাণি খাতকাঃ।
ইষ্টকা দশলক্ষাণি তৃণং কাষ্ঠং দ্বয়ং দ্বয়ং॥
গবাং শতসহস্রাণি সুবর্ণং ষট্‌পলাধিকং।
শীতবস্ত্রাণ্যসংখ্যানি ধৌতং বস্ত্রং জনং জনং॥
সশস্যভূমিদানঞ্চ শালগ্রামস্য সন্নিধৌ।
দ্বিজেভ্যো দক্ষিণা দত্তা ইতি সাগরদীর্ঘিকা॥"

এই শ্লোকটী সাগরদীঘীর একটী বাঁধা ঘাটে সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডে লিখিত ছিল। ঘাটটী ভগ্ন হইয়া গেলে, প্রস্তরখণ্ডখানি বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতে পতিত থাকে।

বাঁধা ঘাট এবং তাহাদের উপরে পথিকগণের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে যেরূপ অসংখ্য লোক ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোকদিগকে যথেষ্ট দ্রব্যাদিও প্রদত্ত হয়। সাগরদীঘী পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, উত্তর ও দক্ষিণ পারে ৩টী করিয়া ৬টী এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে ২টী করিয়া ৪টী বাঁধা ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সাগরদীঘীর বর্ত্তমান অবস্থা।

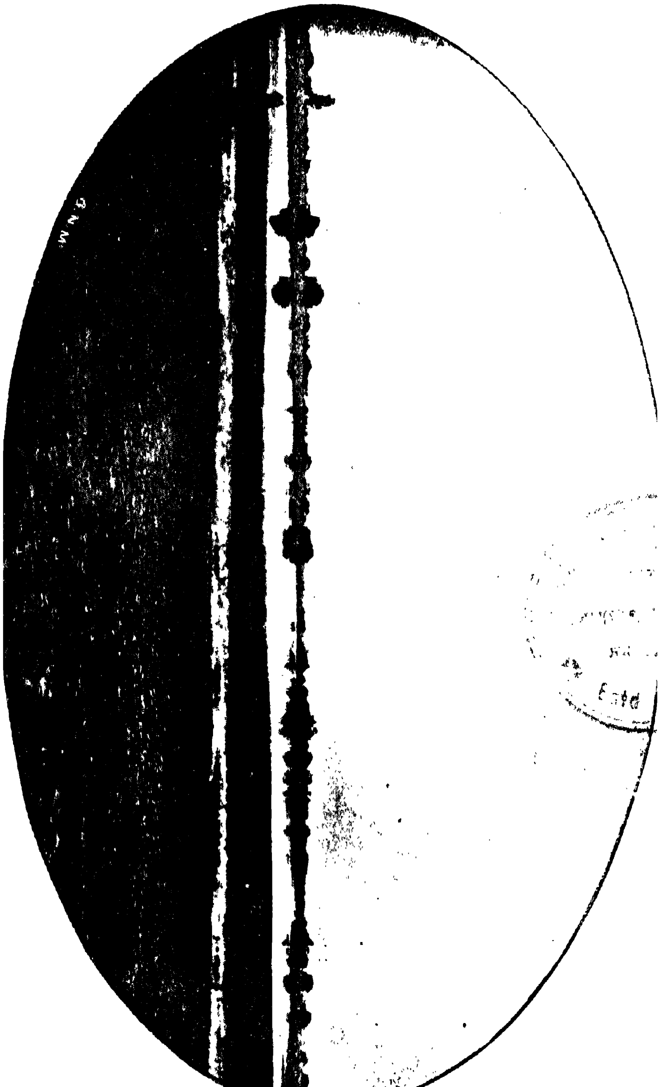
সাগরদীঘীর এক্ষণে কতকাংশ শুষ্ক হইয়াছে। দীঘীর পার হইতে অনেক দূরে জল সরিয়া গিয়াছে। তথাপি এক্ষণে তাহা যেরূপ আকারে বর্ত্তমান আছে, তাহাতেই তাহার বিশালত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঘাট ১০টীর যৎসামান্য চিহ্ন আছে, একটীও পূর্ণাবস্থায় নাই। স্থানে স্থানে কতকগুলি ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই সমস্ত ইষ্টকখণ্ড দেখিয়া ঘাটগুলির স্থান স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্ব পারের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ

প্রায় ২৫। ৩০ বৎসর হইল, কোন এক জন ধান্যব্যবসায়ী তাহাকে গোশকটে করিয়া লইয়া যায়। কেহ তাহার সংবাদ বলিতে না পারায় আমরা উক্ত প্রস্তরখণ্ডের অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। শ্লোকটী সাগরদীঘী অঞ্চলের কোন কোন লোকের নিকট লিখিত থাকায়,এবং কাহার কাহার মুখস্থ থাকায় আমরা দুই তিন জনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব, শুদ্ধাকারে তাহাকে প্রকাশ করিলাম। আমাদের প্রকাশিত শ্লোকে কোন শব্দ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তবে অশুদ্ধ বিভক্তিগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়াছে মাত্র। ইহার সময়সম্বন্ধে দুই একটী পাঠে কিছু অনৈক্য আছে। সে বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

আছে, এক্ষণে তাহাকে বুড়া পীরের আস্তানা বলে। সেই স্তূপের উপর কতকগুলি বৃক্ষও জন্মিয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত স্তূপ ঘাটসংলগ্ন কোন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ হইবে। পশ্চিম পারের উত্তর-পশ্চিম কোণে আর একটী স্তূপ আছে, তাহা পূর্ব্ব পারের বুড়া পীরের ভাগিনেয়ের আস্তানা বলিয়া কথিত। তাহার উপরেও কতকগুলি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। পূর্ব্ব পারের উপর সন্তোষপুর নামক একখানি গ্রাম আছে, * উহা মহীপালের সময় হইতে বর্ত্তমান বলিয়া কথিত। দীঘীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সাগরদীঘী থানা, ও তাহারই কিছু দূরে রেলওয়েষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে দীঘীর উত্তর পার দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরদীঘীর দক্ষিণ পার হইতে কিছু দূরে মুসল্মানদিগের একটী নূতন দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসল্মানরাজত্বসময়েও সাগরদীঘী অঞ্চলের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। † সাগরদীঘীর জল অদ্যাপি অনেক গভীর আছে, এবং তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য পাওয়া যায়। দীঘীর কতকাংশ শৈবালে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। সাগরদীঘীর পশ্চিমে লস্করদীঘী নামে আর একটী দীঘী দেখা যায়, তাহা সাগরদীঘী হইতে আকারে অনেক ক্ষুদ্র। সাহাপুর বা বাড়ালা ষ্টেশনের নিকটে দুইটী দীঘী আছে, তাহার একটী এখনও প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। অপরটী গ্রীষ্মকালে জলশূন্য হইয়া পড়ে, তাহাকে লোকে কাণাদীঘী বলে। উক্ত কাণাদীঘীর

* দিনাজপুরের মহীপালদীঘীর নিকট সন্তোষনামে গ্রাম আছে। উক্ত মহীপালদীঘী ধর্ম্মপালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপালদেবের খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† সাগরদীঘীর নিকট হইতে হোসেন সার নামাঙ্কিত ২। ১টী রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে।



উপর দিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। মহীপালদেবের বিবরণ ব্যতীত উত্তররাঢ়ে জয়পালনামে রাজারও উল্লেখ দেখা যায়, তিনিও যে পালবংশোদ্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উত্তররাঢ় ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।

আমরা মহীপালপ্রভৃতির বিবরণে উত্তররাঢ়ে পালবংশের রাজত্বের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, এবং পালবংশের পূর্ব্বে তথায় যে শূরবংশের আধিপত্য ছিল, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তররাঢ় যেরূপ পালবংশের অন্যতম শাখাদ্বারা শাসিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ইহা এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণকর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়া অদ্যাপি বাঙ্গালার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রদেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। উত্তররাঢ়ের নামানুসারে উক্ত কায়স্থ সন্তানগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। রাঢ়প্রদেশ সাধারণতঃ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে যে, সেনবংশের রাজত্বকালে তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্য মিথিলা, রাঢ়, বাগড়ী বা বগ্ড়ী (উপবঙ্গ), বারেন্দ্র ও বঙ্গ, এই ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, * এবং বল্লালসেনদেব উক্ত পঞ্চ বিভাগের কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু বল্লালসেনের বহুপূর্ব্ব হইতে রাঢ়প্রদেশের অন্তর্গত উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের কথা যে অবগত হওয়া যায়, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। মিথিলার পর হইতে উড়িষ্যাপর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই রাঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে কতদূর পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ের শেষ ও

* রাঢ়বঙ্গৌ তথা বগ্ড়ী বারেন্দ্রমিথিলৌ তথা।
ইতি তেষাং পঞ্চসংজ্ঞা দেশাচারানুসারতঃ॥ কায়স্থকারিকা।

দক্ষিণরাঢ়ের প্রারম্ভ, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে। যদি ইহাদের কোন প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ করার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে আমরা প্রসিদ্ধ অজয়নদকে সেই সীমারূপে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। অজয়ের উত্তর ভাগকে উত্তররাঢ় ও তাহার দক্ষিণভাগকে দক্ষিণরাঢ় বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পশ্চিম মুর্শিদাবাদ উত্তররাঢ়েরই অন্তর্গত হয়। পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ফতেসিংহ পরগণা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের যে প্রাচীন ও প্রধান সমাজ তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোন্ সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত পশ্চিম মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থশ্রেণীর কুলাচার্য্যগণের মধ্যে কাহার কাহার মতে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ভৃত্যসহ ৫ জন কায়স্থ আনয়ন করেন। * এই ৫ জন কায়স্থ রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়া রাঢ়প্রদেশে গঙ্গার নিকটে বাস করিয়াছিলেন। আবার কাহার কাহার মতে আদিশূরের কিছু কাল পরে অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে ৫ জন কায়স্থ গৌড়দেশে আসিয়া বাস

* বিপ্র পঞ্চ, করণ পঞ্চ, ভৃত্য পঞ্চজন,
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন ॥

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণকে ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া আপনাদিগকে পঞ্চকরণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে দ্বিপঞ্চ ভিন্ন কোথায়ও ত্রিপঞ্চের উল্লেখ নাই, এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের আদিপুরুষগণের সহিত উত্তররাঢ়ীয়দিগের আদিপুরুষগণের যে ঐক্য আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

করেন। * ইহার কোন মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আলোচনাদ্বারা এইরূপ অনুমান হয় যে, আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে যে ৫ জন কায়স্থ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত বঙ্গদেশের তদানীন্তন কায়স্থগণের মধ্যে কাহার কাহার বংশধর উত্তররাঢ়ে বাস করায় তাঁহাদের সন্তানগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। † ঐরূপে বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয়, ও বারেন্দ্র কায়স্থশ্রেণীর উৎপত্তি হয়। বাৎস্যগোত্রজ অনাদিবর সিংহ, সৌকালীনগোত্রজ সোমেশ্বর ঘোষ, মৌদ্গল্যগোত্রজ পুরুষোত্তম দাস, বিশ্বামিত্রগোত্রজ সুদর্শন মিত্র, কাশ্যপগোত্রজ দেব দত্ত, যথাক্রমে উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত সিংহেশ্বর গ্রামে, যজানে, বহড়ানে, মেহগ্রামে ও বিরামপুরে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। ইহাঁরাই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পঞ্চবীজ বলিয়া কথিত হন। ‡

* অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা,
হস্তিনা দ্বারকাপুরী কায়স্থস্থানমষ্টকম্।

এই বচন হইতে সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষদিগের অযোধ্যাপ্রভৃতি স্থান হইতে আগমন স্থির করিয়াছেন।

† আদিশূরের সমকালীন কায়স্থগণের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করায় যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কায়স্থকারিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"এতেষাঞ্চ সুতাঃ পুনর্দেশান্তরংগতাঃ ক্রমাৎ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ॥
উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃস্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥
পুরাণাদিবরঃ সোমস্তথৈব পুরুষোত্তমঃ।
সুদর্শনো দেবদত্তঃ পঞ্চবীজং সমাগতং॥

তাঁহাদের অধ্যুষিত পঞ্চগ্রামের মধ্যে যজান পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত, এবং অদ্যাপি তাহার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। তথায় এবং তাহার নিকটস্থ পাঁচথোপীপ্রভৃতি স্থানে সোমঘোষবংশীয় এবং কান্দীপ্রভৃতি স্থানে অনাদিবর সিংহের সন্তানগণ বাস করিয়া পশ্চিম-মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণাকে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের শ্রেষ্ঠ সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আদিশূরের সময় যে সমস্ত কায়স্থ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করায় উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণী কায়স্থগণের গোত্রাদি আলোচনা করিলে উহাই প্রতিপন্ন হয়। * দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের অন্যতম আদিপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষ সৌকালীনগোত্রজ ছিলেন, এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্ব পুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ সেই গোত্রজ হওয়ায় মকরন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা অনুমান করা যাইতে পারে। আবার আমরা আদিশূরের সময় পশ্চিম গৌড় হইতে আগত বাৎস্য-গোত্রজ বীরবাহু সিংহের উল্লেখ দেখিতে পাই। বীরবাহু বঙ্গজ

* ব্রাহ্মণব্যতীত অন্যান্য জাতির পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র স্থির হইয়া থাকে। সেই জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতির গোত্র দেখিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে এক বংশোদ্ভব বলিয়া স্থির করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য জাতিরও গোত্রপ্রথা বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমগোত্রজ-দিগকে একবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কায়স্থজাতির মধ্যে এক উপাধিযুক্ত ব্যক্তিগণের এক গোত্র দেখিলে তাহাদিগকে অনায়াসে এক-বংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়।

ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সম্মাননীয় সিংহবংশীয়গণের আদিপুরুষ। অনাদিবর সিংহ ও বীরবাহু সিংহ একগোত্রজ হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব। আবার সুদর্শন মিত্রের ন্যায় কান্যকুব্জ হইতে আগত বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের অন্যতম আদিপুরুষ কালিদাস মিত্র বিশ্বামিত্রগোত্রজ হওয়ায় এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে। আদিশূরের সময়ে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ দত্তবংশীয়দের আদিপুরুষ পুরুষোত্তম মৌদ্গল্যগোত্রজ ছিলেন, কিন্তু বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে কাশ্যপগোত্রজ দত্তও দেখিতে পাওয়া যায়। দেব দত্তের এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রজ দত্তগণের আদিপুরুষকে এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ঐরূপ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ দাসবংশীয় কায়স্থগণ কাশ্যপগোত্রজ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে মৌদ্গল্যগোত্রজ দত্তও দৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের ও উত্তর-রাঢ়ীয় পুরুষোত্তম দাসের পূর্ব্বপুরুষকে এক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং যে যে বীজপুরুষ হইতে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের উৎপত্তি হইয়াছে, উত্তররাঢ়ীয়গণও যে সেই সেই বীজপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বারেন্দ্র কায়স্থগণের উৎপত্তিপ্রকারও সেইরূপ। তবে তাঁহাদিগকে অনেক পরিমাণে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহাদের বীজপুরুষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১৪। ১৫ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তররাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ হইতে ২৮। ২৯ পুরুষ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদি

পুরুষদিগকে তদপেক্ষা আরও ৩।৪ পুরুষ পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। *

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের আগমনসময়।

এক্ষণে কোন্ সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ উত্তররাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সোমেশ্বর ঘোষ ও অনাদিবর সিংহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথমে উত্তররাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন। সোম ঘোষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোন বংশে ২৮, কোন বংশে ২৯ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনাদিবর সিংহ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৮ হইতে ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ২৯ পুরুষ ধরিয়া প্রত্যেক পুরুষের গড়ে ৩৫ বৎসর ধরিলে ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বা পরে সোমেশ্বর প্রভৃতির উত্তররাঢ়ে আগমন স্থির হয়। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বা পরে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আদিশূরকর্ত্তৃক আনীত হন। তাহা হইলে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের অন্ততঃ ৩ পুরুষ পরে সোমেশ্বর ঘোষপ্রভৃতি উত্তররাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। উত্তর-

* বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের বল্লালীকৌলীন্যের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় ২১।২২ পুরুষ দেখা যায়। বল্লালের সময়ের ১০।১১ পুরুষ পূর্ব্বে আদিশূরের সময় স্থির হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের আদিশূরানীত পূর্ব্বপুরুষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩২।৩৩ পুরুষ দৃষ্ট হয়। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণও ৩২।৩৩ পুরুষ পূর্ব্বেই হইবেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলজী গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ মনে হয় যে, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কোন কোন বংশীয় ব্যক্তি লইয়া উত্তরকালে ঐ শ্রেণীর কায়স্থসমাজ গঠিত হইয়াছিল।

রাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রবাদানুসারেও উক্ত সিদ্ধান্ত স্থির হয়। তাঁহারা বল্লালী কৌলীন্য অস্বীকার করিয়া বলিয়া থাকেন যে, বল্লাল সেনের সময় তাঁহাদের নেতা ব্যাস সিংহ বল্লালের সহিত আহার ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলে, বল্লালের আদেশে করাতের দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করা হয়, সেই জন্য তিনি "করাতীয়া" ব্যাস সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই সময়ে ব্যাস সিংহের পিতা বৃদ্ধ লক্ষ্মীধর সিংহ জীবিত ছিলেন। তিনিও তদবধি উত্তররাঢ়ীয়-গণ কর্তৃক 'কায়স্থগুরু' নামে অভিহিত হন। উক্ত প্রবাদের সত্যাসত্য বিচার না করিয়া বল্লাল, লক্ষ্মীধর সিংহ ও ব্যাস সিংহকে সমসাময়িক ধরিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লালসেনের রাজত্বকালে লক্ষ্মীধর ও ব্যাস সিংহ বিদ্যমান ছিলেন। লক্ষ্মীধর উত্তররাঢ়ীয় সিংহবংশের আদিপুরুষ অনাদিবর হইতে অষ্টম পুরুষ।* দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লক্ষ্মীধর বিদ্যমান থাকিলে নবম শতাব্দীর শেষভাগেই অনাদিবরের সময় স্থির হয়। সুতরাং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রবাদানুসারে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহাদিগের উত্তররাঢ়ে আগমন প্রতিপন্ন হয়। যে পাঁচ জন প্রথমে উত্তররাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সোম ঘোষ পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত যজান গ্রামে বাস করেন। ইহার পর করাতীয়া ব্যাস সিংহের

* সিংহবংশের বংশতালিকায় দুই জন লক্ষ্মীধর ও তাঁহাদেরই পুত্র দুই জন ব্যাসের নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে করাতীয়া ব্যাস ও তাঁহার পিতা লক্ষ্মীধর নবম ও অষ্টম পুরুষ। দ্বিতীয় লক্ষ্মীধর ও ব্যাস তাঁহাদের পরবর্ত্তী ও ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পুরুষ। অনেকে শেষোক্ত ব্যাসকে করাতীয়া ব্যাস সিংহ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন।

পুত্র বনমালী সিংহ বন কাটিয়া কান্দীতে বাস করিয়াছিলেন। কান্দীও পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ও যজানের নিকটস্থ। বনমালী সিংহের পৌত্র বিনায়ক সিংহ উক্ত প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। সিংহ ও ঘোষবংশে অনেক পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তদ্বংশীয়গণ পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া ফতেসিংহ পরগণাকে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের শ্রেষ্ঠ সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কৌলীন্য-প্রথা।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালী কৌলীন্য স্বীকার করেন না, এবং বল্লালের সহিত আহার ব্যবহার না করায় ব্যাস সিংহকে ছিন্নমস্তক হইতে হয়, এবং তিনি করাতীয়া ব্যাস সিংহ ও তাঁহার পিতা কায়স্থগুরুনামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের কোন মূল আছে কি না বলা যায় না। তবে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের আচার ব্যবহার হইতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের আচার ব্যবহার পৃথক্ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে যে বল্লালী কৌলীন্য নাই, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ীয়গণ নিজেরাই আপনাদের কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চগোত্রজ কায়স্থ ব্যতীত ক্রমে ক্রমে শাণ্ডিল্যগোত্রজ ঘোষ, কাশ্যপগোত্রজ দাস, ভরদ্বাজগোত্রজ সিংহ ও মৌদ্গল্যগোত্রজ কর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে প্রবেশ লাভ করেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চগোত্রজ কায়স্থ এবং শাণ্ডিল্যগোত্রজ ঘোষ ও কাশ্যপগোত্রজ দাস প্রত্যেকে এক এক ঘর রূপে গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু ভরদ্বাজগোত্রজ

সিংহ ও মৌদ্গল্যগোত্রজ কর, প্রত্যেকে ।০ আনা ঘর রূপে গণ্য হওয়ায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ সর্ব্ব সমেত ৭৷৷০ ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত ৭৷৷০ ঘরের মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে সৌকালীনগোত্রজ ঘোষ ও বাৎস্য-গোত্রজ সিংহই কুলীন। অন্যান্য সকলেই মৌলিক বলিয়া গণ্য। মৌলিকগণের মধ্যে প্রথমাগত ৩ ঘর সন্মৌলিক বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ তিন পুরুষমধ্যে সদ্বংশে পুত্রের কুলক্রিয়া না করিলে কুলের খর্ব্বতা হয়। * উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুল পুত্রগত। সেই জন্য কুলীনগণের শাণ্ডিল্য ঘোষের কন্যা-গ্রহণে পুত্রদোষ, কাশ্যপ দাসের কন্যাবিবাহে ধনক্ষয়, ভরদ্বাজ সিংহের কন্যাগ্রহণে কুলধ্বংস ও মৌদ্গল্য করের কন্যায় মর্য্যাদার হানি হয়। † উপরোক্ত কয়েক শ্রেণীর কায়স্থ ব্যতীত উত্তররাঢ়ীয় সমাজে নিম্নশ্রেণীর আরও দুই এক ঘর কায়স্থ আছেন। উত্তর কালে রাজা বিনায়ক সিংহের বংশীয় ৬ জন ও সোম ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরবিন্দের বংশীয় ৬ জন উত্তররাঢ়ীয় গণের মধ্যে মুখ্যকুলীন বলিয়া গণ্য হন। ইহাকেই ষট্‌কুল কহে। উত্তররাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের পরবর্ত্তী কালে যে ছয়টী শ্রেণীবিভাগ হয়, তাহাকে ভাব বলে। এক্ষণে তাঁহারা ষোল আনা, পনর আনা, চৌদ্দ আনা, বার আনা, দশ আনা এবং

* ত্রৈপুরুষে নিরাবিল, ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিবজটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ॥
(উত্তররাঢ়ীয় কুলপদ্ধতি।)

† শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপেতে।
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশায় করে শীল নিপাতিতে॥

আট আনা ভাবের কুলীন বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ভাবের কুলীনেরা ক্রমানুযায়ী কৌলীন্যমর্য্যাদায় সমাজে বিশেষরূপে আদৃত। অন্যান্য কায়স্থসমাজের ন্যায় ইহাঁদিগের মধ্যেও সমীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে সভা কহে। সভায় কুলীনদিগকে মাল্যচন্দন প্রদান করা হয়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে বিংশতি বার সভা আহ্বানের কথা শুনা যায়। এক্ষণে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছেন, কিন্তু ফতেসিংহ সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

সর্ব্বমঙ্গলা ও সোমেশ্বর।

সোমেশ্বর ঘোষ যে সর্ব্বপ্রথমে পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত যজানগ্রামে আসিয়া বাস করেন, ইহা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত যজানগ্রামে সর্ব্বমঙ্গলা-নামে দেবীর মন্দির আছে। সর্ব্বমঙ্গলা সোম ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। সর্ব্বমঙ্গলা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বে তিনি যজান-গ্রামের অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সোমেশ্বর তাঁহাকে তথা হইতে আনিয়া বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সোমেশ্বর তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে দেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার বর্ত্তমান মন্দির সোমেশ্বরের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। সোমেশ্বরের নির্ম্মিত মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইয়া এক্ষণে তাহা বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে। রামেশ্বর দাস নামে এক জন সাধু দেবীর সেবার জন্য অনেক ভূভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিত্য পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি ও শারদীয় চতুর্দ্দশীতে অতি ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা হয়। সর্ব্বমঙ্গলার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদা তাম্রাবরণে মণ্ডিত থাকে, সুতরাং সাধারণের পক্ষে সহসা তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিবার উপায় নাই। সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সোমেশ্বর নামক শিবের মন্দির অবস্থিত। সোমেশ্বরও সোম ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিবের সোমেশ্বর নামের দ্বারাও তাহার অনুমান হইয়া থাকে। মন্দিরটী অষ্টভূজাকৃতি, প্রায় ৫০ হস্ত উচ্চ হইবে। অগ্রভাগের কত-কাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিত্তিতে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। উত্তর দিকে একটী সুড়ঙ্গ আছে। মন্দিরটী দেখিয়া বোধ হয়, তাহা সোমেশ্বরস্থাপনের অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, অথবা বহুবার সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলার ন্যায় সোমেশ্বর শিবের সেবার সুবন্দোবস্ত নাই। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনোপলক্ষে সোমেশ্বর শিবের অনেক ধুমধাম হইয়া থাকে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ কালের অন্যান্য চিহ্ন।

পশ্চিম মুর্শিদাবাদের যে কয়েকটী স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধকালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাঙ্গা-মাটী ও মহীপালের ন্যায় কোন কোন স্থানে ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায়, সেই সেই স্থানকে প্রাচীন নগরাদির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। আজিমগঞ্জ রেলওয়েষ্টেশনের নিকটস্থ কুসুমখোলানামক স্থান একটী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তথায় কুসুমেশ্বরনামক রাজা বাস করিতেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত;

কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুসুমখোলা রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের রাজধানী বড়নগরের নিকটস্থ হওয়ায় কথঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এইরূপ অন্যান্য অনেক স্থানে প্রাচীন নগরাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তিও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন মূর্ত্তি অদ্যাপি ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে অল্পোচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গীপুরের নিকট গণকর, বহরমপুরের পরপারে ভৃঙ্গেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। সাধারণে তাহাদিগকে ভীমের গদা বলিয়া অভিহিত করে। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত স্তম্ভ বৌদ্ধকালের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। বহরমপুরের পরপারে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অমরকুণ্ডনামক একটী স্থান আছে, ইহার নিকট তেলকার নামক একটী বৃহৎ বিল অবস্থিত। তেলকার এক সময় যে গঙ্গার গর্ভ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অমরকুণ্ডের অপর নাম পাণিকুণ্ড। এখানে গঙ্গাদিত্য নামে সূর্য্যের এক মন্দির আছে। গঙ্গাদিত্য একটী প্রাচীন দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু মন্দিরটীকে বহুকালের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। গঙ্গাদিত্যের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। যৎকালে তেলকার গঙ্গার গর্ভ ছিল, সেই সময়ে যে গঙ্গাদিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ গঙ্গার নিকট আদিত্যদেব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি গঙ্গাদিত্য নামে অভিহিত হন। কাশীখণ্ডের লিখিত দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম গঙ্গাদিত্যও গঙ্গার সমীপে

অবস্থিতি করায় উক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অমরকুণ্ডের গঙ্গাদিত্য কাশীর গঙ্গাদিত্যের নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গঙ্গাদিত্য একটী পুষ্করিণী হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, উক্ত পুষ্করিণীকে "দেবগড়ে" কহিয়া থাকে। দেবগড়ে হইতে সম্ভবতঃ অমরকুণ্ড নামের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় গঙ্গাদিত্য অশ্বোপরি উপবিষ্ট। তিনি অমরকুণ্ড গ্রামের গ্রাম্যদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন্ সময়ে গঙ্গাদিত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা বলা যায় না। তবে তেলকার যে সময়ে গঙ্গাগর্ভ ছিল, সেই সময়েই গঙ্গাদিত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বঙ্গে মুসলমান-আগমনের বহুপূর্ব্বে যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অমরকুণ্ড গ্রামে পূর্ব্বে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এক্ষণে তাঁহারা স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। এ স্থানের স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তান্ত্রিকধর্ম্মের আদর দেখা যাইত। অমরকুণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বে চায়েনডাঙ্গানামক স্থানে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মহবৎজঙ্গের দেওয়ান রায় রায়ান চায়েনরায়ের একটী বাসভবন ছিল। ইহার নিকট চায়েনদীঘী নামে একটী প্রকাণ্ড দীঘী বিদ্যমান আছে। চায়েনরায়ের সময় অমরকুণ্ডের পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় ইহার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কান্দী গ্রামে যে রুদ্রদেবের মূর্ত্তি আছে, তাহা প্রাচীনকালের বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব ক্রমে রুদ্রদেবে পরিণত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ পূর্ব্ব মুর্শিদাবাদের স্থানে স্থানেও মুসলমান-আগমনের পূর্ব্ব সময়ের

চিহ্নাদিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। চূণাখালি প্রভৃতির জঙ্গলে যে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহা প্রাচীনকালের মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমান হয়। মুর্শিদাবাদের নাককাটীতলায় একটী প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ পশ্চিম ও পূর্ব্ব মুর্শিদাবাদের স্থানে স্থানে মুসলমান-আগমনের পূর্ব্ব সময়ের অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাঠান রাজত্বকাল।

বঙ্গে পাঠানপ্রভুত্ব।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেনবংশের রাজত্বসময়ে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে মুসল্মান্‌পতাকা উড্ডীন হয়। ঘোরী সুল্‌তানগণের প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন যৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সেনাপতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গলার তদানীন্তন অধীশ্বর বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থান বহুদিবসাবধি সেনবংশের করায়ত্ত থাকে। সেনবংশের প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে দিল্লীর পাঠানপ্রতিনিধিগণ আপনাদিগের শাসনদণ্ড স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে মুসল্মান্‌প্রভুত্ববিস্তারের সূচনা করিয়া তুলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে গৌড়ের পাঠানপ্রতিনিধিগণ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তদবধি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গরাজ্য স্বাধীন পাঠান ভূপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মোগলকেশরী আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে বঙ্গরাজ্য মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ষোড়শ

শতাব্দীর শেষভাগপর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে পাঠান-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকায়, তাহার অনেক স্থানে বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে পাঠানরাজত্বের নানাপ্রকার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মুর্শিদাবাদ-প্রদেশেও তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের যে যে স্থানে পাঠানরাজত্ব-কালের বিশেষরূপ নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাদেরই উল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গয়সাবাদ।

সর্ব্বপ্রথমে পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত গয়সাবাদনামক স্থানে আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। গয়সাবাদ আজিমগঞ্জ রেলওয়েষ্টেশন হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। গয়সাবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। যদিও তাহা এক্ষণে একটী সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, তথাপি তাহার চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিলে এক কালে তাহা যে একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। এই গয়সাবাদ পূর্ব্বকালে প্রাচীন মহীপালনগরের একাংশ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বর্ত্তমান মহীপাল গ্রাম হইতে গয়সাবাদ তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মহীপালনগরের প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি লইয়া উত্তরকালে গয়সাবাদ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। গয়সাবাদের রাজপথে এক্ষণেও অনেক প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ মহীপাল হইতে গয়সাবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই একটী প্রসিদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌড়ের সুলতান গয়স উদ্দীনের সময়

তাঁহারই নামানুসারে গয়সাবাদনগর স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ের সুল্‌তানগণের মধ্যে দুইজন গয়স উদ্দীনের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উক্ত দুই জনই ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। প্রথম গয়স উদ্দীন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দিল্লীর প্রতিনিধিরূপে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান জয় করেন। গয়স উদ্দীন দিল্লীর অধীনতাচ্ছেদনের চেষ্টা করিলে সম্রাট আল্‌তমাসের পুত্র নাসির উদ্দীন গৌড় অধিকার করিয়া বসেন, এবং গৌড়ের নিকট যুদ্ধে গয়স উদ্দীন নিহত হন। গয়স উদ্দীন গৌড় হইতে এক দিকে দেবকোট ও অন্যদিকে বীরভূমের নগর পর্য্যন্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাহাতে সাধারণের যাতায়াতের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয় গয়স উদ্দীন খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি গৌড়ের চতুর্থ স্বাধীন নরপতি। দ্বিতীয় গয়স উদ্দীন ন্যায়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। একদা এক বিধবার পুত্র তাঁহার তীরবিদ্ধ হওয়ায় তিনি শাস্তিস্বরূপে কাজীর নিকট হইতে বেত্রাঘাত লাভ করিয়াছিলেন। গয়স উদ্দীন মুসল্মান্ শাস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজ তাঁহার সমসাময়িক, এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষরূপ পরিচয় ছিল। এই দুই গয়স উদ্দীনের মধ্যে কাহার সময়ে গয়সাবাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা যায় না। তবে তাহার প্রাচীনত্ব, ও অন্যান্য কোন কোন বিষয়ের জন্য প্রথম গয়স উদ্দীনের সময় তাহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাহা হইলে খৃষ্টীয়

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গয়সাবাদ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে তাহা প্রাচীন মহীপালনগরের একাংশরূপে বিদ্যমান ছিল। মহীপালনগরের ধ্বংসের পর গয়সাবাদ যে সে প্রদেশের একটী সমৃদ্ধিশালী নগর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও সে বিষয়ের প্রতীতি হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত গয়সাবাদ মুর্শিদাবাদের একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে কীর্ত্তিত হইত। তাহার নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রাম গয়সাবাদের সহিত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভাগীরথীতীরস্থ হওয়ায় তথায় ব্যবসায় বাণিজ্যেরও যথেষ্ট-প্রসার হইয়াছিল। গয়সাবাদ এক কালে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যে তথায় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৭টী হাট * বা ক্রয় বিক্রয়ের স্থান স্থাপিত হয়। অদ্যাপি তাহারা এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপে অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ পাঠানরাজত্বের প্রারম্ভ হইতে গয়সাবাদ যে মুর্শিদাবাদপ্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ নগর বলিয়া পরিচিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে তথায় একটী থানা স্থাপিত হইয়াছিল, এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

* উক্ত ৭ হাটের নাম যথা—সরাইহাট, গোপালহাট, হুঁকারহাট, ভাদুড়ীহাট, দস্তরহাট, বাগানহাট, ও ভুঁইহাট। ইহারা এক্ষণে গয়সাবাদের নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপে অবস্থিতি করিতেছে। ভাদুড়ীহাট গয়সাবাদের সংলগ্ন বলিয়া তাহা গয়সাবাদের নামান্তর হইয়া উঠিয়াছে। ৭ হাটে বেচা ও কেনা আমাদের একটী প্রবাদবাক্য। তাহাতে অত্যন্ত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে নগরে ও তাহার উপকণ্ঠে ৭টী হাট ছিল, সে স্থান যে প্রসিদ্ধ উক্ত প্রবাদবাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়।



পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গয়সাবাদ পাঠানরাজত্বকাল হইতে একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই পরিলক্ষিত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে তাহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে তাহাকে একটী প্রসিদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহার রাজপথে ও অন্যান্য স্থানে অদ্যাপি অনেক প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত ও পতিত আছে। ঐ সমস্ত প্রস্তরখণ্ড যে মহীপালনগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। গয়সাবাদে একটী দরগা আছে। সাধারণ লোকে তাহাকে সুলতান গয়স উদ্দীনের সমাধি বলিয়া থাকে। প্রথম গয়স উদ্দীন সম্রাট আলতমাসের পুত্র নাসির উদ্দীনের সহিত যুদ্ধে গৌড়ের নিকট নিহত হন, সুতরাং গয়সাবাদে তাঁহার সমাধি নির্ম্মিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় গয়স উদ্দীনও গৌড়ে প্রাণত্যাগ করেন। অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত দরগা একটী ফকীরের সমাধি। দরগা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, তাহার প্রবেশদ্বার দক্ষিণমুখে অবস্থিত। দরগার অভ্যন্তরে ৪টী সমাধি আছে, তাহাদের মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ। সেটী সম্ভবতঃ উক্ত ফকীরের সমাধিই হইবে। তাঁহার পার্শ্বে ক্রমে ক্রমে আরও তিন জন সমাহিত হইয়াছেন। দরগাটী ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু তাহার সোপানাবলী প্রস্তরখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তরখণ্ডগুলি মহীপালের ভগ্নাবশেষ হইতে আনীত। কাপ্তেন লেয়ার্ড এই দরগার নিকট হইতে দুইখানি

গয়সাবাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

খোদিত প্রস্তরখণ্ড ও কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তরখণ্ডে পালি অক্ষর খোদিত বলিয়া স্থির হইয়াছিল। দরগাটী দেখিয়া তাহাকে প্রাচীন কালের নির্ম্মিত বলিয়াই প্রতীত হয়। দরগা ব্যতীত গয়সাবাদে একটী নাত্যুচ্চ শিবমন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দিরটী নবনির্ম্মিত, মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। মন্দিরগাত্রে গণেশাদি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। গয়সাবাদে নশীপুররাজবংশের নির্ম্মিত একটী বিশাল তুলসীবিহার মন্দির আছে। তাহার গগনস্পর্শী চূড়া বহুদূরে ভাগীরথীগর্ভ হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তথায় পূর্ব্বে নশীপুররাজবংশীয় বিগ্রহের তুলসী-বিহার হইত, এবং তদুপলক্ষে এক বৃহৎ মেলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত মন্দিরে কোন উৎসবাদি হয় না, তাহা ভগ্নাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ভাগীরথী তাহার যেরূপ সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়াছেন, তাহাতে অচিরে তাহাকে তাঁহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। গয়সাবাদের অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। তাঁহার গর্ভে প্রবেশকালে গয়সাবাদ যে সমস্ত মৃৎপাত্রচূর্ণাদি উদ্গীরণ করিতেছে, তাহাতে তাহাকে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই স্বতঃই মনে হইয়া থাকে, এবং পুরাকালে যে তাহা প্রাচীন মহীপালনগরের একাংশ ছিল, ঐ সমস্ত মৃৎপাত্রচূর্ণ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

ফতেসিংহ।

পাঠানরাজত্বকালে গয়সাবাদপ্রভৃতি স্থান যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ মুর্শিদাবাদের কোন কোন স্থানে সম্ভ্রান্ত মুসল্মান্গণ বাস করিয়া সেই সেই স্থানকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানের মধ্যে ফতেসিংহ

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ফতেসিংহ পশ্চিম মুর্শিদাবাদের একটী সুপ্রসিদ্ধ পরগণা, এবং পূর্ব্ব মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বর্দ্ধমান ও বীরভূমেও তাহার কতকাংশ বিদ্যমান আছে। পাঠানরাজত্বারম্ভের পর হইতেই ফতেসিংহ ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য পরগণায়* অনেক সম্ভ্রান্ত মুসল্মান্ বংশ বাস করেন। রাঢ়প্রদেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁহারা ঐ সকল স্থান আপনাদের বাসোপযোগী বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান সম্ভ্রান্ত মুসল্মান্গণের বাসহেতু পরিশেষে সরীফাবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, এবং আকবরের সময়ে ফতেসিংহ ও তাহার নিকটস্থ আরও অনেকগুলি পরগণা লইয়া সরকার সরীফাবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ফতেসিংহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে ফতেসিংহ নামে হাড়ী রাজা হইতে উক্ত পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বীরভূমপ্রদেশের জনশ্রুতি অনুসারে বীরসিংহ ও ফতেসিংহ নামে দুই ভ্রাতা পশ্চিমপ্রদেশ হইতে এতদঞ্চলে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন, পরে তাহা তাঁহাদের নামানুসারে বীরভূমি ও ফতেসিংহ আখ্যা ধারণ করে। ব্লকম্যান্ সাহেব তাঁহার বাঙ্গলার ভৌগলিক বিবরণে অনুমান করেন যে, বাঙ্গলার পাঠানাধিপতি ফতেসাহ ও বার্ব্বাকসাহ হইতে ফতেসিংহ ও বার্ব্বাকসিংহ দুই সন্নিহিত পরগণার নামকরণ হইয়াছে। এই শেষোক্ত মতের কিছু ঐতিহাসিক সত্য আছে

* আকবর বাদসাহের সময় হইতেই রীতিমত পরগণাসৃষ্টি হয়, তবে তৎপূর্ব্বে কতক কতক প্রদেশবিভাগও ছিল।

বলিয়া বোধ হয়। * ফতেসাহ ১৪৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ফতেসিংহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে তথায় ও তাহার নিকটস্থ স্থানসমূহে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। পাঠানরাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মোগলরাজত্বসময় পর্য্যন্ত অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশ ফতেসিংহে আসিয়া বাস করেন। আরব, আজম, আফগানিস্থান, তুর্কস্থান প্রভৃতি দেশ ও প্রদেশ হইতে সাদাৎ, সেয়ুখ সিদ্দিকি, ফারুকি, জিররি, আব্বাসি, আজমি, মোগল ও আফগান প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমানগণ এখানে আপনাদিগের আবাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম সাদাৎ, দ্বিতীয় খোন্দকার ও সেয়ুখ সিদ্দিকি এবং তৃতীয় খোন্দকারান্ সেয়ুখ আব্বাসি। এই তিন বংশ বহুকাল হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত তিন বংশের মধ্যে খোন্দকারান্ আব্বাসি মর্য্যাদায় কথঞ্চিৎ হীন হওয়ায়, ঐ তিন বংশ ফতেসিংহে আড়াই ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তাঁহাদের মধ্যেই সচরাচর পরস্পরের আদান প্রদান হইয়া থাকে। ফতেসিংহের যেরূপ অনেক স্থানে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রাধান্য আছে, সেইরূপ ইহার বহুস্থলে মুসলমানগণেরও প্রভুত্ব

* ফতেসিংহ ও বার্ব্বাকসিংহ মুসলমান ও হিন্দু নামের মিশ্রণে উৎপন্ন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জাহাঙ্গীরনগর, আলিনগর, ফতেপুর প্রভৃতি নাম হইতেও ঐরূপ মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেখা যায়। তন্মধ্যে সালার, তালিবপুর, সিজগ্রাম প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও সম্ভ্রান্ত মুসল্মান্‌সম্প্রদায় ব্যতীত ফতেসিংহে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট প্রভুত্ব দেখা যায়। তাঁহারা জিঝোতিয়া নামে প্রসিদ্ধ। এই জিঝোতিয়াগণই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ফতেসিংহের ভূম্যধিকারীরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। যদিও মুর্শিদাবাদের মাননীয় নবাব বাহাদুর সম্প্রতি ইহার অর্দ্ধাংশের ভূস্বামী হইয়াছেন, তথাপি অপরার্দ্ধ সেই জিঝোতিয়াগণের ভূমিস্বরূপে বিদ্যমান আছে। পর অধ্যায়ে উক্ত জিঝোতিয়াগণের বিবরণ বিস্তৃতভাবেই উল্লিখিত হইবে। ফলতঃ ফতেসিংহ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, সম্ভ্রান্ত মুসল্মান্‌বংশীয়গণ ও জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রধান আবাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফতেসিংহ ব্যতীত মুর্শিদাবাদের অন্যান্য কোন কোন স্থানও সম্ভ্রান্ত মুসল্মান্‌গণের আবাসস্থান বলিয়া পরিচিত।

পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ন্যায় পূর্ব্ব মুর্শিদাবাদেরও স্থানে স্থানে পাঠানরাজত্বকালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত স্থানের মধ্যে চূণাখালির নাম উল্লেখযোগ্য। চূণাখালি বহরমপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব, মুর্শিদাবাদ হইতে ১।০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব, ও কাশীমবাজারের নিকটস্থ। চূণাখালি মুসল্মান্‌রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাঠানরাজত্বকাল হইতে ইহা বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া উঠে, এবং উক্ত নাম প্রাপ্ত হয়। পাঠানরাজত্বকালে ইহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হওয়ায়, আকবর বাদসাহের পরগণাবিভাগকালে চূণাখালির নামানুসারে সরকার

চূণাখালি।

উড়ম্বরের একটী প্রসিদ্ধ পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ এই চূণাখালি পরগণায় অবস্থিত। চূণাখালিতে মসনদ আউলিয়া নামে এক ফকীরের সমাধি আছে, তাহার নিকটে একখানি প্রস্তরখণ্ডে আবুল মজঃফর ফেরোজ সুল্‌তানের নামোল্লেখ দেখা যায়। ফেরোজ-সাহ হিজরী ৮৯৬ অব্দে বা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে চূণাখালি যার পর নাই উন্নতি লাভ করে। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ হওয়ায় এখানে বহুপ্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইত, এবং তজ্জন্য চূণাখালি হইতে অনেক টাকার শুল্ক আদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। চূণাখালি পূর্ব্বে এক প্রকার কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এক্ষণে ইহার চতুর্দ্দিক্‌ আম্রবাগানে পরিপূর্ণ। মুর্শিদাবাদের আম্র সর্ব্বত্রই আদৃত হইয়া থাকে, চূণাখালি তাহার অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থান।

মুর্শিদাবাদে হোসেন সাহা।

পাঠানরাজত্বকালের যে সমস্ত চিহ্ন মুর্শিদাবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে হোসেন সাহার সময়ের কোন কোন নিদর্শন অদ্যাপি সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাঙ্গলার সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তে কামরূপ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে যাঁহার বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যাঁহার নামাঙ্কিত কীর্ত্তিস্তম্ভ ভগ্নাবস্থায়ও গৌরব ঘোষণা করিতেছে, যাঁহার রাজত্বকালে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার শাসনসময়ে বাঙ্গালা

সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই হোসেন সাহার রাজত্বকাল বাঙ্গালার ইতিহাসের যে একটী স্মরণীয় অধ্যায়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মুর্শিদাবাদের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা যে, সেই ইতিহাসবিখ্যাত হোসেন সাহার সহিত তাহার অনেক স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের সহিত তাঁহার জীবনের যে সমস্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

এক আনা চাঁদপাড়া।

হোসেন সাহা সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দগণ মক্কার অধিবাসী ও মহম্মদ হইতে আপনাদের উদ্ভব বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। হোসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ* মক্কার সম্ভ্রান্তবংশীয় হওয়ায় 'সরিফী মক্কী' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। অবস্থা হীন হওয়ায় হোসেনের পিতা সৈয়দ আসরফ ত্রিমিজনগর হইতে দুই পুত্র হোসেন ও ইসুফের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, এবং রাঢ়প্রদেশের অন্তর্গত চাঁদপাড়ায় বাস করেন। † উক্ত চাঁদপাড়া মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত ও সাগরদীঘী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায়

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হোসেনের পিতারই 'সরিফী মক্কী' উপাধি ছিল (Stewart P. 71)। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। সেখের দীঘীর প্রস্তরফলকে আসরফের উক্ত উপাধির কোন উল্লেখ নাই।

† রিয়াজুস্ সালাতিন ও ষ্টুয়ার্টে চাঁদপাড়ার স্থলে চাঁদপুর লিখিত আছে, রিয়াজে চাঁদপুরকে রাঢ়প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম চাঁদপাড়া। পূর্ব্বে কখনও তাহার চাঁদপুর নাম ছিল কি না বলা যায় না। সেখের দীঘীর সৈয়দবংশীয়গণ চাঁদপাড়াতেই হোসেন সাহার প্রথম বাস স্থান বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। কিছু কাল পরে আসরফ ও ইসুফ বিহারে গমন করিলে হোসেন একাকী চাঁদপাড়ায় অবস্থান করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে যে, সামান্য চাকরী গ্রহণ না করিলে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই সময়ে চাঁদপাড়ায় সুবুদ্ধি রায় নামে* এক সম্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হোসেন তাঁহার অধীনে একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন।† ঐ সময়ে চাঁদপাড়া অঞ্চলের

* সুবুদ্ধি রায়কে চাঁদপাড়া অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ রায় বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তিনি সুবুদ্ধি রায় নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

† সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, হোসেন সুবুদ্ধি রায়ের গোচারণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, তিনি সুবুদ্ধিরায়ের অধীনে কোন সামান্য চাকরী করিতেন, ও রায় তাঁহাকে দীঘী খনন করাইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি যে একটী সামান্য চাকরী করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। Stewart লিখিয়াছেন যে, "It is however certain, that, on his first arrival in Bengal, he was for some-time in a very humble situation." p. 71. মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে হোসেনের চাকরী করার কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, এবং চাঁদপাড়ার লোকেরাও অদ্যাপি তাহাই বলিয়া থাকে। চরিতামৃত ১৫৭২ হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। চরিতামৃতের গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৮৫ বৎসর বয়সে গ্রন্থ শেষ করেন। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। অতএব তিনি যে হোসেন সাহার সমসাময়িক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হোসেন সাহা ১৪৮৯ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চরিতামৃতের কথা অবিশ্বাস করার কোনই কারণ দেখা যায় না।

জলকষ্ট নিবারণের জন্য সুবুদ্ধি রায় একটী দীর্ঘিকা খননের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হোসেন সাহা তাহারই তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হোসেনের কর্ত্তব্য কার্য্যে কোন ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় তাহার অঙ্গে চাবুকের আঘাত করেন। * সেই আঘাতচিহ্ন বহুদিন পর্য্যন্ত হোসেন সাহার অঙ্গে বিদ্যমান ছিল। সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরী করিতে করিতে হোসেন যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হোসেন উত্তরকালে একজন ক্ষমতাশালী লোক হইয়া উঠিবেন। † তৎকালে চাঁদপাড়ায় একজন কাজী বাস করিতেন। তিনি হোসেনের পরিচয়ে তাঁহাকে সৈয়দবংশীয় জানিয়া

* "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী,
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকরী।
দীঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈল,
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।"

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা। ২৫ পঃ।

† প্রবাদ মুখে এইরূপ শুনা যায় যে, হোসেন গোচারণ করিতে করিতে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ধারে অশ্বত্থবৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দুইটী সর্প রৌদ্র নিবারণের জন্য তাঁহার মস্তকে ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করে। ইতিমধ্যে সুবুদ্ধি রায় তথায় উপস্থিত হন, এবং এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করেন। হোসেন জাগ্রত হইলে তিনি তাঁহাকে বলেন যে, তুমি রাজা হইবে, কিন্তু তখন আমার কথা স্মরণ রাখিও। তদবধি তিনি হোসেনকে আর গোচারণে নিযুক্ত করেন নাই। এ প্রবাদের কোন মূল আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। তবে সুবুদ্ধি রায় হোসেনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যে পূর্ব্ব হইতে পাইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

স্বীয় কন্যার সহিত হোসেনের বিবাহ প্রদান করেন। তদবধি হোসেন কাজীর বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে মজঃফর সাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কাজী সর্ব্বদা তাঁহার দরবারে যাতায়াত করিতেন, এবং গৌড়েশ্বরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় থাকায়, তিনি স্বীয় জামাতাকে রাজ-দরবারে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সেই সময় হইতে হোসেনের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অনুগ্রহে হোসেন ক্রমে ক্রমে উজীরের পদে উন্নীত হন। মজঃফর সাহ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা হওয়ায়, অমাত্যবর্গ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিলে, হোসেন সকলের অভিপ্রায়ানুসারে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হোসেন সাহ আপনার পূর্ব্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া রায়কে তাঁহার নিজ গ্রাম চাঁদপাড়া নিষ্কররূপে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। * ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায় যবনের দান লইতে অস্বীকৃত হইলে, হোসেন সাহ চাঁদপাড়ার এক আনা মাত্র কর ধার্য্য করিয়া দেন। তদবধি উহা এক আনা চাঁদপাড়া নামে বিখ্যাত হয়, এবং অদ্যাপি ঐ নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয় সুবুদ্ধি রায় অধিক দিন বৈষয়িক সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। হোসেন সাহার বেগম তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের অন্তরায় হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে

* "পাছে যবে হুঁসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল,
সুবুদ্ধি রায়েরে তিঁহ বহু বাড়াইল।"
চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য, ২৫।

দীঘীখননকালে সুবুদ্ধিরায় হোসেনকে যে চাবুকের আঘাত করিয়াছিলেন, বেগম সাহার অঙ্গে তাহার চিহ্ন দেখিয়া * সুবুদ্ধিরায়ের প্রাণনাশের জন্য তাঁহাকে বারম্বার উত্তেজনা করেন। হোসেন তাঁহার পূর্ব্ব প্রভুর উপকার স্মরণ করিয়া সেই পিতৃতুল্য প্রতিপালকের প্রাণনাশে অস্বীকৃত হন। বেগম তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া প্রাণনাশের পরিবর্ত্তে রায়ের জাতিনাশের জন্য বারম্বার সাহাকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করেন। হোসেন তাহাতেও অস্বীকৃত হইয়া বলেন যে, জাতিনাশ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাণনাশের তুল্যই হইবে। কারণ জাতিনাশের পর ব্রাহ্মণ কখনও জীবিত থাকিবেন না। বেগম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজেই তাঁহার প্রাণনাশের আদেশ দিতে উদ্যত হইলে, হোসেন জলপাত্র হইতে জল লইয়া সুবুদ্ধিরায়ের মুখে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। †

* এই বেগম চাঁদপাড়ার কাজীর কন্যা কি না বলা যায় না। কারণ তাঁহার এত দিন পরে হোসেনের অঙ্গে চাবুকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া কিছু অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুবুদ্ধিরায়ের চাকরী পরিত্যাগের পরই কাজীর কন্যার সহিত হোসেনের বিবাহ হয়। তিনি উক্ত বেগম হইলে হোসেনের অঙ্গে কি পূর্ব্বে আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পান নাই? অথবা তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য না করিতেও পারেন। কিন্তু এই বেগমকে কাজীর কন্যা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়।

† "তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে,
সুবুদ্ধিরায়কে মারিতে কহে রাজাস্থানে।
রাজা কয় আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা,
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে,
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে।

ইহাতে সুবুদ্ধিরায় মর্ম্মাহত হইয়া আপনার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীধামে প্রস্থান করেন। তথায় পণ্ডিতগণ তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণপরিত্যাগের ব্যবস্থা প্রদান করিলে, সুবুদ্ধিরায় আন্দোলিতচিত্তে তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে চৈতন্যদেব কাশীতে উপস্থিত হইলে, সুবুদ্ধিরায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দেন। সুবুদ্ধিরায় নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মথুরায় উপস্থিত হন, এবং তথায় দীনবেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তথায় রূপগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন ঘটিয়াছিল। * সুবুদ্ধিরায়ের শেষ জীবন ঈশ্বরোপসনায়

স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা,
করোয়ার পানী তাঁর মুখে দেয়াইলা।"
চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য, ২৫।

* "তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাঞা,
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া।
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে,
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে।
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়,
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়।
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা,
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা।
প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন,
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।

অতিবাহিত হয়। সুবুদ্ধিরায় অধিক দিন বৈষয়িক সুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর অনুগ্রহে পারমার্থিক সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিরায় হোসেন সাহাকে যে দীঘী খনন করাইতে নিযুক্ত করেন, চাঁদপাড়ায় অদ্যাপি সে দীঘী বিদ্যমান আছে, এবং তাহারই নিকটে সুবুদ্ধিরায়ের বাসবভনের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে তাহাকে চাঁদরায়ের ভিটা কহে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা যে সুবুদ্ধিরায়ের বাসভবনের চিহ্ন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। *

* * * *

* * * *

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল,

* * * *

রূপ গোঁসাঞি আসি তাঁরে বহু প্রীতি কৈল।"

চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য, ২৫।

* সাধারণ লোকে সুবুদ্ধিরায়কে চাঁদরায় বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। চাঁদপাড়া নাম হইতে সম্ভবতঃ চাঁদরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হোসেন সাহ বাদসাহ হইয়া সুবুদ্ধিরায়ের জন্য চাঁদপাড়ার দীঘী খনন করাইয়া দেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, পূর্ব্বে উক্ত দীঘী একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী মাত্র ছিল, হোসেন রাজা হইয়া তাহার আকার বাড়াইয়া দেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সুবুদ্ধিরায় নিজেই দীঘী খনন করাইয়াছিলেন, এবং হোসেন তাহারই কার্য্যে নিযুক্ত হন। হোসেন এক আনা করে সুবুদ্ধিরায়কে চাঁদপাড়া প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। এক আনা চাঁদপাড়া নাম তাহার সমর্থন করিতেছে।

চাঁদপাড়া ব্যতীত মুর্শিদাবাদের আর একটী স্থানের সহিত হোসেন সাহার নাম বিজড়িত আছে। সাধারণ লোকে সেই স্থানটীকে 'জীয়ৎকুঁড়ি' বলিয়া থাকে। জীয়ৎকুঁড়ি জীবৎকুণ্ডের অপভ্রংশ। এই স্থান মুর্শিদাবাদের অন্যতম উপবিভাগ জঙ্গীপুর হইতে ৬। ৭ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। যে কুণ্ডের নামানুসারে স্থানটীর নামকরণ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একটী ক্ষুদ্রায়তন পুষ্করিণীর জলশূন্য পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। পুষ্করিণীটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এক কালে তাহা যে অত্যন্ত গভীর ছিল ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইয়া থাকে। ঐ পুষ্করিণীর উচ্চ পাহাড়ীর উপরিভাগে চারিদিকে কিছু দূর ব্যাপিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ ও দেবদেবীর ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শুষ্ক পুষ্করিণীর গর্ভে একটী অর্দ্ধপ্রোথিত দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পাহাড়ীর উপরিস্থিত ইষ্টকস্তূপ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেবদেবীর মূর্ত্তিদর্শনে সহজেই অনুমান হয় যে, ঐ কুণ্ড বা পুষ্করিণীর পাহাড়ে এক বা ততোধিক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার কিছু দূরে একটী বৃহদায়তন পুষ্করিণী ও ইতস্ততঃ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই স্থান হইতে অনেক লোকে রাশি রাশি ইষ্টক উত্তোলন করিয়াছে। ঐ সকল ইষ্টক আয়তনে ক্ষুদ্র, এবং দেখিলেই সহজে প্রাচীন কালের ইষ্টক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। জীয়ৎকুঁড়ির উত্তর দিকে একটী প্রশস্ত ইষ্টকময় রাজপথের কিয়দংশ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা এক্ষণে মৃত্তিকাবৃত। ইহার নিকটস্থ কৃষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র ও মুদ্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ফলতঃ স্থানটী পর্য্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীন কালে

জীয়ৎকুঁড়ি।

এখানে কোন একটী সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির বাসভবন ছিল। এক্ষণে উক্ত স্থানের যাহা কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। উক্ত বিবরণ একমাত্র প্রবাদমুখ-বিনিঃসৃত হওয়ায় তাহাকে সতর্কতার সহিত গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে হোসেন সাহ গৌড়ের একাধীশ্বররূপে বঙ্গদেশে আপনার প্রভুত্ব ও গৌরব বিস্তার করিতে-
ছিলেন, সেই সময়ে ঐ স্থানে এক জন প্রতাপশালী ব্রাহ্মণজমীদার
ব্রাহ্মণ জমীদার বাস করিতেন। জনৈক তীবর ও তীওর
(তীওর) ভৃত্য তাঁহার যারপরনাই প্রিয়পাত্র ছিল। কর্ম্মচারী।
ক্রমে ক্রমে সে ব্রাহ্মণের জমীদারীকার্য্যে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ জমীদার নিঃসন্তান ছিলেন। এক সময়ে তিনি তীর্থপর্য্যটনমানসে উক্ত তীবর কর্ম্মচারীর প্রতি জমীদারীর ভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক স্বভবন হইতে বহির্গত হন। নানা তীর্থে পর্য্যটন করিতে তাঁহার প্রত্যাগমনের বহুবিলম্ব ঘটায় তীবর উচ্চ আশার বশবর্ত্তী হইয়া প্রভুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছুক হয়, এবং ব্রাহ্মণের অলীক মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়া দানসূত্রে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন। কিন্তু স্বীয় তীবর কর্ম্মচারীর কৌশল ভেদ করিতে সমর্থ না হওয়ায় * চিরদিনের জন্য ঐ স্থান পরিত্যাগ

* ব্রাহ্মণকে নিবৃত্ত করা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যৎকালে ব্রাহ্মণ তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন, সেই সময়ে সম্পত্তিন্যাসের চিহ্নস্বরূপ তীবরকে নিজ চর্ব্বিতাবশিষ্ট তাম্বুল প্রদান করিয়া যান। ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইলে তীবর সেই চর্ব্বিতাবশিষ্ট তাম্বুল লইয়া তাঁহার নিকট

করিয়া চলিয়া যান। নিঃসন্তান হওয়ায় পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণের সংসারের প্রতি অনাসক্তি জন্মে, এক্ষণে তীর্থপর্য্যটনে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি তীবরের অসদ্ব্যবহারের প্রতীকারের কোনই চেষ্টা করেন নাই। ইহার পর হইতে তীবর নিষ্কণ্টকে ব্রাহ্মণের বিপুল সম্পত্তি উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং অল্প দিনের মধ্যে এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে, উক্ত অঞ্চলে সে 'তীওর রাজা' নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

তীওর রাজা ও হোসেন সাহ।

তীওর রাজা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অভিমান ও দম্ভের সঞ্চার হইতে লাগিল, এবং নিজে স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে পাঠান রাজাধিরাজ হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকায় তীওর রাজা সহজে যে স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য ধীরে ধীরে তিনি সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। কিছু দিন পরে তাঁহার সৈন্যদল গঠিত হইলে, তিনি হোসেন সাহার সহিত রণপরীক্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তীওর রাজা বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম হইলেও সদ্বংশে জন্মগ্রহণ না করায় ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়ায় একটী ঘৃণিত উপায়ে হোসেন সাহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া তুলেন। এইরূপ কথিত আছে

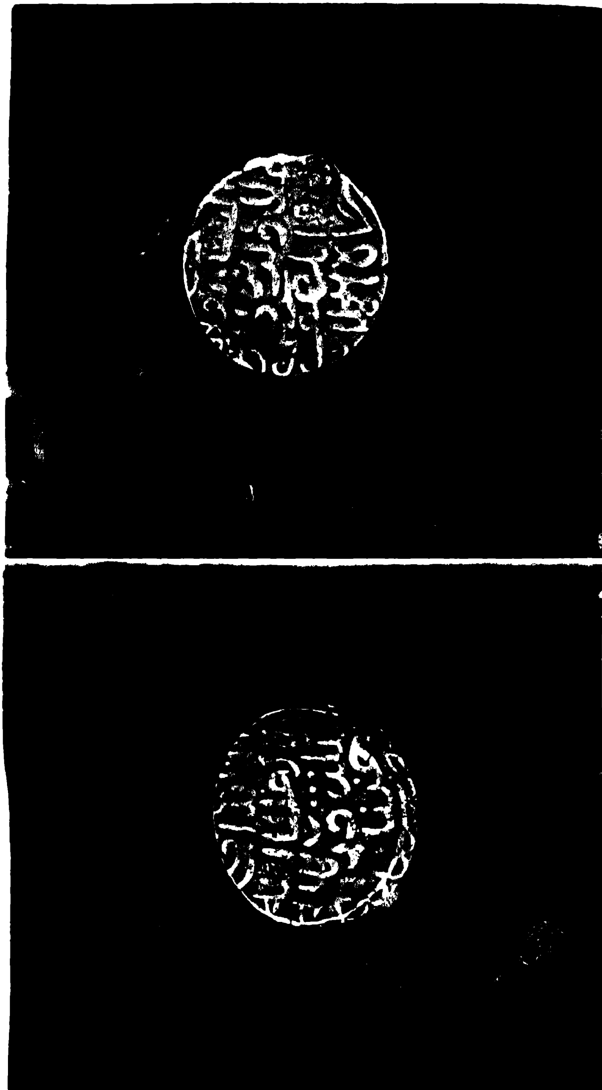
উপস্থিত হয়, এবং এই কথা বলে যে, "প্রভো! যদি সম্পত্তি ফিরাইয়া লইবেন, তবে আপনার দত্ত চর্ব্বিতাবশিষ্ট তাম্বুলও পুনর্গ্রহণ করুন"। ব্রাহ্মণ তাহার কোন উত্তর দিতে সমর্থ না হওয়ায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

যে, হোসেন সাহার মাতা এক আনা চাঁদপাড়া হইতে শিবিকা-রোহণে রাজধানী গৌড়ে গমন করিতেছিলেন।* তীওর রাজার জমীদারীর মধ্য দিয়া রাজপথ প্রচলিত থাকায় সাহজননীকে সেই স্থান দিয়া যাইতে হয়। তাঁহার সহিত সামান্যমাত্র লোকজন ছিল। তীওর রাজা, হোসেন সাহার অবমাননার ইচ্ছায় সেই অল্প-সংখ্যক লোক কয়টীর আক্রমণের জন্য স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে বাদসাহের লোক-জন পরাজিত হয়, এবং সাহজননীও যারপরনাই অবমাননা ভোগ করিতে বাধ্য হন। হোসেন সাহ পূর্ব্ব হইতে এই ক্ষুদ্রপ্রাণ জমীদারের বিদ্রোহলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্টতঃ বিদ্রোহের কোন কার্য্য দেখিতে না পাওয়ায়, তাহার শাসনে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। এক্ষণে নিজের অবমাননার সংবাদ পাইয়া তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে, অচিরাৎ সেই বিদ্রোহী তীওররাজের বিনাশসাধনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাদেশে তথায় এক দল সৈন্যও প্রেরিত হইল, কিন্তু সৈন্যগণ সহজে তীওররাজের রাজধানী আক্রমণে সক্ষম হইল না। তাঁহার সৈন্যগণ এরূপ উৎসাহসহকারে যুদ্ধ করিতেছিল যে, গৌড়েশ্বরের সেনাপতি তাহাদিগকে সহজে পরাজয় করা অসম্ভব মনে করিলেন। তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া সকলের বোধ হইল, যেন তীওররাজের মৃত সৈন্যগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে।

* হোসেন সাহার মাতার এইরূপ ভাবে গমনসম্বন্ধে প্রবাদ যে কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তবে হোসেনের পূর্ব্ব নিবাস চাঁদপাড়ায় থাকায়, এবং সেইস্থানেই তাঁহার শ্বশুরালয় হওয়ায়; চাঁদপাড়া হইতে গৌড়ে তাঁহার পরিবারবর্গের যাতায়াত সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

সাধারণ লোকে এরূপ রটনা করিয়া দিল যে, তীওররাজের সৈন্য-গণের মৃতদেহ নিকটস্থ কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। বাদসাহের সেনাপতি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, একটী গো হত্যা করিয়া কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপের আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইলে কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন মনে করিয়া তীওররাজের সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে, এবং বাদসাহের সেনাপতিও জয়লাভে সমর্থ হন। তৎ-কালে সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গোহত্যার জন্য কুণ্ডের জল অপবিত্র হওয়ায় দেবীর অন্তর্ধানে তাহার মৃত-সঞ্জীবনীশক্তি তিরোহিত হয়, এবং তীওররাজের সৈন্যগণ পুন-র্জীবিত হইতে না পারায় তাহাদের পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রবাদ অদ্যাপি উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে। আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া তীওর রাজা যে কোথায় পলায়ন করেন, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লোকে বলিয়া থাকে, তিনি কুণ্ডের সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। * অতি অল্প সময়ের মধ্যে তীওররাজের ভূস্বামীজীবনের যবনিকা নিপতিত হয়। কিন্তু তিনি অদ্যাপি জীয়ৎকুঁড়ি অঞ্চলে এক অতি-প্রাকৃত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তীওর রাজের সৈন্যগণ কুণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মহিমায় পুনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাসে লোকে উক্ত কুণ্ড বা পুষ্করিণীর 'জীবৎকুণ্ড' বা 'জীয়ৎকুঁড়ি'

* সাধারণ লোকের এক্ষণেও এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, তীওর রাজা সুড়ঙ্গপথে পাতালে প্রবেশ করিয়া অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।



আখ্যা প্রদান করে। অদ্যাপি তাহা সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। জীয়ৎকুঁড়ির গর্ভে যে অর্দ্ধপ্রোথিত দেবীপ্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই লোকে উক্ত কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে। উহা কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে কুণ্ড হইতে শতাধিক হস্ত ব্যবধানে এক খণ্ড প্রস্তর দৃষ্ট হইত, লোকে তাহাকে সুড়ঙ্গের মুখ-রোধক প্রস্তর বলিয়া অভিহিত করিত, এক্ষণে তাহা ভূগর্ভস্থ হইয়াছে। জীয়ৎকুঁড়ি হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে মহেশাল নামে গ্রাম অবস্থিত। তথায় পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩২ রশি দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড দীঘী আছে। তাহারই নিকটে রাজা মঙ্গল সেনের বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মঙ্গল সেন হোসেন সাহার দরবারের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া উক্ত হন। তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ হইতে অনেক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। দীঘীর উত্তর পাহাড়কে শক্তিপাহাড় কহে, তথায় এক প্রস্তরময়ী শক্তি-মূর্ত্তি ছিলেন বলিয়া তাহার উক্ত নামকরণ হইয়াছে। শক্তিমূর্ত্তি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। দীঘীর চারিটী বাঁধা ঘাটের চিহ্ন দেখা যায়। উহার নিকট আরও দুইটী ক্ষুদ্র দীঘী আছে। মঙ্গল সেনের নাম হইতে মঙ্গলপুর পরগণা হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। মঙ্গল সেন মহেশালের চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত। মঙ্গল সেনের বাটীর ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে হোসেন সাহার নামাঙ্কিত যে রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এ স্থলে তাহারই প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল। সাগরদীঘীর নিকটেও হোসেন সাহার নামাঙ্কিত কয়েকটী রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

সেখের দীঘী।

ঐ সমস্ত স্থান ভিন্ন মুর্শিদাবাদের আর একটী স্থানে হোসেন সাহার এক বিরাট্ কীর্ত্তি অদ্যাপি তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ইতিহাস ও প্রবাদ একবাক্যে বলিয়া থাকে যে, হোসেন সাহা ধর্ম্মার্থে সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদেও তাহার একটী চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আজিমগঞ্জ ও নলহাটী শাখা রেলওয়ের বোখারা ষ্টেশন হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ উত্তরে ও চাঁদপাড়া হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড দীঘী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দীঘী সাধারণতঃ 'সেখের দীঘী' নামে প্রসিদ্ধ। সাগরদীঘী ও মহেশালের দীঘীর পর এরূপ বিশাল দীঘী আর মুর্শিদাবাদে দৃষ্টিগোচর হয় না। দীঘীটী যেমন বৃহদায়তন, তেমনই মনোরম। ইহার চারিপার্শ্ব বৃক্ষশ্রেণী-পরিশোভিত হইয়া দীঘীকে পথিকগণের যারপর-নাই প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। সময়ে সময়ে প্রস্ফুটিত পদ্মরাজি লোকলোচনের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে। বোখারা ষ্টেশন হইতে সরকারী রাস্তা দীঘীর পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া জঙ্গীপুর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আতপপরিক্লিষ্ট পথিকগণ দীঘীর পার্শ্বস্থ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ও তাহার পবিত্র জল পান করিয়া আপনাদের ক্লেশ অপনোদন করিয়া থাকে। দীঘীর পশ্চিম পার্শ্বে একখানা গ্রাম দৃষ্ট হয়, দীঘীর নামানুসারে গ্রামখানির নামও সেখের দীঘী হইয়াছে। এই সেখের দীঘী লোকের জল-কষ্ট নিবারণের জন্য পুণ্যকাম হোসেন সাহার আদেশে খনিত হইয়াছিল। দীঘীর পশ্চিম পাহাড়স্থ প্রস্তরফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে ৯২১ হিজরীর রবিয়স্সানি মাসে হোসেন সাহার

রাজত্বসময়ে এই দীঘী খনিত হয়।* হোসেন সাহা ৯২৭ হিজরী বা ১৫২০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর ৬ বৎসর পূর্ব্বে সেখের দীঘী খনিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, হোসেন সাহা গৌড় হইতে জগন্নাথ পর্য্যন্ত রাজপথ নির্ম্মাণ ও স্থানে স্থানে দীঘী খনন করাইয়া দেন। সেই সকল দীঘীর মধ্যে সেখের দীঘীই বৃহত্তম। চাঁদপাড়ার সহিত হোসেন সাহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ থাকায় সম্ভবতঃ তাহার নিকটে তাঁহার একটী সৎকীর্ত্তি স্থাপনের ইচ্ছা হইয়াছিল, সেইজন্য বোধ হয় এই বিশাল সেখের দীঘী খনিত হইয়া থাকিবে। সেখের দীঘীর খননসম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার যথাযথ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সেখের দীঘী ও আবু সৈয়দ ত্রিমিজ।

এইরূপ কথিত আছে যে, যে সময়ে হোসেন সাহার আদেশে সেখের দীঘী খনিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাহার নিকটে এক জন ফকীর অবস্থিতি করিতেন। ফকীরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ঐ অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সাধারণ লোকে তাঁহাকে বিস্ময়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। দীঘীখননকালে ফকীর তাহার পাহাড়ে বসিয়া খনন-

* সেখের দীঘীর প্রস্তর ফলকে যাহা লিখিত আছে তাহার অনুবাদ এইরূপ,—ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে একটী পুণ্যকার্য্য করে, তিনি তাহাকে তাহার দশ গুণ ফলপ্রদান করেন। এই জলাশয় সুল্‌তান সৈয়দ আসরফ উল হোসেনীর পুত্র আলাউদ্দীন দুনিয়াউদ্দীন আবুল মজঃফর হোসেন সাহার সময়ে খনিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। রবিয়স্‌সানি মাস. ৯২১ সাল হিজরী।

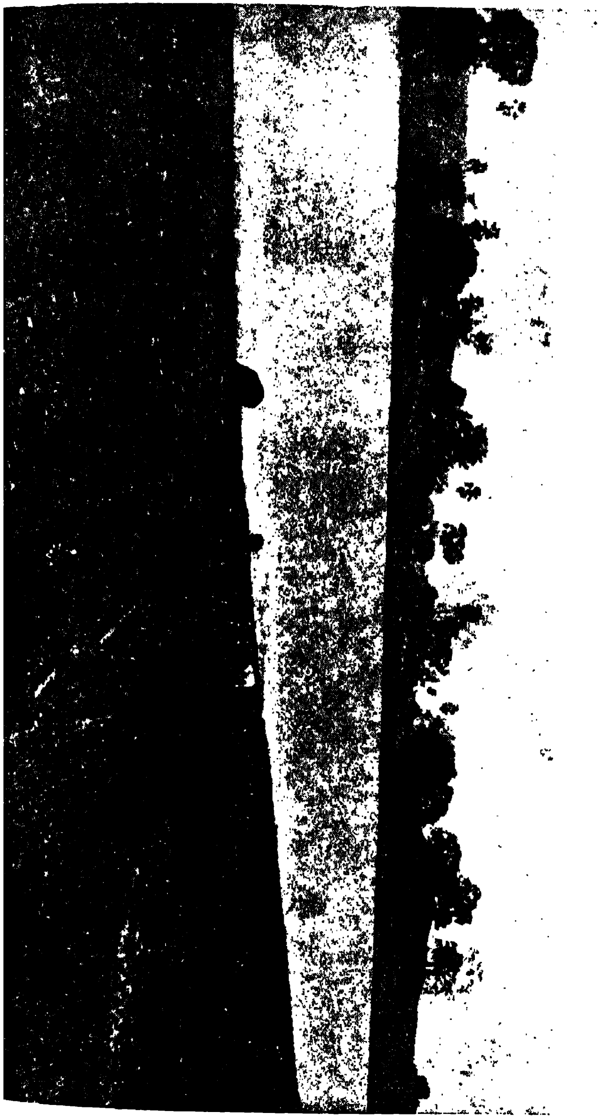
কার্য্য দর্শন করিতেন। দীঘীর হাউজের মধ্যে সুগভীর কূপ খনন করা হইলেও জল বহির্গত হয় নাই। হোসেন সাহার নিকট সেই সংবাদ পঁহুছিলে তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন, এবং কূপ হইতে জল উত্থিত না হওয়ায় অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে তিনি শুনিতে পান যে, এই দীঘীর পাহাড়ে একজন ফকীর অবস্থিতি করিতেছেন, সম্ভবতঃ তাঁহারই কোন অলৌকিক ক্ষমতার জন্য দীঘী হইতে জল উঠিতেছে না। হোসেন সাহা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া ফকীরের ক্ষমতা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। কয়েকটী বিষয়ের পরীক্ষার পর তিনি জানিতে পারেন যে, বাস্তবিকই ফকীর আলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। পরে তিনি তাঁহাকে দীঘী হইতে জল উঠাইতে অনুরোধ করায়, ফকীর নিজ হস্তস্থিত একটা দণ্ড জনৈক চেলা বা শিষ্যকে প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে জল উঠাইতে আদেশ করেন। চেলা কূপমধ্যে দণ্ডটি প্রোথিত করিলে, তৎক্ষণাৎ জল বহির্গত হয় ও দীঘী পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। হোসেন সাহা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া ফকীরের সহিত আলাপনে জানিতে পারেন যে, তিনি হোসেন সাহার স্ববংশীয়, এবং তাঁহার নাম আবু সৈয়দ ত্রিমিজ। আবু সৈয়দ ফকীরের বেশে বহু দেশ ভ্রমণের পর এই স্থানে উপস্থিত হন, এবং স্থানটীকে মনোরম বিবেচনা করিয়া তথায় কিছুদিনের জন্য অবস্থিতি করেন। হোসেন সাহা তাঁহাকে ঐ স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করায়, আবু সৈয়দ তাহাতে স্বীকৃত হন। হোসেন তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ৬৬ বিঘা লাখেরাজ ভূমি ও বাসের জন্য মস্তফাবাদ নামে মৌজা প্রদান করেন, তজ্জন্য এক খণ্ড সনন্দও প্রদত্ত হয়।

উক্ত মগুফাবাদ এক্ষণে সেখের দীঘী নামে অভিহিত হইতেছে। হোসেন সাহা আবু সৈয়দের জীবিকা ও বাসের বন্দোবস্ত করিয়া স্বদেশ হইতে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে আনাইয়া দেন, এবং তাঁহার আদেশক্রমে সেখের দীঘীর পশ্চিমে মগুফাবাদ মৌজায় আবু সৈয়দ ও তাঁহার পরিবার-বর্গের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। সেখের দীঘীও তাঁহাদের অধিকারে আইসে। সেখের দীঘীতে ছয়টী বাঁধা ঘাট ও তাহার পশ্চিম পাহাড়ে একটী মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবু সৈয়দের মহিমার জন্য হউক বা না হউক, তাঁহাকে স্ববংশীয় ও ধর্ম্মপরায়ণ জানিয়া হোসেন সাহা যে তাঁহাকে তথায় বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবু সৈয়দের বাসের পর সেখের দীঘীতে ও তাহার নিকটস্থ স্থানে অনেক লোকের বসতি হয়, ক্রমে ক্রমে সেখের দীঘী একটী গণ্ডগ্রাম হইয়া পড়ে। এক সময়ে তাহা এরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে যে, তথায় অনেক দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত, এবং সেই সময়ে বিদেশীয় লোকদিগের বাসের জন্য তথায় সরাইপ্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা তাদৃশ গণ্ডগ্রাম না হইলেও একটী সুবৃহৎ পল্লী। আবু সৈয়দের মৃত্যু হইলে তিনি দীঘীর পশ্চিম পাহাড়ে সমাহিত হন। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাহারই নিকটে সেখের দীঘীর প্রস্তরফলক পতিত রহিয়াছে। আবু সৈয়দবংশীয়গণ অদ্যাপি সেখের দীঘীতে বাস করিতেছেন। তদ্বংশীয় সৈয়দ সাহাবাজ আলি ও তৎপুত্র আবদুল্ রব্ উক্ত অঞ্চলের সম্মাননীয় ব্যক্তি।

সেখের দীঘী দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২০ রশি ও প্রস্থে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৭ রশি হইবে। দীঘীর জল পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শুষ্ক হইয়াছে। একবার কিছু অধিক পরিমাণে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় দীঘীর মধ্যস্থ হাউজের প্রাচীর বাহির হইয়া পড়ে। সেই সময়ে প্রাচীর মাপিয়া জানা যায় যে, হাউজটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ রশি ও প্রস্থে ৩ রশি হইবে। হাউজটী অগাধ জলে পরিপূর্ণ। দীঘীর পাহাড়ের ঘাটগুলি প্রায়ই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে তাহাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দীঘীর দক্ষিণ পাহাড়ে মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখের দীঘীর সৈয়দ-বংশীয়গণ কহিয়া থাকেন যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ দেশপর্য্যটনে আসিয়া দীঘীটী মনোরম বিবেচনা করায় আবু সৈয়দবংশীয় সৈয়দ আসাদুল্লার * নিকট হইতে দীঘীটী গ্রহণ করেন, এবং এক নূতন সনন্দদ্বারা তাহার পশ্চিম পাহাড়ে ৪২ বিঘা জমি সৈয়দবংশকে প্রদান করা হয়। তদবধি সেখের দীঘী মুর্শিদাবাদের নবাববংশের অধিকারে আছে। সেখের দীঘীর সৈয়দবংশীয়দিগের মতে মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃকই ইহার দক্ষিণ পাহাড়স্থ অট্টালিকা নির্ম্মিত

সেখের দীঘীর বর্ত্তমান অবস্থা।

* আসাদুল্লা আবু সৈয়দ হইতে ৬ পুরুষ এবং আবদুল রব ও আসাদুল্লা হইতে ৬ পুরুষ। আবু সৈয়দ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। মুর্শিদকুলীখাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। এক্ষণে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ। আসাদুল্লা আবু সৈয়দ হইতে ৬ পুরুষ পরে এবং আবদুল রব হইতে ৬ পুরুষ পূর্ব্বে হওয়ায়, মুর্শিদকুলী খাঁর সমসাময়িক প্রতিপন্ন হইতেছেন।



হইয়াছিল। অট্টালিকা এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তবে তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দীঘীর পশ্চিম পাহাড়ে যে মসজীদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার নিকটে আবু সৈয়দ ত্রিমিজের সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সমাধিটী প্রস্তরমণ্ডিত; লোকে এই সমাধি স্থানে অনেক বিষয়ে মানত করিয়া থাকে। এই সমাধির নিকটে একখানি কষ্টি প্রস্তরফলকে সেখের দীঘীর খনন ও সময়ের কথা খোদিত আছে। পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বোথারা হইতে জঙ্গীপুরের পথের পার্শ্বেই সেখের দীঘী অবস্থিত হওয়ায়, তাহা পথিকগণের অত্যন্ত উপকার সাধন করিয়া থাকে। চারি পার্শ্বে বৃক্ষপরিশোভিত এই বিশাল দীঘী মুর্শিদাবাদে হোসেন সাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া তাঁহার নামকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। হোসেন সাহার সহিত মুর্শিদাবাদের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল।

দাদাপীর।

হোসেন সাহার সময় পশ্চিম মুর্শিদাবাদে একজন মুসল্‌মান ফকীর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করিত। উক্ত ফকীর দাদাপীর নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে তাঁহার নাম সাহচাঁদ ছিল। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি আরব দেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং বাল্যকাল হইতে ফকিরী গ্রহণ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন; ক্রমে পশ্চিম মুর্শিদাবাদের আতাই নামক স্থানে আগমন করেন। আতাই সুপ্রসিদ্ধ ফতেসিংহ পরগণার সন্নিহিত সের-পুর পরগণার অন্তর্গত ও বর্ত্তমান খড়গ্রাম থানার অধীন। এই-খানে অনেক দিন অবস্থিতি করার পর দাদাপীর আতাইএর নিকটস্থ নগরনামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। উক্ত প্রদেশে

তিনি নানারূপ বুজুর্গী বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। হোসেন সাহা তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যার বিষয় অবগত হইয়া স্বীয় কর্ম্মচারী রূপ ও সনাতনের * সহিত দাদাপীরের পরীক্ষার্থে নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দর্শন করিয়া দাদাপীরের প্রতি যারপরনাই শ্রদ্ধান্বিত হন। এড়োল গ্রামনিবাসী কাশ্যপবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান দাদাপীরের প্রধান শিষ্য হইয়া উঠেন। উক্ত ব্রাহ্মণ দুরবস্থ হওয়ায় উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন। পথিমধ্যে এক বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া সেইরূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলে, দাদাপীর তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন। তদবধি ব্রাহ্মণ-তনয় তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সাহ মোরাদ নামে বিখ্যাত হন। সাহ মোরাদ গুরুর আহার্য্যাদি প্রস্তুত করিতেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বর্ষাকালের এক দিন অত্যন্ত বারি-পতনহেতু কাষ্ঠসংগ্রহে অক্ষম হইয়া সাহ মোরাদ গুরুর আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য চুল্লীমধ্যে নিজের একখানি পা প্রবেশ করাইয়া দিলে, দাদাপীর তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন; এবং এইরূপ আদেশ ঘোষণা করেন যে তাঁহাদের দেহাত্যয় হইলে প্রথম দিবসে সাহ মোরাদের ও তাহার পর দিবস দাদাপীরের ফতেহা বা মরণোৎসব হইবে। সেইজন্য প্রতিবৎসর পৌষমাসের ১৯শে সাহ মোরাদের ও ২০শে দাদাপীরের ফতেহা হইয়া থাকে। এই ফতেহা উপলক্ষে নগরে

* এই রূপ ও সনাতন পরে চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রসিদ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন।

এক প্রকাণ্ড মেলার অধিবেশন হয়। নানাস্থান হইতে ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম হইয়া থাকে। নগরে অদ্যাপি দাদাপীরের আস্তানা আছে। একখানি খড়ের চালার অভ্যন্তরে দাদাপীর এবং তাহার বাহিরে বারান্দায় সাহ মোরাদ সমাহিত। লোকে তাঁহাদের সমাধিস্থানের প্রতি যারপরনাই মর্য্যাদা প্রদর্শন করে। দাদাপীরের সময় উক্ত প্রদেশে রত্নাকর নামে এক রাজার কথা শুনা যায়। মুসল্‌মানেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা ও রাণী সুড়ঙ্গপথ দিয়া পলায়ন করেন। সেই সুড়ঙ্গের কতকাংশ এবং রত্নাকরের কোন কোন কীর্ত্তি অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় আছে বলিয়া লোকে ব্যক্ত করিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গ, উৎকল ও দক্ষিণাত্যময় এক বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও অভিনব ধর্ম্মান্দোলনের অবতারণা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্রীকৃত মনে করিয়াছিল। যেখানে তিনি গমন করিতেন, সেই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ হরিনামামৃত-পানে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। হোসেন সাহার রাজত্বকালেই তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। চৈতন্যদেব যে ধর্ম্মের প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান সহচর নিত্যানন্দ প্রভুকর্ত্তৃক তাহা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল, অবশেষে পূজ্যপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতি তাহার প্রচারভার সমর্পিত হয়। এই শ্রীনিবাসাচার্য্য হইতেই মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমরা শ্রীনিবাসের সংক্ষিপ্ত

বিবরণ প্রদান করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার শাখা প্রশাখার দ্বারা কিরূপে মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তৃত হয়, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকন্দী গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকালে মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। শ্রীনিবাস স্বগ্রামে ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট কিছু দিন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কাটোয়ার নিকটস্থ মাতুলালয় যাজি-গ্রামে গিয়া বাস করেন, পরে তথা হইতে ভক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান-লাভের জন্য বৃন্দাবনে গমন করিতে বাধ্য হন। তথায় গোপাল-ভট্ট ও জীব গোস্বামীর সহিত সাক্ষাতের পর গোপালভট্টের নিকট দীক্ষিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা এবং আচার্য্য পদবী লাভ করেন। বৃন্দাবনে কায়স্থ-বংশোদ্ভব ভক্ত-প্রবর নরোত্তম ঠাকুর ও সদ্‌গোপ-বংশীয় শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র লইয়া তিন জনে গৌড়দেশে পুনঃ প্রত্যা-গত হন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলে সে স্থানের তদানীন্তন অধীশ্বর রাজা বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক ভক্তিগ্রন্থসমূহ অপহৃত হয়। পরে শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া রাজা উক্ত গ্রন্থ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। শ্রীনিবাস তথা হইতে পুনর্ব্বার যাজিগ্রামে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তাঁহার সহিত প্রচারে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতা-ব্দীর শেষ ভাগ হইতে মুর্শিদাবাদে বিশেষরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়।

রাজসাহী জেলার প্রসিদ্ধ খেতরী নামক স্থানে তৎকালে বৈষ্ণবগণের মহোৎসবের অবতারণা হয়। অদ্যাবধি তথায় এক

মুর্শিদাবাদে শ্রীনিবাসাচার্য্য।

প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে, এবং অনেক বৈষ্ণব সাধু ও ভক্তের আগমন হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রভৃতির সহিত খেতরীতে উৎসবে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তার করিতেন। যে সময়ে তিনি যাজিগ্রাম হইতে খেতরীতে গমন করিতেন, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ তাঁহার ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচারে পুলকিত হইয়া উঠিত। মুর্শিদাবাদের তিনটী স্থানে শ্রীনিবাসাচার্য্য হরিনাম ও ভক্তির যে মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই সমস্ত মুর্শিদাবাদে ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তাঁহারই শাখা প্রশাখা হইতেই পরবর্ত্তী কালে সমগ্র মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদের যে তিন স্থানে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার একটীর নাম কাঞ্চনগড়িয়া; দ্বিতীয়টীর নাম তেলিয়াবুধুরি, এবং তৃতীয়টীর নাম বোরাকুলী। কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদের কান্দী উপবিভাগের অন্তর্গত ও ভরতপুর থানার অধীন। তেলিয়াবুধুরি প্রসিদ্ধ ভগবানগোলার নিকটস্থ, এবং বোরাকুলী গোয়াসের সন্নিহিত। কাঞ্চনগড়িয়ায় হরিদাসাচার্য্য নামে মহাপ্রভুর এক জন পরম ভক্ত বাস করিতেন। তিনি চৈতন্যদেবের এরূপ ভক্ত ছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর হরিদাস মৃতকল্প হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিলে, হরিদাসের তিরোভাব তিথিতে শ্রীনিবাসাচার্য্য কাঞ্চনগড়িয়ায় এক মহোৎসবের অবতারণা করেন, * এবং সেই সময়ে হরিদাসাচার্য্যের পুত্রদ্বয় গোকুলানন্দ

* "কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে আসি গণসনে।
মহামহোৎসবে মগ্ন কৈলা সর্ব্ব জনে॥" ভক্তিরত্নাকর ১০ম।

ও শ্রীদাসও আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। নানাস্থান হইতে বৈষ্ণব ভক্তগণ আগমন করিয়া সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচারে ও হরিনাম সংকীর্ত্তনে কাঞ্চনগড়িয়ার চতুর্দ্দিকে এক মহানন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। কাঞ্চনগড়িয়ায় সমাগত জনবৃন্দ সেই মহোৎসবের কথা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিলে, মুর্শিদাবাদবাসিগণ ক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্যের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। * কাঞ্চনগড়িয়া অদ্যাপি হরিদাসাচার্য্যের স্থান বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হইয়া থাকে। কাঞ্চনগড়িয়ার উৎসবের পর তেলিয়াবুধুরিতে শ্রীনিবাসাচার্য্য উৎসবে মত্ত হন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে প্রত্যাগত হইলে কুমারনগরনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব সুচিকিৎসক রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। রামচন্দ্র চৈতন্যসহচর, পরমভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়াবুধুরিতে বাস করিতেন। ইঁহারা কুমারনগর অপেক্ষা তেলিয়াবুধুরিকে আপনাদিগের বাসের উপযোগী বিবেচনা করায় তথায় গিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। †

* "মহামহোৎসব কথাসর্ব্বত্র ব্যাপিল।"

ভক্তিরত্নাকর ১০ম তরঙ্গ।

† প্রেম বিলাসে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্রের জন্মস্থানই তেলিয়াবুধুরি।

"রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম

* * * * *

তেলিয়াবুধুরি গ্রামে জন্মস্থান হয়।"

প্রেমবিলাস, ১৪ বি।

রামচন্দ্র স্বীয় গুরুদেব আচার্য্যপ্রভুর সহিত কাঞ্চনগড়িয়ার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে নিজ গ্রাম উৎসবে আনন্দময় করিবার জন্য প্রভুকে লইয়া বুধুরিতে উপস্থিত হন; আচার্য্যের আগমনের জন্য বুধুরির ঘরে ঘরে নানারূপ মাঙ্গলিক আয়োজন হইয়াছিল, সমস্ত গ্রাম আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আচার্য্য তথায় উপস্থিত হইয়া গোবিন্দকে দীক্ষা প্রদান করেন। গোবিন্দ পূর্ব্বে শক্তি-উপাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি পরিশেষে আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ঐ সময়ে বুধুরির নিকটস্থ বাহাদুরপুরের বংশীদাস চক্রবর্ত্তীও আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বুধুরির মহোৎসবে মত্ত হইয়া এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া আচার্য্যপ্রভু পরিশেষে তথা হইত খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত হন। ইহার পর কাঞ্চনগড়িয়া ও বুধুরি প্রভৃতি স্থানে আরও দুই একবার মহোৎসব ও সংকীর্ত্ত-

কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে, তাঁহারা কুমারনগর হইতে বুধুরি গিয়া বাস করেন।—

"শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি।
নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥
তাহে এই গঙ্গা পদ্মাবতী মধ্যস্থান।
পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়াবিধুরী নামে গ্রাম॥
অতিগণ্ডগ্রাম শিষ্ট লোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥"

ভক্তিরত্নাকর ৯ম তরঙ্গ।

আমরা ভক্তিরত্নাকরের কথাই গ্রহণ করিলাম। কর্ণানন্দেও কুমারনগর রামচন্দ্রের নিবাস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নাদি হইয়াছিল। পরিশেষে মুর্শিদাবাদের বোরাকুলী গ্রামে এক বিরাট্ মহোৎসব ও সংকীর্ত্তনের অবতারণা হয়। বোরাকুলীতে শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন, তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস মহুলায় ছিল। মহুলা বহরমপুরের নিকটস্থ। বোরাকুলীতে রাধাবিনোদ নামে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। এই উৎসবে বীরচন্দ্রপ্রভৃতি বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ যোগদান করিয়া বোরাকুলীকে আনন্দময় করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস কাঞ্চনগড়িয়া, বুধুরি ও বোরাকুলীতে যে মহোৎসবের অবতারণা করেন, তাহা হইতে ক্রমে সমগ্র মুর্শিদাবাদে তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই শাখা প্রশাখা হইতে মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়।

শ্রীনিবাসের শাখা-প্রশাখাবলী।

শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে বাস করিতেন, কিন্তু তদ্বংশীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ পরিশেষে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করায় মুর্শিদাবাদে আচার্য্যপ্রভুর বংশধরগণের সম্মান ও প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। বুঁধুইপাড়া-নিবাসী শ্রীনিবাসের প্রিয় ভক্ত রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভের সহিত আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা ঠাকুরঝির বিবাহ হয়। বুঁধুইপাড়া,বহরমপুর-সৈয়দাবাদের পরপারে,ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই বুঁধুইপাড়ায় শ্রীনিবাসাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাধামাধব ঠাকুর ও সুবলচন্দ্র ঠাকুর বাস করেন। সুবলচন্দ্র স্বীয় পিতৃষসা হেমলতা ঠাকুরঝির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। রাধামাধব ও সুবলচন্দ্রের বংশলোপ ঘটিলে তাঁহাদের অপর এক শাখা মুর্শিদাবাদের দক্ষিণখণ্ড গ্রাম হইতে বুঁধুইপাড়াতে আসিয়া বাস করেন। গতিগোবিন্দের



সপার্ষদ চৈতন্য দেব।

(নৃত্যগীত)

জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জগদানন্দ মুর্শিদাবাদের মালিহাটীতে ও কনিষ্ঠ মধুসূদন নবগ্রামে বাস করেন। মালিহাটী কাঁদী ও নবগ্রাম লালবাগ উপবিভাগের অন্তর্গত। তদ্বংশীয়গণ মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থানেও বাস করিয়াছেন। সুবিখ্যাত রাধামোহন ঠাকুর জগদানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আচার্য্যপ্রভুর পর তাঁহার বংশে রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় আর কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। রাধামোহনের পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও তেজস্বিতা অদ্যাপি মুর্শিদাবাদে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে। যথাস্থানে রাধামোহনের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। আচার্য্য-প্রভুর বংশে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের একখানি তৈল-চিত্রের পূজা হইত। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, আচার্য্য-প্রভু মহাপ্রভুর সমসাময়িক কোন ভক্ত বৈষ্ণবচিত্রকরের দ্বারা উক্ত চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্তমণ্ডলী ঐ চিত্রে মহাপ্রভুর আকৃতির বিশেষরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া ব্যক্ত করেন। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার প্রিয় শিষ্য মহারাজা নন্দকুমারকে সেই চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন; সেই জন্য নন্দকুমারের দৌহিত্র-বংশীয় সৈয়দাবাদ-কুঞ্জঘাটার রাজবংশীয়েরা অদ্যাপি শ্রদ্ধাসহকারে সেই চিত্রের পূজা করিয়া থাকেন। চিত্র এরূপ সুন্দররূপে অঙ্কিত যে, দেখিলেই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বহুবর্ষ পূর্ব্বের অঙ্কিত সেই চিত্র এক্ষণেও সদ্যচিত্রিত বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাহার প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। শ্রীনিবাসের স্ববংশীয় ব্যতীত তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণের মধ্যে অনেকে মুর্শিদাবাদের বোরাকুলী, ফরিদপুর, গোয়াস, সোনারুন্দিপ্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেন। এক্ষণেও তাঁহাদের কাহারও কাহারও

বংশীয়গণ সেই সেই স্থানে বাস করিয়া বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীনিবাসের প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ হরিরামাচার্য্যকে দীক্ষা প্রদান করেন। এই হরিরামাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহের সেবকরূপে সৈয়দাবাদে বাস করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীনিবাসের প্রিয় সহচর নরোত্তমের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং সৈয়দাবাদে শ্রীমোহনরায় বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হন।* অদ্যাপি হরিরামের ও রামকৃষ্ণের বংশধরগণ সৈয়দাবাদে বাস করিয়া কৃষ্ণরায় ও মোহনরায়ের সেবা করিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণব-সমাজে ইঁহাদেরও যথেষ্ট সম্মান আছে। হরিরামের এক ধারা মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর গ্রামেও বাস করিতেছেন। এইরূপে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা প্রশাখাবলী মুর্শিদাবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া তথায় বৈষ্ণবধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থকার রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মহাত্মা সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় গ্রন্থাদি ও সুললিত পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সেই জন্য অদ্যাপি তাঁহারা বঙ্গদেশে অমর হইয়া আছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থকার ও পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে যাঁহাদের

* জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্য্যবর্য্য, আশ্চর্য্যচরিত-চিতহারী
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন, ভণব কি নরহরি মহিম অপার।
জয় জয় রামকৃষ্ণ আচার্য্য সুধীর মহাশয় সুখদ উদার
শ্রীমন্মোহনরায় সুবিগ্রহসেবা সতত নিযুক্ত প্রধান॥
ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ।

সহিত মুর্শিদাবাদের বিশেষরূপ সম্বন্ধ আছে, আমরা যথাযথরূপে তাঁহাদের বিবরণ প্রদান করিতেছি। ঐ সকল মহাত্মাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইলেও এস্থলে তাঁহাদের একটু বিশেষরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্যসহচর ভক্তপ্রবর বৈদ্যকুলোদ্ভব চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য। কুমারনগরে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল, কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তর কালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কুমারনগরে পৈতৃক বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হন ও পরিশেষে তথা হইতে মুর্শিদাবাদের তেলিয়া বুধুরিতে বাসস্থান স্থাপন করেন, এবং উভয় ভ্রাতাই শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। রামচন্দ্রের কবিত্বের জন্য বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী ও বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহাকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।* তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় রচিত কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলা কবিতার মধ্যে পদকল্পলতিকায় তাঁহার কোন কোন

* "বৃন্দাবনে শ্রীভট্ট গোস্বামী আদি যত,
সবে রামচন্দ্রে প্রশংসয়ে অবিরত॥
শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৯ম তরঙ্গ)

পদের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্মরণ-দর্পণ নামক তাঁহার গ্রন্থ তাদৃশ উল্লেখ-যোগ্য নহে। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, বঙ্গজয় নামে তাঁহার এক খানি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ আছে। তাহাতে মহা-প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণসম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। যাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ যে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় লিখিত কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। রামচন্দ্র অপেক্ষা তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ নিজ পদরচনার জন্য বৈষ্ণবসমাজে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুদেব শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশে গদ্যপদ্যগীতময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়া তাঁহারই নিকট হইতে কবিরাজ উপাধিপ্রাপ্ত হন।* গোবিন্দ কবিরাজ যে সমস্ত পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আচার্য্যপ্রভুর প্রিয় শিষ্য কাঞ্চনগড়িয়ানিবাসী দ্বিজ হরি-দাসের পুত্র গোকুলদাস ও শ্রীদাস কর্ত্তৃক বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত। যেখানে বৈষ্ণবগণের মহোৎসবাদি

* "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণিতে গোবিন্দে
আজ্ঞা করিলেন মহা মনের আনন্দে।
প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্যপদ্যগীত,
সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত।
গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা,
গোবিন্দে প্রশংসি কবিরাজ খ্যাতি দিলা।"
(ভক্তি রত্নাকর ১০ম তরঙ্গ)

হইত, গোবিন্দের গীত সেই খানেই প্রসিদ্ধি লাভ করিত। সেই সুললিত গীতাবলী শ্রবণ করিয়া বীরচন্দ্রপ্রভু, আচার্য্যপ্রভু ও জীবগোস্বামীপ্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের আচার্য্যগণ মোহিত হইতেন, ও কবিকে ক্রোড় দিতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বুধুরি গ্রামে আপনার পদসংগ্রহে মগ্ন থাকিতেন।* ফলতঃ গোবিন্দকবিরাজ স্বীয় গীতাবলীর জন্য অদ্যাপি বৈষ্ণবসমাজে অমর হইয়া আছেন। বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পদ ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে সঙ্গীতমাধব নামক নাটক ও কর্ণামৃত নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে সঙ্গীতমাধবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গোবিন্দকবিরাজ প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে আচার্য্যপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এইরূপ কথিত আছে যে, ৪০ বৎসর বয়সে তিনি আচার্য্যের নিকট দীক্ষালাভ করেন, ও তাহার পর ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীনিবাসাচার্য্য কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আরব্ধ হইলে ১৫৩০ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। † সুতরাং তাহারই

* "নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে
করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে।"
(ভক্তিরত্নাকর ১৪ তরঙ্গ)

† 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দের জন্ম ও ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১ম সংস্করণ ১৭১ পৃ) ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ

কিছু পূর্ব্বে রামচন্দ্র কবিরাজের জন্ম হয়। রামচন্দ্র ও গোবিন্দকবিরাজ ব্যতীত তাঁহাদের সমসাময়িক মুর্শিদাবাদবাসী আরও দুই এক জন পদকর্ত্তা বৈষ্ণবসমাজে বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য বুধুরীর নিকটস্থ বাহাদুরপুরবাসী বংশীদাস ও তাঁহার পুত্র চৈতন্যদাস, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য গোকুলদাস এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য সৈয়দাবাদবাসী হরিরামাচার্য্যের নামই উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও কবিগণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। পর অধ্যায়ে মোগলরাজত্বকালে মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম হয়। (সাহিত্য ১২৯৯, ৩৫৩ পৃ) এত অধিক পূর্ব্বে গোবিন্দের জন্ম না হওয়াই সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়।

মোগলরাজত্বকাল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ গত হইতে না হইতে পাঠানরাজলক্ষ্মী দিল্লী হইতে কিছুকাল অপসৃতা হইয়া, পরে আবার অল্প সময়ের জন্য তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া, স্বীয় সঙ্গিনী গৌড়-লক্ষ্মীর সহিত ভারতবর্ষ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের মহাসমরে সুবিখ্যাত তৈমুরের বংশধর বাবর সাহ পাঠান সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মোগলসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন বিহারের অন্তর্গত সাসেরামের সুপ্রসিদ্ধ আফগানবীর সের সাহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে আবার কিছুকালের জন্য দিল্লীতে আফগানপ্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু সের সাহের মৃত্যুর পরে দুর্ব্বল তদ্বংশধরের হস্ত হইতে পুনর্ব্বার হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। দিল্লীর ন্যায় গৌড়-রাজ্যও সেই সময়ে একবার দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত আবার তাহা হইতে কিছুকালের জন্য স্বতন্ত্র হইতে হইতে অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একেবারে দিল্লীর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। আমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে গৌড়রাজ্যের সেই বিপ্লবের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

হোসেন সাহের রাজত্বাবসানে তাঁহার পুত্র নসারেত সাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তৎপরে নসারেতের পুত্র ফেরোজ সাহ তিন মাস মাত্র রাজত্ব করিলে, হোসেন সাহের অন্যতম পুত্র মামুদ সাহ ফেরোজের হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া গৌড়রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন। মামুদ সাহের রাজত্ব-কালে সের সাহ গৌড় অধিকার করিলে মামুদ সাহ মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সম্রাট মামুদ সাহের সহিত গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে মামুদ সাহের মৃত্যু হয়, এবং সেরও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া ঝারখণ্ড বা বর্ত্তমান ছোটনাগপুর প্রদেশ দিয়া স্বীয় আবাসস্থান সাসেরামে গমন করেন। হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর অধিকার করিয়া বসেন ও বঙ্গরাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল বলিয়া ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন। রাজধানী গৌড়কে জেন্নেতাবাদ নাম প্রদান করা হয়। এই সময়ে অর্থাৎ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে।

গৌড় মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।

সের সাহ সম্রাটের অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলে হুমায়ুনকে গৌড় হইতে দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে হয়। ইহার পর হুমায়ুনের নিকট হইতে সের দিল্লীর সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিলে, গৌড় বা বাঙ্গালায় তিনি একজন অধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সের সাহের সময় বঙ্গরাজ্য কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত হয়, এবং সেই বিভাগই সুপ্রসিদ্ধ মোগলকর্ম্মচারী তোড়রমল্লের সরকার ও পরগণা বিভাগের মূল। সের সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে

উপবিষ্ট হইয়া আপনার আত্মীয় মহম্মদ খাঁ শূরকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আদিল, সেলিমের পুত্রকে নিহত করিয়া ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, মহম্মদ খাঁ শূরও স্বাধীন হইয়া উঠেন, কিন্তু তাঁহাকে আদিলের উজীর হিমুর সহিত যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। মহম্মদ খাঁ শূরের পুত্র বাহাদুর সাহ গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে সম্রাট আদিলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং সেই যুদ্ধে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আদিল নিহত হইলে, হুমায়ুন পুনর্ব্বার দিল্লী অধিকার করেন ও অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র মোগলকেশরী আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাহাদুর সাহ ও তাঁহার ভ্রাতা জেলাল উদ্দীন ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করার পর জেলালের পুত্র গয়েস উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হয়। তৎপরে কেরওয়ানীবংশীয় সলেমান ও তাঁহার ভ্রাতা তাজ খাঁ বাঙ্গালা অধিকার করেন। সলেমান গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান, এবং আকবর বাদসাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ক্রমে তিনি স্বাধীন হওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দায়ুদ খাঁ সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র অবলম্বন করেন, কিন্তু সম্রাট-সেনার নিকট পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল যুদ্ধের পর দায়ুদ সম্রাটের নিকট হইতে উড়িষ্যার শাসনভার লাভ করেন, এবং মনিয়াম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। রাজধানী টাঁড়া হইতে পুনরায় গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। মনিয়ামের মৃত্যুর পর দায়ুদ পুনর্ব্বার বাঙ্গালা

আক্রমণ করিলে, নবনিযুক্ত শাসনকর্ত্তা খাঁ জেহান ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নিহত করিয়া নিষ্কণ্টকে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দায়ুদ খাঁর সহিত গৌড়ে পাঠানরাজত্বের অবসান হয়, এবং সেই সময় হইতে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা প্রকৃত প্রস্তাবে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া উঠে।

মোগল-সুবেদারগণ।

বাঙ্গলারাজ্য মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে তথায় এক একজন অধীন শাসনকর্ত্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়রমল্ল বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটায় বঙ্গরাজ্যশাসনের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া সম্রাট আকবর তাঁহার হস্ত হইতে শাসনভার লইয়া খাঁ আজিমের প্রতি অর্পণ করেন, ও রাজার প্রতি বাঙ্গলার রাজস্ববন্দোবস্তের ভার অর্পিত হয়। রাজা তোড়রমল্ল সমগ্র বাঙ্গলাকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া সমস্ত খালসা ও জায়গীর জমীর উপর ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা রাজস্ব ধার্য্য করেন। তাঁহার এই বন্দোবস্তকে আসল তুমার জমা কহে; স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। রাজা তোড়লমল্লের বিভক্ত সেই সরকার ও পরগণার মধ্যে মুর্শিদাবাদ সরকার ওড়ম্বরের ও পরগণা চূনাখালির অধীন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ প্রদেশের অনেক স্থান বিভিন্ন সরকার ও ভিন্ন ভিন্ন পরগণার অন্তর্গত হয়। ইহার ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা সরকার সরীফাবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার ষষ্ঠ মোগল সুবেদার নিযুক্ত হইয়া ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহের

মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পুনর্ব্বার ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েক মাসের জন্য বাঙ্গলার শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহের সময় রাজমহলে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়। এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যা ও বাঙ্গলায় নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে, এবং বাঙ্গলার ভৌমিকগণ স্বাধীনতা অবলম্বনের প্রয়াস পান। ঐ সমস্ত ভৌমিকগণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট চিরগৌরবময় হইয়া রহিয়াছে। রাজা মানসিংহকে এই সমস্ত বিদ্রোহদমনে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত। সেই সময়ে মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, আমরা পাঠানবিদ্রোহের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে যথাযথরূপে তাহাদের বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।

মানসিংহ ও পাঠানবিদ্রোহ।

রাজা মানসিংহের শাসনভার গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই পাঠানগণ বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গরাজ্য মধ্যে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলে। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সাহাবাজ খাঁ পাঠানবিদ্রোহদমনে অশক্ত হইয়া তাহাদের সর্দ্দার কতলু খাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন, এবং সমগ্র উড়িষ্যাপ্রদেশ তাহাদিগকে প্রদান করেন। রাজা মানসিংহ রোটাসের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গের সংস্কার করিয়া পাঠানদিগের হস্ত হইতে উড়িষ্যার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হন, এবং উড়িষ্যার নিকটস্থ জাহানাবাদ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। কতলু খাঁ উড়িষ্যার সীমান্তপ্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করিলে, মানসিংহ স্বীয় পুত্র

জগৎসিংহকে একদল সৈন্যসহ কতলু খাঁর বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। পাঠানদিগের এক নৈশ আক্রমণে জগৎসিংহ তাহাদের হস্তে বন্দী হন। ইতিমধ্যে কতলু খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার সন্তানগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় পাঠানেরা মানসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী হয়, এবং জগৎসিংহকে মুক্ত করিয়া কতলু খাঁর উজীর খাজা ঈশার দ্বারা মানসিংহের নিকট অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করে। মানসিংহ আফগানদিগকে সম্রাটের অধীন রাজারূপে উড়িষ্যার শাসনকার্য্য করিতে আদেশ দেন। যতদিন পর্য্যন্ত খাজা ঈশা জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে সন্ধির সর্ত্ত রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথপ্রদেশ আক্রমণ করিলে, মানসিংহ তাহাদের বিরুদ্ধে উড়িষ্যাভিমুখে গমন করেন। সুবর্ণরেখা-নদীতীরে আফগানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পরে মানসিংহ জলেশ্বর ও কটকদুর্গ অধিকার করিয়া জগন্নাথে উপস্থিত হইলে, কটকের রাজা রামচাঁদ আফগানদিগের সহিত যোগদান করিয়া মানসিংহের বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে, রামচাঁদ দিল্লীতে করপ্রদানে স্বীকৃত হন, এবং আফগানেরা বাদসাহের বিশ্বস্ত প্রজারূপে বাস করিতে স্বীকার করে, ও আপনাদিগের বৃত্তির জন্য কতকগুলি জায়গীর প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উড়িষ্যা পুনর্ব্বার মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মানসিংহ জগৎসিংহকে একদল সৈন্যের সহিত উড়িষ্যার সীমান্ত-প্রদেশে থাকিবার আদেশ দিয়া নিজে বিহারাভিমুখে অগ্রসর হন। রামচাঁদ সন্ধির সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলে,

মোগলেরা পুনর্ব্বার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করে, এবং জায়গীর লইয়া মোগলদিগের সহিত বিবাদ ঘটায়, আফগানেরাও বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ ও প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া বসে। ইহার পর পুনর্ব্বার গোলযোগের নিবৃত্তি হয়, ও বাদসাহের পৌত্র সুল্‌তান খসরু উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মানসিংহ তাঁহার সাহায্যের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে সাহায্য করার জন্য মানসিংহ বাদসাহ কর্ত্তৃক আহূত হইলে, আফগানেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া মৃত কতলু খাঁর পুত্র ওসমানকে আপনাদের নেতৃত্বে বরণ করে, এবং উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার অনেক স্থান অধিকার করিয়া বসে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার নায়েব শাসনকর্ত্তৃদ্বয় মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ আপনাদের সমবেত সৈন্যসহ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রকের যুদ্ধে আফগানদিগের নিকট পরাজিত হইলে, রাজা মানসিংহ আজমীরে অবস্থানকালে এই সংবাদ অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পাঠান-বিদ্রোহদমনে বাঙ্গলায় আগমন করেন।

উড়িষ্যা হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া আফগানেরা বাঙ্গলা পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, ও রাঢ়প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করে। সেই সময়ে ২০ হাজার আফগান ওসমানের পতাকামূলে সমবেত হইয়াছিল। *

সেরপুর ও আতাইএর যুদ্ধ

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মানসিংহ আজমীর হইতে বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ১৬০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে রোটাসদুর্গে

* Riazus Salatin.

আসিয়া উপস্থিত হন, ও আপনার সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই সময়ে পরাজিত মোগলসৈন্যগণও তাঁহার সহিত মিলিত হয়। এইরূপে বহুসংখ্যক সমবেত সৈন্যসমভিব্যাহারে মানসিংহ রাঢ়াভিমুখে যাত্রা করেন। ওসমান স্বীয় আফগান সৈন্যসহ পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সেরপুর ও আতাইনগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেরপুর ও আতাই এক্ষণে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার অধীন। খড়গ্রাম হইতে সেরপুর ৩ ক্রোশ ও আতাই ১॥৹ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। উভয় গ্রামই সরকার সরীফাবাদের সেরপুর পরগণার অন্তর্গত। পরগণা সেরপুর মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পরগণা ফতেসিংহের সংলগ্ন। আতাইনগরে তৎকালে একটী দুর্গ বর্ত্তমান ছিল। পাঠানেরা উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া প্রথমতঃ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং মানসিংহ উপস্থিত হইলে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। আতাই ও সেরপুরের মধ্যে মরিচা বা মুর্চা নামক স্থানের * পশ্চিম প্রান্তরে উভয়

* আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে, সেরপুর মুর্চায় একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকে সেলিমনগরও বলিত। সম্রাট্ আকবরের পুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরের নামানুসারে তাহার নাম সেলিম নগর হয়। রাজা মানসিংহও তথায় একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, উক্ত সেরপুর ময়মনসিংহের অন্তর্গত (Ain-i-Akbari P. 340) হণ্টার বলেন যে, উহা বগুড়ার অন্তর্গত, এবং তাহাকে ময়মনসিংহের সেরপুর হইতে স্বতন্ত্ররূপে অভিহিত করার জন্য সেরপুর মুর্চা নাম দেওয়া হয়, এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহাকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্যান ডেন ব্রুক তাঁহার ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে

পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। আফগানদিগের সহিত বহুসংখ্যক রণহস্তী ছিল। সর্ব্বাগ্রে সেই সমস্ত মদোন্মত্ত রণ-হস্তী স্থাপিত হইলে, মোগল ও রাজপুতগণ তাহাদের প্রতি গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করায় হস্তিগণ বিকট নিনাদ করিতে করিতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, এবং আফগানগণও উপর্য্যুপরি আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মোগল ও রাজপুতগণ কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, ক্রমে তাহারা উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই যুদ্ধে মোগলবক্সী মীর আবদুল রজক ঘোর বিপদমধ্যে নিপতিত হইয়া কোন ক্রমে জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আফগানদিগের সহিত পূর্ব্বযুদ্ধে তিনি বন্দী হন। আফগানেরা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটী হস্তীর উপর সংস্থাপিত করে, ও একজন দুর্দ্ধর্ষ আফগানকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া রণক্ষেত্রমধ্যে সেই হস্তীকে চালাইয়া দেয়। আফগানের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়া-ছিল যে, মোগলেরা জয়লাভ করিলে সে আবদুল রজককে নিহত করিবে। এইরূপে আবদুল রজক মোগলসৈন্যের বন্দুক ও কামানের গোলাগুলির সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপনার জীব-নের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে

তাহাকে Ceerpore Mrit বলিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। (Imperial Gazetteer Vol VIII p. p 274-75) আমরা মুর্শিদাবাদের সেরপুরের নিকটও মুর্চা নামক স্থানের কথা জানিতে পারিতেছি, এবং তাহার নিকটস্থ আতাই গ্রামে দুর্গের কথাও জানা যাইতেছে। আইন আকবরীর সেরপুর মুর্চা ময়মনসিংহ, বগুড়া বা মুর্শিদাবাদের সেরপুরের মধ্যে কোন্‌টী তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। মুর্শিদাবাদের সেরপুরের নিকট নগর নামে একটী স্থান আছে, সেলিমনগর, পরে নগরে পরিণত হইয়াছে কিনা, তাহাও বিবেচনার বিষয়।

একটী গুলি আসিয়া তাঁহার রক্ষক আফগানকে নিপাতিত করিলে মোগলেরা আসিয়া রজকের উদ্ধারসাধন করে। আবদুল রজ্জকের উদ্ধারে মানসিংহ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ তাঁহাকে সাত হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাদসাহের পুত্র পৌত্র ভিন্ন কোন হিন্দু বা মুসলমান এই উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। সেরপুর ও আতাইএর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, এবং মানসিংহের উপস্থিতিতে আফগানগণের বিজয়-আশা একেবারেই অন্তর্হিত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহারা বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করিতে পারে নাই। অবশেষে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সেখ ইসলাম খাঁর শাসনসময়ে ওসমান পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। তাহার পর হইতে আফগানেরা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। সেরপুর ও আতাইএর যুদ্ধ পশ্চিম মুর্শিদাবাদের একটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। অদ্যাপি উক্ত প্রদেশের স্থানীয় লোকেরা যুদ্ধসম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অধিবাসিগণের অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় তাহারা ওসমানের নামই বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে পারে। কিন্তু মানসিংহের নাম তাহাদের নিকট শুনা যায় না, তবে ওসমানের সহিত একজন হিন্দু রাজার যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তাহারা প্রকাশ করিয়া থাকে। মরিচার যে পশ্চিম প্রান্তরে যুদ্ধ হইয়াছিল, লোকে অদ্যাপি তাহার স্থান নিদর্শন করে, ও তাহাকে গড়ের মাঠ বলে। সেরপুরের একটী পুষ্করিণীতে মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। মধ্যে মধ্যে তথায় মনুষ্যের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আতাইএর দুর্গের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটী উচ্চ ডাঙ্গার চারিপার্শ্বে পরিখার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ডাঙ্গাভূমি ইষ্টকখণ্ড ও ইষ্টকচূর্ণে পরিপূর্ণ। আতাই গ্রামে কয়েকটী সমাধি আছে, যুদ্ধে হত ব্যক্তিগণের সমাধি বলিয়া লোকে তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। আতাই দুর্গের স্থান হইতে প্রায় ১ রশি উত্তরে একটী প্রাচীন মসজীদ ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহার কারুকার্য্য বিশেষরূপ প্রশংসনীয়। সেরপুর প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার উপরে ও নীচে অনেক প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, এককালে ঐ সকল স্থান সম্ভ্রান্ত জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এই স্থানের প্রসিদ্ধ ফকীর দাদাপীরের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যৎকালে রাজা মানসিংহ বিদ্রোহী পাঠান ও ভৌমিকগণের দমনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে সবিতারায় নামে একজন জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার সাহায্যের জন্য দুই পুত্র ও চারি পৌত্র সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই সবিতারায় ফতেসিংহের রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি কোচাড়,কোচবিহার,খরগপুর প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যশোলাভ করেন, ও মানসিংহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। * এই সমস্ত স্থানের মধ্যে কোচাড়-যুদ্ধের বিশেষ কোন

সবিতারায় ও মানসিংহ

*"যুদ্ধে শ্রীসবিতা সবন্ধুভিরলং দুষ্টান্ ক্ষিতীশানরীন্।
কোচাড়্—কোচবিহার—দুর্জ্জয়খরগপুরাদি-দেশস্থিতান্॥
* * * * * * *

বিবরণ পাওয়া যায় না। কোচাড় সম্ভবতঃ কাছাড়প্রদেশ হইবে। কাছাড়ের অসম্পূর্ণ ইতিহাসে আকবর বাদসাহের সময় তৎপ্রদেশে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু কাছাড়ের সংলগ্ন শীলহাট বা শ্রীহট্টের ইতিহাসে দেখাযায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়াধিপতি পাঠানরাজ সামসুদ্দীনের রাজত্বসময়ে শীলহাটের কতকাংশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া গৌড়ের একজন অধীন শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হইত, অন্যান্য অংশে স্বাধীন হিন্দু নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। সম্রাট আকবরের সময় শ্রীহট্টের হিন্দু রাজা গোবিন্দ আপনার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার, ও দিল্লীতে বাদসাহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপ কর প্রদান করিতেন না। * সম্ভবতঃ গোবিন্দের স্বাধীনতা বিসর্জ্জনকালে শ্রীহট্ট বা কাছাড় প্রদেশে যে যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সবিতারায় তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং এককালে রঙ্গপুর, আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরা এই সমস্ত প্রদেশই কাছাড়রাজ্য নামে অভিহিত হইত বলিয়া † কাছাড় বা শ্রীহট্ট প্রদেশের যুদ্ধ কোচাড় বা কাছাড়ের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে। কোচবিহারের যুদ্ধের কথা ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেন। মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামে একজন

জিজ্ঞাসৌ"—(শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা)

* Imperial Gazetteer Vol VIII P. 494

† বিশ্বকোষ—কাছাড়।

ব্রাহ্মণ কোন কারণে রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া মোগলদিগের নিকট রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেন। তাহার পর কোচবিহার রাজ্যে এক দল মোগলসৈন্য প্রেরিত হইলে, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সহজেই পরাভূত হন এবং রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে বাদসাহের অধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন,* ও তাঁহাদের বংশীয় নারায়ণী মুদ্রা অর্দ্ধাকারে মুদ্রিত করিতে আদিষ্ট হন। লক্ষ্মীনারায়ণের এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও সন্নিহিত রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, তিনি দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মানসিংহের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, মানসিংহ জাহাজ খাঁকে এক দল সৈন্য সহ কোচবিহারে পাঠাইয়া দেন। জাহাজ খাঁ কোচবিহার জয় ও বিদ্রোহ দমন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন। † ডাক্তার বুকাননের মতে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তাঁহার লিখিত বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, মুসল্-মানেরা কোচরাজ্য আক্রমণ করিয়া রাঙ্গামাটী নামক স্থানে

* আকবরনামায় লিখিত আছে যে, লক্ষ্মীনারায়ণের পিতৃব্যপুত্র পাটকুমার বিদ্রোহী হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদসাহ মানসিংহকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আদেশ দেন। মানসিংহ কোচবিহারে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার এক কন্যার, কাহার কাহারও মতে, তাঁহার এক ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। কোচবিহারের ইতিহাসলেখক বাবু ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার কোন স্থানীয় নিদর্শন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Stewart p, 119.

অধিনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধে সবিতা রায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। খরগপুর বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলার অধীনে অবস্থিত। যে সময়ে মোগলগণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় সংঘটিত হয়, সেই সময়ে বিহারের অন্তর্গত হাজিপুর ও খরগপুরের হিন্দু জমীদারগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। খরগপুরের রাজা সংগ্রামসহায় প্রথমে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে মোগলসৈন্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বিদ্রোহিগণের সহিত যোগ দেন, এবং বাদসাহের সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তিনি আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, রাজা মানসিংহ বিহারে অবস্থানকালে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করেন। * এই সময়ে সবিতা রায় মানসিংহের সাহায্য করিয়াছিলেন। সংগ্রাম পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইলে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

সবিতারায়ের ফতেসিংহ অধিকার।

এইরূপে সবিতা রায় অনেক যুদ্ধে মানসিংহের সাহায্য করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলে, মানসিংহ তাঁহাকে বঙ্গদেশে ভূমি সম্পত্তি প্রদান করার জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া দেন। সেই সনন্দের বলে তিনি কায়স্থরাজা, শূর, সৈয়দ ও হাড়িগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফতেসিংহ ভূমি অধিকার করেন। † এই

* Blochmann's Ain-i-Akbari p. 340.

† কায়স্থাবনিপালশূরসন্নিদান্ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্।
ফতেসিংহমুখক্ষিতাবধিকৃতো জাতোহি জিত্বৈব তান্॥"
পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা।

কায়স্থরাজা সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ীয়বংশীয় কোন জমীদার হইবেন। কারণ ফতেসিংহ বহুকাল হইতে প্রবল পরাক্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং ফতেসিংহের উত্তররাঢ়ীয়বংশে অনেক পরাক্রমশালী রাজারও উল্লেখ দেখা যায়। শূরবংশীয় ও সৈয়দবংশীয়গণ ফতেসিংহের দুর্দ্ধর্ষ পাঠান অধিবাসিগণ। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ন্যায় ফতেসিংহের মুসলমান্‌গণও পাঠান-রাজত্বসময়ে উক্ত প্রদেশে যারপরনাই প্রাধান্য বিস্তার করেন, সুতরাং ফতেসিংহ অধিকার করিতে হইলে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও ফতেসিংহের পাঠান অধিবাসিগণের সহিত বিবাদ অনিবার্য্য। আবার সেই সময়ে ফতেসিংহে একজন হাড়ি রাজারও উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত হাড়ি রাজাকেও পরাজিত করিয়া সবিতা-রায়কে ফতেসিংহের কতকাংশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। হাড়ি রাজার স্মৃতি এখনও ফতেসিংহ প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। কিম্বদন্তীমতে হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ। ফতেপুর গ্রাম তাহার রাজধানী ছিল। কান্দী হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে বীরভূম জেলার প্রসিদ্ধ গনুটিয়া কুঠী যাইবার পথে ময়ুরাক্ষীনদীর অদূরে ফতেপুর অবস্থিত। ফতেপুরের পার্শ্ববর্ত্তী মুণ্ডমালা-নামক স্থানে হাড়িবংশের ধ্বংস হয় বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। হাড়ি রাজার ধ্বংসের পর সবিতারায় ফতেসিংহ লাভ করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সবিতারায় কর্ত্তৃক ফতেসিংহ অধিকৃত হয় বলিয়া অনুমান হইতেছে।

সবিতারায়ের ধারিক ও অজয়ী নামে দুই পরাক্রমশালী পুত্র ছিলেন। তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ফতেসিংহের নানা স্থানে

গ্রাম নগরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশধরগণ মাধুনিয়া, কল্যাণপুর, আন্দুলিয়া ও জেমো প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় অন্যান্য জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণও ফতেসিংহে আসিয়া উপস্থিত হন। এইরূপে ফতেসিংহ জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের প্রধান আবাসভূমি হইয়া উঠে। জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণ কনোজিয়া বা কান্যকুব্জ শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যজুর্ব্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী। যজুর্হোতা শব্দ হইতে জিঝোতিয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় জিঝোতিয় বণিক্‌ও দৃষ্ট হয় বলিয়া জিঝোতি প্রদেশের অধিবাসিগণেরই নাম জিঝোতিয় হইয়া থাকিবে। কনিংহাম আবুরিহানের বর্ণনানুসারে বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ডকে জঝোতি প্রদেশ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা, পশ্চিমে বেটোয়া নদী, পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, দক্ষিণে চন্দেরী, সাগর ও নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের নিকটস্থ বিলহারী জেলা। এই চতুঃসীমার মধ্যস্থ প্রদেশ বুন্দেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই সীমার মধ্যেই জঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন দেশ বর্ত্তমান। বুকাননের মতে জিঝোতিয়ার বাসভূমি উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা ও পশ্চিমে বেটোয়াতীরস্থ উর্চা হইতে পূর্ব্বে বুঁদেলা নালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বুঁদেলা নালা মির্জাপুর হইতে দুই চটি মাত্র দূরে কাশীর নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছে। সুতরাং কনৌজিয়া, গৌড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের নামের উৎপত্তির ন্যায় জঝোতি

ফতেসিংহে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের বাস।

প্রদেশ হইতে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। * সার হেনরি ইলিয়াটের মতে মধ্য প্রদেশের উত্তরে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণাংশে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান। কুক সাহেবের মতে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জের অন্যতম শাখা। মদনপুরের লিপিতে যে জেজাকভুক্তিনামক দেশের কথা আছে, তাহাই জঝোতি প্রদেশ হইতে অভিন্ন। আলবিরুণি বলিয়াছেন যে, গোয়ালিয়ার ও কালিঞ্জর নগর জঝোতি প্রদেশের অন্তর্গত। † এই সমস্ত স্থানই জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের আদিভূমি ও বর্ত্তমান প্রধান সমাজ। সবিতারায় উক্ত প্রদেশ হইতেই বাঙ্গলায় আগমন করেন। তিনি দীক্ষিত উপাধিধারী ও পুণ্ডরীকগোত্রসম্ভূত। সবিতারায়ের বংশ আশ্রয় করিয়া আরও কয়েক ঘর জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ ফতেসিংহে আসিয়া বাস করেন। ফতেসিংহের জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দীক্ষিত, ত্রিবেদী, (তেওয়ারী), চতুর্ব্বেদী, (চোবে) দ্বিবেদী; (দুবে) বাজ্‌পেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র এই কয় উপাধি দেখা যায়। জমিদারী বা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ও কৃষি হইতে ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ‡ কনৌজিয়া ও মৈথিলী

* Ancient Geography of India p. p. 481-83.

† Cooke's Tribes and Castes of the N. W. Provinces and Oudh, 111.

‡ এইজন্য ইঁহারা সাধারণতঃ জমীদারী বা ভূমিহার ব্রাহ্মণনামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইঁহাদিগকে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি বলিয়া অনুমান করেন। মূর্দ্ধাবসিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বিবাহিতা ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হন। কোন কোন স্মৃতিকারের মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে ন্যূন ও ক্ষত্রিয় হইতে

ব্রাহ্মণ হইতে ইঁহারা পুরোহিত গ্রহণ করেন। উপনয়ন ও বিবাহ ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই ইঁহারা বঙ্গদেশপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও বঙ্গদেশপ্রচলিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা ও পরিচ্ছদে এখন সকলেই বাঙ্গালী। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আচারানুষ্ঠান ভিন্ন কোন বিষয়েই পশ্চিমদেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না। সবিতারায়ের বংশ অনেক দিন ফতেসিংহের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই জেমোর রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে ফতেসিংহ তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য এক জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ বংশের ভূসম্পত্তি হইয়া উঠে। সেই বংশকে বাঘডাঙ্গার রাজবংশ বলে। কালে আবার ফতেসিংহ উভয় বংশের মধ্যে বিভক্ত হয়। এক্ষণে বাঘডাঙ্গা বংশের অংশ বিক্রীত হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে। ফতেসিংহ ব্যতীত পলাশী পরগণাও এক কালে সবিতারায়ের বংশধরগণের অধিকারে ছিল। যথাস্থানে সবিতারায়ের বংশধরদিগের বিবরণও প্রদত্ত হইবে। ফতেসিংহ ব্যতীত মুর্শিদাবাদের

উচ্চ জাতি, অথচ ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হন। মনুর মতে তাঁহারা মাতৃদোষদুষ্ট হইয়া পিতৃসদৃশ হন। বৌধায়নের মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণই হন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে ন্যূন ও ক্ষত্রিয় হইতে উচ্চ, এই মতানুসারে ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হওয়ায় কালে সম্ভবতঃ তাঁহারা ব্রাহ্মণরূপেই গণ্য হইয়া থাকিবেন। কিন্তু মনু, বৌধায়ন ও মহাভারতের মতে তাঁহারা স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ। জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণ কিন্তু আপনাদিগকে কাণ্যকুব্জের অন্যতম শাখা ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অন্যান্য স্থানেও ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে লালগোলার রাওসাহেববংশ প্রসিদ্ধ। উক্ত বংশের সহিত ফতেসিংহের রাজবংশের আদান প্রদান হইয়া থাকে।

জয়রাম রায় ও কপিলেশ্বর।

সবিতা রায়ের পুত্র ধাম্বিকের গঙ্গন ও অজয়ীর উমা রায়, কমলা রায় ও কস্তূরী রায় তিন পুত্র জন্মে। গঙ্গন মানসিংহের মুখ্য সৈনিক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। উমারায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়রাম অত্যন্ত বীর ও তেজস্বী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে রাজা জয়রাম নামে অভিহিত করিত। জয়রাম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। * তিনি শক্তিপুর গ্রামে পবিত্র গঙ্গাতীরে কপিলেশ্বর নামে শিব স্থাপন করিয়া অত্যুচ্চ মন্দির ও ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। † শক্তিপুর বহরমপুর হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

* শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন যে, বাঘডাঙ্গার রামসাগর পুষ্করিণী হইতে একখণ্ড প্রস্তরফলক উত্থিত হয়, তাহাতে "নমো নারায়ণায় শুভমস্তু। গগনরায়। রায়সেনরায়। জয়রামরায় উত্তম রায়। * * * সন ১০০৯ লেখা আছে। প্রস্তরফলকের তারিখ ঠিক হইলে জয়রাম ১০০৯ সন বা ১৬০০খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু তাহার আরও কিছু পরে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

† "যেনাকারি জগৎপবিত্রতটিনীতীরে শিবস্থাপনং
সৌধং কারুতরৈঃ সুসম্ভৃতিনা নির্ম্মায় মেরোঃ সমম্।
ঘট্টকাপি কুলস্য তারণবিধৌ গোলোকসোপানকং
সোঽয়ং শ্রীজয়রামসংজ্ঞনৃপতির্যৎকীর্ত্তিরেতাদৃশী।"
পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা।

কপিলেশ্বরের মন্দিরের জন্য শক্তিপুর মুর্শিদাবাদের একটী প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। জয়রামের বংশধরগণও কপিলেশ্বরে বেদী, মণ্ডপ ও প্রকোষ্ঠাদি নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রিগণের নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দেন। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা পাঠে জানা যায় যে, কপিলেশ্বরের বাটীর বকুল বৃক্ষতলে সন্ন্যাসী বৈষ্ণবেরা প্রায় অবস্থিতি করিতেন। অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণগণের চণ্ডীপাঠে, শিবপূজায়, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি পাঠে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নানা উপচারে কপিলেশ্বরের পূজার বন্দোবস্ত ছিল। মন্দির-সংলগ্ন উপবন, নারিকেল, আম্র, কাঁঠাল, বিল্ব, চম্পক, কদম্ব বকুলপ্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত হইয়া লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তদ্ব্যতীত জবা, টগর, মল্লিকা, শেফালিকা, বক, কুন্দ, কাঞ্চন, যুথিকা, জাতি প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ ফুলভারে অবনত হইয়া মহেশ্বরের পূজার জন্য প্রস্তুত থাকিত। গঙ্গা তৎকালে মন্দির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত করিতেন। কিন্তু মন্দিরের নিকট দ্বারকা নদী প্রবাহিত ছিল। শিবরাত্রির দিন মহাসমারোহে উৎসব হইত। সেই সময়ে গঙ্গা হইতে মন্দির পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গতায়াত করিত। রাত্রিকালে প্রাঙ্গণ দীপান্বিত ও স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিত, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নানা লোকের মিশ্রণে কোলাহল উৎপন্ন হইত। বাদ্যসহকারে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কৌতুক ঘটিত। নানাসামগ্রীক্রয়বিক্রয়ে সমাগত ব্যবসায়ীদিগের দীপালোকিত দোকান বসিত। এইরূপে কপিলেশ্বরের মন্দির শোভাশালী হইয়া উঠিত ও লোকে আনন্দে রাত্রি জাগরণ করিয়া নানা উপচারে কপিলেশ্বরের পূজা

করিত। বর্ত্তমান কালেও শিবরাত্রির সময়ে কপিলেশ্বরের উৎসব হয় ও তথায় একটী মেলাও বসিয়া থাকে।

কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থা।

জয়রাম রায়ের নির্ম্মিত কপিলেশ্বর মন্দির বহুদিন হইল গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়াছে। তাহার ভগ্নাবশেষ প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিছু দূরে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী দেখা যায়। বর্ত্তমান মন্দির ১২৪১ সালে মাহাতাগ্রামনিবাসী জগমোহন মাহাতা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত মন্দির শক্তিপুরের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত; শক্তিপুর পূর্ব্বে পলাশী পরগণার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগরাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে পলাশী হইতে খারিজ হইয়াছে। শক্তিপুরের উত্তরাংশে কপিলেশ্বরের সম্পত্তি দেবোত্তর, এই অংশের নাম শিবপুর। এক্ষণে শিবপুর অর্থাৎ শক্তিপুরের দেবোত্তর অংশ নদীয়ারাজের অধিকারে আছে। কিন্তু শক্তিপুর কাশীমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সম্পত্তি। কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরের প্রায় এক রশি পূর্ব্বে ভাগীরথী। বর্ষাকালে গঙ্গার জল মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে সংলগ্ন হয়। মন্দিরের বাহিরে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে দ্বারকা বা বাবলা নদী। উভয় নদী একটী নালা দ্বারা সংযুক্ত; ঐ নালার নাম ডাকরা, ডাকরা দিয়া বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করে। ডাকরার দক্ষিণ দিকে শক্তিপুর গ্রাম, ও উত্তরে কপিলেশ্বরের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন ভূমি। কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত ও দক্ষিণদ্বারী। দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ হাত, প্রস্থও ১৮ হাত, উচ্চতা প্রায় ৪০ হাত হইবে। মন্দিরের পশ্চাতে আম্র, কাঁঠাল ও বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ আছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু দূরে এক আম্র-

বাগান দৃষ্ট হয়। মন্দিরের নিকটে দক্ষিণ-পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির। উক্ত মন্দির বাঘডাঙ্গার রাজবংশের কোন আত্মীয়ের নির্ম্মিত। একখানি ভগ্ন ইষ্টক গৃহে প্রতি বৎসর মৃণ্ময়ী শ্যামা মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। দেবোত্তর সম্পত্তি হইতেই কপিলেশ্বরের পূজা ও সেবা নির্ব্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন জেমো ও বাঘডাঙ্গার প্রদত্ত পৃথক্ নিষ্কর ভূমির আয়ও দেবসেবায় ব্যয়িত হইয়া থাকে, দর্শকগণের প্রণামী হইতে সামান্য আয় আছে। কৃষ্ণনগরাধিপ কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান সেবাইত। শিবচতুর্দ্দশীর দিন শিবের অভিষেক ও মহাসমারোহে পূজা হয়। প্রথমে কৃষ্ণনগরের মহারাজের, পরে জেমো, বাঘডাঙ্গার ও তৎপরে শক্তিপুরের জমীদারের পূজা হইয়া থাকে। ঐ দিন প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। আগন্তুকগণের মধ্যে অনেক সন্ন্যাসীও থাকেন। শিবচতুর্দ্দশীর দিন হইতে একমাসব্যাপী একটী মেলা বসে। মেলার অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ। কপিলেশ্বরের বাগানে ও শক্তিপুরের অধিকারের মধ্যে মেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। জমীদারের ও পুলিশের পক্ষ হইতে মেলার তত্ত্বাবধান হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীর দিন চিড়া মহোৎসব ও পর দিন অন্ন মহোৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণব ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করান হয়। কয়েক বৎসর হইতে মেলা উপলক্ষে কালীপূজা ও যাত্রা গান প্রভৃতি হইতেছে।

মুর্শিদাবাদে রাজপুতগণের বাস।

জিঝোতিয় ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত মানসিংহের সময় হইতে মুর্শিদাবাদে কয়েক ঘর রাজপুত বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা মানসিংহ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০৬

খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য সুন্দরবনে গমন করেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর কৃষ্ণনগররাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে নদীয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া রাজমহল ও পরে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সেই সময়ে তাঁহার অনুচর কতিপয় রাজপুত, মানসিংহের অনুগমন না করিয়া শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে বাস করার ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন। তাঁহারা জঙ্গীপুর উপবিভাগের মিঠাপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজপুতগণ আপনাদিগকে চৌহানবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এক্ষণে বিবাহাদি ব্যাপার ব্যতীত তাঁহাদের অন্যান্য আচার ব্যবহার বাঙ্গালীর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জঙ্গীপুর উপবিভাগ ব্যতীত মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থানেও দুই চারি ঘর রাজপুত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাজপুতগণ ভূসম্পত্তি উপভোগের দ্বারা আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে মানসিংহের সময় হইতে মুর্শিদাবাদে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ আপনাদের বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহারা প্রকৃত বাঙ্গালীই হইয়া পড়িয়াছেন।

বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে যেরূপ রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠানবিদ্রোহে, ভৌমিকগণের স্বাধীনতাঘোষণায় বঙ্গদেশে যেরূপ আশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সকলেই

অনুমান করিতে সক্ষম হইতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত বিপ্লব ও অশান্তির মধ্যে স্থাপিত হইয়াও ভক্ত বৈষ্ণবগণ আপনাদের ধর্ম্ম ও কাব্যালোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যেন এই সমস্ত বিপ্লব হইতে দূরে রহিয়া আর এক জগতে বিচরণ করিতেন। রাজনৈতিক অশান্তির ছায়ামাত্র তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, এবং সেই সময় হইতে মুর্শিদাবাদের দুই চারি জন বৈষ্ণব কবি খ্যাতি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদাবাদের একজন ভক্ত বৈষ্ণব কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈষ্ণব-সমাজ মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার নাম যদুনন্দন দাস। যদুনন্দন দাস সাধারণতঃ যদুনন্দনদাস ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশধরগণের বাসস্থান মালিহাটী বা মেলেটীতে বৈদ্যবংশে যদুনন্দন দাস জন্ম পরিগ্রহ করেন ও শ্রীনিবাসের পৌত্র ও তাঁহার কন্যা হেমলতার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য বুঁধুইপাড়ানিবাসী সুবলচন্দ্র ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হন।

* "শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়।
ভ্রাতুষ্পুত্র হয় তাঁহার শিষ্য মহাশয়॥
* * * *
দীন যদুনন্দন বৈদ্যদাস নাম তার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥
সেবকাভাস কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল॥"

কর্ণানন্দ ২য় নির্য্যাস।

তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে কর্ণানন্দ নামে গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা প্রশাখাবলীর বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং বৈষ্ণবসমাজে তাহার যথেষ্ট আদরও দেখা যায়। পয়ারবিরচিত সেই পদ্যগ্রন্থ তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস-বিশেষ। তাহা হইতে বৈষ্ণবসমাজের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই গ্রন্থ রচিত হইলে হেমলতা ঠাকুরাণী ইহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করায় নিজে তাহার কর্ণানন্দ নাম প্রদান করেন। ১৫২৯ শকাব্দে বা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে হেমলতা ও সুবলচন্দ্রের বাসস্থান বুঁধুইপাড়ায় এই গ্রন্থের রচনা সম্পূর্ণ হয়। * কর্ণানন্দ ব্যতীত যদুনন্দন কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সংস্কৃত বৃহৎ গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের মূলের পয়ারানুবাদ, রূপগোস্বামী প্রণীত বিদগ্ধমাধব নাটকের পয়ারানুবাদ এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বা শিহ্লন মিশ্র প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ-

* বুঁধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস ॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥

কর্ণানন্দ, ৬ষ্ঠ নির্য্যাস।

কর্ণামৃতের কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত টীকা অবলম্বনে পয়ারানুবাদ করিয়াও খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার রচিত বিবিধ রসভাবাত্মক পদাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণবগণের নিকট সেগুলি অত্যন্ত আদরের ধন ও বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের আসনও উচ্চে দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত পদাবলী রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে ও বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার অপেক্ষা পদকর্ত্তা বলিয়াই যতুনন্দনের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত।

কুমারপুরে রাধা-মাধবের প্রতিষ্ঠা।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদের কুমারপুর বা কোঁয়ারপাড়া নামক গ্রাম বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠে। কুমারপুর মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ মতিঝিলের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। মতিঝিল মুর্শিদাবাদ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা মতিঝিলের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে, যথাস্থানে আমরা তাহার বিবরণ প্রদান করিব। এই মতিঝিল পূর্ব্বে ভাগীরথীর গর্ভ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাগীরথীর সহিত তাহার সংযোগ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সেই সময়ে বৈষ্ণব চূড়ামণি জীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে কুমারপুরে উপস্থিত হইয়া রাধামাধববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। * দেবতার মন্দিরের সঙ্গে একটী অতিথিশালাও নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরাতন মন্দির ভগ্নদশায় পতিত,

* কেহ কেহ হরিপ্রিয়ার সেবাধিকারী বংশীবদনের প্রথমে কুমারপুরে আগমন ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান মোহান্ত হরিপ্রিয়ার আগমনেরই কথা প্রকাশ করেন।

নূতন মন্দিরে এক্ষণে রাধামাধব অবস্থিত। হরিপ্রিয়ার অতিথি-শালার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। রাধামাধবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে কুমারপুরে একটি উৎসব ও মেলার অধিবেশন হয়। সে সময়ে তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। রাধামাধবের সেবার জন্য অনেক ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তজ্জন্য বাদসাহী ফার্ম্মান ও অন্যান্য অনেক আদেশপত্র প্রদত্ত হয়। মতিঝিলের সন্নিকটে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইলেও রাধামাধবের গৌরবের কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। মুর্শিদা-বাদের নবাবেরা আপনাদের নিকটস্থ হিন্দু দেবতার প্রতি কোন রূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। নবাব মহবৎজঙ্গের (আলিবর্দ্দির) মৃত্যুর পর রাধামাধবের কতক ভূমি খাসমহালের গোমস্তা কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে, তৎপরবর্ত্তী নবাব সম্ভবতঃ সিরাজউদ্দৌলা, তৎকালীন মোহান্ত রূপনারায়ণ গোস্বামীকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। রূপনারায়ণ হরিপ্রিয়া হইতে পঞ্চম সেবক। আলিবর্দ্দি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ মতিঝিলের পশ্চিম তীরে এক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বসতি করিতেন। তিনি তাঁহার দত্তক পুত্র সিরাজের কনিষ্ঠ এক্রামউদ্দৌলার শোকে বিপ্রকৃতিস্থ হওয়ায় ঝিলের পরপারস্থ মন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে বিরক্ত হইয়া মোহান্তদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করার ইচ্ছায়, তাঁহাদের নিকট থালা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেই থালা তদানীন্তন মোহান্তের প্রভাবে যুইফুলের মালায় পরিণত হয় বলিয়া এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। * নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ

* কেহ কেহ এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য নবাবের নামও উল্লেখ করিয়া

ঐরূপ ব্যাপারে মোহান্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার অনুরোধে ঝিলের চারিটী ঘাটের সীমার মধ্যে মৎস্য ও পক্ষী বধ করার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। কুমারপুরের বর্ত্তমান মোহান্তের নাম রাইমোহন গোস্বামী, ইনি বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশসম্ভূত। হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী হইতে রাইমোহন একাদশ সেবক।

বঙ্গে পর্টুগীজ প্রভাব।

কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারের পর পর্টুগালাধিপ ইমানুয়েল ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য একটী নূতন জলপথের আবিষ্কার করিতে ভাস্কো ডী গামার প্রতি ভারার্পণ করেন। ভাস্কো ডী গামা জাহাজ লইয়া ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পর্টুগাল হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হন। সমুদ্রে ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া নবেম্বর মাসে গামার জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণের পর ভারত মহাসাগরে পঁহুছিয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উপস্থিত হয়। তাহার পর পর্টুগীজগণ শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষ, সিংহল, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া প্রাচ্য প্রদেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন। ক্রমে মালাবার উপকূলস্থ গোয়া তাঁহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। অদ্যাপি উক্ত গোয়া তাঁহাদেরই অধিকারে রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিস্তার ও আধিপত্য-

থাকেন। কিন্তু কুমারপুরের মোহান্তদিগের কথায় নওয়াজেস মহম্মদ খাঁকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এতৎসম্বন্ধে মৎপ্রণীত মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর মতিঝিল নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্থাপনের পর ১৫৩০ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজগণ বাঙ্গলায় বাণিজ্য উপলক্ষে উপস্থিত হন। সেই সময়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার মধ্যে দুইটী প্রধান বন্দর ছিল। চট্টগ্রামে সকল প্রকার জাহাজের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পর্টুগীজেরা তাহার পোর্টো গ্রাণ্ডী বা বৃহৎ স্বর্গ ও সপ্তগ্রামের পোর্টো পিকেনো বা ক্ষুদ্র স্বর্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। * ক্রমে তাঁহারা হুগলী প্রভৃতি স্থানে কুঠী স্থাপন ও গির্জা নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত পর্টুগীজ অধিবাসীর মধ্যে অনেকে বাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজগণের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ জলদস্যুর ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণের চক্ষে ইউরোপীয়দিগকে হেয় করিয়া তুলে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি চট্টগ্রাম ও তাহার নিকটস্থ স্থানে বাস করিয়াছিল। তাহারা এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে যে, ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসিগণের ধন প্রাণ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গঞ্জালেস নামে পর্টুগীজ-জলদস্যুগণের একজন সর্দ্দার চট্টগ্রাম প্রদেশে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া ঐ সমস্ত দস্যুগণের দমনের জন্য রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে গঞ্জালেস সনদ্বীপ অধিকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। আরাকানের রাজাও পর্টুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গলা আক্রমণে উদ্যোগী হন। এইরূপে

* Wilson's Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., P. 132.

আরাকানী বা মগ, ও পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গীগণের অত্যাচারে পূর্ব্ব বঙ্গ কিছু দিন পর্য্যন্ত অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর মোগল সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিলে, মগেরা আপনাদের দেশে ও ফিরিঙ্গীরা চট্টগ্রামে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পর পর্টুগীজগণ পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠে। গঞ্জালেস সহজে সনদ্বীপ পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু মগদিগের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় পর্টুগীজ দস্যুগণ ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে। গঞ্জালেস বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আরাকান রাজ্য আক্রমণ করিলে, মগদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া গোয়ার পর্টুগীজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধি গঞ্জালেসের সাহায্যের জন্য একদল সৈন্যসহ কয়েক খানি জাহাজ পাঠাইয়া দেন। আরাকানরাজ ওলন্দাজদিগের সাহায্যে পর্টুগীজদিগকে পরাস্ত করিয়া গাঞ্জালেসের সনদ্বীপ অধিকার করেন, এবং বাঙ্গলার নানাস্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসিগণের মনে যারপরনাই ভীতির সঞ্চার করিয়া দেন। * বাঙ্গলার তদানীন্তন সুবেদার কাশীম খাঁ এই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিতে অশক্ত হওয়ায় বাদসাহ তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইব্রাহিম খাঁর রাজত্বসময়ে বাঙ্গলায় পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হয়। এই সময়ে বাদসাহ জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গলা অধিকার করেন। বাদসাহ পুত্রকে ক্ষমা করিলে,

* Stewart.

সাজাহানের বাঙ্গলা পরিত্যাগের পর তথায় পুনর্ব্বার সুবেদার নিযুক্ত হয়। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, এবং কাশীম খাঁ জবানী বাঙ্গলার সুবেদারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই সময়ে আবার পর্টুগীজগণ প্রবল হওয়ায় কাশীম খাঁকে তাহাদের দমনের জন্ত চেষ্টা করিতে হয়।

পর্টু'গীজ-প্রাধান্যের ধ্বংস।

বাঙ্গলায় উপস্থিত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে কাশীম খাঁ পর্টুগীজগণের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি দেখিলেন যে, পর্টুগীজগণ হুগলীতে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলার নানা স্থানে আধিপত্য স্থাপনের, এবং হুগলীকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের আধিপত্যবিস্তারে সম্রাটের প্রজাগণও অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, হুগলীর নিকট দিয়া যে সমস্ত নৌকা বা জাহাজ যাতায়াত করে, তাহারা তাহাদের শুল্ক আদায় করিতে ক্রটি করে না। তজ্জন্ত সাম্রাজ্যের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের যারপরনাই ক্ষতি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্র প্রজাগণের পুত্র কন্তাগণকে বলপূর্ব্বক বা প্রলোভনের দ্বারা হস্তগত করিয়া ক্রীতদাসরূপে ভারতের অন্তান্ত স্থানে তাহারা প্রেরণ করিতেছে। এই সমস্ত বিষয়ের তথ্য অবগত হইয়া কাশীম খাঁ বাদসাহকে পর্টুগীজগণের বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। সাজাহান তাহাদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রদান করেন। বাদসাহের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুবেদার, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে মুখসুসাবাদ (মুর্শিদাবাদ) ও হিজলীর বিদ্রোহী জমীদারগণকে দমন করার প্রয়োজন, এইরূপ প্রচার

করিয়া, পর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করার জন্ত বাহাদুর কুম্বুর অধীন একদল সৈন্ত ঢাকা হইতে মুখসুসাবাদে পাঠাইয়া দেন। আর এক দল সৈন্ত তাঁহার পুত্র এনায়েৎ আলির অধীনে বর্দ্ধমানাভিমুখে প্রেরিত হয়, তৃতীয় দল খাজা সেরের অধীন জলপথে শ্রীরামপুরের দিকে যাত্রা করে। খাজা সের শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইয়া অন্য দুই জন সর্দ্দারকে সম্বাদ দিলে, সকলে আসিয়া হুগলী আক্রমণ করেন। তিন মাস পর্য্যন্ত পর্টুগীজেরা মোগলদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহারা গোয়া অথবা ইউরোপ হইতে আপনাদের সাহায্যের জন্য জাহাজাদি আসিতেছে মনে করিয়াছিল। অবশেষে মোগলদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পর্টুগীজেরা আপনাদের অনেকগুলি জাহাজে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। তাহাদের সমস্ত জাহাজ, লোকজন ও দ্রব্যাদি মোগলদিগের হস্তে পতিত হয়। কেবল দুই এক খানি জাহাজ কোনরূপে মোগলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া গোয়াভিমুখে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই আক্রমণে প্রায় সহস্রাধিক পর্টুগীজ মোগলহস্তে নিহত ও প্রায় ৪৪০০ স্ত্রী ও পুরুষ বন্দী-অবস্থায় আগরায় বাদসাহের নিকট নীত হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোক বাদসাহের ও আমীর ওমরার অন্তঃপুরে আশ্রয় লাভ করে। বালকগণকে মুসলমান করা হয়, পাদরীদিগকেও মুসলমান করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল কারাবাসের পর তাহারা ও অবশিষ্ট পর্টুগীজগণ মুক্তিলাভ করিয়া গোয়াভিমুখে যাত্রা করে। * ইহার পর হইতে বাদ-

* Stewart.

লায় পর্টুগীজগণের বাণিজ্যবিস্তার ও আধিপত্যস্থাপন একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং অন্যান্য ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য করার আদেশ পাইয়া ক্রমে আধিপত্যস্থাপনে সচেষ্ট হন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

অন্যান্য ইউরোপীয়গণের ভারতবর্ষে আগমন।

প্রাচ্য দেশে পর্টুগীজগণের বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তার দেখিয়া অন্যান্য ইউরোপীয়গণের মনে তাঁহাদের পথানুসরণের চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠে। প্রথমতঃ ইংরাজ ও পরে ওলন্দাজগণ প্রাচ্যদেশে আগমনের চেষ্টা করেন। ইংরাজেরা প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, ওলন্দাজেরা সর্ব্বাগ্রে পর্টুগীজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে প্রাচ্য দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা ভারত মহাসাগরস্থ যবপ্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যবিস্তার ও আধিপত্যস্থাপন করিয়া পর্টুগীজগণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ভারতবর্ষেও তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। ওলন্দাজদিগের পর ইংরাজেরা এতদ্দেশে উপস্থিত হন। ইংরাজেরা অনেক দিন হইতে প্রাচ্যদেশে আগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে টমাস ষ্টীফেন্স নামক একজন ইংরাজ বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন।* তিনি ভারতবর্ষের সহিত

* উলিয়াম মামসবেরীর মতে সর্ব্বপ্রথমে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সেরবোরনের সিঘেলমস্ পোপের নিকট প্রেরিত হইয়া তথা হইতে প্রাচ্য ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়া মান্দ্রাজের নিকট মলয়পুরস্থ সেণ্ট টমাসের সমাধির নিকট উপস্থিত হন, ও ভারতবর্ষ হইতে হীরা জহরত ও মসলাদি লইয়া যান। (Hunter)

ইংলণ্ডের বাণিজ্যের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ্, জেমস্ নিউবেরি, এবং লীড্‌স নামে তিনজন ইংরাজ বণিক স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। পর্টু-গীজেরা তাঁহাদিগকে অর্ম্মজে ও পরে গোয়ায় বন্দী করিয়া রাখেন। কিছুকাল পরে মুক্তি লাভ করিলে নিউবেরি গোয়ায় একটী দোকান করিয়া সামান্তরূপ দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হন। লীড্‌স মোগল সম্রাটের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন, এবং ফিচ্ সিংহল, বাঙ্গলা, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা ও অন্যান্য স্থানে দীর্ঘ ভ্রমণের পর ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে গোল মরিচের মূল্য বৃদ্ধি করিলে, ইংরাজেরা স্বয়ংই ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করার জন্য লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে লণ্ডনে এক সভা আহ্বান করিয়া একটী বাণিজ্যসমিতি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথও ইংরাজ বণিক্‌কোম্পানীর সুবিধার জন্য সার জন মিল্ডেনহলকে কনষ্টাণ্টিনোপলের পথ দিয়া দিল্লীশ্বর মোগল-কেশরী আকবর বাদসাহের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞীর নিকট হইতে সনন্দ লাভ করিয়া প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যার্থে আদেশ প্রাপ্ত হয়। উক্ত কোম্পানী তৎকালে "প্রাচ্য ভারতে বাণিজ্যার্থী লণ্ডন বণিকগণের শাসনকর্ত্তা ও কোম্পানী" নামে অভিহিত হইত।* প্রথম ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া

* The Governor and Company of Merchants of London trading to the East Indies.

কোম্পানীর ১২৫ জন অংশীদার ছিলেন, ও তাহার মূলধন ৭০ হাজার পাউণ্ড হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ৪ লক্ষ পাউণ্ডে উত্থিত হয়। ইহার পর "কোর্টেন সমিতি" বা "আসেডা বণিকসমিতি" নামে একটী কোম্পানী গঠিত হইলে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাহারা লণ্ডন কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে "বণিক সাহসিক কোম্পানী"* নামে একটী সমিতি ক্রমওয়েলের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করে; দুই বৎসর পরে উক্ত সমিতিও লণ্ডন কোম্পানীর সহিত মিলিত হয়। কিন্তু ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহ করিয়া "ইংলিশ কোম্পানী" বা "প্রাচ্য ভারতে বাণিজ্যার্থী সাধারণ সভা"† নামে একটী মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী সমিতি গঠিত হইয়া লণ্ডন কোম্পানীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। অবশেষে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ‡ লণ্ডন ও ইংলিশ কোম্পানী মিলিত হইয়া "প্রাচ্যভারতে বাণিজ্যার্থী ইংলণ্ডীয় বণিকগণের যুক্ত কোম্পানী§" নামে অভিহিত হয়। এই যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তার করিয়া অবশেষে ভারতের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ

* Company of Merchant Adventurers.

† General Society trading to The East Indies.

‡ Hunter ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দুই কোম্পানীর মিলিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু উইলসন ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে উভয় কোম্পানীর মিলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (Wilson's Early Annals of the English in Bengal Vol I.)

§ "The United Company of Merchauts of England trading to the East Indies".

হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ দ্বাদশ বার প্রাচ্য দেশে উপস্থিত হয়। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপস্থ ব্যাণ্টাম নামক স্থানে ইংরাজদিগের এক কুঠী স্থাপিত হয়। ব্যাণ্টাম সর্ব্ব প্রথমে প্রাচ্য দেশে ইংরাজদিগের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। এই সময়ে ওলন্দাজদিগের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হয়, পরিশেষে আবার সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬১০ ও ১৬১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সপ্তম বারের জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন হিপন্ মছলীপত্তনে এজেন্সী বা বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন, এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা সুরাটে বাণিজ্য করার অধিকার প্রাপ্ত হন। ক্রমে সুরাটে একটী কুঠীও স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজগণের বাণিজ্য বিস্তারের এই প্রথম সূচনা। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের আদেশে সার টমাস রো ইংলণ্ডাধিপের দূতরূপে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহাতে ভারতবর্ষে ইংরাজগণের বাণিজ্যের বিশেষরূপ সুবিধা হয়, রো বাদসাহের নিকট হইতে তাহার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সাজাহানের রাজত্বকালে সুরাট কুঠীর ডাক্তার গাব্রিয়েল বৌটন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া বিনা শুল্কে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের আদেশ লাভ করেন। * এইরূপে ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে ভারতে

* প্রচলিত ইতিহাসে দেখা যায় যে বৌটন সাজাহানের এক কন্যার ক্ষত আরোগ্য করিয়া বাদসাহদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্ত সে বিষয়ে কেহ কেহ সন্দিহান হইয়া থাকেন।

বাণিজ্যালয় ও কুঠী প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের ঐ সমস্ত কুঠী ও বাণিজ্যালয়ের মধ্যে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে আগরা ও পাটনার বাণিজ্যালয় ও ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মছলীপত্তনে একটী কুঠী স্থাপিত হয়। কিছুকালের জন্য তাহার কার্য্য স্থগিত থাকিলে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে "ফোর্টসেণ্ট জর্জ" বা মান্দ্রাজে কুঠী স্থাপিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে ইংরাজদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপ দ্বিতীয় চার্লসের পত্নী ক্যাথারাইন্ যৌতুকস্বরূপ পর্টুগালের নিকট হইতে বোম্বাই প্রাপ্ত হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে উহা ইংলণ্ডের হস্তগত হয়। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে বোম্বাই সমর্পণ করেন। তদবধি বোম্বাই ইংরাজদিগের একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে। ১৬৮৪ হইতে ৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুরাট হইতে বোম্বাই নগরে ইংরাজদিগের কার্য্যালয় সমস্ত স্থানান্তরিত হইয়া বোম্বাইকে দক্ষিণাত্যের পশ্চিম পার্শ্বে ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান করিয়া তুলে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বেই ইংরাজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য বিস্তার ও কুঠী স্থাপনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। যদিও ইংরাজদিগের পূর্ব্বে ওলন্দাজগণ প্রাচ্য দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হওয়ার পর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম

ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়া প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করে। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়, ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়, ১৬৪২খৃষ্টাব্দে চতুর্থ ও ১৬৪৪খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের পঞ্চম কোম্পানীর গঠন হয়। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ও ওয়েষ্ট কোম্পানী ও "সেনিগ্যাল" ও "চীন কোম্পানী" মিলিত হইয়া "ভারতীয় কোম্পানী" আখ্যা গ্রহণ করে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজাজ্ঞায় তাহাদের একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষমতা হ্রাস হয়, ও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে "জাতীয় মহা সমিতির" * দ্বারা কোম্পানীর বিলোপ সাধন হয়। ফরসীগণও বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, এবং দক্ষিণ ভারত-বর্ষের পণ্ডিচেরী প্রভৃতি নগর তাঁহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। ক্রমে বঙ্গদেশেও তাঁহাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইংরাজ-দিগের সহিত বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া ছিল। অবশেষে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে হতবীর্য্য করিয়া ফেলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ও ১৬৭০খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় দিনেমার "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠিত হইয়া মালাবার উপকূলে পোর্ট নভো প্রভৃতি স্থানে দিনেমারদিগের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কচ্‌গণও একটী কোম্পানী গঠন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে "স্প্যানিশ কোম্পানী" ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য আরম্ভ করে, ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই। উক্ত শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়াসম্রাটের আদেশে "অষ্টেণ্ড কোম্পানী" গঠিত হইয়া

* National Assembly.

ভারতে ও বাঙ্গালায় বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হয়। যথাস্থানে তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হইবে। সর্ব্বশেষে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যার্থে একটী "সুইডীশ কোম্পানী"ও গঠিত হইয়াছিল।

কিরূপে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ প্রাচ্য দেশ ও ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদের বাঙ্গলায় উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে কাহারা প্রথমে বাঙ্গলায় বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হন ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে ইংরাজদিগের বাঙ্গলায় আগমনের পূর্ব্ব হইতে দেখা যায় যে, বাঙ্গলার সহিত ওলন্দাজদিগের কোন কোন বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, যৎকালে গঞ্জালেস গোয়ায় পর্টুগীজগণের সাহায্যে আরাকান রাজ্য আক্রমণ করে, সেই সময়ে আরাকানরাজ ওলন্দাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, ওলন্দাজগণ তৎকালে বঙ্গোপসাগরে আপনাদের জাহাজ লইয়া উপস্থিত হইতেন, এবং সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে তাঁহাদের অল্পবিস্তর বাণিজ্যারম্ভও হইয়া থাকিবে। অন্যে অনুমান করেন যে, ১৬২৫খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব হইতে ওলন্দাজেরা বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেও যে বাঙ্গলার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। ওলন্দাজগণ চুঁচুড়া, বরাহনগর, কালিকাপুর, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে আপনাদের কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণের পর আমরা ইংরাজদিগকে বাঙ্গলায় বাণিজ্যার্থে

বাঙ্গালায় ইউরোপীয়গণের উপস্থিতি।

উপস্থিত দেখিতে পাই। যৎকালে সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই সময় তিনি ইংরাজদিগের জন্য যে সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে ইংরাজদিগকে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। * সেই অনুমতি পত্রের বলে ইংরাজেরা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বিহার ও বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। তৎকালে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলায় ও আফজল খাঁ বিহারের সুবেদারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দুই জন ইংরাজ পাটনায় উপস্থিত হইয়া তথায় বস্ত্রাদি ক্রয় ও একটী বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু স্থলপথে পাটনা হইতে আগরায়, পরে তথা হইতে সুরাটে দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া বহু ব্যয়সাধ্য দেখিয়া পর বৎসর বাঙ্গলার বাণিজ্য কার্য্য স্থগিত করা হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার আদেশে হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠী স্থাপন করেন। † সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সা সুজার বাঙ্গলাশাসনসময়ে ডাক্তার বৌটন আগরা হইতে বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী রাজমহলে উপস্থিত হইয়া সুজার দরবারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ব্রিজ্‌-ম্যান ও ষ্টীফেন্স বাঙ্গলায় কতকগুলি কুঠী স্থাপনের উদ্যোগী হন। বৌটন তাঁহাদিগকে রাজমহলে আনয়ন করিয়া সা সুজার সহিত পরিচয় করিয়া দিলে, ¶ ইংরাজেরা হুগলীতে কুঠী নির্ম্মা-

* Beveridge's History of India Vol I., P. 166.

† Wilson's Early Annals of the English in Bengal, Vol 1.

¶ এই সময়ে বৌটন সা সুজার দরবারে উপস্থিত ছিলেন কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ণের আদেশ লাভ করেন, এবং হুগলী বাঙ্গলায় ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রধান স্থান হইয়া উঠে। উহার অধীনে বালেশ্বর, পাটনা, কাশীমবাজার ও রাজমহলে এজেন্সী বা বাণিজ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে কাশীমবাজার, পাটনা, রাজমহল, মালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও তাঁহাদের কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সা সুজার নিকট হইতে ইংরাজেরা বাঙ্গলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ প্রাপ্ত হন। মীরজুম্লার সুবেদারী সময় হইতে তাঁহাদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র পেস্কশ দিতে হইত, কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণ শতকরা ৩॥ টাকা শুল্ক প্রদান করিতেন। বাঙ্গলার ইংরাজ কুঠীসমূহ পূর্ব্বে মান্দ্রাজের অধীন ছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা মান্দ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হয়, এবং মিষ্টার উইলিয়ম হেজেস্ বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া হুগলীতে অবস্থিতি করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হুগলী হইতে কলিকাতায় কুঠী স্থানান্তরিত হওয়ায়, কলিকাতা ক্রমে বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রধান স্থান হইয়া উঠে। সেই কলিকাতা এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী। নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া প্রথম বারে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া ছিলেন। তাহার পর ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয় বার সুবেদার নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম বারের শাসনসময়ে ফরাসী ও দিনেমারেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য বিস্তার ও কুঠী নির্ম্মাণের আদেশ লাভ করেন। তদনুসারে চন্দননগর-ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীগণ কর্ত্তৃক ও শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ কর্ত্তৃক কুঠী স্থাপিত হয়। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে

ফরাসীরা চন্দননগরে অবস্থিতি করিয়া ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহাকে আপনাদের অধিকারভুক্ত করেন। * ইহার পর তাঁহারা মুর্শিদাবাদের সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গা, ঢাকা ও পাটনা বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানেও কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দননগর বাঙ্গলার মধ্যে ফরাসীগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান হইয়া উঠে; এবং গবর্ণর ডিউপ্লের সময় তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। দক্ষিণ ভারতবর্ষের ন্যায় বঙ্গদেশেও ফরাসীগণের সহিত ইংরাজদিগের মহা বিবাদ বাঁধিয়া উঠে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে "অষ্টেণ্ড কোম্পানী" বাঙ্গলায় বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হয়, যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

কালিকাপুরে ওলন্দাজগণ।

বাঙ্গলায় ইউরোপীয়গণ উপস্থিত হইয়া কিরূপে মুর্শিদাবাদ-প্রদেশে আপনাদের বাণিজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ওলন্দাজেরাই পর্টুগীজগণের পর সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। সেইজন্য মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীমবাজারের পশ্চিমসংলগ্ন কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের কুঠী অবস্থিত ছিল। রেভারেণ্ড লং সাহেব মিষ্টার ব্রুটনের বর্ণনা হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজারে ইউরোপীয়-গণের কুঠী অবস্থানের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রুটন ১৬৩২

* ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও দিনেমারেরা বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ফরাসীদিগকে চন্দননগরে অবস্থান করিতে দেখা যায়।

খৃষ্টাব্দে মছলীপত্তন হইতে উড়িষ্যায় ও পরে বাঙ্গলায় উপস্থিত হন, সে সময়ে উড়িষ্যা বা বাঙ্গলায় ইংরাজদিগের কোন কুঠী ছিল না। তাহার পর উড়িষ্যার হরিহরপুর ও বালেশ্বরে ইংরাজদিগের কুঠী সংস্থাপিত হয়। * সুতরাং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজারে কোন ইউরোপীয় কুঠী থাকিলে তাহা ওলন্দাজদিগের স্থাপিত কুঠী বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। ক্রুটন সেই সময়ে কাশীমবাজারকে রেশম ও মসলিনের জন্য বিখ্যাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীমবাজার রেশম, গজদন্ত ও তূলার ব্যবসায়ের জন্য বাঙ্গলার মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তন্নিমিত্ত ইউরোপীয়গণ তথায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের ব্যবসায়ের পরিচালন করিতেন। বাঙ্গলার মধ্যে চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। কালিকাপুরের কুঠীর কার্য্য চুঁচুড়ার অধীনেই পরিচালিত হইত। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের বিশেষতঃ আলিবর্দ্দি, সিরাজ-উদ্দৌলা ও মীরজাফরের সময় ওলন্দাজেরা কালিকাপুরে বিশেষরূপ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার শাসনকালে মিষ্টার ভিনেট কালিকাপুরের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কাশীমবাজার হইতে ইংরাজেরা বন্দী-অবস্থায় সিরাজউদ্দৌলার নিকট নীত হইলে মিষ্টার ভিনেট প্রতিভূ হইয়া তাঁহাদিগের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা ক্লাইবের আদেশে আক্রান্ত হইয়া

* Wilson's Early Annals of the English in Bengal Vol I.

পরাস্ত হইলে, তাঁহারা চুঁচুড়ার, কাশীমবাজার বা কালিকাপুরের ও পাটনার কুঠী রক্ষার জন্ত কেবল ১২৫ জন ইউরোপীয় সৈন্ত রাখিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন।* ইহার পর হইতে ক্রমে ওলন্দাজদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে গবর্ণর জেনারাল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে কর্ণেল আইরণসাইড কালিকাপুর কুঠী অধিকার করেন। তৎকালে কালিকাপুরে একটী দুর্গ ছিল বলিয়া জানা যায়।† কিন্তু ইহার পর ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কালিকাপুরের কুঠী ও তাহার স্থানাদি ক্রয় করিয়া লন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত কুঠীর উপকরণ দ্বারা বহরমপুর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত নদী-তীরস্থ রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে কালিকাপুরে কেবল ওলন্দাজদিগের একটী সমাধিস্থান তাঁহাদিগের প্রাচীন অবস্থিতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেই সমাধিস্থানের পশ্চিমে রাস্তার বামধারে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও মঠ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তাহার কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। কালিকাপুর এককালে মহা সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তাহার বাজার বা চকে নানাপ্রকার সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় হইত। যৎকালে ভাগীরথী তাহার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিলেন, সেই সময়ে কালিকাপুরে কার্ত্তিকবিসর্জ্জনের দিবস

* Beveridge's History of India Vol I., P. 663.

† "Colonel Ironside on taking possession writes thus to the Civil Authorities :—I should think tomorrow morning the properest time for the Troops to evacuate the Fort and its environs' (Gastrell's Statistical Report of Murshidabad P. 12.)



এ[illegible]ব্রহ্মারোহের উৎসব হইত। সেই দিবস তথায় একটী মেলাও বসিত, এবং নদীতে ময়ূরপঙ্খী, ছিপ ও অন্যান্য বহু প্রকার নৌকার বাইচ হইত। বহু লোকের সমাগমে তাহার চতুর্দ্দিক্ কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিত। মুর্শিদাবাদের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত জনগণ এমন কি নবাববংশীয়েরাও সেই উৎসব সন্দর্শনে আগমন করিতেন। কালিকাপুর ও কাশীমবাজারের নিম্নস্থ ভাগীরথীর প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে উক্ত স্থানসমূহের অধিবাসিগণ স্থানান্তরে পলায়ন করে। এক্ষণে কালিকাপুর আম্র কাঁঠালের বাগান ও নানা প্রকার জঙ্গলের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন তথায় একটী থানা অবস্থিত ছিল। এক্ষণে দুই এক ঘর সামান্য লোকের বাস মাত্র আছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালিকাপুরে এক্ষণে কেবল ওলন্দাজদিগের একটী সমাধি-স্থান বিদ্যমান আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন গ্যাষ্ট্রেল তথায় ৪৭টী সমাধি-স্তম্ভ থাকার কথার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ২২টী মাত্র সমাধি দেখা যায়। তন্মধ্যে ৬টীর উপরিভাগে কেবল স্তম্ভ অবস্থিত আছে, অবশিষ্ট সমাধিগুলি ইষ্টকমণ্ডিত হইয়া দুই এক হাত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। গ্যাষ্ট্রেলের সময়ের অধিকাংশ সমাধি-স্তম্ভ ভগ্ন হওয়ায়, তাহারা এক্ষণে মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সমাধির মধ্যে ডানিয়েল ভান ডার মিউলের সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মিউল ১৭২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে সমাহিত হন।* ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে

ওলন্দাজ সমাধির বর্ত্তমান অবস্থা।

* গ্যাষ্ট্রেল ভ্রমক্রমে 'Muyl' এর স্থলে 'Muyz' ও 1721 স্থলে 1725 লিখিয়াছেন।

সমাহিত জন কাণ্ট ভুর্টের সমাধি শেষ সমাধি বলিয়া দৃষ্ট হয়। যে কয়টী সমাধি-স্তম্ভ এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে টেমারস্ ক্যাণ্টর ভিশারের সমাধি-স্তম্ভটী সর্ব্বোচ্চ। ভিশার ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সমাহিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সমাধি-স্থানটী গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। স্থানটীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত। দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের মধ্যস্থলে প্রবেশ-দ্বার। প্রবেশ-দ্বার হইতে একটী পরিচ্ছন্ন পথ সমাধি-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে গিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে জবা, করবী, কুন্দ, কলিকা প্রভৃতি বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সমাধি-স্থানের শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে। প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণে মালীদের থাকিবার জন্য একখানি সুন্দর চালা ঘর। সমাধি-স্তম্ভগুলি সুসংস্কৃত অবস্থায় এক্ষণে বিদ্যমান আছে। সমাধি-স্থানের দক্ষিণে রাজ-পথ। অপর তিন পার্শ্বের ভূমি কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে। সমাধি-স্থানের পূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহাতে একটী বাঁধা ঘাট দৃষ্ট হয়। উক্ত পুষ্করিণী ও ঘাটটীকে আধুনিক বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে। এই সমাধি-স্থান ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের আর কোনই চিহ্ন নাই। টীফেনথেলারের উল্লিখিত বহু ও সুবৃহৎ ওলন্দাজ অট্টালিকা, এবং কুঠী, গির্জা, মঠ বা দুর্গের কিছু মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না।

কাশীমবাজারে ইংরাজগণ।

ওলন্দাজদিগের পরে ইংরাজেরা মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হইয়া কাশীমবাজারে আপনাদিগের কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংসের পর ও কলিকাতার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে

কাশীমবাজার বাণিজ্য-বিষয়ে বাঙ্গলার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীমবাজার এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, পদ্মা হইতে জলঙ্গী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর অংশ সচরাচর ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক কাশীমবাজার নদী নামে অভিহিত হইত। পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যস্থিত ত্রিকোণ ভূভাগ কাশীমবাজার দ্বীপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। * অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মেজর রেনেল কাশীমবাজার দ্বীপের একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর প্রবাহের জন্য কাশীমবাজার বাণিজ্যোপযোগী স্থান হইয়া উঠে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহের উল্লেখ দেখা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্ণিয়ার ও টেভারনিয়ার কাশীমবাজারে আগমন করেন। বার্ণিয়ার ভাগীরথীর সঙ্কীর্ণ প্রবাহের জন্য তাহার মোহানা স্থুতী হইতে স্থলপথে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। টেভারনিয়ার উহাকে একটী ক্ষুদ্র খাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন ইংরাজ অধ্যক্ষ মিষ্টার হেজেস ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নদীয়া হইতে মুর্শিদাবাদের মহুলায় উপস্থিত হন, পরে তথা হইতে জলপথে কাশীমবাজারে আগমন করা দুষ্কর মনে করিয়া স্থলপথেই আসিয়াছিলেন। † ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর মিষ্টার হলওয়েল মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য কতক দূর বজরায় আসিয়া পরিশেষে ডিঙ্গি

* Orme's Indostan Vol. II. P. 11.

† Calcutta Review, April 1892.

নৌকার সাহায্য লইতে বাধ্য হন। * বৎসরের কোন কোন সময়ে ভাগীরথীর প্রবাহ সঙ্কীর্ণ থাকিলেও তৎকালে তাহার তীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান স্থানসমূহের তাদৃশ ক্ষতি হইত না। কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী রুদ্ধপ্রবাহ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সকল বিষয়েই মহান্ অনর্থ ঘটিতেছে। মুর্শিদাবাদ প্রদেশের মধ্যে কাশীমবাজারকে বাণিজ্যোপযোগী স্থান বিবেচনা করিয়া ইংরাজেরা কাশীমবাজারে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য স্থানেও বিভিন্নদেশীয় বণিক্‌গণেরও কুঠী স্থাপিত হয়। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে বাঙ্গলার প্রথম ইংরাজ কুঠী স্থাপিত হওয়ার পরে আমরা কাশীমবাজারের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সেই সময়ে কাশীমবাজারে হুগলীর অধীনে একটি এজেন্সী বা বাণিজ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। যে ষ্টীফেন্স মিষ্টার ব্রিজম্যানের সহিত বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া হুগলী কুঠীর স্থাপনা করিয়াছিলেন, তিনি অবশেষে ঋণজালে জড়িত হইয়া ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজারে প্রাণত্যাগ করেন †। ১৬৫৮০খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাশীমবাজারে কুঠীস্থাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ বৎসরে মিষ্টার জন কেন ৪০ পাউণ্ড বেতনে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক ২০ পাউণ্ড বেতনে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ‡ হণ্টার ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই কাশীমবাজারে প্রথম ইংরাজ কুঠী স্থাপিত হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* Holwell's India Tracts.

† Wilson's Early Annals of the English in Bengal, Vol. I. P. 28.

‡ Wilson's Annals Vol 1.

মার্শম্যান সাহেবের মতে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজারে কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং মিষ্টার মার্শেল তাহার বন্দোবস্তের জন্ত নিযুক্ত হন। মার্শেল এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ও ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের কতকাংশ সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, এবং সম্ভবতঃ ইংরাজদিগের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে ব্যুৎপত্তি লাভে সক্ষম হন। * কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাশীমবাজার কুঠীর উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মার্শেল কথনও কাশীমবাজার কুঠীর বন্দোবস্তের জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না; তবে তিনি যে সেই সময়ে কাশীমবাজারে থাকিয়া দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই অবগত হওয়া যায়। † কাশীমবাজারে কুঠী স্থাপন করিয়া, ইংরাজেরা নানাপ্রকার দ্রব্যের বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেশম, তূলা, নানাপ্রকার রেশমী বস্ত্র, মসলিন ও গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্ত এসিয়া ও ইউরোপে কাশীমবাজারের নাম বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার নিকটস্থ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপিত হইলে বাণিজ্যবিষয়ে কাশীমবাজারের গৌরব দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হয়। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ভিন্‌সেণ্ট কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলার কুঠীসমূহে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের সুবন্দোবস্তের জন্ত ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার নিযুক্ত হন। কাশীমবাজার

* Marshman's Bengal, P. 59.

† Wilson's Annals Vol. I. P. 375.

কুঠীর গোলযোগনিবারণের জন্য ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মাষ্টারকে কাশীমবাজার আসিতে হয়। তৎকালে কাশীমবাজার রেশমের ব্যবসায়ের জন্য বাঙ্গলার মধ্যে ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রধান স্থান ও হুগলীর সমকক্ষ ছিল। এক ক্রোশ দীর্ঘ সহরের মধ্যে রাজপথ এরূপ সংকীর্ণ ছিল যে, স্থানে স্থানে দোকানের জন্য একখানি পাল্কীও যাতায়াত করিতে পারিত না। তৎকালে সহরের অধিকাংশ গৃহই কাঁচা ছিল। তাহার চারিপার্শ্বের জমী উর্ব্বরা হওয়ায়, অধিক পরিমাণে তুত গাছের চাষ হইত। ঐ সমস্ত গাছের পাতা পলু বা রেশমকীটের আহারে লাগিত। কাশীমবাজারের রেশম পীতবর্ণ হইলেও তাহার অধিবাসীরা কদলীত্বকের ক্ষার দ্বারা তাহাকে প্যালেষ্টাইনের রেশমের মত শ্বেতবর্ণ করিত।* ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলায় ধনপ্রয়োগের জন্য যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড বা ২৩ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড বা ১৪ লক্ষ টাকা কেবল কাশীমবাজারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।† সুতরাং বাঙ্গলার মধ্যে তৎকালে কাশীমবাজার কিরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম গিফোর্ড কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের ব্যবহারে, এবং ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে

* Wilson's Annals Vol. I. P. 55.

† Hunter's Statistical Account of Murshidabad P. 88.

কাশীমবাজারের ফৌজদারের উৎপীড়নে ইংরাজেরা বাঙ্গলার সুবেদারের বিরুদ্ধাচরণ করায়, বাদসাহ আরেঙ্গজেব ও নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তজ্জন্য ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁর আদেশে পাটনা, ঢাকা ও মালদহ কুঠীর সহিত কাশীমবাজারের কুঠীও সরকারকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, এবং ইংরাজেরাও বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত হন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ প্রদান করিলে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশীমবাজার কুঠীরও কার্য্য আরব্ধ হয়। এই সময়ে কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে ইংরাজদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হওয়ায় কাশীমবাজারের গৌরব হ্রাস হইতে থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহে ভীত হইয়া কাশীমবাজারের বণিকগণ মথসুসাবাদে বিদ্রোহিগণকে শান্ত করিয়া কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় জলদস্যুগণের উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া বাদসাহ আরেঙ্গজেব ইংরেজদিগের বাণিজ্যরোধের আদেশ দেন। তজ্জন্য ১৭০২ খৃষ্টাব্দে পাটনা, রাজমহল ও কাশীমবাজার কুঠীর কর্ম্মচারিবর্গ সমস্ত সম্পত্তিসহ বন্দী হইলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত কাশীমবাজার কুঠীর কার্য্য অপ্রচলিত থাকে। ইহার পর মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে দেওয়ান ও পরে নাজিমরূপে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিলে, ইংরাজেরা কাশীমবাজার কুঠীর পুনর্বন্দোবস্তের জন্য বহু বৎসর ব্যাপিয়া চেষ্টা করেন। সেই সময়ে মিষ্টার রবার্ট হেজেস্ কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপরে মিষ্টার ফীক্ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে

কাশীমবাজার কুঠীর পুনর্বন্দোবস্তের আদেশলাভ করেন। * ক্রমে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে ইংরাজদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। তজ্জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবেরা সময়ে সময়ে কাশীম-বাজার কুঠীর ইংরাজদিগকে দমন করার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্ ব্যতীত এসিয়া ও ভারত-বর্ষের নানা স্থানের ব্যবসায়িগণ কাশীমবাজারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে জৈনগণই সর্ব্বপ্রধান। ১৭৪২—৪৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসনসময়ে সার ফ্রান্সিস্ রসেল কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে হলওয়েল সাহেব কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়া একটী সতীদাহ দর্শন করিয়াছিলেন। † ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মিষ্টার আয়ার কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষতা করিতেন। নানাপ্রকার বিপ্লবের, বিশেষতঃ বর্গীর হাঙ্গামার জন্য ইংরাজদিগকে কাশীমবাজার কুঠী সুদৃঢ় করিতে হয়। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনের পর কাশীম-বাজার কুঠীর অধ্যক্ষেরা নবাবদরবারে ইংরাজদিগের রাজ-নৈতিক প্রতিনিধিস্বরূপে কার্য্য করিতেন। তৎকালে তাঁহারা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয়বিধ রেসিডেণ্ট নামেই অভিহিত হইতেন ও তাঁহাদের আবাসস্থানকে রেসিডেন্সী বলিত। সিরাজ-উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ইংরাজদিগের সহিত বিবাদারম্ভ হইলে, সর্ব্বপ্রথমে কাশীমবাজার কুঠীই তাঁহার সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেই সময়ে মিষ্টার ওয়াট্স কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ বা রেসিডেণ্ট ছিলেন, এবং ওয়ারেন্

* Wilson's Annals Vol. II.

† Beveridge's History of India Vol. II.

হেষ্টিংস তথায় একটী সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন। কাশীমবাজারের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বন্দী-অবস্থায় নবাবসমীপে নীত হইলে, কালিকাপুরের ওলন্দাজকুঠীর অধ্যক্ষ মিষ্টার ভিনেট প্রতিভূ হওয়ায় তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর পরিচয় হয়, এবং কালে হেষ্টিংসের অনুগ্রহে কান্তবাবু অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া, কাশীমবাজারে আপনার বৃহদায়তন বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত বিবাদের সময়, কাশীমবাজার কুঠীর কার্য্য মন্দ ভাবে পরিচালিত হইত। পলাশী যুদ্ধের পর পুনর্ব্বার তাহার কার্য্য সোৎসাহে আরব্ধ হয়। সেই সময় হইতে নবাব-দরবারে একজন স্বতন্ত্র ইংরাজ রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি মুর্শিদাবাদের মোরাদবাগে অবস্থিতি করিতেন। প্রথমে স্ক্রাফ্‌টন ও পরে ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ দরবারে রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ তদবধি কেবল বাণিজ্যিক রেসিডেণ্ট নামে অভিহিত হইতেন। উক্ত রেসিডেণ্টের জন্য ৫০,১৬০ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়। * ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নবাব মীর কাসেমের রাজত্বকালে মিষ্টার বাট্‌সন কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ও চেম্বার্স তাঁহার সহকারী ছিলেন। ঐ বৎসরে বাঙ্গলার ৪ লক্ষ পাউণ্ড ধনপ্রয়োগের মধ্যে কাশীমবাজার আড়ঙ্গের জন্য ৯০ হাজার পাউণ্ডের আবশ্যক হইয়াছিল। কলিকাতা কাউ-

* Hunter's Statistical Account.

ন্সিলের সভ্য মিষ্টার বোল্ট ১৭৬০ হইতে ৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীমবাজারে কুঠীয়াল অবস্থায় থাকিয়া ৯ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল রেনেল লিখিয়াছেন যে, মালদহ ও রাজমহলের ধ্বংসের পর কাশীমবাজার যথেষ্ট উন্নতি-লাভ করিয়াছে। এই স্থান বাঙ্গলার রেশম ও তূলার সাধারণ আড়ঙ্গ, এবং এইখান হইতেই এসিয়ার সর্ব্বত্র ঐ সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানী হইয়া থাকে। ইউরোপীয়গণ ইহার বাজারে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ৩৭৫০ হইতে ৫ হাজার মণ ওজনের রেশম ক্রয় করিয়া থাকেন। * কাশীমবাজারের বানকের মূল্য এককালে ২০ লক্ষ টাকা অনুমিত হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে জোজেফ বরডিউ কাশীমবাজার কুঠীর ফ্যাক্টর বা প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাণিজ্য-বিষয়ের ন্যায় স্বাস্থ্যবিষয়েও কাশীমবাজার বাঙ্গলার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাপ্তেন হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন যে, কাশীমবাজারের চারি পার্শ্বের স্থান স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বর, এবং ইহার শ্রমশীল অধিবাসিগণ নানা প্রকার দ্রব্যের চাষ করিয়া থাকে। † পলাশীযুদ্ধের পর কলিকাতা ও চন্দননগরে যে সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পীড়িত হইয়া পড়ে, কিন্তু কাশীমবাজারের ২৫০ সৈন্যের মধ্যে ২৪০ জন সুস্থ শরীরে ছিল। ‡ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে কলিকাতা অপেক্ষা কাশীমবাজারে রাখা

* Hunter's Statistical Account.

† Hunter.

‡ Orme.

স্থির হয়, কারণ কলিকাতার স্বাস্থ্য ইউরোপীয়গণের উপযোগী ছিল না। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একজন কেরাণী বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে কাশীমবাজারে আসার জন্য কলিকাতা কাউন্সিলে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। * ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কাশীমবাজারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরব্ধ হয়। ইহার চারিদিক্ জঙ্গলময় হইয়া বন্য পশুর আশ্রয়-স্থান হইয়া উঠে. এবং কৃষিকার্য্যেরও অবনতি ঘটে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেন্সিয়া কাশীমবাজারসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহার লোকসংখ্যা কিছু বর্দ্ধিত হওয়ায় ও গবর্ণমেণ্ট এক একটী ব্যাঘ্র শিকারে দশ টাকা পারিতোষিক নির্দ্দেশ করায়, কাশীমবাজারের চতুর্দ্দিকে আর ব্যাঘ্র দেখা যায় না। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে একজন ভ্রমণকারী এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, কাশীম-বাজার, রেশম, রেশমীবস্ত্র ও গজদন্তের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলময় ও বন্য পশুর আশ্রয়স্থান। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার নিম্নস্থ ভাগীরথীর প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায়, † কাশীমবাজারের ব্যবসায়ের ধ্বংস ও স্বাস্থ্য

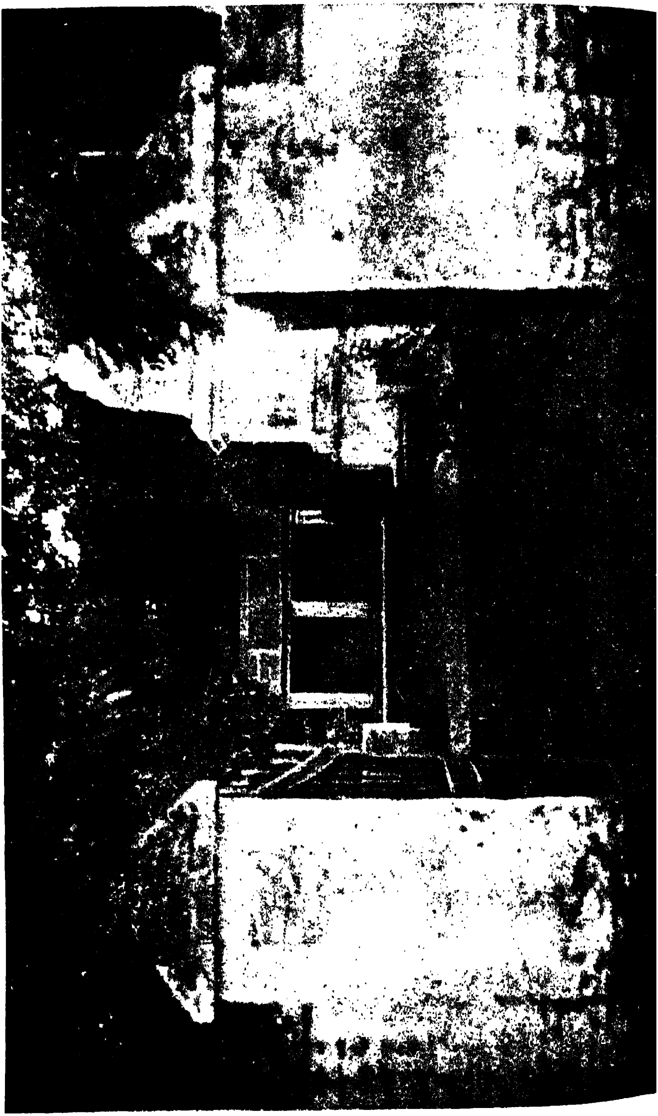
* Long.

† মুর্শিদাবাদ-লালবাগের দক্ষিণ কারবোলা মাঠের নিম্ন অর্থাৎ পূর্ব্বে যথায় কাশীমবাজারের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীর উত্তর মুখ ছিল, সেই স্থান হইতে সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গা অর্থাৎ ভাগীরথীর প্রাচীন দক্ষিণ মুখ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ভাগীরথী প্রবাহ কাটিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু হণ্টার প্রভৃতি সহসা ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়াছেন। কাশীমবাজারের নিম্নস্থ রুদ্ধ প্রবাহকে কাটিগঙ্গা বলে। ইহাকে কাটিগঙ্গা বলে কেন, জানা যায় না। কোন কালে তাহারও কতকাংশ কাটা হইয়া-ছিল, বলিয়া বোধ হয়।

বিনষ্ট হয়। পর বৎসর ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়া কাশীমবাজারের অধিবাসিবর্গকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এক বৎসরের মধ্যে মহামারীতে ইহার অধিকাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অবশিষ্ট লোকের মধ্যে অনেকে অন্যান্য স্থানে পলায়ন করে। এরূপ অবস্থায়ও কাশীমবাজারের রেশমকুঠীর কার্য্য অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। দেশীয় প্রবাদানুসারে ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকারাজির জন্য যে কাশীমবাজারের রাজপথে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না, এক্ষণে তাহার চারিদিক্ জঙ্গলময় ও ম্যালেরিয়ার আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছে। কাশীমবাজারের রাজবংশের ও রাজা আশুতোষনাথের বাস না থাকিলে এতদিন তাহা ঘোরতর জঙ্গলে পরিণত হইত।

কাশীমবাজারের প্রাচীন চিহ্ন।

কাশীমবাজারের প্রাচীন চিহ্নের মধ্যে এক্ষণেও কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ইংরাজ রেসিডেন্সীর ভগ্নাবশেষ, তৎসংলগ্ন সমাধিস্থান, ও বানকেরও দুই একটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটী প্রাচীন শিবমন্দির ও জৈনদিগের একটী প্রাচীন মন্দির তাহার পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরাজ রেসিডেন্সী ভাগীরথীর তীরেই অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার নিম্নস্থ ভাগীরথীর প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া রেসিডেন্সী হইতে কিছু দূরে অপসৃত হইয়াছে। এই রেসিডেন্সীর স্থান প্রথমে লায়াল কোম্পানী পরে কাশীমবাজারের রাজবংশ ক্রয় করিয়া তাহাকে একটী বাগানে পরিণত করিয়াছেন। উহাকে এক্ষণে হাতার বাগান কহে। রেসিডেন্সীর বিশেষ কোন



চিহ্ন নাই, কেবল উত্তর দিকের প্রাচীরের কিছু ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, কাশীমবাজারের মহারাজা কর্তৃক তাহা সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। রেসিডেন্সীর সময়ের এক বৃহৎ বটবৃক্ষ সংলগ্ন একটী মসজীদের জীর্ণাবশেষও দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে রেসিডেন্সীর বিবরণসহ ভগ্নাবশেষের চিত্র প্রদর্শিত হইবে বলিয়া এস্থলে তাহার বিশেষরূপ উল্লেখ পরিত্যক্ত হইল। রেসিডেন্সীসংলগ্ন সমাধি-স্থানটী গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকায় এক্ষণে সুসংস্কৃত অবস্থায় সুরক্ষিত আছে। সমাধি স্থানে ১৮টী সমাধি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ৭টীর উপরে স্তম্ভ বিদ্যমান। এই সমস্ত সমাধির মধ্যে একটীতে ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী ও তাঁহার শিশু কন্যা এলিজাবেথ সমাহিত। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই মেরীর মৃত্যু হয়। * এই সমাধিটী সমাধি-স্থানের বর্ত্তমান সমাধিগুলির মধ্যে প্রাচীন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা

* Revenue Surveyer Captain Gastreli ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত "সমাধির প্রস্তরফলকের উপর খোদিত লিপির বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন— To the Memory of Mrs. Warren Hastings and her daughter Elizabeth. She died the 11th July, 1759. In the 2—year of her age. This Monument was erected by her husband, Warren Hastings Esq. In due regard to Her Memory. গ্যাষ্ট্রেল "2"এর পর আর কোন অঙ্ক দেখিতে পান নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত হওয়ার পর সমাধি-স্তম্ভের উপর এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—In Memory of Mrs. Mary Hastings and her daughter Elizabeth, who died 11th July, 1759 in the 2—year of her age. This monument was erected by her husband Warren Hastings Esq. In due regard to Her Memory. Restored by Government of Bengal 1863.

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার একবার সংস্কার হয়। বর্ত্তমান সমাধির ছাদ প্রস্তর নির্ম্মিত দুইখানি চালের সমাবেশ। প্রবেশদ্বারের সংলগ্ন পথের অপর পার্শ্বেই সমাধিটী অবস্থিত। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মেজর এডওয়ার্ড ক্লার্কের পত্নী এলিজা এই থানে সমাহিত হন। এলিজা এডমিরাল ওয়াট্‌সনের সার্জন টীচ্‌ফীল্ডের এডওয়ার্ড আইভ্‌সের কোন আত্মীয়া ছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মৃত ডেভিড্ ও মেরী আনষ্ট্রথারের শিশু পুত্র আলেকজাণ্ডার ডইলীর সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডেভিড আনষ্ট্রাথার মুর্শিদাবাদের নিকট একটী বিস্তৃত প্রান্তরে ফেলিসিটি হল বা সুখনিকেতন নামে একটী রম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। * ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে মৃত লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জন ম্যাটকের পত্নী সারা ম্যাটকের সমাধি এই থানেই অবস্থিত। সারা ২৭ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী জন হ্যাম্‌ডেনের পৌত্রী বা দৌহিত্রী বলিয়া সমাধি-ফলকে উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্ভবযোগ্য নহে। † ১৭৯০

মেরী হেষ্টিংস কাপ্তেন ডিউগ্যাল্ড ক্যাম্বেলের বিধবা পত্নী। ক্যাম্বেল ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বজবজে গুলির আঘাতে নিহত হন. পরে মেরীর সহিত হেষ্টিংসের বিবাহ হয়। এলিজাবেথ ১৯ দিন মাত্র জীবিত ছিল।

* ১৮০৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত Edward Orme এর Views in India নামক গ্রন্থে এই Felicity Hall এর চিত্র আছে।

† ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী জন হ্যামডেনের নাম ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি সুবিখ্যাত ক্রমওয়েলের পিতৃস্বসৃপুত্র। ইংলণ্ডাধিপ প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে জাহাজীয় কর (ship-money) দানে অস্বীকৃত হইয়া তিনি পরে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, ও ১৬৪৩ খৃঃ অব্দে যুদ্ধে নিহত হন। সুতরাং তাহার ১১৮ বৎসর পরে তাঁহার পৌত্রী বা দৌহিত্রীর (grand daughter) জন্ম হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। সুতরাং সারা তাঁহার প্রপৌত্রী বা প্রদৌহিত্রী হইতে পারেন।

খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কোম্পানীর ফ্যাক্টর বা প্রতিনিধি জোফেফ্ বরডিউ এইখানে সমাহিত হন। এই সমাধিস্থানে মিষ্টার লায়ন প্রেজার নামে একজন হীরক ব্যবসায়ী ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীল ও ঔষধাদির পরীক্ষকের সমাধি দৃষ্ট হয়। প্রেজার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কাশীমবাজারের কুঠীতে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার সমাধিই শেষ সমাধি। রেসিডেন্সী বিক্রয়ের সময় দুইখানি সমাধি-ফলক এখান হইতে বহরমপুরের বাবুলবোনার কুঠীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি মালদহের অধ্যক্ষ ও পরে কলিকাতা কাউন্সিলের মেম্বর জর্জ গ্রের স্ত্রীর ও দ্বিতীয়খানি মেরী চার্লস্ এডাম্সের ও তাঁহার বালক বালিকাগণের সমাধি-ফলক। গ্রের পত্নী ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ও এডাম্সের পত্নী ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সমাহিত হন। এই দুইটী সমাধি রেসিডেন্সীসংলগ্ন সমস্ত সমাধির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইতেছে। প্রবেশ-দ্বার হইতে হেষ্টিংসপত্নীর সমাধি পর্য্যন্ত যে পথটী গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ। প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মালীদিগের ঘর। সমাধি-স্থানের সম্মুখেই কাটিগঙ্গায় যাইবারপথ, হাতার বাগান ও সমাধি-স্থানকে এই পথটী বিভক্ত করিতেছে। এই পথের ধারে ও সমাধি স্থানের নিকটেই একটী প্রাচীন কূপ দৃষ্ট হয়। যে স্থানে কোম্পানীর বানক বা রেশমকুঠী ছিল, তাহাও কাশীমবাজার রাজবংশ কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া একটী বাগানে পরিণত হইয়াছে, তাহার নাম বানকের বাগান। বাগানে প্রাচীন কালের দুইটী কূপের ও প্রবেশ-দ্বারের বাম দিকে দুইটী প্রাচীন প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান আছে।

বানকের বাগান কাশীমবাজার ডাকঘরের পশ্চিমে অবস্থিত, ও রাজবাটীর সন্নিহিত। কাশীমবাজারে দুই চারিটী প্রাচীন শিবমন্দির ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিতেছে। ভাগীরথীর প্রাচীন গর্ভের বা কাটিগঙ্গার তীরে দুই একটী প্রাচীন ঘাটের চিহ্নও দেখা যায়। তন্মধ্যে কাশীমবাজার ও তাহার পরপারস্থ সন্ন্যাসীডাঙ্গার পারঘাটের পূর্ব্বে পাথুরিয়া ঘাট নামে একটী প্রাচীন ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। পাথুরিয়া ঘাট প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল। তাহার উপরিস্থ ভূভাগে এক্ষণে অনেকগুলি শিবমন্দির ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে। কোন কোন মন্দিরে যদিও শিবলিঙ্গের চিহ্ন মাত্রও নাই, কিন্তু কাশীমবাজারের স্থানে স্থানে বৃক্ষতলেও শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাথুরিয়া ঘাটের পশ্চিমসংলগ্ন একটী ঘাট ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না, তাহাকে লোকে সতীঘাট বলিত। এই ঘাটে কোন সতী স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। উক্ত সতী হলওয়েলের বর্ণিত সতী কি না তাহা বলা যায় না। * কাশীমবাজারের রাজবাটীর বর্ত্তমান ঘাটের দক্ষিণ একটী প্রাচীন ঘাটের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে তাহাকে নিমতলার ঘাট কহে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণের ন্যায় অনেক দেশীয় ব্যবসায়ীও কাশীমবাজারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে জৈনগণই সর্ব্বপ্রধান। জৈনগণ কাশীমবাজারের যে স্থানে বাস করিতেন তাহাকে মহাজনটুলী বলিত। জৈনগণেরও

* হলওয়েলের বর্ণিত সতীদাহের বৃত্তান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইবে।



কোন কোন চিহ্ন অদ্যাপি কাশীমবাজারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটী মুর্শিদাবাদের জৈনগণের যত্নে অদ্যাপি সুসংস্কৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। নেমিনাথ জৈনগণের চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের অন্যতম। এই মন্দিরে শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের সমস্ত তীর্থঙ্করের মূর্ত্তিই আছে, তবে নেমিনাথ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া মন্দিরটী তাঁহার নামেই প্রসিদ্ধ। নেমিনাথের মূর্ত্তি প্রস্তর-নির্ম্মিত, মন্দিরটী পশ্চিমমুখে অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণটীও পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের পশ্চাতে একটী সুড়ঙ্গ আছে, মন্দিরে অনেকগুলি দর্শনীয় পদার্থ আছে। শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের দেবতা ব্যতীত দিগম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের দেবতাদিগের মূর্ত্তিও মন্দিরে দৃষ্ট হয়। ইহার নিকটে মধুগেড়ে নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। এককালে তাহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত জৈন মহাজনগণের বাস ছিল। * মন্দিরের সম্মুখে জগৎশেঠদিগের একটী প্রাচীন বাটীতে কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর অন্যতম ভ্রাতার বংশধর বাস করিতেছেন। জৈন মহাজনগণ কাশীমবাজার মহাজনটুলী হইতে জগৎশেঠের আবাসস্থলের নিকট মহিমাপুরের মহাজনটুলীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে বালুচর ও আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আপনাদের আবাস স্থান স্থাপন করেন। ১৭৬৩ শকে বা ১৮১১ খৃঃ অব্দে কাশীমবাজারের ব্যাসপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতৃদেব রামকেশবের স্থাপিত একটী সুন্দর শিব

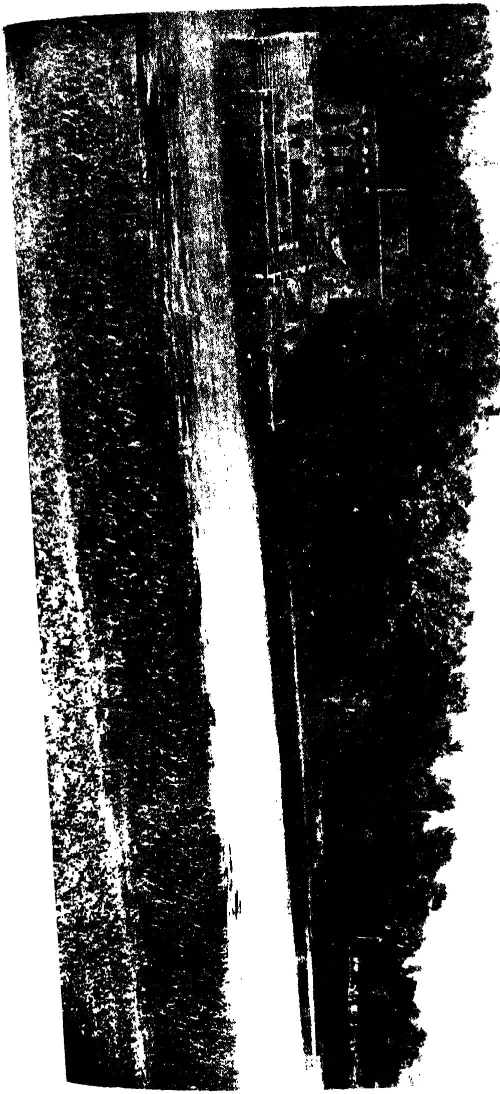
* নেমিনাথের মন্দির ও মধুগেড়ের বিস্তৃত বিবরণ "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী"র কাশীমবাজার প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মন্দির কাশীমবাজারের একটি দর্শনীয় পদার্থ। কাশীমবাজার হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে কৃষ্ণেন্দ্র হোতার স্থাপিত বিষ্ণুপুরের কালীমন্দিরে পূজোপলক্ষে নানাবিধ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। উক্ত মন্দির পলাশীর যুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ দুই একটী সামান্য প্রাচীন চিহ্ন ও কাশীমবাজার রাজবংশের সুবিস্তৃত ভবন ব্যতীত অরণ্যসম কাশীমবাজারে প্রাচীন গৌরবের কোনই নিদর্শন দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত রাজা আশুতোষনাথের বাটীও কাশীমবাজারে দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সৈয়দাবাদ-খেতাখাঁর বাজারে আর্ম্মেণীয়গণ।

ইউরোপীয়গণের ন্যায় এসিয়ার কোন কোন স্থানের বণিক্‌গণও ভারতে বাণিজ্যার্থে সমাগত হইয়া ইউরোপীয়গণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আর্ম্মেণীয়গণই সর্ব্বপ্রধান। কেবল বাণিজ্যবিষয়ে নহে, বাঙ্গলায় অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিয়া আর্ম্মেণীয়গণ এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেণীয়গণ দিনেমারদিগের সহিত মিলিত হইয়া কিছু কাল একযোগে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেণীয়গণ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হন। তাঁহারা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হওয়ায় একটী গির্জা নির্ম্মাণের ইচ্ছায় বাদসাহ আরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া সৈয়দাবাদে এক খণ্ড ভূমির সনন্দ লাভ করেন, এবং তথায় একটী ক্ষুদ্র গির্জাও নির্ম্মিত হয়।* উক্ত গির্জা এতদ্দেশের প্রথম

* Calcutta Review, January, 1894.



আর্ম্মেণীয় গির্জা। তাঁহারা সৈয়দাবাদের যে স্থানে বাস করিতেন সাধারণ লোকে তাহাকে শ্বেতাখাঁর বাজার বলিত। এসিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে আর্ম্মেণীয়গণ অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ হওয়ায়, তাহারা শ্বেতা খাঁ নামে অভিহিত হইতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে আর্ম্মেণীয়গণের বাণিজ্যকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তাহার চতুঃপার্শ্বে ইউরোপীয় বণিকৃগণ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবস্থিতি করিলেও তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হন নাই। ক্রমে মুর্শিদাবাদের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বাণিজ্যের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর বৎসর ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেণীয়গণ একটী বৃহৎ গির্জা নির্ম্মাণ করেন। মিষ্টার পোগোজ নামে একজন ধনী আর্ম্মেণীয় এই গির্জানির্ম্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। খোজা মাইনাসের তত্ত্বাবধানে গির্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। * গির্জানির্ম্মাণে ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণীখননে ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই বৃহৎ গির্জা পূর্ব্বতন ক্ষুদ্র গির্জার পূর্ব্বসংলগ্ন ভূমিতে নির্ম্মিত হয়। সৈয়দাবাদে আর্ম্মেণীয় অধিবাসিগণের সংখ্যাবৃদ্ধিই এই বৃহৎ গির্জানির্ম্মাণের কারণ। ক্রমে ক্ষুদ্র গির্জাটী ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের নির্ম্মিত গির্জা ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণী আজিও আর্ম্মেণীয়গণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

* Gastrell লিখিয়াছেন, ১৭৫৮ সালের গির্জা পিটার আরাটুন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে।

আর্ম্মেণীয় গির্জার বর্ত্তমান অবস্থা।

শ্বেতাখাঁর বাজারের বৃহত্তর গির্জা মধ্যে ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ার উপক্রম করিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল সুসংস্কৃত হইয়া যত্নে পরিরক্ষিত হইতেছে। কলিকাতাবাসী আর্ম্মেণীয়গণ ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন, ও ইহার তত্ত্বাবধানে একজন আর্ম্মেণীয়কেও নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন গ্যাষ্ট্রেল ইহার সুরক্ষিত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তখন একজন আর্ম্মেণীয় পুরোহিত গির্জায় বাস করিতেন, তথায় তাঁহার স্বতন্ত্র আবাস স্থানও ছিল এবং প্রতি পঞ্চম বর্ষে পুরোহিতের পরিবর্ত্তন হইত। উক্ত পুরোহিতগণ আর্ম্মেণীয়া হইতে আগমন করিতেন। * কিন্তু মধ্যে ইহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকে অচিরে একটী ভগ্নস্তূপে পরিণত হইতে হইত। যাহা হউক, কলিকাতার আর্ম্মেণীয়গণের যত্নে এক্ষণে গির্জাটী সুন্দররূপে সংস্কৃত হইয়াছে। গির্জাটী উচ্চে সার্দ্ধ ২৮, দৈর্ঘ্যে ৭০ ও প্রস্থে ৩৬ ফুট। গির্জার দালানের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে বিস্তৃত বারাণ্ডা ও উত্তরে একটী চাতাল; গির্জার দালানের প্রবেশদ্বার দক্ষিণ মুখে, কিন্তু গির্জা-বাটীর প্রবেশদ্বার উত্তর মুখে অবস্থিত। ঐ সমস্ত বারাণ্ডা, চাতাল ও তাহাদের নিম্নস্থ কোন কোন স্থান সমাধিতে পরিপূর্ণ, ঐ সকল সমাধির উপর প্রস্তরফলক সন্নিবেশিত আছে। তাহার অধিকাংশই আর্ম্মেণীয় ভাষায় লিখিত। দুই এক খানিতে ইংরাজী ভাষাও দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত সমাধির মধ্যে এস্, এম্, ভারডনের সমাধিটীই শেষ সমাধি। ভারডন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সমাহিত হন। তিনি গির্জার

* Gastrell's Statistical Account of Murshidabad.



তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। দালানের অভ্যন্তরে একটী বেদী আছে, তাহা মেরীর নামে উৎসর্গীকৃত। তথায় মেরীর একখানি সুন্দর চিত্রপট ছিল, এক্ষণে তাহা ছিন্ন অবস্থায় পতিত। গির্জার মাথায় ৪টী বৃহৎ ঘণ্টা ছিল, বহুদূর হইতে তাহাদের শব্দ শুনা যাইত, এক্ষণে আর ঘণ্টাগুলি দেখা যায় না। শুনা যায়, তাহাদের দুই একটী অপহৃত হয় এবং অবশিষ্টগুলি কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, গির্জা-বাটীর চতুর্দ্দিক আম্র কাঁটাল প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান গির্জারক্ষকের আবাস গৃহ। গির্জা-বাটীর প্রবেশদ্বারে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে। বাটীর উত্তরে একটী পথ, তাহার নীচে একটী বাঁধা ঘাটসংযুক্ত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী বকুল বৃক্ষের ছায়া বক্ষে করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। বহুদিনের প্রাচীন পুষ্করিণী বলিয়া তাহা দুই চারিটী কুম্ভীরের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে শ্রেণীবদ্ধ দেবদারু বৃক্ষ, এই পুষ্করিণী বিষ্ণুপুরের বিলের গর্ভ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বিষ্ণুপুরের বিলও এককালে ভাগীরথীর গর্ভ ছিল। বর্ত্তমান গির্জার পশ্চিমে প্রাচীন গির্জার স্থান। তথায় কয়েকটী সমাধি আছে বলিয়া তাহার ভূমিতে লাঙ্গল বা কোদালী প্রয়োগ নিষিদ্ধ। পুষ্করিণীর পশ্চিমে একটী প্রাচীন সেতু বিদ্যমান। তাহার কোন কোন স্থানের ইষ্টকের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সেই দিক্ দিয়া পূর্ব্বে কালিকাপুর যাওয়ার পথ ছিল। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিয়া এক্ষণে কালিকাপুরে যাইতে হয়, সেই পথে একটী নূতন সেতুও নির্ম্মিত হইয়াছে। চারি পার্শ্বে ছায়াবৃক্ষ-পরিশোভিত পুষ্করিণীর সম্মুখস্থ গির্জা সৈয়দাবাদের একটি দর্শনীয় পদার্থ।

সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গার ফরাসীগণ।

আর্ম্মেণীয়গণের পর ফরাসীদিগকে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বাণিজ্যার্থে আগত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাও সৈয়দাবাদে আপনাদিগের কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্ম্মেণীয়গণের আবাস স্থানের পশ্চিমে ফরাসীগণ অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের অবস্থিতি স্থানকে সাধারণ লোকে ফরাসডাঙ্গা বলিয়া থাকে। যদিও এক্ষণে সৈয়দাবাদে ফরাসীদিগের কোনই চিহ্ন নাই, তথাপি তাঁহাদের বসতিস্থান অদ্যাপি ফরাসডাঙ্গা বলিয়া অভিহিত হইতেছে। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে অবস্থান করার পর তাঁহারা সৈয়দাবাদে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। যে ডিউপ্লে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কিছু কাল সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতি করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে নবাব-দরবারের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, সৈয়দাবাদের ফরাসী কুঠী নবাবের সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, পরে ৫০ হাজার সিক্কা টাকা দিয়া ফরাসীগণ নিষ্কৃতি লাভ করেন। * নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে 'ল' সাহেব সৈয়দাবাদ ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। সিরাজের দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এবং সিরাজও অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কলিকাতা আক্রমণের পর হলওয়েল সাহেব যে সময়ে বন্দী-অবস্থায় মুর্শিদাবাদে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গায় তাঁহার নৌকা উপস্থিত হইলে 'ল' সাহেব আহার্য্য প্রভৃতি প্রদান

* Long's Records.

করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। * ইংরাজগণ কর্ত্তৃক চন্দননগর আক্রমণের পর অনেকগুলি ফরাসী তথা হইতে সৈয়দাবাদে আগমন করেন। ক্রমে বাণিজ্যবিষয়ে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইংরাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ফরাসীরা হীনবল হইয়া পড়েন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গবর্ণর জেনারাল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আদেশে মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল সৈয়দাবাদের ফরাসী কুঠী অধিকারের জন্য যত্নবান হন, এবং উক্ত কাউন্সিলের আদেশে বহরমপুরের ইংরাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ কর্ণেল জেম্‌স্‌ মর্গান ও তাঁহার সহকারী কাপ্তেন কিলপ্যাট্রিক ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গার ফরাসী কুঠী অধিকার করেন। সেই সময়ে মিষ্টার চিলি সৈয়দাবাদ কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। আরও কতিপয় ফরাসী তৎকালে সৈয়দাবাদে বাস করিতেন। তাহার পর হইতে সৈয়দাবাদে ফরাসীদিগের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইতে আরব্ধ হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত নদীতীরস্থ রাজপথনির্ম্মাণের জন্য ফরাসী কুঠীকে ভূমিসাৎ করা হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লং সাহেব ফরাসী কুঠীর ভগ্ন প্রাচীর ও পতাকা স্থাপনের একটী প্রাচীন স্তম্ভ দর্শন করিয়াছিলেন। † বর্ত্তমান সময়ে তাহার কোনই চিহ্ন নাই। প্রাচীন প্রাচীরের যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ বহুকাল ধরিয়া ভাগীরথীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এক্ষণে

* Holwell's India Tracts.

† Long's Banks of the Bhagirathi.

তাঁহার প্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসডাঙ্গায় এক্ষণে বহরমপুরের জলের কল স্থাপিত হইয়াছে।

বাণিজ্যে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইংরাজপ্রাধান্যের কারণ।

ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষে ও বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া কিরূপে ক্রমে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে অবস্থান ও প্রভুত্ব বিস্তার আরম্ভ করেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয়গণকে বাণিজ্যে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে পরাভূত করিয়া অবশেষে মুসলমান্‌গণের হস্ত হইতে বাঙ্গলার বা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। এই সমস্ত ব্যাপার সংসাধনের জন্য তাঁহারা বহুকাল হইতে বঙ্গদেশের একটী স্থানকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই বহুকালব্যাপিনী চেষ্টার শেষ ফলে তাঁহারা ভারতের ভাবী রাজধানী কলিকাতার অধিকার লাভ ও তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন। সুতরাং মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সহিত কলিকাতাস্থাপনের যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে। সেই জন্য কলিকাতাস্থাপনের ইতিহাস সাধারণের নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ ইংরাজেরা বাণিজ্যে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে কিরূপে অন্যান্য ইউরোপীয়গণকে বহুদূরে স্থাপন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া পরে কলিকাতাস্থাপনের বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে আমরা যে সমস্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ও বাঙ্গলায় বাণিজ্যবিষয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা অনেক প্রকার সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ও অধিপতিগণ ইংরাজ বণিক্‌গণের সুবিধার জন্য যেরূপ যত্ন লইতেন, অন্যান্য ইউরোপীয়গণের অধিপতিদিগকে সেরূপ ভাবে যত্ন লইতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ফ্রান্সাধিপের আজ্ঞায় অবশেষে ফরাসী কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও রাজা মোগল বাদসাহের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়া যাহাতে ভারতবর্ষে ইংরাজবণিক্‌গণের বাণিজ্যের সুবিধা হয়, তজ্জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে ইংরাজেরা মোগল দরবার হইতে ভারতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করেন। বঙ্গদেশে বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও অবশেষে সা সুজার নিকট হইতেও সেইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন। যদিও নবাব মীরজুম্লার সময় তাঁহারা বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পেস্কশ মাত্র প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি যে স্থানে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক প্রদান করিতেন, সেই স্থলে তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করায় তাঁহাদের বাণিজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। কোন কোন সময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণের চেষ্টা হইলেও তাঁহারা যাহাতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ স্থির রাখিতে পারেন, বরাবরই তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং পরিণামে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া বাণিজ্যবিষয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়-

দিগকে দূরে স্থাপন করিতে সক্ষম হন। এই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধার জন্য ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় ইংরাজদিগের যত অধিক পরিমাণে কুঠী বা বাণিজ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, অন্যান্য ইউরোপীয়গণের সেরূপ ঘটিয়া উঠে নাই, এবং তাহারই জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা ইংরাজদিগের অধিক সংখ্যক জাহাজ ইংলণ্ড ও ভারতে গতায়াত করিত। তন্নিমিত্ত ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া উঠে, ইউরোপের অন্যান্য স্থানের সহিত তাহার সেরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। সেই কারণে ইংলণ্ডাধিপগণের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি পতিত হইয়াছিল। ভারতের ও বাঙ্গলার নানা স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায়, ইংরাজেরা সেই সেই স্থানের জন্য সৈন্য রক্ষা করিতেও প্রবৃত্ত হন, এবং মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডাধিপও ইংরাজবণিক্‌গণের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সৈন্যসহ দুই এক জন সেনাপতিও প্রেরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত অনধিকারী ইংরাজ ইংলণ্ডাধিপের বিনা আদেশে ভারতে বা বাঙ্গলায় বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হইত, কোম্পানী তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। এইরূপে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য করার ভার আপনার হস্তে রাখিয়া ও বিনা শুল্কে ভারতে ও বাঙ্গলায় বাণিজ্যের আদেশ লাভ করিয়া ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌দিগকে বাণিজ্যবিষয়ে পরাভূত করিতে সক্ষম হন। বাণিজ্যবিষয়ে শক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা ভারতের ও বাঙ্গলার রাজনৈতিক ব্যাপারেও সংসৃষ্ট হইয়া পড়েন। ধীরে ধীরে এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার জ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইংরাজেরা ভারতের রাজনৈতিক

ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করেন। যদিও সেই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তথাপি মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতগণের সহিত অবিরত বিবাদে তিনি যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়েন ও মোগল কর্ম্মচারিগণের কার্য্যশৈথিল্যে মোগল-সাম্রাজ্য যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইতেছিল, তাহাতে আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যে ঘোর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, ইহা যে কোন ভবিষ্যদ্দর্শী রাজনৈতিক পুরুষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং আরঙ্গজেবের জীবিতকাল হইতে রাজনৈতিক ব্যাপারে সংসৃষ্ট হইতে পারিলে ভবিষ্যতে সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তৃত এবং ক্রমে ক্রমে ভারতে যে একটি স্বাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারিবে, ইহা ইংরাজ কোম্পানী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয়গণের বিশেষতঃ ফরাসীগণের দৃষ্টি যে সেদিকে আকৃষ্ট না হইয়াছিল, এমন নহে, কিন্তু ইরাজেরা বাণিজ্য-বিষয়ে শক্তিশালী হইয়া উঠায়, ও ইংলণ্ড হইতে রাজনৈতিক ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্য উৎসাহিত হওয়ায়, এবং তাঁহাদের স্বাভাবিক চতুরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অদম্য অধ্যবসায়ের জন্য অন্যান্য ইউরোপীয়গণ বাণিজ্যবিষয়ের ন্যায় রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এই জন্য ইংরাজ কোম্পানীর শক্তি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্ কোম্পানীর শক্তিকে অতিক্রম করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। বাঙ্গলার রাজনৈতিক ব্যাপারে সংসৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রথমতঃ তাঁহাদের একটী সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানের প্রয়োজন হওয়ায় কলিকাতার প্রতিষ্ঠা হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত

অকৃতকার্য্য হইয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

বাদসাহী নিশান ও বাঙ্গলার প্রথম ইংরাজ-গবর্ণর মিষ্টার হেজেস্‌।

যদিও ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ বহুদিন হইতে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথাপি প্রায় প্রত্যেক সুবেদারের নিকট হইতে তাঁহাদিগকে নূতন অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত, এবং তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকারও বহু অর্থ ব্যয় না করিলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। সায়েস্তা খাঁর প্রথম বারের সুবেদারী সময়ে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তাঁহার নিকট হইতে সাসুজার নিশান বা সনন্দ স্থির রাখার আদেশ লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সুবেদার ফেদাই খাঁ ও বাদসাহের দেওয়ান হাজী সুফী খাঁ তাহা অগ্রাহ্য করায়, ইংরাজ কোম্পানীকে অত্যন্ত গোলযোগে পড়িতে হয়। কিন্তু ফেদাই খাঁর মৃত্যুর পর বাদসাহের তৃতীয় পুত্র যুবরাজ আজিম বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিলে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ প্রতিনিধি মিষ্টার ভিন্সেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার নিশান লাভ করেন। এইরূপ প্রত্যেক সুবেদারের নিকট হইতে নূতন আদেশ লাভ করায় নানাপ্রকার অসুবিধা দেখিয়া কোম্পানী সম্রাট আরঙ্গজেবের দরবার হইতে বাঙ্গলায় বাণিজ্যের জন্য এক বাদসাহী নিশান পাওয়ার ইচ্ছায় নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত একজন প্রতিনিধিকে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাদসাহী নিশান লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং হুগলীতে সেই নিশান উপস্থিত হইলে তাঁহারা তোপধ্বনিতে আপনাদের

আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলেন। * কিন্তু সে নিশান-পত্রও ইংরাজ ও বাদসাহের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে গোলযোগের শান্তি করিতে পারে নাই। নিশান-পত্রের লিখন কিছু দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় আবার নূতন গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ইংরাজেরা নিশান-পত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছিলেন যে, সুরাটে কেবল ইংরাজদিগকে শুল্ক ও জিজিয়া করের † জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু অন্যত্র তাঁহারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। বাদসাহের কর্ম্মচারীরা, সকল স্থানেই শুল্ক ও জিজিয়া করের জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা দিতে হইবে, এই অর্থ করিয়া বাঙ্গলার ইংরাজদিগের সহিত গোলযোগ আরম্ভ করেন। সেই জন্য সায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয় বার বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াই ইংরাজদিগের নিকট হইতে জিজিয়া করের দাবী করিয়া বসেন। ‡ এই সময়ে বাঙ্গলায় বাণিজ্যকার্য্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষগণ বাঙ্গলাকে স্বতন্ত্র বাণিজ্যবিভাগ করার জন্য ইচ্ছুক হন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলার কুঠীসমূহ মান্দ্রাজের অধ্যক্ষের অধীন ছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা ইংরাজদিগের স্বতন্ত্র বাণিজ্যবিভাগ হয়, এবং মিষ্টার উইলিয়ম হেজেস্ ইহার প্রথম গবর্ণর বা স্বাধীন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া হুগলীতে আপনার আবাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য ২০জন ইউরোপীয় সৈন্য মান্দ্রাজ হইতে

* Stewart, P. 195.

† জিজিয়া = মাথা গুণিয়া করগ্রহণ।

‡ Wilson's Annals Vol. I.

বাঙ্গলায় প্রেরিত হয়, এবং ইহাই বাঙ্গলায় ইংরাজ কোম্পানীর সৈনিক বিভাগস্থাপনের সূচনা। * কিন্তু সেই সময়ে কোম্পানীর বাণিজ্যবিষয়ে নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ বাদসাহের নিশানের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া সুবেদার ও শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারী বালচন্দ্র ও তাঁহার অধীনস্থ হুগলীর তহশিলদার পরমেশ্বর দাস ইংরাজদিগের নিকট শুল্কের দাবী করিয়া তাঁহাদের সহিত গোলযোগ উপস্থিত করেন। এতদ্ভিন্ন সেই সময়ে কতকগুলি অনধিকারী ইংরাজ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষতি করিয়া তুলে। হেজেস্‌কে এই সমস্ত গোলযোগনিবৃত্তির জন্য ঢাকায় নবাব সায়েস্তা খাঁর দরবারে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি অনধিকারী ইংরজেদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা, মোগল কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার নিবারণ ও ইংরাজদিগের প্রতি শুল্ক বা কর আদায়ের নিমিত্ত উৎপীড়ন না করার জন্য সুবেদারের নিকট আবেদন করেন। অন্ততঃ বাদসাহের নিকট তাঁহাদের পুনরাবেদনের নিমিত্ত সাত মাস সময়ের জন্য তিনি ইংরাজদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে নবাবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। † সায়েস্তা খাঁ মৌখিক যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে হেজেসের এইরূপ অনুমান হয় যে, নবাব ইংরাজদের আবেদন গ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। হেজেস্ বাঙ্গলার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া একটী সুরক্ষিত স্থানের অধিকারের জন্য ইচ্ছুক হন। তাঁহার ও অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মতে সাগর দ্বীপে

* Stewart.

† Wilson's Annals Vol, I.

একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া মোগলদিগের অত্যাচারে বাধা প্রদানের প্রস্তাব হয়। কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাহাতে অনেক অর্থব্যয় হওয়ার, ও মোগলেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইংরাজদিগকে দমন করার আশঙ্কায় সে প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিয়া, বোম্বাই অথবা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া তথা হইতে মোগলদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি প্রদান করেন। ইতিমধ্যে অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় হেজেস্ কোম্পানীর কার্য্য হইতে অপসৃত ও মিষ্টার বিয়ার্ড তাঁহার স্থানে অধ্যক্ষ মনোনীত হন, এবং বাঙ্গলা পুনর্ব্বার মান্দ্রাজের অধীন হয়। মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার গিফোর্ড বাঙ্গলায় আসিয়া আবার নূতন বন্দোবস্ত করেন।

মোগলদিগের সহিত বিবাদারম্ভ ও জব চার্ণক।

ইংরাজেরা যতই আপনাদের সর্ত্ত রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, নবাব সায়েস্তা খাঁ ততই তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। ক্রমে কতিপয় ঘটনায় ইংরাজ ও মোগল কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং সায়েস্তা খাঁও বুঝিতে পারিলেন যে,ইংরাজেরা মোগল-শাসন উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন। বাদসাহ আরঙ্গজেব কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত ও আরাকানে মৃত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সা সুজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া একটী যুবক বিহারে বিদ্রোহের সূচনা করিলে তথাকার শাসনকর্ত্তা সৈফ খাঁ কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়। সেই সময়ে গঙ্গারাম নামে বিহারে একজন জমীদার বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে বাদসাহের বিদ্রোহী পুত্র আকবরের পক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করায়, অনেকে তাহার সহিত যোগ দান করে। সৈফ খাঁ ইহাতে

ভীত হইয়া নগর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হন। বিদ্রোহীরা কিছু দিন পর্য্যন্ত নগর অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করে। এই সময়ে সেই কারারুদ্ধ সুজাপুত্র মুক্তিলাভ করিয়া বিদ্রোহিগণের সহিত যোগ দেয়। কিন্তু অল্প দিন পরে বারাণসী ও ঢাকা হইতে মোগল-সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই গোলযোগের সময় পাটনা হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে সিঙ্গির ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ পীকক সাহেবকে অবাধে সোরার বাণিজ্য পরিচালন করিতে দেখিয়া, বিদ্রোহীদিগের সহিত তাঁহার যোগ ছিল সন্দেহ করিয়া, নবাব সৈফ খাঁ তাঁহাদিগের সোরাক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা প্রদান ও পীককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তাহার পর অনেক কষ্টে পীকক মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। বিহারের ন্যায় বাঙ্গলায়ও কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রতি কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত করার জন্য নবাব সায়েস্তা খাঁ সচেষ্ট হন। তাঁহাদের মধ্যে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ জব চার্ণকের নামই উল্লেখযোগ্য। জব চার্ণক ১৬৫৫ বা ৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ৫৮ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজার কুঠীর সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। পরে তথা হইতে পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন, এবং ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার কাশীমবাজার কুঠীর প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ১৬৭৮।৭৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক হিন্দু বিধবাকে সহমরণ হইতে রক্ষা করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে চার্ণকের অনেকগুলি পুত্রকন্যা জন্মে। কাশীমবাজার অবস্থান কালে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের সহিত তাঁহার গোলযোগ উপস্থিত হয়। কাশীমবাজারের দেশীয় ব্যব-

সায়িগণ ও ইংরাজ কুঠীর সরবরাহকারগণ চার্ণক ও তাঁহার সহযোগিগণের বিরুদ্ধে অনেক টাকার দাবী করিলে, কাশীমবাজারের মোগল বিচারক তাঁহাদের নিকট হইতে অভিযোগকারিগণের ৪৩ হাজার টাকা প্রাপ্য স্থির করেন। নবাব সায়েস্তা খাঁও উক্ত বিচারের সমর্থন করিয়া অর্থপ্রদানে অসম্মত চার্ণককে ঢাকায় উপস্থিত হওয়ার জন্য পরওয়ানা পাঠাইয়া দেন। চার্ণক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কাশীমবাজার ও ঢাকার বিচারাদেশের কিছু পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নবাব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কাশীমবাজার কুঠীর সহিত অন্যান্য স্থানের চলাচল বন্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। সেই সময়ে বাঙ্গালার ইংরাজ অধ্যক্ষ বিয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইলে, যাহাতে চার্ণক হুগলীতে গমন করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার উপর প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করিয়া হুগলীতে উপস্থিত হন, এবং বাঙ্গলার ইংরাজ কোম্পানীর সমস্ত কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। *

আড্‌মিরাল নিকল্‌সনের হুগলীতে উপস্থিতি।

ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি মোগলের অসন্তোষের বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ অধ্যক্ষগণ নবাব সায়েস্তা খাঁ ও বাদসাহ আরঙ্গজেবের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বিবাদারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বাইএর অধ্যক্ষের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইল যে, মোগল জাহাজ দেখিলেই তাহা অধিকার

* Wilson's Annals. Vol. I.

করিতে হইবে। বঙ্গোপসাগরেও সৈন্যসহিত কয়েকখানি জাহাজ পাঠাইবারও প্রস্তাব হইল। ঐ সমস্ত জাহাজ প্রথমে বালেশ্বরে উপস্থিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করিবে, এবং ঢাকায় নবাবকে সংবাদ দিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিবে। আড্‌মিরাল নিকল্‌সন ও ভাইস্‌-আড্‌মিরাল হ্যামন বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধ-জাহাজ সকলের পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জব চার্ণকও কোম্পানীর ইংরাজ, পর্টুগীজ ও দেশীয় সৈন্য লইয়া প্রস্তুত থাকিতে আদিষ্ট হন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নিকল্‌সনের জাহাজ ও অন্য আর একখানি জাহাজ বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু হ্যামনের জাহাজ সে সময়ে পঁহুছিতে পারে নাই। ঐ দুই খানি জাহাজে কতকগুলি কামান, কিঞ্চিন্ন্যূন চারি শত সৈন্য ও চার্ণকের নিকটও প্রায় চারি শত সৈন্য ছিল। এই আট শত সৈন্যের সাহায্যে ইংরাজ কোম্পানী বিপুল নবাব বাহিনীর সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। নবাবের আদেশে তিন সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী হুগলী বন্দর রক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ফৌজদার আবদুল গণি নদীর দিকে বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া ১১টী কামান স্থাপন করেন। এইরূপে উভয় পক্ষের সৈন্য সমবেত হইলে ক্রমে মোগল ও ইংরাজে বিবাদ বাধিয়া উঠে।

হুগলীর বিবাদ।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তিন জন ইংরাজ সৈন্য হুগলীর বাজারে উপস্থিত হইলে, কয়েক জন নবাব-সৈন্য তাহাদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করে, এবং ইংরাজ সৈন্যত্রয় যৎপরোনাস্তি অবমানিত ও আহত হইয়া,

অবশেষে বন্দী-অবস্থায় ফৌজদারের নিকট নীত হয়। নগরে এইরূপ প্রচার হয় যে, উক্ত তিন জন ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে দুই জন মৃতকল্প হইয়া রাজপথে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সম্বাদে ইংরাজদিগের কাপ্তেন লেস্‌লি এক দল সৈন্য লইয়া সেই আহত সৈনিক দুইটীর মৃত বা জীবিত দেহ আনয়নের জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু নবাব সৈন্যেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করে। মোগল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ ইংরাজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনায়, নগরমধ্যে অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের বুরুজ হইতে কামানসকল ইংরাজদিগের নৌকা ও জাহাজের প্রতি অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে ইংরাজকুঠীর চারিপার্শ্বের কুটীরসকল প্রজ্বলিত হইয়া কুঠীভবনকে অগ্নিশিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া তুলিল। * সেই সময়ে অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্য চন্দননগরে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের আগমনের পূর্ব্বে কাপ্তেন রিচার্ডসন্ মোগল বুরুজ আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইয়া পরাভূত হন। ইতিমধ্যে চন্দননগরস্থ ইংরাজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাদের নেতা কাপ্তেন আরবুথনট্ বুরুজ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া বসেন। ইংরাজদিগের জয়লাভের প্রারম্ভে ফৌজদার আবদুল গণি হুগলী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। নদীবক্ষ হইতে ইংরাজ সৈন্যের ঘন ঘন কামানবৃষ্টিতে হুগলী নগরে মহান্ উৎপাত সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে মোগল ও ইংরাজ উভয় পক্ষের

* ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, সেই সময়ে নদীবক্ষ হইতে নিকল্‌সনের সৈন্যেরা গোলাবৃষ্টি করায় তাহাতেই ইংরাজ কুঠীতে অগ্নিসংযোগ হয়।

যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হয়। ইংরাজ পক্ষ অপেক্ষা মোগল পক্ষের হতাহতের সংখ্যা কিছু অধিক। কিন্তু মোগলদিগের যেমন চারি পাঁচ শত গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ ইংরাজদিগের কুঠী অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাঁহাদের ৩ লক্ষ পাউণ্ড বা ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। * ফৌজদার আবদুল গণি আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন মনে করিয়া অবশেষে ওলন্দাজদিগের মধ্যস্থতায় ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সেই সন্ধির বলে ইংরাজেরা নবাবের সাহায্যে সোরা ও অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষিত অন্যান্য দ্রব্য জাহাজে তুলিবার আদেশ লাভ করেন, এবং নবাবের নিকট হইতে নূতন সনন্দ পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন।

ইংরাজগণের বাঙ্গলা পরিত্যাগ।

হুগলীর বিবাদে জয় লাভ করিয়াও ইংরাজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। হুগলীর দুঃসংবাদ নবাব সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে, তিনি পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশীমবাজারের ইংরাজ কুঠী অধিকারের আদেশ প্রদান করিয়া, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য হুগলী বন্দরে প্রেরণ করিলেন। গবর্ণর চার্ণক ও নবাবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আপনার সমস্ত দ্রব্য ও লোকজনসহ হুগলী পরিত্যাগ করিয়া তাহার কিছু দূরে নদীর পর পারে সুতানটি নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুতানটি ও তাহার সংলগ্ন কলিকাতা ক্রমে ইংরাজদিগের প্রধান স্থান হইয়া অবশেষে ভারতের রাজধানী হইয়া

* Stewart, P, 198.

উঠে। সুতানটিতে ১৬৮৬ খৃঃ অব্দের খৃষ্টম্যাস বা বড়দিন অতিবাহিত করিয়া চার্ণক নবাবের নিকট ইংরাজদিগের একটী দুর্গ ও টাঁকশাল নির্ম্মাণের ও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের প্রার্থনা করিয়া পাঠান। কিন্তু কোনরূপ আশাজনক উত্তর লাভ না করায়, অগত্যা তাঁহারা মোগলদিগের প্রতি উপদ্রব করিতে আরম্ভ করেন। আড্মিরাল নিকল্সন কতকগুলি সৈন্য লইয়া হিজলী দ্বীপ অধিকারে অগ্রসর হন। হিজলী হইতে তাঁহারা উলুবেড়িয়া ও অবশেষে পুনর্ব্বার সুতানটিতে আগমন করেন। মোগলসেনাপতি আবত্নল সমদ খাঁ ইংরাজদিগের প্রতি বিশেষ কোন রূপ অত্যাচার করেন নাই; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহে বাস করিয়া রোগগ্রস্ত হইবে। সেই জন্য হিজলী প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা পীড়িত ও অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সুতানটিতে পুনর্ব্বার আগমন করিতে বাধ্য হন। সুতানটিতে উপস্থিত হইলে, নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগকে সুতানটি পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসার জন্য আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু চার্ণক সুতানটিকে সুরক্ষিত ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রাপ্তির আশায় আয়ার ও ব্রাডিল্ নামে প্রতিনিধিদ্বয়কে ঢাকায় নবাবের নিকটে পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে মালাবার উপকূলেও মোগলদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষগণ ইংলণ্ড হইতে কাপ্তেন হীথ্কে সৈন্য ও জাহাজসহ বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। হীথ্ মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া অবশেষে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুতানটিতে উপস্থিত হন। সেই সময়ে সায়েস্তা

খাঁ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিলে বাহাদুর খাঁ তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তৎকালে আরাকানরাজের সহিত মোগলদিগের বিবাদ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনায়, বাহাদুর সাহ ইংরাজদিগকে মোগলের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে কাপ্তেন হীথ্ স্মুতানটির সমস্ত ইংরাজগণকে লইয়া চট্টগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তাঁহারা বালেশ্বরে উপদ্রব করিতে ত্রুটি করেন নাই। হীথ্ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া, আরাকানরাজকে ইংরাজদিগের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলে, রাজা তাহার কোন উত্তর প্রদান না করায়, হীথ্ বিরক্ত হইয়া গবর্ণর চার্ণক ও অন্যান্য সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিসহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। আয়ার ও ব্রাডিল্ বন্দী-স্বরূপে ঢাকায় অবস্থিতি করিতে থাকেন।

ইংরাজগণের পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় আগমন ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠা।

সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ইংরাজদিগের প্রতি বাদসাহের ক্রোধের শান্তি হওয়ায়, সম্রাটের আদেশক্রমে ইব্রাহিম খাঁ মান্দ্রাজ হইতে পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠান। তাহার পূর্ব্বে তিনি বন্দী ইংরাজ প্রতিনিধিদ্বয়কেও মুক্ত করিয়া দেন। চার্ণক নবাবের আহ্বানানুসারে বাঙ্গলায় আগমন করার পূর্ব্বে বাদসাহের নিকট হইতে ইংরাজদিগের বাঙ্গলায় বাণিজ্য করার সনন্দপ্রাপ্তির জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ পাওয়ার বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনায়, ইব্রাহিম

খাঁ ইংরাজদিগকে পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান, এবং বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া দিতেও প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৪ এ আগষ্ট চার্ণক ও তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারী ৩০ জন ইংরাজ সৈন্য সহ পুনর্ব্বার সুতানটি বা কলিকাতায় আগমন করেন, এবং সেই সময় হইতেই কলিকাতার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। পর বৎসর ১৬৯১ খৃঃ অব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে ইংরাজদিগকে সনন্দ আনাইয়া দেন। তদনুসারে ইংরাজেরা বার্ষিক ৩ হাজার টাকা মাত্র পেস্কশ্ প্রদান করিয়া বাঙ্গলায় বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করেন। ইংরাজেরা কলিকাতায় বাসস্থান স্থাপনের পূর্ব্বে তাহা একটী সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল।*

* কলিকাতার নামোৎপত্তি লইয়া নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। একটী প্রবাদ এই যে, কোন ঘাসিয়াড়াকে জনৈক সাহেব ঐ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায়, সে নিজের ঘাস কবে কাটা হইয়াছে, তাহাই সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন মনে করিয়া, 'কাল কাটা,' অর্থাৎ কল্য কাটিয়াছি, বলে। তাহা হইতে সাহেব উক্ত স্থানের নাম 'কালকাটা' বলিয়া প্রচার করেন। ঘাস কাটার স্থলে একটী গাছ কাটারও কথা শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে এখানে কোল জাতির বাস থাকায়, এবং তাহাদের কুটীরশ্রেণীকে খাতা বলায় প্রথমে ইহার নাম 'কোলখাতা,' পরে কলিকাতা হয়। কৈবর্ত্ত জাতির এক শ্রেণীর নাম কোলে, তাহা হইতেও কোলেকাতা হইয়াছে বলিয়া কাহারও কাহারও মত। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় কোল শব্দে শূকর বুঝায়। পূর্ব্বে এখানকার বনজঙ্গলে শূকর থাকিত বলিয়া ইহার নাম 'কোলকাতা' হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। ইহার নিকটস্থ বরাহনগরে ঐ সমস্ত শূকরের ব্যবসায় হইত বলিয়া তাঁহাদের মত। লং সাহেব মার্হাট্টা খাদ বা খাল কাটা হইতে ক্যালকাটা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রচলিত মত এই যে, কলিকাতার অধিষ্ঠাত্রীদেবী এক্ষণে আদিগঙ্গা বা সাহেবদিগের মতে টালীর নালার তীরস্থ

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে কলিকাতার উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি বিপ্রদাসের লিখিত মনসার ভাসানে চিৎপুর, কলিকাতা, ও কালীঘাটের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। * তদ্ব্যতীত গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ শিবপুরের সন্নিহিত বেতড়েরও উল্লেখ দেখা যায়। এই বেতড় পর্টুগীজগণের

কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবীর নামানুসারে কলিকাতার নামোৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ "কিলকিলা" নাম হইতে কলকলা পরে কলিকাতা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণে কৈলকিলা নামের উল্লেখ দেখা যায়। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবিরাম প্রণীত দিগ্বিজয়প্রকাশে কিলকিলা প্রদেশ ও গ্রামের উল্লেখ আছে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার রচিত একখানি পদাবলীতে কলিকাতার স্থলে কিলকিলা লিখিয়াছেন। ওলন্দাজ ভৌগলিকগণ কলিকাতাকে কলকলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ কলিকাতার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত আছে। কিন্তু কিরূপে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে,তাহা নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম। এইরূপ গোবিন্দপুর ও সুতানটি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতার কাল মেয়র গোবিন্দরাম মিত্রের নামানুসারে গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গোবিন্দরাম খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দপুরের উল্লেখ দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে সপ্তগ্রাম হইতে শেঠেরা এইখানে আসিয়া বাস করায়, তাঁহাদের আনীত গোবিন্দজী বিগ্রহের নামানুসারে গোবিন্দপুরের নাম হইয়াছে। দিগ্বিজয়প্রকাশের মতে গোবিন্দশরণ দত্ত নামে কোন এক ব্যক্তি কালিকার আদেশে এখানে বাস করায় তাঁহার নামানুসারে গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গোবিন্দশরণ তোড়লমল্লের সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়া থাকেন। সুতানটির নামোৎপত্তির কারণ এই যে, পূর্ব্বে তন্তুবায়েরা এখানে সুতার নুটি বা লুটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত।

* Bipradas by Pandit Haraprasad Sastri in the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1892.

সময় বাণিজ্যবিষয়ে একটী প্রধান স্থান ছিল। * ইহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে আইন আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থে কলিকাতা নামে একটী পরগণা দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও কলিকাতা ও কালী ঘাটের নাম দেখা যায়। † এতদ্ভিন্ন দিগ্বিজয়প্রকাশ ও ভবিষ্য পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে। গোবিন্দপুর কলিকাতার দক্ষিণ ও সুতানটি তাহার উত্তরসংলগ্ন। চার্ণক ইহাদের সুন্দর অবস্থান দেখিয়া তাহাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া বাঙ্গলার মধ্যে ইংরাজ কোম্পানীর প্রধান স্থান করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার বহুকালব্যাপিনী চেষ্টা এতদিনে ফলবতী হইল। সুতানটিতে অবস্থান করিয়া ক্রমে তাঁহারা কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত অধিকারের চেষ্টা ও একটী দুর্গ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করেন। কালে তাঁহারা সে বিষয়েও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। সুতা-নটি বা কলিকাতায় ইংরাজেরা বাস করিলে, দেশীয় শেঠ, বসাক, এবং বিদেশীয় আর্ম্মেণীয় প্রভৃতি বণিক্‌গণ তথায় আগমন করেন ও ক্রমে তাহার প্রাধান্য বাড়াইয়া তুলেন। এইরূপে দিন দিন কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে জব চার্ণকের মৃত্যু হইলে, মিষ্টার এলিস্ তাঁহার পদে কলিকাতার

* বেতড় এক্ষণে গঙ্গাতীর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া কেহ কেহ বেতড়ের কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে গঙ্গার প্রবাহ কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা কে বলিতে পারে?

† কোন কোন চণ্ডীর পুঁথিতে কলিকাতা ও কালীঘাটের উল্লেখ না থাকায় অনেকে কবিকঙ্কণের লিখিত কলিকাতা ও কালীঘাটের কথায় সন্দিহান হইয়া থাকেন।

গবর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু তখনও বাঙ্গালা মান্দ্রাজের অধীন ছিল। সেই বৎসরে বাদসাহ ইংরাজদিগের উপর পুনর্ব্বার অসন্তুষ্ট হওয়ায়, ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বাণিজ্যের নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হয়। কিন্তু নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে ও চেষ্টায় ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গলায় সর্ব্ব বিষয়ে অধিকারচ্যুত হন নাই। ইহার পরই বঙ্গরাজ্যে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজেরা কলিকাতায় দুর্গনির্ম্মাণের অধিকার লাভ করেন। সেই বিপ্লবের সহিত মুর্শিদাবাদেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমরা তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিদ্রোহ।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার শাসন ভার গ্রহণ করিয়া যদিও শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সামরিক ব্যাপারে তাদৃশ পারদর্শী না হওয়ায়, তাঁহার রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা আরব্ধ হয়। অবশেষে হিজরী ১১০৭ বা ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে অশান্তিময় করিয়া তুলে। বর্দ্ধমান প্রদেশের চেতোয়া ও বর্দ্দানামক গ্রামদ্বয়ের জমীদার সভা সিংহ কর্ত্তৃক এই বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায় ঐশ্বর্য্যে ও ক্ষমতায় পশ্চিম বঙ্গে অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। কোন কারণে সভা সিংহ রাজা কৃষ্ণরামের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। রাজার প্রভুত্ববিস্তারেই হউক, অথবা তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়াই হউক, সভা সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ আরম্ভ করে। কিন্তু একাকী রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী না হইয়া উড়িষ্যার আফগানগণের জনৈক সর্দ্দার রহিম খাঁকে তাহার

সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠায়। ওসমানের পতনের পর হইতে আফগানগণের দর্প চূর্ণ হইলেও, তাহারা দুই চারি জন সর্দ্দারের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গরাজ্যে উপদ্রব করিতে ত্রুটি করিত না। রহিম খাঁ সেই সমস্ত দলপতিগণের অন্যতম ছিল। সভা সিংহের আহ্বানে রহিম খাঁ উপস্থিত হইলে উভয়ে মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণে অগ্রসর হয়। রাজা কৃষ্ণরামের সহিত তাহাদের একটী সামান্য যুদ্ধও ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণরাম রায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। রাজার পরিবারবর্গ ও সমস্ত সম্পত্তি বিপক্ষগণের হস্তগত হয়। কেবল রাজপুত্র জগৎরাম কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া প্রথমে কৃষ্ণ-নগরাধিপ রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রয়ে, * পরে তথা হইতে রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরাভিমুখে পলায়ন করেন। সভা সিংহ ও রহিম খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও অত্যাচার আরম্ভ করে, ও ক্রমে রাজবিদ্রোহী হইয়া আপনা-দিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়।

* ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিতে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণরাম রায় স্বীয় পুত্র জগৎরাম রায়কে স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া স্ত্রীলোকদিগের আরোহণোপযোগী যানে কৃষ্ণনগরাধিপের নিকট পাঠাইয়া দেন।

"তদানীমেব কৃষ্ণরামরায়েন পরবলমায়াতীতি বিজ্ঞাতং স্বপরিবারস্য পলায়নাবসরকালোনাস্তি যুদ্ধসামগ্রীচ পূর্ব্বং ন কৃতা, ক উপায়ঃ, স্বপরিবারস্য নাশ উপস্থিত ইতি চিন্তয়ন্ স্বপুত্রং জগদ্রামনামানং স্ত্রীবেশধারিণং কৃত্বা স্ত্রীনামারোহণযোগ্যযানেন পরবলৈরনুপলক্ষিতং রামকৃষ্ণরায়স্য সন্নিধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেষয়ামাস।" রামকৃষ্ণরায় জগৎরামকে তাঁহাদেব মাটিয়ারির বাটীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে জগৎরাম ঢাকায় গমন করেন।

জগৎরাম রায় কৃষ্ণনগর হইতে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে বিদ্রোহিগণের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই। পরে যখন বিদ্রোহিগণের অত্যাচার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে আরব্ধ হয়, তখন তিনি তাহাদের দমনের জন্য যশোহরের ফৌজদার * নুর উল্লা খাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করেন। নুর উল্লা খাঁ অনেক দিন ব্যাপিয়া যশোহরে ফৌজদারী করিয়াছিলেন। † তাঁহার দেওয়ান রামভদ্র

বিদ্রোহ দমনে নুর উল্লা খাঁ।

* তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, নুর উল্লা খাঁ যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও হিজলীর ফৌজদার ছিলেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহাকে কেবল যশোহরের ফৌজদার বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যশোহরেরই ফৌজদার ছিলেন।

† নুর উল্লা খাঁ কপোতাক্ষ নদের তীরবর্ত্তী মির্জানগরে অবস্থিতি করিতেন। তথায় অদ্যাপি তাঁহার বাসভবনের চিহ্ন বিদ্যমান আছে, লোকে তাহাকে নবাববাটী কহিয়া থাকে। নুর উল্লা খাঁর নাম হইতে নুরনগর পরগণার সৃষ্টি হয় বলিয়া কথিত হয়। উক্ত নুরনগরে অদ্যাপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর হইতে যশোহর ফৌজদারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফৌজদারগণের সকলে উক্ত যশোহরে বাস করিতেন না। তাঁহারা ফৌজদারীর জন্য আপনাদিগের সুবিধামত স্থান পছন্দ করিয়া লইতেন। কিন্তু ফৌজদারীর নাম যশোহর হওয়ায় তাঁহাদিগের বাসস্থানও সাধারণতঃ যশোহর বলিয়া অভিহিত হইত, এইরূপে বর্ত্তমান যশোহরেরও উৎপত্তি হইয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে বর্ত্তমান যশোহর কোন সময়ে যশোহর ফৌজদারীর প্রধান স্থান হওয়ায় এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নুর উল্লা খাঁর সময় মির্জানগর যশোহর ফৌজদারীর প্রধান স্থান ছিল। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে মেজর রেনেল তাঁহার মানচিত্রে মির্জা-

রায়ের * সুবন্দোবস্তে যশোহর প্রদেশের রাজস্বাদি সুচারুরূপে সংগৃহীত হইত, এবং উক্ত দেওয়ানের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে নুর উল্লা খাঁ ব্যবসায় ও তেজারতীর দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া উঠেন। দেওয়ানের সুবন্দোবস্তে রাজস্বসংগ্রহসম্বন্ধে কোন রূপ গোলযোগ না ঘটায়, ফৌজদার যুদ্ধকার্য্যাদি একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সুবেদারের অদেশ পাইয়া তিনি বিদ্রোহিগণকে দমন করার জন্য তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যশোহর হইতে যাত্রা করিলেন, ও ভাগীরথী পার হইয়া হুগলী বন্দরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে বিদ্রোহিগণও হুগলীতে উপস্থিত হয়। হুগলীতে পঁহুছিয়া নুর উল্লা খাঁ বিদ্রোহিগণের সম্মুখীন হইতে সাহসী হন নাই। যখন শুনিলেন যে, বিপক্ষেরা অগ্রসর হইতেছে, তখন তিনি হুগলী কেল্লার মধ্যে আত্মরক্ষার

নগরকে একটী প্রধান স্থান বলিয়া বৃহত্তর অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও মির্জানগর যশোহরের একটী প্রধান স্থান বলিয়া সরকারী রিপোর্টে উল্লিখিত হইত। এক্ষণে তাহা একটী সামান্য গ্রামমাত্র। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন যে, ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নুর উল্লা খাঁর প্রপৌত্র হেদায়েৎ উল্লা ও রহমৎ উল্লা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্সনের দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা নুর উল্লাকে আরঙ্গজেবের দুধ ভাই বলিয়া উল্লেখ করেন।

* রামভদ্র রায় বঙ্গজ কায়স্থসন্তান। তাঁহার আদি নিবাস বরিশাল জেলায়, পরে তিনি যশোহর প্রদেশে বাস করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ বরিশালের কাঁচাবেলিয়া গ্রামে ও তাঁহার বংশধরগণ ২৪ পরগণার পুঁড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। রামভদ্রের বংশধরগণ, পুঁড়া ও অন্যান্য কতিপয় গ্রামের জমীদার। রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণের অব্যবহিত পরেই রামভদ্র যশোহর বঙ্গজ কায়স্থসমাজে পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ উক্ত সমাজে সেইরূপ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। বিদ্রোহিগণ বণিক-সৈন্য হইতে তাদৃশ আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া সাহসের সহিত হুগলী কেল্লা বেষ্টন করিয়া ফেলে, এবং এরূপ ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করে যে, নুর উল্লা খাঁ যারপরনাই ভীত হইয়া রাত্রিযোগে আপনার কতিপয় সহচরের সহিত নৌকারোহণে বহু কষ্টে নদী পার হইয়া যশোহরাভিমুখে পলায়ন করেন। হুগলী কেল্লা অবশেষে বিদ্রোহিগণের হস্তগত হয়।

ইউরোপীয়গণের দুর্গনির্ম্মাণের সূচনা এবং কলিকাতা দুর্গের সূত্রপাত।

এই বিদ্রোহের প্রারম্ভে চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণ, চন্দননগরের ফরাসীগণ ও সুতানটির ইংরাজগণ কতকগুলি দেশীয় সিপাহী নিযুক্ত করিয়া আপনাদের সম্পত্তিরক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। ইউরোপীয়গণ সে সময়ে আপনাদিগের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বিস্মৃত হইয়া সৌহার্দ্দবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। বিদ্রোহি-গণের অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় ইউরোপীয়গণ সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নিকট এইরূপ আবেদন উপস্থিত করেন যে, সরকারের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায়, বিদ্রোহিগণ তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় নবাব তাঁহা-দিগকে আপনাপন কুঠীরক্ষার জন্য উপায় অবলম্বনের আদেশ প্রদান না করিলে, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইবে। নবাব তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণ আপনাদের কুঠীর চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া চারি কোণে মিনার নির্ম্মাণ করেন। চুঁচুড়া, চন্দননগর ও কলিকাতায় এইরূপে ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক দুর্গনির্ম্মাণের সূত্রপাত

হয়। ইহার পূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্যের কোন স্থানে তাঁহারা দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই।* ইংরাজেরা বহুদিন হইতে যে বিষয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিনে তাহা ফলোন্মুখী হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহারা সোৎসাহে কলিকাতাস্থ আপনাদিগের কুঠী সুরক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহারা প্রাচীর ও বুরুজাদির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে দশটী কামান চাহিয়া পাঠান।† ইংরাজদিগের কুঠী সুরক্ষিত হইতেছে দেখিয়া নিকটস্থ কোন রাজা তাঁহাদের কুঠীতে ৪৮ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখেন। বিদ্রোহিগণ হুগলী প্রদেশ হইতে গমন করিলেও তাঁহারা দুর্গনির্ম্মাণ পরিত্যাগ করেন নাই।

বিদ্রোহিগণের হুগলী পরিত্যাগ ও সভাসিংহের পরিণাম।

বিদ্রোহিগণ হুগলী দুর্গ অধিকার করিয়া যারপরনাই দাম্ভিক হইয়া উঠে, এবং দেশের চারি দিকে লুটপাটের জন্য এক এক দল লোক পাঠাইয়া দেয়। হুগলী বন্দরের অধিকাংশ সওদাগরগণ, ও গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ অন্যান্য স্থানের জনসমূহ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ওলন্দাজগণ ঐ সমস্ত লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার প্রতিকারের ইচ্ছায় কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য সহিত দুইখানি জাহাজ হুগলীতে পাঠাইয়া দেন। বিদ্রোহিগণও ওলন্দাজদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া যেমন জাহাজ দুই খানির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, অমনি কামান ও বন্দুকের

* Stewart's Bengal.

† Wilson's Annals vol. I.

গোলাগুলি আসিয়া তাহাদের উপর নিপতিত হয়। সহসা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া বিদ্রোহীরা দুর্গ ও নগর পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে, সপ্তগ্রাম হইতে সভা সিংহ রহিম খাঁকে এক দল সৈন্যের সহিত নদীয়া ও মুখসুসাবাদ (মুর্শিদাবাদ) অধিকারের জন্য পাঠাইয়া দেয়, এবং নিজে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানের রাজা নিহত হওয়ার পর, তাঁহার সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ বিদ্রোহিগণের হস্তে পতিত হইয়াছিল। উক্ত রাজপরিবারবর্গের মধ্যে বর্দ্ধমান-রাজের একটী সুন্দরী কুমারী কন্যা ছিল। সভা সিংহ তাহাকে করায়ত্ত করার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করে। কিন্তু রাজকুমারী কোনমতে সম্মত না হওয়ায়, সভা সিংহ তাহাকে বলপ্রয়োগে আয়ত্ত করার জন্য কৃতসংকল্প হয়। একদিন রাত্রিকালে কামোন্মত্ত পিশাচ, কন্যার প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহুবিস্তার পূর্ব্বক যেমন তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইবে, অমনি কুমারী স্বীয় বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত একখণ্ড তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া সভা সিংহের উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ছুরিকার আঘাতে সভাসিংহের উদর বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং কন্যাও তদ্দ্বারা আত্মহত্যা সম্পাদন করে। * অল্লক্ষণ পরে সভা সিংহের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সভা সিংহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ তাহার সম্পত্তির অধিকারী ও সৈনিকগণের নেতা হইয়া দাঁড়ায়। হিম্মৎ সিংহ চারিদিকে লুটপাট আরম্ভ করে। এই সময়ে জগৎরাম ঢাকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করিতে-

* তারিখ বাঙ্গালা ও Stewart.

ছিলেন। তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য হিম্মৎসিংহ কৃষ্ণনগর-রাজের বিরুদ্ধে দুই তিন বার সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। *

মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বিদ্রোহিগণ।

সভাসিংহের মৃত্যুর পর হিম্মৎসিংহ তাহার সৈন্য ও সম্পত্তির কর্তা হইলেও বিদ্রোহিগণ রহিম খাঁকেই আপনাদের নেতা মনোনীত করিয়াছিল। রহিম খাঁ 'রহিম সা' উপাধি ধারণ করিয়া প্রায় সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গলায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময়ে বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত † সমস্ত দেশ বিদ্রোহিগণের অধীন হয়। সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ-দমনের বিশেষ কোন রূপ চেষ্টা হয় নাই। দিন দিন বিদ্রোহি-গণের অত্যাচার বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, নবাব ইব্রাহিম খাঁর পুত্র ও অমাত্যবর্গ নবাবকে বিদ্রোহদমনের জন্য উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করেন। নবাব তাঁহাদিগকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিতেন যে, রাজ্যমধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া অতীব ভয়াবহ। তাহাতে বহু প্রাণীর জীবননাশের সম্ভাবনা। কিন্তু বিদ্রোহিগণকে যদি কিছু না বলা যায়, তাহা হইলে, তাহারা আপনা হইতেই ক্রমশঃ দল ভঙ্গ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইবে। ইহাতে কেবল সরকারী রাজস্বের

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

† তারিখ বাঙ্গালা ও রিয়াজুস সালাতীনে বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্তের কথা আছে। ষ্টুয়ার্ট মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্তের কথা লিখিয়াছেন।

সামান্য রূপ ক্ষতি ব্যতীত অন্য কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। নবাবের বিদ্রোহদমনের কোন রূপ উদ্যোগ না দেখিয়া বিদ্রোহিগণের স্পর্দ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রহিম সা সেই সময়ে মুখসুসাবাদ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়াছিল। মুখসুসাবাদ প্রদেশের কতিপয় জমীদার তাহাদের সহিত যোগদান করে। তন্মধ্যে ফতেসিংহের জমিদারগণই প্রধান। ফতেসিংহের তদানীন্তন জমীদার সবিতারায়ের বংশোদ্ভব ঘনশ্যামের পুত্র জগৎ, কালু প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা রহিম সার সহিত যোগ দান করিয়া অনেক স্থানে লুটপাট ও অন্যান্য উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। * রহিম সা মুখসুসাবাদের দিকে অগ্রসর হইয়া তথাকার জায়গীরদার নিয়ামত খাঁকে তাহার সহিত যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠায়। নিয়ামত এইরূপ উত্তর দেন যে, সরকারের কর্ম্মচারী হইয়া রাজবিদ্রোহিগণের সহিত তিনি কোন রূপ সম্বন্ধ রাখিতে

* "ঘনশ্যামসুতা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো গুরুসাহসাঃ।
জগৎ কালুশ্চ বেণী চ কৃষ্ণরামশ্চ বিশ্রুতঃ॥
সভাসিংহগণো ভূত্বা জগদাদির্জগৎপতিম্।
বিশ্বেশ্বরং বিরুধ্যৈব প্রায়ো রাজ্যচ্যুতোহভবৎ॥";
পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা।

ঘনশ্যামের চারি পুত্র, জগৎ, কালু, বেণী ও কৃষ্ণরাম অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিল। জগৎ প্রভৃতি সভাসিংহের বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়া জগৎপতি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করায় প্রায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। তাহাদের জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইলে অনেক দরবারের পর তদ্বংশীয়েরা উক্ত জমীদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চাহেন না। ইহাতে রহিম সা নিয়ামতের প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে দমন করার জন্য সসৈন্যে মুখ-সুসাবাদাভিমুখে অগ্রসর হয়। নিয়ামতও আপনার আত্মীয় স্বজন ও সামান্য একদল সৈন্যের সহিত রহিম সাকে বাধা প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। নিয়ামতের ভাগিনেয় তহবর খাঁ আফগানদিগের মধ্যে যে কোন যোদ্ধাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু কেহ একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী না হওয়ায়, এক দল আফগান সৈন্য তহ-বরের উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। নিয়ামত এই সংবাদ পাইয়া নিজেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। তিনি স্বীয় পরিহিত রঞ্জিত পরিচ্ছদের উপর তরবারি ঝুলাইয়া অশ্বারোহণে বিপক্ষগণের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং চারি পার্শ্বস্থ আফগান-গণের মস্তক ছেদন করিতে করিতে রহিম সার নিকট উপস্থিত হইয়া, তরবারির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করেন। রহিম সার শিরস্ত্রাণে লাগিয়া তরবারি দুই খণ্ড হইয়া যায়। পরে তিনি নিজ হস্তস্থিত ভগ্ন তরবারিখণ্ড রহিম সার উপরে নিক্ষেপ করিলে তাহার আঘাতে রহিম সা ভূতলে পতিত হয়। * নিয়ামত নিমেষমধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রহিম সার বক্ষে উপবিষ্ট হইয়া কটিদেশসংলগ্ন মৎস্যাকৃতি যমধার নামক ক্ষুদ্র তরবারির দ্বারা যেমন তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে যাইবেন, অমনি আফগানগণ চারিদিক্ হইতে আসিয়া, তীর, বর্শা ও তরবারির

* তারিখ বাঙ্গালায় লিখিত আছে যে, নিয়ামত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রহিম সার কটিদেশ ধরিয়া তাহাকে ভূতলে নামাইয়া দেন।

দ্বারা নিয়ামতকে আহত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রহিম সার উদ্ধার সাধন করে। নিয়ামত আহত হইয়া জলপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। রহিম সার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় থাকায় রহিম সা তাঁহাকে জল প্রদানের আদেশ দেয়। কিন্তু জল পঁহুছিতে না পঁহুছিতে সেই রাজভক্ত বৃদ্ধ জায়গীরদারের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। * নিয়ামতের অনেক লোকজন হত ও আহত হইয়াছিল এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিদ্রোহিগণ করায়ত্ত করে। অতঃপর বিদ্রোহিগণ মুখসুসাবাদে উপস্থিত হইয়া পাঁচ হাজার বাদসাহী সৈন্য পরাজিত করিয়া লুটপাটের দ্বারা উক্ত নগরকে হতশ্রী করিয়া ফেলে। কাশীমবাজারের ব্যবসায়িগণ ভীত হইয়া শরণাগতের ন্যায় রহিম সার নিকট আপনাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেন। রহিম সা তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া কাশীমবাজার লুণ্ঠনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। রহিম সার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অবশেষে কাশীমবাজারের প্রধান ব্যবসায়ী গোলাচাঁদ সরকারে অনেক টাকা জরিমানা প্রদান করিয়াছিলেন। †

অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহিগণ।

মুর্শিদাবাদ প্রদেশের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানেও বিদ্রোহিগণ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এক দল সুতানটির দিকে অগ্রসর হয়। ইংরাজেরা তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য 'ডায়মণ্ড' নামে একখানি জাহাজ নদীবক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণ সুতানটির নিকটস্থ কতকগুলি গ্রামে অগ্নি

* তারিখ বাঙ্গালা।

† Stewart.

প্রদান করিয়া লুটপাট ও অন্যান্য উপদ্রব আরম্ভ করিলে, চারি পার্শ্বের জমীদারেরা লোক জন সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। ইহাতে বিদ্রোহিগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের প্রায় ৯০ জন লোক জমীদারদিগের লোকজনের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। * বিদ্রোহিগণের আর এক দল কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দূরে গঙ্গার পর পারে টানা দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে, হুগলীর ফৌজদারের অনুরোধে ইংরাজগণ উক্ত দুর্গ রক্ষার জন্য 'টমাস' নামে আর এক খানি ক্ষুদ্র জাহাজ প্রেরণ করেন। বিদ্রোহিগণ অবশেষে টানা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে চুঁচুড়া, চন্দননগর ও সুতানটির ইউরোপীয়গণ আপনাদের কুঠী সংরক্ষণের চেষ্টা করিতে থাকেন। ইংরাজগণ সুতানটিতে রীতিমত প্রাচীর, পরিখা ও বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে কামান আনাইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যে রাজমহল ও মালদহ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিদ্রোহিগণের অধিকারে আইসে, এবং তাহারা মালদহের ওলন্দাজ ও ইংরাজ কুঠী লুণ্ঠন করিয়া অনেক সম্পত্তি হস্তগত করে।

সরকার হইতে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা ও জবরদস্ত খাঁ।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ যখন জানিতে পারিলেন যে, বিদ্রোহিদিগের অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন তিনি বাদসাহের নিকট সংবাদ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। বাদসাহ আরঙ্গজেব সংবাদবাহকগণের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া ইব্রাহিম খাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং

* Stewart.

স্বীয় পৌত্র আজিম ওশ্বানকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিম নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বিহারের শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতিও বিদ্রোহি-দিগকে দমন করার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। আজিম ওশ্বানের বাঙ্গলায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে নবাব ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁর প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় যে, তিনি সত্বর সসৈন্যে বিদ্রোহিগণকে দমন করার জন্য অগ্রসর হন। সম্রাটের আদেশ পাইয়া জবরদস্ত খাঁ অশ্বারোহী পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত কতিপয় রণতরী লইয়া ঢাকা হইতে মুখসুসাবাদের দিকে গমন করেন। এই সময়ে বিদ্রোহিগণের লোক ও অর্থবল চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এইরূপ কথিত হয় যে, তাহাদের সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা হইয়া উঠে এবং তাহাদের অধীনে ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও ১২ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। * রহিম সা তৎকালে মুখসুসাবাদের নিকট পদ্মাতীরস্থ ভগবান-গোলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। জবরদস্ত খাঁ প্রথমতঃ এক দল সৈন্য মালদহের দিকে প্রেরণ করেন। রাজমহলে বিদ্রোহিগণের সহিত যুদ্ধে তাহারা জয় লাভ করে। আফগান সর্দ্দার ঘীরেট খাঁ নিহত এবং বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত অনেক দ্রব্য জবরদস্ত খাঁর সৈন্যগণের করায়ত্ত হয়। জবরদস্ত খাঁ নিজে রহিম সার শিবিরের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে স্থলপথ দিয়া ও রণতরীগুলি জলপথ দিয়া বিপক্ষ-

* East India Records Vol. XIX. P. 263.

গণকে আক্রমণ করার জন্য পাঠাইয়া দেন। ফিরিঙ্গীদিগের দ্বারা চালিত গোলন্দাজ সৈন্যগণ গোলাবর্ষণে বিদ্রোহিগণকে অস্থির করিয়া তুলে। যুদ্ধের প্রথম দিবস গোলাবর্ষণে অতিবাহিত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে বাদসাহী অশ্বারোহী সৈন্যেরা বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয়। পর দিবস জবরদস্ত খাঁ নিকটস্থ জমীদারদিগকে বাদসাহী সৈন্যের জয় লাভের সংবাদ দিয়া বিদ্রোহিগণের সহিত কোন রূপ সম্বন্ধ না রাখার জন্য আদেশ দেন। সেই দিনে জবরদস্ত খাঁ মুখসুসাবাদের নিকট উপস্থিত হইয়া নগরের পূর্ব্ব দিকে প্রশস্ত ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে রহিম সাকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু রহিম সা সেই রাত্রিতেই গঙ্গা পার হইয়া বর্দ্ধমানের দিকে পলায়ন করে।

আজিম ওশ্বানের বাঙ্গালায় আগমন ও বিদ্রোহের শান্তি।

যে সময়ে জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সাজাদা আজিম ওশ্বান প্রথমে এলাহাবাদে ও পরে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হন। এলাহাবাদ হইতে তিনি অযোধ্যার শাসন্ কর্ত্তাকে আপনার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। পাটনায় আসিয়া আজিম ওশ্বান শুনিতে পান যে, জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহিগণকে পরাস্ত করিয়াছেন। জবরদস্তের জয়লাভে আজিম ওশ্বান কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, তিনি আর যেন বিদ্রোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হন। এই সংবাদ পাইয়া জবরদস্ত খাঁ অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং সেই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায়, তিনি

সাজাদার জন্য বর্দ্ধমানে অপেক্ষা করিতে থাকেন। আজিম ওশ্বান বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে, জবরদস্ত খাঁ তাঁহার হস্তে সমস্ত বাদসাহী সৈন্যের ভার অর্পণ করিয়া ক্ষুন্ন মনে দাক্ষিণাত্যের দিকে চলিয়া যান। আজিম ওশ্বান বর্দ্ধমানে থাকিয়া জমীদার-দিগের নিকট হইতে উপহার ও অভিনন্দনাদি লইতে আরম্ভ করেন এবং ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। এদিকে বিদ্রোহিগণ জবরদস্ত খাঁর দাক্ষিণাত্য-গমনের সংবাদ পাইয়া মহানন্দে জয়নাদ করিতে আরম্ভ করে এবং নদীয়া ও হুগলী প্রদেশে লুটপাট করিয়া বর্দ্ধমানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। আজিম ওশ্বান প্রথমতঃ রহিম সাকে বিদ্রোহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য এক পত্র লিখেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত হয় যে, সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে ও সে রাজানু-গ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। * রহিম সা এইরূপ উত্তর দেয় যে, সাজাদার প্রধান মন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলে, সে সাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিতে পারে। †

* গবর্ণর আয়ার ১৬৯৮ খৃঃ অব্দের ৬ই জানুয়ারির পত্রে এইরূপ লেখেন যে, আজিম ওশ্বান রহিম সাকে এক যোড়া বেড়ী ও এক খানি তরবারি পাঠাইয়া দেন। রহিম সা তরবারিখানি লয়, কিন্তু সাজাদাকে এইরূপ ভাবে পত্র লেখে যে, আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর হইতে হইলে আজিম ওশ্বানকে আফগানদিগেরই সাহায্য লইতে হইবে।

† তারিখ বাঙ্গালায় লিখিত আছে যে, রহিম সাই সাজাদাকে তাহার নিকট যাইতে লেখে, কিন্তু তিনি খাজা আনোয়ারকেই পাঠাইয়া দেন।

আজিম ওশ্বান রহিম সার কথায় বিশ্বাস করিয়া খাজা আনোয়ারকে কতিপয় সঙ্গীর সহিত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু আফগানেরা আনোয়ার ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিহত করে। রহিম সা যখন বুঝিতে পারিল যে, কিছুতেই আর তাহার নিষ্কৃতি নাই, তখন সে আপনার সৈন্যদিগকে সাজাদার শিবির আক্রমণের জন্য আদেশ দেয়। আজিম ওশ্বান আনোয়ারের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিদ্রোহিগণের প্রতি ধাবিত হন। ইতিমধ্যে রহিম সাও অশ্বারোহণে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে হামিদ খাঁ নামক সাজাদার এক প্রিয় কর্ম্মচারী আপনাকে আজিম ওশ্বান বলিয়া পরিচয় দিয়া রহিম সার সম্মুখীন হন এবং একটী তীরে রহিম সার পার্শ্ব ও আর একটী তীরে তাহার অশ্বের মস্তক বিদ্ধ করিয়া ফেলেন। রহিম সা অশ্ব হইতে নিপতিত হইলে, হামিদ নিজেও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তরবারির আঘাতে রহিম সার মস্তক ছেদন করেন এবং সেই ছিন্ন মস্তক একটী বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া সাজাদার নিকট উপস্থিত হন। আফগানগণ তাহাদের নেতার মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। তদবধি (১৬৯৮ খৃঃ অব্দ হইতে) সপ্তদশ শতাব্দীর সেই ভয়াবহ রাজবিদ্রোহের অবসান হয়। আজিম ওশ্বান বিদ্রোহিগণকে ধৃত করার জন্য দেশের চতুর্দ্দিকে লোক-জন পাঠাইয়া দেন। পরে কিছু কাল বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিয়া পশ্চিম বঙ্গে শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরাভিমুখে গমন করেন এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনে প্রবৃত্ত হন।

ইংরাজ কোম্পানীর সূতানটি প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের জমিদারী লাভ ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

১৬৯৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে ইংরাজ কোম্পানী খোজা সরহদ্দ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ আর্ম্মেণীয় সওদাগরকে উপঢৌকনের সহিত জবরদস্ত খাঁর শিবিরে পাঠাইয়া, অনধিকারী ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে গৃহীত রাজমহল ও মালদহ ইংরাজ কুঠীর সম্পত্তিসমূহ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু জবরদস্ত খাঁ তাহাতে কর্ণপাত না করায়, তাঁহারা পরিশেষে আজিম ওশ্বানের বাঙ্গলায় আগমনের পর তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষের প্রেরিত একজন প্রতিনিধি বর্দ্ধমানে সাজাদার শিবিরে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্যবিষয়ে ওলন্দাজদিগের শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক প্রদানের পরিবর্ত্তে ইংরাজদিগের ন্যায় বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র প্রদান করার আবেদন করেন। সাজাদা উক্ত আবেদনের বিষয়ে বিশেষ কোন রূপ উত্তর প্রদান করিতে না করিতে ইংরাজেরা খোজা সরহদ্দ, মিষ্টার ষ্ট্যানলী ও মিষ্টার ওয়ালশ্‌কে প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আজিম ওশ্বানকে ইংরাজদিগের প্রতি পূর্ব্ব সুবেদারগণের আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রার্থনা করেন। তাহার পর ইংরাজেরা ১৬৯৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে সাজাদাকে ১৬ হাজার টাকা নজর দিয়া সূতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের ভূমি ক্রয় করার আদেশ প্রাপ্ত হন। এই আদেশপত্রে বাদসাহের দেওয়ানের স্বাক্ষর হইতে কিছু কাল বিলম্ব হওয়ায়, জমীদারেরা প্রথমতঃ উক্ত গ্রামত্রয় বিক্রয় করিতে

অসম্মত হন। কিন্তু পরিশেষে ইংরাজ কোম্পানী উক্ত গ্রাম-ত্রয়ের জমিদারী ক্রয় করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা ১৭০০ খৃঃ অব্দে আজিম ওশ্বানের নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশও প্রাপ্ত হন। ১৬৯৯খৃঃ অব্দের প্রথমে কলিকাতার গবর্ণর মিষ্টার আয়ার বিলাত গমন করেন এবং দ্বিতীয় বিয়ার্ড সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। সেই বৎসরের শেষে আয়ার পুনর্ব্বার আসিয়া কলিকাতার প্রধান অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন, এবং ১৭০০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা মান্দ্রাজ হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায়, তিনি বাঙ্গলার প্রথম প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। রাল্‌ফ শেল্ডন কলিকাতার প্রথম কালেক্টর বা তহশিলদার ও বেঞ্জামিন আডাম্‌স বাঙ্গলার দ্বিতীয় চ্যাপলেন বা পাদরী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্গ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইংলণ্ডাধীশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্ট উইলিয়ম" আখ্যা গ্রহণ করে। এই সময়ে নবগঠিত ইংলিশ কোম্পানীর পক্ষ হইতে উইলিয়ম নরিস্‌ ইংলণ্ডাধিপের দূতস্বরূপে দাক্ষিণাত্যে সম্রাট্‌শিবিরে উপস্থিত হন। উক্ত নূতন কোম্পানী সেই সময়ে পুরাতন কোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধ্যক্ষ লিটল্‌টন্‌ হুগলীতে অবস্থিতি করিয়া অনেক টাকা নজর দিয়া বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করেন। কিন্তু পুরাতন লণ্ডন কোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ রূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অবশেষে কয়েক বৎসর পরে উভয় কোম্পানী মিলিত হইয়া "যুক্ত কোম্পানী" নাম ধারণ করে। এই সময়ে ইংরাজগণ পুনর্ব্বার বাদসাহের কোপে পড়িয়া আপনাদিগের সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন, পরে ক্রমে ক্রমে

আবার তাঁহারা সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করেন। আমরা পর অধ্যায়ে তাহার বিশেষ রূপ বিবরণ প্রদান করিব। পর অধ্যায় হইতে মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস আরব্ধ হইবে। তৎপূর্ব্বে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের দুই এক জন বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ফকীরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাসারম্ভের পূর্ব্বে তাহার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের শেষ করিব।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক মহাপণ্ডিত ও ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভক্ত ও পণ্ডিতপ্রবরের নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। মুর্শিদাবাদ প্রদেশে যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই সুপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশে বিশ্বনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা তিন সহোদর, জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ, এবং বিশ্বনাথই কনিষ্ঠ। হরিবল্লভ বিশ্বনাথের নামান্তর। বিশ্বনাথের রচিত পদাবলীতে তাঁহার হরিবল্লভ নামই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ গ্রামেই ব্যাকরণাদি বাল্যকালের পাঠ শেষ করিয়া মুর্শিদাবাদের সৈয়দাবাদে গমনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য্যের পুত্রগণ সৈয়দাবাদের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও নিকট বিশ্বনাথ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। সৈয়দাবাদে বাসকালে তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, এবং এইখানে অলঙ্কারকৌস্তুভের তাঁহার কৃত সুবোধিনী

টীকা সম্পূর্ণ হয়। * রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণ নরোত্তম ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য বালুচরের গাম্ভিলাপল্লীনিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। বিশ্বনাথ সৈয়দাবাদে অবস্থানকালে কৃষ্ণচরণের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। তিনি গুরুর নিকটে বাস করিয়া শাস্ত্রালোচনায় ও ভক্তি অর্জ্জনে বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়নের পর বিশ্বনাথ একবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন, পরে তথা হইতে পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বিবাহিত হইলেও বাল্যকাল হইতে বিশ্বনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। † সেই বৈরাগ্যের ফলে তিনি পরিশেষে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। বৃন্দাবনে নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া তিনি শেষ জীবনে রাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। তথায় ১৬২৬ শাক বা ১৭০৪ খৃঃ অব্দের মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনী পরিসমাপ্ত হয়। ‡ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাগবতের টীকাসমাপ্তির অল্পকাল পরেই প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি ইহ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। যৎকালে বিশ্বনাথ রাধাকুণ্ডতটে ভাগবতের

* "সৈয়দাবাদবাসিশ্রীবিশ্বনাথাখ্যশর্ম্মণা
চক্রবর্ত্তীতিনাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥"

† নরোত্তমবিলাসের শেষে তাঁহার বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

‡ "ঋত্বক্ষিষড়্ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
শুক্লষষ্ঠ্যাং সিতে মাঘে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥"

টীকা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে গোবিন্দভাষ্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রণেতা বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া জয়পুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নেতাস্বরূপে শাস্ত্রার্থবিচারে জয়ী হন ও তথাকার গোপালদেবের সেবাধিকার লাভ করেন। বলদেব তদবধি বিশ্বনাথকে আপনার গুরুর ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন। বিশ্বনাথের রচিত চব্বিশ খানি গ্রন্থের * পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাগবত, গীতা, অলঙ্কার-কৌস্তভ, উজ্জ্বলনীলমণি, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও বিদগ্ধমাধব প্রভৃতির টীকাই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অনেক পদাবলীতে তাঁহার কবিত্ব ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এই সমস্ত গ্রন্থ ও পদাবলীরচনায় বিশ্বনাথ জীবগোস্বামী প্রভৃতির পরে বৈষ্ণব সমাজের নেতাস্বরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। বিশ্বকে ভক্তিপথ প্রদর্শনের জন্য, ও ভক্তচক্রে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া চক্রবর্ত্তী,

* সে চব্বিশখানি গ্রন্থ এই :—

(১) সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), (২) সারার্থবর্ষিণী (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা), (৩) সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভের টীকা), (৪) সুখবর্ত্তিনী (আনন্দবৃন্দাবন চম্পূকাব্যের টীকা), (৫) বিদগ্ধমাধবের টীকা, (৬) আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা), (৭) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, (৮) স্তবামৃতলহরী, (৯) চমৎকারচন্দ্রিকা, (১০) প্রেমসম্পুট, (১১) গোপীপ্রেমামৃত (১২) গোপালতাপনীর টীকা, (১৩) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, (১৪) উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, (১৫) ভাগবতামৃতকণিকা, (১৬) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, (১৭) মাধুর্য্যকাদম্বিনী, (১৮) ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, (১৯) গৌরাঙ্গলীলামৃত, (২০) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, (২১) স্বপ্নবিলাসামৃত, (২২) গৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা, (২৩) চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা (২৪) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সংস্কৃত টীকা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক পদাবলীও আছে। চৈতন্যরসায়ন নামে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

এইরূপে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে তাঁহার নামের ব্যাখ্যা হইত। * ফলতঃ অদ্ভুত বৈরাগ্যে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, অগাধ শাস্ত্রবিদ্যায়, অলৌকিক ভক্তিতে ও মধুর কবিত্বে বিশ্বনাথ তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার রচিত ভাগবত ও গীতা প্রভৃতির টীকা যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অমূল্য গ্রন্থ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এরূপ মহাপণ্ডিতের সংখ্যা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদৃশ অধিক নহে।

সৈয়দ মর্ত্তুজা।

এই সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে এক মুসলমান্ ফকীর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার নাম সৈয়দ মর্ত্তুজা। মর্ত্তুজার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থ বরেলী জেলায় বাস করিতেন। মর্ত্তুজার পিতা সৈয়দ হাসেন কাদেরীও এক জন আউলিয়া বা ফকীর ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মর্ত্তুজা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কি বাঙ্গলায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, জঙ্গীপুরের নিকট বালিঘাটায় তাঁহার জন্ম হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে।† যাহা হউক, মর্ত্তুজা বাল্যকাল হইতে জঙ্গীপুর ও তাহার নিকটস্থ স্থানে বাস

* "বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

† মর্ত্তুজা হইতে এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ ৮ পুরুষ, এবং কেহবা ৯ পুরুষ স্থির হইয়া থাকেন। তাহা হইলে ন্যূনাধিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মর্ত্তুজার আবির্ভাব স্থির করা যাইতে পারে। মর্ত্তুজা নিজে দীর্ঘজীবী ছিলেন, ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া শুনা যায়।

করিতেন। শৈশব সময় হইতেই তিনি ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন এবং ফকীরের বেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। জঙ্গীপুরের সন্নিহিত চড়কা নামক স্থানের রাজাক্ সাহেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তিনি সুতীর নিকট ছাপঘাটীতে এক আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেন এবং প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে তথায় দেহ ত্যাগ করেন। ছাপঘাটীতে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। মর্ত্তুজা মুসল্মান ফকীর হইয়াও হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। এইজন্য মুসল্মান গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে মর্ত্তুজা হিন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দময়ী নাম্নী কোন ব্রাহ্মণ কন্যা ভৈরবীরূপে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন বলিয়া উভয়কে লোকে মর্ত্তুজানন্দ বলিত। তান্ত্রিকগণের ন্যায় মর্ত্তুজা মদ্যপানাদিও করিতেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। রাজমহলের কোন স্থানে তাঁহার পানাগার ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহার বুজুর্গি বা অলৌকিক ক্ষমতার সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।* খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুর্শিদাবাদে প্রচারিত হইয়া যে অভিনব ধর্ম্মান্দোলনের সূচনা করিয়া তুলে, এবং যে ধর্ম্ম হিন্দু ও মুসল্মান উভয় জাতিকেই ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিল,

* এইরূপ শুনা যায় যে, মর্ত্তুজা এক কিস্তি বা ফকীরগণের পাত্রবিশেষে পদার্পণ করিয়া 'না জানি পাগলের মনঙ্গিঙ্গা কোন ঘাটে লাগাবি রে' এই গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গা বা পদ্মা পার হইতেন। মদ্যপান মুসল্মান শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া মর্ত্তুজার কোন আত্মীয় তাঁহার আচরণে দুঃখিত হইলে মর্ত্তুজা উক্ত আত্মীয়ের বাটীর সমস্ত জল মদ্যে পরিণত করেন। এইরূপ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

সৈয়দ মর্ত্তুজা সেই ধর্ম্মেরও রসাস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুন্দর সুন্দর পদ বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের ভাব ও রচনা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল ও সুললিত যে, পদগুলিকে সহসা উত্তরপশ্চিম দেশবাসী মুসল্‌মান ফকীরের রচিত বলিয়া বুঝা যায় না, কোন বাঙ্গালী ভক্তের আবেগময় হৃদয়ের কথা বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। মর্ত্তুজার এইরূপ উদার ধর্ম্মভাব ছিল যে, মুসল্‌মানেরা তাঁহাকে ফকীর, তান্ত্রিকেরা সাধক ও বৈষ্ণবেরা এক জন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া* মনে করিতেন। হিন্দু মুসল্‌মান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ তাঁহার প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। ছাপঘাটীর দরগা অদ্যাপি হিন্দু, মুসল্‌মানে পূজা করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর রজব মাসে নানা স্থান হইতে ফকীরগণ আগমন করিয়া দরগার পূজা করেন। তদুপলক্ষে ছাপঘাটীতে একটী মেলারও অধিবেশন হয়। মর্ত্তুজার সমাধির নিকট আনন্দময়ীরও সমাধি আছে। ফকীর ও সমাগত জনগণ উভয় সমাধির প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মর্ত্তুজার পরিণীতা স্ত্রীর নাম নেজাম বিবি, তাঁহার গর্ভে মর্ত্তুজার চারিটী

* আমরা এস্থলে তাঁহার একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"শ্যাম বন্ধু চিতনিবারণ তুমি। কোন্ শুভ দিনে, দেখা তোমা সনে, পাসরিতে নারি আমি॥ যখন দেখিয়ে, ও চাঁদবদনে, ধৈরজ ধরিতে নারি। অভাগীর প্রাণ, করে আন চান, দণ্ডে দশ বার মরি॥ মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ-কানু। কুল শীল সব, ভাসাইনু জলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥ সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে, নিবেদন শুন হরি। সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে, জীবনমরণ ভরি॥" (পদকল্পতরু ৪র্থ শাখা, ৩৩ পল্লব)

পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বালিঘাটানিবাসী সৈয়দ কাসেমের সহিত তাঁহার আসিয়ানাম্নী কন্যার বিবাহ হয়। কাসেম ১১৫৫ হিজরী বা ১৭৪২ খৃঃ অব্দে বালিঘাটায় একটী মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি সেই মসজীদ তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মর্ত্তুজার বংশধরগণ অদ্যাপি জঙ্গীপুরের নিকট বাস করিতেছেন।

প্রকৃত ইতিহাসারম্ভের পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সাধারণ অবস্থা। হিন্দু ও বৌদ্ধকাল।

বহু প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির দ্বারা ভারতের কোন কোন স্থানের বিশেষ রূপ আচার ব্যবহার জ্ঞাত হইলেও মুর্শিদাবাদ প্রদেশের ন্যায় কোন স্থানবিশেষের বিবরণ অবগত হওয়া দুষ্কর। সুতরাং যে সময় হইতে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সুস্পষ্ট বিবরণ জানা যায়, সেই সময় হইতে আমরা তাহার অবস্থাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে পারি। হিন্দু ধর্ম্মের পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম

* মসজীদের প্রস্তরফলকে ফারসী ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ.—"সৈয়দ কাসেম পবিত্র অন্তঃকরণে ও স্থির চিত্তে এই মসজীদকে কাবা (মক্কার মসজীদ) স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সন তারিখের জন্য মনকে বলিলেন যে, হে মন, বল যে, ইহার গুম্বজ ঈশ্বরের জ্যোতির্দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে।" ফারসী ভাষার লিখিত শব্দগুলিতে যতগুলি অক্ষর আছে, সেই অক্ষর গুলির এক একটার দ্বারা যে যে অঙ্ক বুঝায়, তাহা যোগ করিলে ১১৫৫ হয়। সুতরাং ১১৫৫ হিজরীতে কাসেম কর্ত্তৃক মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। বেভারিজ সাহেব উক্ত মসজীদকে ১৫৬১ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত মনে করিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদের প্রাচীনতম মসজীদ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা ১৫৬১ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয় নাই। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে বা ১১৫৫ হিজরীতে নির্ম্মিত হয়। এইরূপ কথিত

প্রবল হইয়া উঠিলে এবং মগধ প্রভৃতি দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্র-স্থল হইলে, মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়। তাহার পর খৃষ্টজন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিলে, এই সমস্ত স্থানেও ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হয়। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ও পরে যৎকালে গুপ্ত সম্রাট্গণ কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মের, বিশেষতঃ শক্তি ও শিব উপাসনার, প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীটেশ্বরী প্রভৃতি স্থান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু সে সময়ে একেবারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এতৎপ্রদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই এবং কোন কোন সময়ে তাহা প্রাধান্য লাভও করিয়াছিল। হিউয়েন সিয়াঙ্গের কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যে আগমনের সময় হইতে আমরা মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সাধারণ অবস্থার বিষয় কিছু স্পষ্টরূপে জানিতে পারি। তৎকালে এতৎপ্রদেশের লোকেরা ধনশালী ও স্বচ্ছন্দচিত্ত ছিল। ভূমিতে নানা প্রকার শস্য ও ফুল ফল উৎপন্ন হইত। জলবায়ু স্বাস্থ্য-কর ও লোকের আচার ব্যবহারও মনোজ্ঞ ছিল, এবং বিদ্যার অনুশীলন ও সমাদর হইত। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দু ও

হইয়া থাকে যে, মর্ত্তুজা ও আনন্দ শেষ বয়সে কাসেমের নির্ম্মিত বালিঘাটার মসজীদে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গিরিয়া প্রান্তরে নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত আলিবর্দ্দীর যুদ্ধের সময় মর্ত্তুজা সমাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। রিয়াজুস সালাতীন্ প্রভৃতি গ্রন্থে ও গিরিয়া যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতা হইতে বোধ হয় যে, গিরিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই মর্ত্তুজার দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। তাহা হইলে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে কাসেমের নির্ম্মিত মসজীদে তাঁহার অবস্থান করা প্রতিপন্ন হয় না। মর্ত্তুজা ছাপঘাটীতেই থাকিতেন বলিয়াই জানা যায়।

বৌদ্ধ উভয় মতাবলম্বী লোকই দেখা যাইত। হিন্দুদিগের দেবমন্দির ও বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘারামও বিদ্যমান ছিল। সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমাগত হইতেন। রাঙ্গামাটী হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য গুপ্তমুদ্রা এবং ভগ্ন মহিষমর্দ্দিনী প্রভৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে জানা যায় যে, এককালে এতদ্দেশে শক্তি-উপাসনা বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি মুর্শিদাবাদের রাঢ় বিভাগে তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। ইহার পর বহু দিন মুর্শিদাবাদ প্রদেশের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপ রাজা আদিশূরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে সমগ্র বঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য তাঁহাকে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিতে হয়। মুর্শিদাবাদ প্রদেশেরও যে সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশধরগণের মধ্যে রাঢ়ীয় শ্রেণীর অনেকে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের কোন কোন স্থানে বাস করায়, ক্রমে ক্রমে এতৎপ্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষরূপ প্রচলন আরব্ধ হয়। আবার উত্তর রাঢ়ের মহীপাল নগরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজা মহীপালাদি বাস করায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মও সমভাবে প্রচলিত ছিল। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনেক বিষয় প্রতিপালন করিতেন, ধর্ম্মপালাদির বিবরণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, উত্তর রাঢ়ের রাজা মহীপালও ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সাগরদীঘী খনন করাইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই সমভাবে প্রচলিত ছিল। পালবংশের সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়

হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর ও গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সময় এতদ্দেশে হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্মও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ক্রমে এই উভয় তান্ত্রিক মতের মিশ্রণ হইয়া বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মত প্রবল হইয়া উঠে। মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও সেই মতের বাহুল্য ঘটিয়াছিল। ইহার স্থানে স্থানে ও ইহার নিকটস্থ বীরভূম প্রভৃতি স্থানে এই উভয় তান্ত্রিকমতসম্মত ধর্ম্মের নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই মিশ্র মত প্রচলিত হইলেও হিন্দুদিগের পবিত্র তান্ত্রিক মতকে একবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, মিশ্র মতের সহিত তাহা চির-দিনই চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারাও শক্তি-উপাসক ছিলেন। সোমেশ্বর ঘোষের স্থাপিত সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরাদি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-গণ সাধারণতঃ শক্তিশালী হওয়ায় মুর্শিদাবাদ প্রদেশে শক্তি-উপাসনার প্রভাব বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। পালবংশের সময় ব্রাহ্মণে-তর সমস্ত জাতি উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে বৌদ্ধ আচার কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।* শূর ও পাল বংশের পর সেনবংশীয়গণ বঙ্গরাজ্যের

* কায়স্থগণের কুলজীতে লেখা আছে যে, তাঁহারা মূলে ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন ছিলেন। আদিশূরের পরে সম্ভবতঃ পালবংশের সময় তাঁহারা উপবীতাদি পরিত্যাগ করেন। পরে তাঁহারা তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর পবিত্র হইয়া শূদ্রাচারসম্পন্ন হন। কাহারও কাহারও মতে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় নহেন, কিন্তু করণ। বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে করণের জন্ম হয়। কোন কোন স্মৃতির মতে করণ শূদ্র হইলেও মনু, বৌধায়ন ও মহাভারতের মতে করণেরা দ্বিজ। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে করণ বা রথকারের উপনয়নের ব্যবস্থা আছে।

একাধীশ্বর হইয়া উঠিলে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া হিন্দুধর্ম্ম-প্রবল হইয়া উঠে। উক্ত বংশের সুবিখ্যাত বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কৌলীন্য স্থাপন করিয়া হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রাধান্য স্থাপন করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বনামক গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ বল্লালসেনের কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান হইলে পরে বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণও আগমন করেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করেন। হিন্দু আচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ এতদ্দেশে প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং এতদ্দেশীয় আদিম ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা সপ্তশতী নামে অভিহিত হইয়া উঠেন, তাঁহারা নিকৃষ্ট জাতিগণের যাজনাদি করিয়া অত্যন্ত হেয় হইয়া পড়েন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করায় আপনাদিগের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হন। সমগ্র বঙ্গদেশের ন্যায় মুর্শিদাবাদ

ভারতের অন্যান্য স্থানের কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন বলিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐক্য ও সম্বন্ধ থাকায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে চাহেন। ক্ষত্রিয় বা করণ হইলে তাঁহারা দ্বিজ ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার না থাকায় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের সময় সম্ভবতঃ তাঁহারা সে সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ বঙ্গদেশীয় গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতি যাঁহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও উপনয়ন সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। এক মাত্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের বৈদিক সংস্কার প্রতিপালন করিতেন। সেইজন্য ক্রমে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটী মাত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছে।

প্রদেশেও ঐরূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়। মুর্শিদাবাদ প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করিলেও উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণ বঙ্গজ বা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ন্যায় বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বল্লালী মর্য্যাদা প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনারাই স্বাধীনভাবে কৌলীন্য মত প্রবর্ত্তন করেন। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের পর দক্ষিণ-রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজগণও ক্রমে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বল্লালের পর বারেন্দ্রগণের সমাজ গঠিত হয়, কাজেই তাঁহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য দেখা যায় না। হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু আচার ব্যবহার ক্রমে বদ্ধমূল হওয়ায় বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্নাদি লোপ হইতে থাকে এবং পরিণামে তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া যায়। এইজন্য হিন্দু ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদের রাঢ় প্রদেশে যে ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচলিত আছে. তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এক্ষণে এতদ্দেশে ধর্ম্মরাজ শিবরূপে পূজিত হন। কিন্তু পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ও সঙ্ঘের ধর্ম্মই এতদ্দেশে পূজিত হইতেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মত প্রকাশ করেন। কিরীটেশ্বরী, কান্দী প্রভৃতি স্থানের বুদ্ধমূর্ত্তি ভৈরব ও শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ কালে মুর্শিদাবাদের অবস্থা এইরূপই অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে মুসল্‌মান রাজত্বকালে তদ্বিষয়ে, যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

মুসল্‌মান রাজত্বকাল।

মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাসারম্ভের পূর্ব্বে মুসল্‌মান রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সাধারণ অবস্থা জানিতে হইলে, আমাদিগকে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় * এবং সেই সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের যে সমস্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সকলও আলোচনা করিয়া আমরা তাহার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারি। পাঠান রাজত্বকালে গৌড় বাঙ্গলার রাজধানী হইয়া উঠিলে তাহার নিকটস্থ মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও মুসল্‌মান প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। অনেক মুসল্‌মান মুর্শিদাবাদ প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেও আরম্ভ করেন এবং মুসল্‌মান ফকীরগণ স্থানে স্থানে আবাসস্থান স্থাপন করায় অনেক হিন্দুসন্তান মুসল্‌মান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। পাঠানরাজত্বকালে রাজাজ্ঞায় অনেকে ইস্-

* আমরা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তৎকালীন বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থা অবগত হইতে পারি, ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ হইতে মুর্শিদাবাদ প্রদেশেরই অবস্থা জানিতে পারা যায়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ প্রদেশসমূহের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও যে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল ইহা অনুমান করা যায়। সেইজন্য আমরা সে সমস্ত গ্রন্থও অবলম্বন করিয়াছি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে দেশের তৎকালীন অবস্থা জানিতে হইলে তাহা সতর্কতার সহিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ কাব্যগ্রন্থে সত্য ঘটনার সহিত অনেক কল্পিত বিষয় মিশ্রিত থাকে। সেই জন্য যে সমস্ত বিষয় ইতিহাস ও প্রবাদ প্রভৃতির সহিত ঐক্য হয় ও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাহাদের অস্তিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া তৎকালের সাধারণ অবস্থার চিত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেও বাধ্য হয়। মুসল্‌মানগণ ক্রমে বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়া উঠায় তাঁহাদের সহিত নানাপ্রকারে সংস্পৃষ্ট হইয়া হিন্দু সন্তানগণের কেহ কেহ মুসল্‌মান আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন, এমন কি অনেক ব্রাহ্মণসন্তানও ঐরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। মুসল্‌মান-গণের মধ্যে যাহারা হীনাবস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কৃষি ও চাকরী করিতে বাধ্য হন। গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সাহাও এককালে হিন্দুর চাকরী করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে মুসল্‌মান আচার ব্যবহার প্রবেশ করিয়া যখন তাহাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলে, সেই সময়ে তাহার প্রতিকূলে উক্ত সমাজ হইতে শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যক হয় এবং তাহারই ফলে চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার, রঘুনন্দন কর্ত্তৃক স্মৃতির ব্যবস্থাপ্রচলন, দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধন এবং রাজা পরমানন্দ রায় কর্ত্তৃক বঙ্গজ ও পুরন্দরখাঁ কর্ত্তৃক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলবিধি সংশোধনের প্রয়োজন হইয়া উঠে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পর বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে এবং মিশ্র তান্ত্রিক মত ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে উক্ত তান্ত্রিক মত বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ শক্তি-উপাসনারও তৎকালে লোপ ঘটে নাই। রঘুনন্দনের স্মৃতি ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। মিশ্র তান্ত্রিক মতের সহিত মুসল্‌মান আচার ব্যবহার মিশ্রিত হইয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সমাজমধ্যে

ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছিল। মদ্যপ ও অভক্ষ্যভক্ষক জগাই মাধাই প্রভৃতির জীবনী হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এবং মেলবন্ধনের বিবরণ আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নানা রূপ দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। এক প্রকারের দোষযুক্ত কুলীনগণ এক মেলভুক্ত হন। নবদ্বীপ প্রদেশের নিকটস্থ মুর্শিদাবাদ প্রদেশেরও অবস্থা যে ঐ প্রকারই হইয়াছিল তাহাও অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারের জন্য যে সকল শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদ প্রদেশও তাহার ফললাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার, স্মৃতির ব্যবস্থা প্রচলন, মেলবন্ধন প্রভৃতি সমস্ত বঙ্গদেশের ন্যায় মুর্শিদাবাদ প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন ছিল না, এমন নহে। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী এবং চৈতন্যের পূর্ব্বে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের অবস্থান দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। চণ্ডীদাস প্রভৃতির জীবনী ও পদাবলী হইতে জানা যায় যে, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম মিশ্র ভাবে প্রচলিত ছিল। নিত্যানন্দের অবধূতাশ্রমগ্রহণও তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। চৈতন্যের পর হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অধিকতর প্রেমাত্মক করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহা একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হইয়া সম্প্রদায়বিশেষের সৃষ্টি করিয়া তুলে। যে মুসল্‌মান ধর্ম্ম হিন্দুদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারই অনুচরগণ আবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। শক্তি-উপাসকগণও শক্তিমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে মুসল্‌মান, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সংঘর্ষণ সমাজমধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া

চলিয়াছিল। অন্য দিকে রঘুনন্দনের স্মৃতিমত প্রচারিত হওয়ায়, হিন্দুগণের আচার ব্যবহার, পূজা উপাসনাও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে। রঘুনন্দনের পূর্ব্বে যে এতদ্দেশে স্মৃতির মত প্রচলিত ছিল না, এমন নহে; কিন্তু রঘুনন্দন তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিয়া তুলেন। তৎকালে সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালেও নানাপ্রকার দেবদেবীপূজার উৎসব হইত, তন্মধ্যে শরৎকালের দুর্গোৎসবই প্রধান। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়ই অনুষ্ঠিত হইত। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও এইরূপই সুসম্পন্ন হইতে দেখা যাইত। ক্রিয়া উপলক্ষে কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ আগমন করিতেন। পুরুষেরা উপ-যুক্ত দোলা ও স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাচ্ছাদিত দোলা যানস্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ক্রিয়াসভায় মাল্যচন্দনদান উপলক্ষে কুলীনদিগের মধ্যে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা হইত। দধি, চিড়া ও অন্ন ব্যঞ্জনের ব্যব-হারই দেখা যাইত। বৈষ্ণবেরা ভোজ উপলক্ষে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন ও মিষ্টদ্রব্য ব্যবহার করিতেন। দেবতাকে প্রথমে নিবে-দন করিয়া সেই সমস্ত প্রসাদরূপে প্রদান করা হইত। তৎকালে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইমাত্র বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে ব্রাহ্মণের পক্ষে দশ দিন ও অন্যান্য সকল জাতিকে শূদ্র স্থির করিয়া তাহাদের পক্ষে ত্রিশ দিন অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। * শূদ্রদিগের মধ্যে কায়স্থ,

* বঙ্গদেশের প্রাচীন হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ও কোন কোন স্থানে বৈদ্যেরা উপনয়ন ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রঘুনন্দনের সময় বৈদ্যগণ

বৈদ্য, বণিক্, নবশাখ ও তদ্ভিন্ন অনেক নীচ জাতিও ছিল। ব্রাহ্মণসন্তানেরা সাধারণতঃ চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি পাঠ করিতেন। পরে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। রঘুনাথ শিরোমণি যে নব্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলন করেন, অনেকে তাহাই অধ্যয়ন করিতেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ যাজন পৌরহিত্যাদি এবং অনেকে চাকরী প্রভৃতি বৃত্তিও অবলম্বন করিতেন। কায়স্থগণ ফারসী

যে শূদ্ররূপে গণ্য ছিলেন, তাহা তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অবগত হওয়া যায়। বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভজাত অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। রঘুনন্দনের মতে কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য, অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্র, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল জাতিরই ত্রিশ দিন অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের পর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্য্য নুলো পঞ্চাননের উক্তি হইতে জানা যায় যে, রাঢ়, বঙ্গ সকল স্থানের বৈদ্যগণই শূদ্র ছিলেন, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যাজনাদি করিতেন না। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কুলাচার্য্য ভরত মল্লিক রঘুনন্দনের মত অবলম্বন করিয়া বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং সে সময়েও বৈদ্যেরা শূদ্রবৎই ছিলেন। ভরত মল্লিক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং দুই শত বৎসরের পর হইতে বৈদ্যেরা উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে বৈদ্যেরা উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ কি না, তাহা বুঝা কঠিন। মহাভারতের মতে শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈদ্য। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইলেও মনু ও বৌধায়নের মতে তাঁহারা দ্বিজ নহেন। মনু ও বৌধায়নের মতে সজাতিজ ও অনন্তরজ সন্তান দ্বিজ হন। অম্বষ্ঠ একান্তর হওয়ায় তাঁহারা দ্বিজপদবাচ্য নহেন অমরকোষে অম্বষ্ঠগণ শূদ্র বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং বৈদ্যের অম্বষ্ঠ হইলেও শূদ্র। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা যে শূদ্র ছিলেন, তাহা রঘুনন্দন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

আদি লেখা পড়া শিখিয়া রাজদরবারে ও অন্যান্য স্থানে নানা প্রকার চাকরী গ্রহণ করিতেন। বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। গন্ধবণিকেরা গন্ধ-দ্রব্যাদির, শঙ্খবণিকেরা শঙ্খের, কাঁসারীরা বাসনের, সুবর্ণবণি-কেরা সোণারূপার ব্যবসায় করিতেন। তাম্বূলীরা পান সুপারির দ্বারা বীড়া করিয়া বিক্রয়, বারুজীরা বরজ নির্ম্মাণ ও পান বিক্রয়, তাঁতী, কুম্ভকার, কামার সকলেই স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন। কৈবর্ত্তগণের এক শ্রেণী মৎস্য ধরার ও আর এক শ্রেণী চাষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। অন্যান্য অন্ত্যজ জাতিরা নানা-রূপ ব্যবসায় করিত। মুসল্‌মানগণের মধ্যে সৈয়দ, মোল্লা, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসল্‌মানগণ মস্তক মুণ্ডন ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া ইজার, অঙ্গরাখা ও টুপি পরিধান করিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ, মালাজপ, দরগায় বাতি দেওয়া প্রভৃতি তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্য ছিল। কেতাব কোরাণ লইয়া তাঁহারা আলোচনা করিতেন। হীনাবস্থ মুসল্‌মানগণ কৃষিকার্য্য ও চাকরী প্রভৃতি বৃত্তিও করিত। তাঁহাদের মধ্যে জোলাগণ বস্ত্রের, মুকেরিগণ বলদবহনের, কাবারিগণ মৎস্যবিক্রয়ের, সানাকরগণ বস্ত্রের সানাবন্ধনের, কাগজিগণ কাগজনির্ম্মাণের ও অন্যান্য অনেক মুসল্‌মান নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত। পাঠানরাজত্বকালে গৌড়ের বাদসাহের অধীনে এক এক স্থানে কাজী নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা শাসন ও বিচার উভয়বিধ কার্য্য করিতেন। কিন্তু মোগলরাজত্বকালে ফৌজদারগণ নিযুক্ত হইয়া শাসনভার গ্রহণ করেন এবং কাজীগণের হস্তে বিচারভার অর্পিত হয়। জমীদার-গণ ডিহিদার, তালুকদার প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন।

কৃষকগণের অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ ছিল না। যে সমস্ত প্রজা করদানে অক্ষম হইত, জমীদারেরা তাহাদের ধান্য বলদ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া খাজানা আদায় করিতেন। তৎকালে দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। রৌপ্য তাম্রমুদ্রার সহিত কড়িরও প্রচলন ছিল। মুর্শিদাবাদ প্রদেশের কৃষির অবস্থা মন্দ ছিল না। অন্যান্য শস্যের চাষের সহিত তুতগাছের চাষ অধিক পরিমাণে হইত, তাহাদের পাতা রেশমকীটের আহারে লাগিত। অনেকে পলু বা রেশমকীটের ব্যবসায় করিত। রেশমী বস্ত্র, গজদন্ত, মসলিনের ব্যবসায়ের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আমরা প্রকৃত ইতিহাসারম্ভের পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের সাধারণ অবস্থা প্রদান করিলাম। পর অধ্যায় হইতে মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস আরব্ধ হইবে এবং তৎসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।



নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ

চতুর্থ অধ্যায়।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

মুর্শিদকুলীর প্রকৃত ইতিহাসারম্ভের সূচনা।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস আরব্ধ হয়। সেই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক মহা রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিয়াছি। যে সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের দ্বারদেশে উপনীত হইতেছিল, এবং মহারাষ্ট্রীয় ইংরাজ ও ফরাসীগণ নব নব রাজ্যস্থাপনে আপনাদিগের বিজয়িনী শক্তি প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদ নামে একটী সামান্য নগরের আকারে অবস্থিতি করিত। বাঙ্গলার কার্য্যদক্ষ দেওয়ান, অবশেষে নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ সেই সামান্য নগরে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গরাজ্যের রাজধানী হওয়ায় আমরা তদবধি তাহার প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইতে পারি এবং মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস বলিলে তদ্দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র বাঙ্গলার ইতিহাসই বুঝিয়া থাকি। আমরা প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্ব্ব

বিবরণ প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকৃত ইতিহাস প্রদানে চেষ্টা করিতেছি।

মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব বিবরণ।

মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঘোরতর দারিদ্র্যে নিস্পেষিত হওয়ায় তাঁহার পিতা হাজী সফী নামক জনৈক পারসীক ব্যবসায়ীর নিকট আপন পুত্রকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। হাজী সফী তাঁহাকে ইস্পাহানে লইয়া যান ও তথায় মুসল্মান সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয়কে মহম্মদ হাদী আখ্যা প্রদান করেন। সফী মহম্মদ হাদীকে নিজ সন্তানগণের ন্যায় রীতিমত সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। হাজী সফীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ মহম্মদ হাদীকে দাসত্ব হইতে মোচন করিয়া দেন ও তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। দাক্ষিণাত্যে আগমন করার অব্যবহিত পরেই তিনি বেরারের দেওয়ান হাজী আবদুল্লার অধীনে একটী সামান্য কর্ম্ম প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে আপনার আয়ব্যয়সংক্রান্ত জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তাঁহার ক্ষমতার কথা দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট তাঁহাকে একজন উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদ শূন্য থাকায় মহম্মদ হাদীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তথায় তাঁহার কার্য্যদক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সম্রাট তাঁহার পারদর্শিতায় মুগ্ধ হইয়া ১১১৩ হিজরী বা ১৭০১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্থান বাঙ্গলার

দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিয়া কারতলব খাঁ উপাধি প্রদান করেন। *

নাজিম, দেওয়ান ও কাননগো।

দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের সময় মোগল সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন সুবায় বিভক্ত হয় এবং সেই সময়ে বঙ্গ-রাজ্য মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত হইলে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা এক একটী স্বতন্ত্র সুবায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সুবায় এক এক জন সুবেদার নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য্য পরি-চালনের ভার গ্রহণ করিতেন, তিনি নাজিম নামেও অভিহিত হইতেন। প্রত্যেক সুবার শাসনকার্য্যের বন্দোবস্তের সহিত তাহার রাজস্ববন্দোবস্তেরও প্রয়োজন হয়। রাজা তোড়রমল্ল বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সের সাহাও একবার বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তের চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত সের সাহের প্রথা হইতে গৃহীত হয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তোড়রমল্ল বঙ্গরাজ্যকে যে বিভিন্ন সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক পরগণায় কাননগো নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপর এক জন প্রধান কাননগো নিযুক্ত করেন, এই প্রধান কাননগোর অধীনে একজন নায়েব কাননগো নিযুক্ত হইতেন। পরগণা কাননগোগণ জমীর পরিমাণ, নিরিখ, হস্তবুদ, রাজস্ব ও নানাবিধ

* তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, বাঙ্গলার দেওয়ানীপদপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, হায়দরাবাদের দেওয়ানীপদপ্রাপ্তির সময় তিনি কারতলব খাঁ উপাধি ও বাঙ্গলার দেওয়ানীলাভের সময় মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস সালাতীনে বাঙ্গলার দেওয়ানীপ্রাপ্তির সময় কারতলব খাঁ ও তৎপরে মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি পাওয়ার উল্লেখ আছে।

আবওয়াব এবং মাল লাখরাজ, জায়গীর প্রভৃতি জমীর তালিকা, সীমাসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ও আদায় অনাদায়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া প্রধান কাননগোর নিকট পাঠাইতেন। সরকারী রাজস্বের রসীদাদি ও সমস্ত ভূমির সীমাসম্বন্ধীয় কাগজপত্র নায়েব কাননগোর নিকট থাকিত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক স্থানের সদর কাছারী হইতে আগত সামান্য ইজারদারদিগের রাজস্বের হিসাব ও অন্যান্য অনেক কাগজপত্র তাঁহাকে রাখিতে হইত। প্রধান কাননগো নায়েব কাননগোকে তাঁহার কার্য্যের উপযোগী কাগজপত্র প্রদান করিতেন। নায়েব কাননগোকে অনেক বিষয়ে প্রধান কাননগোর সাহায্যও করিতে হইত এবং কাননগো-সেরেস্তার অনেক প্রধান প্রধান কার্য্যে তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। প্রধান কাননগো সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি রাজস্ববিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। যদিও পরিশেষে রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তাস্বরূপ একজন দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ায়, প্রধান কাননগোকে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী-রূপে গণ্য হইতে হইয়াছিল, তথাপি রাজস্ব বিভাগের সমস্ত বিষয়ে প্রধান কাননগোকে তত্ত্বাবধান করিতে হইত বলিয়া তিনিই কার্য্যতঃ উক্ত বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দেওয়ান নামে মাত্র কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইতেন। দেওয়ান ও প্রধান কাননগো বাদসাহের দরবার হইতে নিযুক্ত হইলেও সুবেদার বা নাজিমের সম্পূর্ণ অধীনে ছিলেন। এইরূপ বন্দোবস্তে রাজস্বের অনেক ক্ষতি হয় দেখিয়া এবং রাজনৈতিক গূঢ় কারণের জন্য নাজিমের ও প্রধান কাননগোর ক্ষমতাহ্রাসের কিছু প্রয়োজন হওয়ায়, বাদসাহ আরঙ্গজেব দুই জন প্রধান কাননগো নিযুক্ত

করিয়া, দেওয়ানের প্রতি রাজস্ববন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করেন এবং নাজিম হইতে তাঁহাকে স্বাধীন কর্ম্মচারীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। নাজিম ও দেওয়ানের কার্য্য পরিশেষে এইরূপে বিভক্ত হয়। বহিরাক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করা, অন্তর্বিবাদ নিবারণ ও প্রজাদিগকে আইনের বশে আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য নাজিমের দ্বারা সম্পন্ন হইত। কিন্তু রাজস্বসংগ্রহ ও রাজ্য-সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়নির্ব্বাহের ভার দেওয়ানের উপর বিন্যস্ত হয়। রাজ্যরক্ষার আবশ্যকীয় অর্থের জন্য দেওয়ানকে নাজিমের লিখিত আদেশ প্রতিপালন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে দেওয়ান সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। নাজিম অন্যায়রূপে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া রাজকোষের অর্থ নষ্ট করিলে বাদসাহের নিকটে তাঁহাকে দায়ী হইতে হইত। তিনি আপনার প্রাপ্য বেতন ব্যতীত নিজের প্রয়োজনের জন্য দেওয়ানের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। নাজিম ও দেওয়ান বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পরস্পরে পরামর্শ করিবার জন্য আদিষ্ট হইতেন এবং যখন যে নিয়ম প্রচলিত হইত, উভয়ে মিলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন। দেওয়ান ও নাজিমের কার্য্য বিভাগ করিয়া যেমন উভয়ের ক্ষমতার হ্রাস করা হয়, সেইরূপ প্রধান কাননগোর পদকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া তাঁহারও ক্ষমতার লাঘব করা হইয়াছিল। প্রধান কাননগোর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভগবান রায় প্রধান কাননগোর কার্য্য করিতেন। * তাহার পর

* ভগবান উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মিত্রবংশসম্ভূত। তাঁহার আদি নিবাস কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরডিহি গ্রাম। সাহুজার সময়ে তিনি প্রধান কানন-

তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ ও তৎপরে ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ইঁহারা 'বঙ্গাধিকারী' নামে অভিহিত হইতেন। হরিনারায়ণের সময় বাদসাহ আরঙ্গজেব প্রধান কাননগোর পদকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া একাংশের ভার হরিনারায়ণের প্রতি ও অপরাংশের ভার দেবকীনন্দন সিংহের পুত্র রামজীবন সিংহের প্রতি অর্পণ করেন।* প্রধান কাননগোগণ বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে দেওয়ানের অধীনে ছিলেন। এইরূপে দেওয়ানের প্রতি রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হয়।

কারতলব খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান।

কারতলব খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে আজিম ওশ্বান বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কারতলব খাঁ অত্যন্ত তৎপরতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি কাননগোগণের নিকট হইতে সমস্ত কাগজপত্র তলব করেন। এই সময়ে হরিনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ প্রথম কাননগো ও রামজীবনের পুত্র জয়নারায়ণ দ্বিতীয় কাননগোর কার্য্য করিতেন। বঙ্গভূমি চিরকাল স্বর্ণপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত, এমন শস্যশ্যামল দেশ পৃথিবীর অল্প স্থানেই আছে বলিয়া বোধ হয়। কৃষি ও বাণিজ্যে বাঙ্গলা ভারতের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ প্রদেশ।

গোর কার্য্য করিতেন বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। প্রধান কাননগোর বিস্তৃত বিবরণ মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর 'বঙ্গাধিকারী' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু চিরকাল তথা হইতে সম্রাটসরকারে অল্প পরিমাণে রাজস্ব প্রেরিত হইত। কারতলব খাঁ তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, বঙ্গভূমি বাস্তবিকই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু রাজস্বের অধিকাংশ অসদুপায়ে ব্যয়িত হয়। এই প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আপনার পরিচিত দক্ষ ও উপযুক্ত আমীন বা তহশীলদার নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করিলে দেওয়ান জানিতে পারিলেন যে, বাঙ্গলার রাজস্ব হইতে এক কোটী টাকা প্রেরিত হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানদিগের সময়ে বাঙ্গলা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অনুর্ব্বর দেশ বলিয়া প্রচারিত ছিল, তজ্জন্য রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি সৈনিক বিভাগের জায়গীর-রূপে * ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে বিভক্ত হইত। কেবল অতি সামান্য পরিমাণ ভূমির রাজস্ব রাজকোষে যাইত। সুতরাং এই অত্যল্প রাজস্ব হইতে নাজিমের এবং সৈন্যসংক্রান্ত ও বিচার-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের বেতনাদির ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ ঘটিয়া উঠিতনা, সেইজন্য কোন কোন সুবা হইতে ইহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থগ্রহণের প্রয়োজন ঘটিত। কারতলব খাঁ এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বাঙ্গলার যাবতীয় জায়গীর পুনর্গ্রহণের এবং উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানের ভূমি কর্ম্মচারিগণের নিমিত্ত নির্দ্দেশের জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। সম্রাট দেওয়ানের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। তদনুসারে উড়িষ্যার ভূমি

* যাঁহারা রাজসরকারে কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সাহায্য করিতেন, তাঁহারাই সৈনিক জায়গীর প্রাপ্ত হইতেন।

জায়গীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জায়গীরদারদিগের সাহায্যে উক্ত প্রদেশের রাজস্বও সুচারুরূপে সংগৃহীত হইতে আরব্ধ হয়। বাঙ্গলায়ও দেওয়ানের আদেশে জমীদারগণের করবৃদ্ধি এবং অনেক ভূমির নূতন বন্দোবস্ত হইয়া সন সন খাজানা আদায় হইতে লাগিল। এই প্রকারে জমীদারগণ দেওয়ানের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিতে বাধ্য হন। নিজামত ও দেওয়ানীর ব্যয় ভিন্ন বাঙ্গালার রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ব্যয়িত হইতে পারিত না। এইরূপে বাঙ্গালার রাজস্ববৃদ্ধি দেখিয়া সম্রাট্ আরঙ্গজেব কারতলব খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

নবাব আজিম ওশ্বান ও দেওয়ান কারতলব খাঁ।

কারতলব খাঁর এই প্রকার কার্য্যদক্ষতায় সম্রাট্ সন্তুষ্ট হওয়ায়, নবাব আজিম ওশ্বান মনে মনে দেওয়ানের উপর বিরক্ত হইলেন। বিশেষতঃ যাবতীয় অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানের একমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকায় ও অনেক সময়ে নবাবের কার্য্যের প্রতিবাদ করায়, সুবেদার আপনাকে যারপরনাই অবমানিত মনে করিতে লাগিলেন। ইহার উপর তাঁহার পারিষদ ও অনুচরবর্গের বিলাসপ্রযুক্ত অযথা ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে দেওয়ান স্বীকার না করায়, তাঁহার বিদ্বেষবহ্নি ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তিনি কি প্রকারে এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন ইহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। সম্রাটবংশধর হইয়া একজন সামান্য দেওয়ানের ভ্রূকুটি সহ্য করা তাঁহার পক্ষে বড়ই লজ্জাস্কর বোধ হইতে লাগিল। নবাব প্রকাশ্য ভাবে দেওয়ানের শত্রুতাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। কারণ তিনি পিতামহ আরঙ্গজেবকে বিশেষরূপে

জানিতেন এবং দেওয়ানও যে তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ইহাও তাঁহার অবিদিত ছিলনা। দেওয়ানের অনিষ্টসাধন করিলে পাছে সম্রাট তাঁহাকে কোন রূপ দণ্ড প্রদান করেন, এই ভয়ে অনেক সময়ে তাঁহাকে নীরবে সমুদয় সহ্য করিতে হইত। অথচ দেওয়ানের ব্যবহার তিনি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না। এই প্রকার দোলায়মান চিত্তে কালযাপন করা দুষ্কর বিবেচনায় তিনি বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়াসী হইলেন। সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হইল। আবদুল ওয়াহেদ নামে এক জন সর্দ্দারের অধীনে এক দল নগদী সৈন্য অনেক দিন হইতে নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেছিল; তাহারা দেওয়ানের নিকট হইতে আপনাদিগের বেতনাদি লইত। কিন্তু অন্যান্য সৈন্য ও সেনা-পতিবর্গ জমীদারগণের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব হইতে আপনাদিগের বেতন প্রাপ্ত হওয়ায়, নগদী সৈন্যেরা তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিত। এক্ষণে আবদুল ওয়াহেদ নবাব আজিম ওশ্বানকে দেওয়ানের প্রতি অসন্তুষ্ট জানিয়া তাঁহার প্রাণনাশের জন্য নবাবের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিল যে, যদি তিনি তাহাকে অথবা তাহার উত্তরাধিকারিবর্গকে অধিক পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে সে দেওয়ানকে অনায়াসে নিহত করিতে পারে। নবাব তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন এবং স্থির হইল যে, যখন দেওয়ান নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজপ্রাসাদে আগমন করিবেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার জীবলীলার অবসান করিতে হইবে। দেওয়ান কারতলব খাঁ যদিও অনেক বিষয়ে নবাবের প্রতিবাদ করিতেন, তথাপি কখনও তিনি তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই। এক দিন

প্রাতঃকালে তিনি নবাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছায় আপনার বাসভবন হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিতে না করিতে আবদুল ওয়াহেদের সৈন্যগণ তাঁহার পথ অবরোধ করিল এবং চীৎকারপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রাপ্য বেতনের প্রার্থনা করিয়া এক হাঙ্গামা উপস্থিত করিল। দেওয়ান সর্ব্বদাই সশস্ত্রে গমন করিতেন। তিনি তাহাদিগের এরূপ ব্যবহারে ভীত না হইয়া আপন অনুচরবর্গকে পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন। তৎপরে নগদী সৈন্যগণ পলায়ন আরম্ভ করিল। দেওয়ান অক্ষত শরীরে প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া এবং আজিম ওশ্বানকে এই সকল কার্য্যের মূল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে যারপরনাই তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিজের তরবারিতে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন, "যদি আপনি আমার জীবন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আসুন, আমরা এইখানেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, অন্যথা যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত না হয় তজ্জন্য সতর্ক হইবেন।" আজিমওশ্বান দেওয়ানের ব্যবহারে ভীত হইয়া আপনার নির্দ্দোষিতাপ্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে আবদুল ওয়াহেদকে আহ্বান করিয়া তাহার অনুচরবর্গের এরূপ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতে ঐ প্রকার কার্য্য হইলে তিনি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু দেওয়ান ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তথা হইতে দেওয়ানী আমে গমন করিয়া আবদুল ওয়াহেদকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগের প্রাপ্য বেতনাদি

পুত্রনাপুত্ররূপে পরিদর্শন করিয়া একজন জমীদারের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। পরিশেষে তাহাকে ও তাহার সৈন্যগণকে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

কারতলব খাঁ বাসভবনে প্রত্যাগত হইয়া উপরোক্ত ঘটনার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সাক্ষরসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি নবাবের এরূপ ব্যবহারে ঢাকায় অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া, ঢাকা পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বাঙ্গালার মধ্যে একটী উপযুক্ত স্থানে দেওয়ানী কার্য্যালয় স্থাপনের জন্য স্বীয় আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, মুখসুসাবাদই দেওয়ানীর পক্ষে উপযুক্ত স্থান।* কয়েকটী কারণে মুখসুসাবাদ দেওয়ানী কার্য্যের উপ-

কারতলব খাঁর মুখসুসাবাদে আগমন।

* অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে যে মুখসুসাবাদ একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদের প্রতিষ্ঠা বা নামকরণ হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। মুর্শিদাবাদ প্রদেশে একটি সাধারণ প্রবাদ এই যে, বাদসাহ হোসেন সাহের সময় মুখসুদন দাস নামে কোন নানকপন্থী সন্ন্যাসী তাঁহার পীড়া শান্তি করিয়া এই স্থান লাখরাজস্বরূপে প্রাপ্ত হন এবং সন্ন্যাসীর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম মুখসুদাবাদ হয়। কেহ কেহ মুখসুদ সাহ হইতে ইহার নাম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। রিয়াজুস সালাতীনের মতে মুখসুস খাঁ নামক কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হইতে ইহার মুখসুসাবাদ নামের সৃষ্টি হয়। আকবর নামায় বঙ্গের শাসন কর্ত্তা সায়েদ খাঁর ভ্রাতা মুখসুস খাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি বাঙ্গালাবিহারের নানা স্থানে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন· এই মুখসুস খাঁ রিয়াজের লিখিত মুখসুস কিনা বলা যায় না। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে

যুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ স্থানটী অতি মনোহর। মন্থরগামিনী ভাগীরথী ধীরে ধীরে ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, উগ্রচণ্ডা পদ্মার ন্যায় তিনি কখনও সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ স্থানটী অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তৃতীয়তঃ মুখসুসাবাদ বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উড়িয্যা ও বিহার প্রদেশ হইতে অধিক দূরে নহে। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় বিহারের সন্নিহিত রাজমহল ও বাঙ্গলার দ্বারস্বরূপ তিলিয়াগড্ডী ও শকরীগলি। পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় বীরভূম, পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর এবং ঝারখণ্ড প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ। এই সমস্ত স্থান দাক্ষিণাত্য ও হিন্দুস্থানের সীমান্তস্বরূপ। দক্ষিণে ও পূর্ব্বে উড়িষ্যাসংলগ্ন বর্দ্ধমান, হুগলী ও হিজলী এবং পূর্ব্ব ও উত্তরে জাহাঙ্গীরনগর ও ভূষণা প্রভৃতি পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধান প্রধান বিভাগ। সুতরাং এই স্থানটী বাঙ্গলার রাজস্বসংগ্রহের পক্ষে যে বিশেষরূপ উপযোগী তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ বাঙ্গালার বাণিজ্যকার্য্য পরিদর্শনের পক্ষে মুখসুসাবাদই উপযুক্ত স্থান ছিল। কারণ, ভাগীরথী বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রসারণের সর্ব্বপ্রধান পথ এবং গঙ্গা, পদ্মা ও জলঙ্গী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীর সহিত তাহার সংযোগ থাকায়, তত্তীরবর্ত্তী অথচ বাঙ্গালার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত মুখসুসাবাদ বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত

লিখিত টিফেনথেলারের মতে মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদ আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে টেভারনিয়ার ইহাকে মেদসৌবাজার-কি (Madesoubazarki) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উহা সায়েস্তা খাঁর দেওয়ানের বাসস্থান ছিল।

স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ ঐ সময়ে কাশীমবাজারে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য কুঠী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাহাদের গতিবিধি পর্য্যালোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের কোন রূপ অত্যাচার না থাকায়, পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান করার বিশেষ কোন রূপ প্রয়োজন ছিল না। এই সমুদয় কারণ বিবেচনা করিয়া দেওয়ান কারতলব খাঁ কানুনগো ও থালসা বা রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুখসুসাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কুলুড়িয়া * নামক পতিত মৌজায় দেওয়ানখানা ও মহলসরা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষতাসহকারে দেওয়ানী কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জগৎশেঠবংশের আদিপুরুষ মাণিকচাঁদও দেওয়ানের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন।

আজিম ওশ্বানের বিহারে গমন।

দেওয়ানের লিখিত তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টার সংবাদ যথা সময়ে সম্রাটের নিকট পঁহুছিলে, তিনি পৌত্র আজিমওশ্বানের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্রাট্ তথা হইতে আজিমকে এইরূপ পত্র লিখিলেন যে, ইহার পর যদি দেওয়ানের শরীর অথবা সম্পত্তির কোন রূপ সামান্য ক্ষতি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আজিম ওশ্বানকে তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইবে এবং তৎসঙ্গে এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইল যে, নবাব তাঁহার পত্রপ্রাপ্তি মাত্র বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বিহারে আপনার রাজধানী স্থাপন

* নিজামত কেল্লার পূর্ব্ব দিকের স্থান অদ্যাপি কুলুড়িয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

করিবেন। সুবেদার সম্রাটের এই প্রকার পত্র পাইয়া নিজের নির্দ্দোষিতাপ্রমাণের কোন রূপ চেষ্টা না করিয়া অবিলম্বে বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আপনার দ্বিতীয় পুত্র ফরখ্‌সেরকে সেরবলন্দ খাঁর তত্ত্বাবধানে ঢাকায় তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া, রাজকীয় নৌকাযোগে অন্যান্য পরিবারবর্গ ও কর্ম্মচারিগণের সহিত রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুল্‌তান সুজার প্রাসাদে কিছুকাল বাস করার পর স্থানটী অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায়, রাজধানী পাটনায় স্থানান্তরিত করিলেন এবং তথাকার দুর্গাদির সংস্কার করিয়া পিতামহের অনুমতিক্রমে স্বীয় নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম আজিমাবাদ রাখিলেন। তদবধি মুসল্‌মানগণ পাটনাকে আজিমাবাদ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।* এদিকে কারতলব খাঁ মুখসুসাবাদেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দেওয়ানের দাক্ষিণাত্যে গমন ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুখসুসাবাদের মুর্শিদাবাদ নামকরণ।

কারতলবখাঁ মুখসুসাবাদে আপনার আবাসস্থান স্থাপন করিলে, দেওয়ানী বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মচারীও তথায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। বৎসরের শেষে দেওয়ান আয়ব্যয়সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সময়ে বাঙ্গলার রাজস্ব কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, বাদসাহকে তাহা দেখাইবার জন্য নিজেই তৎসমুদয় লইয়া দাক্ষিণাত্যে সম্রাট-শিবিরে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তিনি সমস্ত কাগজপত্রে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া কাননগোদ্বয়কে আপনাপন নাম স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ করেন। তৎকালে দেওয়ানের হিসাব-

* Stewart's Bengal p 224.

পত্রে কাননগোর স্বাক্ষর না থাকিলে তাহা বাদসাহের নিকট পেশ হইত না। কিন্তু প্রধান কাননগো দর্পনারায়ণ আপনার প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা না পাইলে নাম স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন। দেওয়ান দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, কিন্তু দর্পনারায়ণ তাহাতে সম্মত হন নাই। অগত্যা দেওয়ানকে কেবল দ্বিতীয় কাননগো জয়-নারায়ণের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হয়। তিনি দাক্ষিণাত্যে বাদসাহদরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাট, উজীর ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীকে অনেক পরিমাণে নজর ও বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিয়া আয়ব্যয়সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পেশ করিলেন। উজীর উক্ত কাগজপত্র বিশেষরূপ পরিদর্শন করিয়া তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। পরিশেষে সম্রাট তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানী পদে এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী পদে নিযুক্ত করিয়া একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ, পতাকা, নাগরা ও তরবারি প্রদান করেন এবং সেই সময়ে কারতলব খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে মুর্শিদকুলী মোতমনউলমুল্ক আলাউদ্দোলা জাফর খাঁ নাসিরী নাসিরজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি ইতিহাসে মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। জাফর খাঁ বাঙ্গলায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুখসুসাবাদকে নিজ নামানুসারে মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করিয়া তথায় একটী টাঁকশাল, চেহেলসেতুন বা চত্বারিংশস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ ও অন্যান্য কার্য্যাগার নির্ম্মাণ

করেন ও তাহাকে বাঙ্গলার রাজধানীরূপে পরিণত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন।

ইংরাজ কোম্পানী।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উইলিয়ম নরিস্ নবগঠিত ইংলিশ কোম্পানীর পক্ষ হইতে ইংলণ্ডাধিপের দূত-স্বরূপ বাদসাহদরবারে উপস্থিত হন। নরিস্ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতবর্ষে এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মছলীপত্তন হইতে সুরাটে উপস্থিত হইয়া, পর বৎসরের প্রথমেই বাদসাহদরবারে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। সেই সময়ে লিটল্‌টন্ ইংলিশ কোম্পানীর অধ্যক্ষরূপে হুগলীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নরিস্ যে সময়ে সম্রাটের নিকট নূতন কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকারের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে ইংরাজ জলদস্যুগণ সুরাট ও মক্কার মধ্যে যে সকল মোগল জাহাজ গতায়াত করিত তাহাদের প্রতি অত্যাচার করায়, বাদসাহ ইংরাজদিগের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই দস্যুতা-সম্বন্ধে উভয় কোম্পানী পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিত। * তৎকালে যে কয়খানি মোগল জাহাজ ইংরাজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল, সেইগুলি যাহাতে প্রত্যর্পিত হয় ও ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার জন্য নরিস্ যদি দায়ী হইতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে নরিসের প্রস্তাব বিবেচিত হইতে পারে বলিয়া উজীর স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। নরিস্ তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, কোন বিষয় স্থির হইল না। সম্রাট জলদস্যুগণের অত্যাচারে এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, অবশেষে ১৭০১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি

* Wilson's Annals Vol. I.

সাম্রাজ্যস্থিত যাবতীয় ইউরোপীয়কে ধৃত ও কারারুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। বাদসাহের আদেশে ১৭০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পাটনা, রাজমহল ও কাশীমবাজারের এবং ৩০শে মার্চ সমস্ত ইউরোপীয় কুঠী অধিকারের চেষ্টা হয়। ঐ সমস্ত কুঠীর কর্ম্মচারিবর্গ যাবতীয় সম্পত্তিসহ কারারুদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবগঠিত ইংলিশ কোম্পানীকে এই আদেশে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় ৬২ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। পুরাতন লণ্ডন কোম্পানীর তাদৃশ অধিক পরিমাণে ক্ষতি হয় নাই। তাহাদের অধিকাংশ সম্পত্তি সুরক্ষিত কলিকাতায় অবস্থিত হওয়ায়,তৎসমুদয় রক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল ১৭০২ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার কলিকাতার ইংরাজ সম্পত্তি অধিকারের আদেশ দেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বিয়ার্ড সাহেব পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়ায়, মোগল কর্ম্মচারীরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অধ্যক্ষ বিয়ার্ড ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া তথায় অধিক পরিমাণে কামান ও সৈন্য স্থাপন করেন। তিনি মোগল কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দেওয়ার পরিবর্ত্তে বারুদ ও গোলাগুলিতে অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন এবং মোগল শাসনকর্ত্তাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে, বাদসাহদরবারে দূত প্রেরণ অপেক্ষা সৈন্যসংগ্রহ ও দুর্গনির্ম্মাণ তাঁহার নিকট শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সময়ে আজিম ওশ্বান ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় বঙ্গদেশে বিশেষ কোন রূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। বিয়ার্ড ৫ হাজার টাকা দিয়া হুগলীর ফৌজদারকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদার তদপেক্ষা অধিক টাকার দাবী করায় বিয়ার্ড নিরস্ত হন এবং মোগল

জাহাজ আটক করিয়া ফৌজদারকে ভয় প্রদর্শন করেন। আজিম ওশ্বান রাজমহলস্থ ইংরাজ বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইংরাজদিগের বাণিজ্যপরিচালনের জন্য বাদসাহের ঘোষণাপত্র উপস্থিত হয়। দেওয়ান কারতলব খাঁ মুখসুসাবাদে আগমন করার অব্যবহিত পরেই ইংরাজদিগকে বাণিজ্যাদেশ দেওয়ার জন্য বিশ হাজার টাকার দাবী করিয়া বসেন। ইংরাজেরা তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে, সমস্ত ইউরোপীয় জাতির নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত ফার্ম্মান্ বা নিশান্ তলব করান হয়। ফরাসী ও ওলন্দাজগণ সাসুজার প্রদত্ত নিশান্ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহা উপস্থিত করিতে না পারায়, তাঁহারা দেওয়ানের কর্ম্মচারিবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া কোন রূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু দেওয়ানের মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম না হওয়ায়, ইংরাজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ কোন রূপ সুবিধা হয় নাই।

যুক্ত কোম্পানী ও দেওয়ান।

পুরাতন লণ্ডন কোম্পানী ও নবগঠিত ইংলিশ কোম্পানীর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গদেশে ইংরাজ-দিগের বাণিজ্যের নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিয়াছিল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে উভয় কোম্পানী মিলিত হওয়ার চেষ্টা হয় এবং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা মিলিত হইয়া "যুক্ত কোম্পানী" নাম ধারণ করে। উভয় কোম্পানী মিলিত হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীদ্বয়ের কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। বিয়ার্ড লণ্ডন কোম্পানীর ও লিটল্টন ইংলিশ কোম্পানীর স্বতন্ত্র অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। ইংলিশ কোম্পানীর কাউন্সিল

বা মন্ত্রণাসভা হুগলী হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। উভয় কোম্পানীর অধ্যক্ষদ্বয় স্বতন্ত্র ভাবে কোন কোন কার্য্য করিলেও যুক্ত কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনের জন্য ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একটী কাউন্সিল বা মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছিল। তাহাতে রবার্ট হেজেস্, রাল্‌ফ শেল্ডন্, ওয়াই-ওার, রসেল, নাইটিঙ্গেল, রেড্‌শ, বাউয়ার এবং প্যাটেল সভ্য নিযুক্ত হন। হেজেস্ ও শেল্ডন্ সভাপতির কার্য্য করিতেন। * এইরূপ বন্দোবস্ত "পর্য্যায়ক্রমিক শাসনপ্রথা" † নামে অভিহিত হইত। কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ায় পর্য্যায়ক্রমিক শাসনপ্রথায় নানারূপ অসুবিধা ঘটিতেছে দেখিয়া, কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অবশেষে বাঙ্গালার জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এইরূপে উভয় কোম্পানী মিলিত হইয়া দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে সনন্দলাভের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদিও ফোর্ট উইলিয়মকে সুদৃঢ় করিয়া ইংরাজেরা মোগল কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে তাদৃশ অত্যাচারের আশঙ্কা করিতেন না, তথাপি নানা কারণে তাঁহাদিগের সনন্দলাভের প্রয়োজন ছিল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে উভয় কোম্পানীর মিলনের চেষ্টা হইতেছিল, সে সময়ে লণ্ডন কোম্পানীর যে নামান্তর হইতে পারে, ইহা কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ দেওয়ানের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন নাই। কোম্পানীর বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণ উভয় কোম্পানীর পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন হাজার

* Summeries of the Bengal Public Consultation Books. (Wilson's Annals Vol. I.)

† 'Rotation Government.'

টাকা পেস্কস দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে যুক্ত কোম্পানী গঠিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমিক শাসনপ্রথা প্রচলিত হইলেও, তাঁহারা যুক্ত কোম্পানীর জন্য এক খানি মাত্র সনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। উক্ত অব্দের মার্চ্চ মাসে যুক্ত কোম্পানী প্রকাশ্য ভাবে কার্য্য পরিচালনের জন্য এক মোহরে দস্তক জারি করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে ইংরাজেরা তাঁহাদিগের বাণিজ্যের পুনর্ব্বন্দোবস্তের জন্য রাজমহল হইতে যুবরাজ আজিম ওশ্বানের আদেশ প্রাপ্ত হন। মার্চ্চ মাসেই হুগলীর ফৌজদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য উকীল রামচন্দ্র হুগলী গমন করেন এবং দেওয়ানের নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্তির নিমিত্ত জুন মাসে রাজারাম নামে একজন বিচক্ষণ উকীল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগত দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বালেশ্বরে প্রেরিত হন। রাজারামকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হয় যে, তিনি দেওয়ানকে বলিবেন; এক্ষণে উভয় কোম্পানী মিলিত হইয়া এক কোম্পানী হইয়াছে এবং তাঁহারা উক্ত যুক্ত কোম্পানীরই পক্ষ হইতে তিন হাজার টাকা মাত্র পেস্কস প্রদান করিবেন এবং দেওয়ান যে ১৫ হাজার টাকার দাবী করিয়াছেন তাহা প্রদান করিতে তাঁহারা একেবারেই অসম্মত, তাঁহাদের বাণিজ্য রোধ হওয়া কদাচ সঙ্গত নহে। হুগলীর ফৌজদার এক জন ইংরাজ প্রতিনিধিকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আহ্বান করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের জন্য অনেক টাকার উপহার চাহিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান ওলন্দাজদিগের নিকট ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি ইংরাজদিগের সামান্য উপহার অগ্রাহ্য করিয়া নগদ টাকার দাবী করেন। ১৫ বা ২০ হাজার টাকায় তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ইংরাজদিগকে অবাধ বাণিজ্যের আদেশ দিবার জন্য

২৫ হাজার টাকা চাহিয়া বসেন। ইংরাজ কোম্পানী যখন দেখিলেন যে, দেওয়ান কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না, তখন অগত্যা নানা উপহার ও অনেক পরিমাণে টাকা দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার ও কাশীমবাজার কুঠীর কার্য্যপরিচালনের নিমিত্ত বগ্‌ডেন ও ফীক্ নামক ইংরাজ প্রতিনিধিদ্বয়কে কাশীমবাজারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কাশীমবাজারে পঁহুছিতে না পঁহুছিতে বাঙ্গলায় সংবাদ আসিল যে, দিল্লীশ্বর আরেঙ্গজেবের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র ইংরাজ কোম্পানী প্রতিনিধিদ্বয়কে কাশীমবাজার হইতে প্রত্যাগমনের জন্য আদেশ পাঠাইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

আজিম ওশ্বানের বিহার পরিত্যাগ ও মুর্শিদকুলীর স্বাধীন ভাবে কার্য্যারম্ভ।

অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাট-শিরোমণি আরঙ্গজেব এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। * অনন্তর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া কিরূপে বাহাদুর সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আজিম ওশ্বানকেই তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির প্রধান কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, আজিম ওশ্বান বাঙ্গলার রাজস্ব হইতে ৮ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া ৩০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং আগরার যুদ্ধে পিতাকে সাহায্য করায়, বাহাদুরসাহ জয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাহাদুরসাহ আজিম ওশ্বানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী পদে নিযুক্ত করেন এবং তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রতি এলাহাবাদ শাসনেরও

* আরঙ্গজেবের মৃত্যুর তারিখসম্বন্ধে নানা রূপ মত ভেদ আছে। কাফি খাঁ প্রভৃতি ১১১৮ হিজরীর ২৮শে জেকদ্ তাঁহার মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণকার ২০শে জেকদ্ বলেন। এলফিন্‌ষ্টোন ও ষ্টুয়ার্ট ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বলিয়া থাকেন। উইলসন ৪ঠা মার্চ্চ বলেন। তাঁহার বয়স সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ ৮৯, কেহ ৯১ ও কেহ ৯৪ও বলিয়া থাকেন।

ভার অর্পিত হয়। কিন্তু সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামবক্সের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় আজিম ওশ্বানকে পিতার নিকট থাকিতে হয়। এই সময়ে বাদসাহের অনুমতিক্রমে আজিম ওশ্বান মুর্শিদকুলী খাঁকে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার, সৈয়দ হোসেন খাঁকে বিহারের * ও সৈয়দ আবদুল্লাকে এলাহাবাদের নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। ফরখ্সের তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতে থাকেন এবং সেরবলন্দ খাঁ তাঁহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। আজিম ওশ্বান বিহার পরিত্যাগ করিলে, মুর্শিদকুলী খাঁ সম্রাট বাহাদুর সাহের অনুমতিক্রমে বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফরখ্সেরকে নাম মাত্র প্রতিনিধি জানিয়া নিজেই দেওয়ানী ও নাজিমী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য স্বাধীন ভাবে পরিচালন করিতে লাগিলেন। তিনি সৈয়দ এক্রাম খাঁ ও স্বীয় জামাতা সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁকে যথাক্রমে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে মেদনীপুর প্রদেশ উড়িষ্যা হইতে খারিজ হইয়া বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূপতি রায় ও কিশোর রায় নামক দুই জন ব্রাহ্মণতনয়কে † তিনি যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ ও মুন্সীর পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত মুদ্রায় মুর্শিদাবাদ লিখিত হইতে আরব্ধ হয়।

* তারিখ বাঙ্গালায় হোসেন আলি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন বলিয়া লিখিত আছে।

† ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতে এই দুই জন তাঁহার স্বসম্পর্কীয় বলিয়া অনুমিত হন। মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাদিগকে এলাহাবাদ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার লাভের চেষ্টা।

বাদসাহ আরঙ্গজেবের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যমধ্যে নানা রূপ বিশৃঙ্খলা হইবে মনে করিয়া ইংরাজ কোম্পানী আপনাদের সমস্ত মালপত্র মফঃস্বল হইতে কলিকাতার ভাণ্ডারে আনয়ন করেন। সেই সময়ে পাটনা হইতে সংবাদ আসে যে, আজিম ওশ্বান পিতার সাহায্যের জন্য অনেক টাকা কর আদায় করিতেছেন ও ইংরাজদিগের নিকট এক লক্ষ টাকা দাবী করিয়াছেন। ইংরাজেরা তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের উকীলকে বন্দী হইতে হয়। কলিকাতার কাউন্সিল বা মন্ত্রণাসভা আজিম ওশ্বানকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। পাটনার উকীলের নিকট এইরূপ সংবাদ প্রেরিত হয় যে, পাটনায় কোন রূপ গোলযোগ ঘটিলে, তাঁহারা হুগলী প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিশোধ লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অতঃপর ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সুদৃঢ় করিতে যত্নবান হন। কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ কোন রূপ অসুবিধা ঘটিবে না ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। যখন তাঁহারা অবগত হইলেন যে, বাহাদুরসাহের নিকট হইতে মুর্শিদকুলী তিন প্রদেশের দেওয়ান ও বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজীম পদে নিযুক্ত হওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি ইংরাজদিগকে তাঁহাদের বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করার জন্য ও কাশীমবাজার কুঠীর কার্য্য পুনঃ পরিচালনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, তখন তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে চিন্তাকুল হইলেন। বিশেষতঃ সেই সময়ে নবীন সম্রাটের ভ্রাতা কাম্‌বক্স দক্ষিণাত্যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করায়, দিল্লীসাম্রাজ্য কাহার করায়ত্ত হইবে ইহাও নির্ণয় করা সহজ ছিল না। তাঁহাদের সোরার নৌকা যাহা পূর্ব্বেও নির্ব্বিঘ্নে

পঁহুছিতে পারিত না এক্ষণে তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তজ্জন্য পাটনা কুঠীর কার্য্য বন্ধ করার পরামর্শ চলিতেছিল। সেই সময়ে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে হুগলীতে এক জন নূতন ফৌজদার আগমন করেন। তিনি প্রথমতঃ ইংরাজদিগের সহিত মিত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অন্য প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করায়, কোম্পানী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জুলাই মাসে ফৌজদার স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগকে ইংরাজদিগের সহিত কারবার করিতে নিষেধ করিলেন, কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ অবমানিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারিবর্গ-কেও বন্দী করা হইল এবং কলিকাতা আক্রমণেরও ভয় প্রদর্শিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টানগণ কুজ কাওয়াজ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে সাজাদা ফরখ্‌সেরের খোয়াসীদার মীর মহম্মদ জাফর ফৌজ-দারকে শান্ত হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন ও ইংরাজদিগের বাণি-জ্যের কোনরূপ বাধা না দিতেও অনুরোধ করিলেন। ফৌজদার তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, দেওয়ানের আদেশে তাঁহাকে এই সমস্ত করিতে হইতেছে। মীর মহম্মদ জাফর ইংরাজদিগকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাণিজ্যাধিকারের আদেশ পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গলায় তদ্বিষয়ে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে রাজমহলে সাজাদার নিকট উকীল শিবচরণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বলিয়া পাঠান যে, তাঁহারা বাদসাহের নিকট হইতে সত্বর সনন্দ পাওয়ার আশা করিতেছেন এবং তাহা আসিলেই যুবরাজের নিকট প্রেরিত হইবে, এক্ষণে পুরাতন

সনন্দাদি প্রেরিত হইল। হুগলীর ফৌজদার কথঞ্চিৎ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে, কোম্পানী উকীলের দ্বারা সাজাদা ও দেওয়ানের নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাউন্সিল প্রথমতঃ ১৫ হাজার টাকা দিতে চাহেন, কিন্তু সাজাদা ও দেওয়ান তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, আরও ১৫ হাজার টাকা ও এক খানি দর্পণ যুবরাজের ও দুই খানি দেওয়ানের জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাঁহারা বলিয়া বসেন যে, ওলন্দাজেরা যখন ৩৫ হাজার টাকা দিয়াছেন তখন ইংরাজদিগকেও তাহাই দিতে হইবে। ৩৫ হাজার টাকার কথা শুনিয়া কোম্পানী কিছুতেই সম্মত হইলেন না এবং তাঁহারা পরিশেষে ২০ হাজার টাকার অধিক দেওয়া যুক্তি-যুক্ত মনে করিলেন না। ইহার কিছু দিন পরে শিবচরণ সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজ ও দেওয়ানকে ৩৬ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়া কোম্পানীর নামে হুণ্ডী কাটিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন ও শিবচরণের ব্যবহারে সন্দিহান হন। তাঁহারা প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে হুণ্ডী অমান্য করিবেন, পরে স্থির হইল যে, একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হউক। ইহার পর ফজল্ মহম্মদ রাজমহলে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইল যে, শিবচরণকে তিনি প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। ২২শে অক্টোবর ফজল্ মহম্মদ রাজমহল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিলেন যে, সাজাদা ও দেওয়ান প্রথমতঃ ৩৬ হাজার টাকায় সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ৫০ হাজার টাকা না পাইলে আদেশপত্র দিতে চাহিতেছেন না ও তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগকে সুরাটের রাজকোষে ১ লক্ষ

টাকা দিতে হইবে। ইংরাজেরা বিপন্ন হইয়া অবশেষে হুগলীর ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলেন। ফৌজদার এক্ষণে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাপ্য ৩ হাজার টাকায় কোম্পানীর পক্ষাবলম্বনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি ৩৫ হাজার টাকায় যুবরাজ ও দেওয়ানকে নিরস্ত করিবেন বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্য হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ আসিল যে, কোম্পানীর রাজমহলস্থ ইংরাজ প্রতিনিধি কথর্প সাহেব বন্দী হইয়াছেন এবং ১৪ হাজার টাকা না পাইলে যুবরাজ তাঁহাকে ও কোম্পানীর কোন নৌকা ছাড়িয়া দিবেন না। অতঃপর কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে সাহআলম কর্ত্তৃক কামবক্সের পরাজয় ও তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছিল, তথাপি কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ খিদিরপুরের কয়েক জন চৌকীদারকে তাঁহাদের নৌকা আটক করার জন্য ধৃত করিয়া বেত্রাঘাত করেন। এই সময়ে সাজাদা ফরখ্‌সের ও দেওয়ান মুর্শিদকুলী কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সেরবলন্দ খাঁর হস্তে বাঙ্গলা বিহার, ও উড়িষ্যার সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হয়।

জমীদার ও দেওয়ান, বীরভূম ও বিষ্ণুপুর।

বাদসাহ সাহআলমের নিকট হইতে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতি পাইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জমীদারগণের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। তাঁহার এই প্রকার কঠোরতায় রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু জমীদারগণকে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। দেওয়ান ভূমির

প্রকৃত মূল্য অবগত হওয়ার জন্য প্রধান প্রধান জমীদারদিগকে আবদ্ধ করিয়া, কয়েক জন কার্য্যদক্ষ আমীনের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা কৃষকগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দেওয়ান সমস্ত জমী পুনর্ব্বার জরিপ করিতে আদেশ দিলেন, এবং প্রত্যেক গ্রামের পতিত অনুর্ব্বর ভূমি কর্ষণোপযোগী করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আমীনগণ দুরবস্থ কৃষকগণকে শস্যাদির বীজক্রয়ের জন্য তাগাবী বা অগ্রিম অর্থ প্রদানে এবং প্রজাদিগের উৎপন্ন শস্য হইতে পরে উক্ত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আদিষ্ট হইলেন। জমীদারগণের হস্ত হইতে রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা অপহৃত হওয়ায়, তিনি তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য নান্‌কর* নামে একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তজ্জন্য কোন কোন স্থলে ভূমি ও কোন কোন স্থলে অর্থও নির্দ্দিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন বনকর ও জলকর নামে আরও দুইটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শিকার ও কাষ্ঠের জন্য জঙ্গল হইতে বৃক্ষছেদন বনকর এবং নদী ও ঝিলাদি হইতে মৎস্যগ্রহণ জলকর নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জমীদারকেই এইরূপ ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেবল দুই জন মাত্র নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম বীরভূমের জমীদার আসাদ উল্লা এবং দ্বিতীয় বিষ্ণুপুরের জমীদার রাজা দুর্জ্জন সিংহ। আসাদ্‌ উল্লা আফগানবংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি ঝারখণ্ডের পার্ব্বতীয় অধিবাসিগণের হস্ত হইতে আপনার অধিকৃত ভূভাগ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আসাদ্‌ উল্লার আয়ের অর্দ্ধাংশ দানাদি

* নান্‌ শব্দে রুটি বুঝায়।

সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত, তিনি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌দিগকে প্রতিপালন ও দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের জন্য অকাতরে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। আসাদ্ উল্লা অনেক মসজীদনির্ম্মাণ ও জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন এবং কখনও কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করেন নাই। দেওয়ান এরূপ সদাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তির জমীদারীতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজা দুর্জ্জন সিংহ গড়বেতার রাজাকে পরাস্ত করিয়া বগ্‌ড়ী পরগণা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ইঁহার সময় বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ মদনমোহনজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। * উক্ত মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দুর্জ্জন সিংহ আপনার আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশের জন্য দেওয়ানের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। যখন কেহ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইত, তখন তিনি দুর্গম স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিপক্ষ পক্ষের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেন। দেওয়ানও বিষ্ণুপুর প্রদেশ অনুর্ব্বর ও তথা হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন জানিয়া, এমন কি যাহা সংগৃহীত হইবে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, বিষ্ণুপুরের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই দুই ভূম্যধিকারী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, দরবারস্থ আপনাদিগের উকীলদ্বারা স্ব স্ব রাজস্ব প্রদান করার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

* বিষ্ণুপুররাজবংশীয়েরা এই মদনমোহনজীকে পরে কলিকাতা বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক দেন। এক্ষণে তিনি বাগবাজারের মিত্রবংশের দেবতাস্বরূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

আসাম, কোচবিহার ও ত্রিপুরা।

আসাম, কোচবিহার ও ত্রিপুরা অনেকবার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও পাঠান বা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। উক্ত প্রদেশের অধিপতিগণ চিরদিনই স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া, স্ব স্ব রাজ্যে আপনাদিগের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিতেন। তাঁহারা কখনও সম্পূর্ণরূপে দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া, তাঁহারা আপন আপন প্রদেশে শান্তিস্থাপনের প্রয়াসে নানাপ্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া, কুলী খাঁর সহিত মিত্রতাবন্ধনে বদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হন ও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। আসামের আহম বা ইন্দ্রবংশীয় রাজা রুদ্র সিংহ * সেই সময়ে জীবিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা আর কেহ আহমবংশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। রুদ্র সিংহ সেতু ও দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া অনেক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা হইতে গায়ক ও বাদক লইয়া গিয়া তিনি আসামে বাঙ্গলা গানবাদ্যের প্রচলন করিয়াছিলেন। রুদ্র সিংহ শেষ জীবনে মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মিত্রতাভঙ্গের ইচ্ছা করিলেও † তাঁহার পুত্র শিব সিংহ ‡ কুলী খাঁর সহিত মিত্র ব্যবহার রক্ষা করিয়াছিলেন। শিব সিংহেরও অনেক সৎকীর্ত্তিতে আসাম বা কামরূপ পরিপূর্ণ। তিনি অনেক নিস্কর ভূমি দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর রূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক বৃহৎ

* রুদ্র সিংহের অপর নাম চুখ্রুংফা।

† রুদ্র সিংহ বাঙ্গলা জয় করিয়া গঙ্গাকে আপনার রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

‡ শিব সিংহের নাম চুতনুফা।

বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। শিব সিংহের খনিত সুবৃহৎ শিবসাগর পুষ্করিণী হইতে শিবসাগর প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। আসামরাজ তাঁহার প্রতিনিধি বড় ফুকন * দ্বারা গজদন্তনির্ম্মিত শিবিকা ও চৌকী, মৃগনাভি, লাক্ষা, ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেন। কোচবিহাররাজ রূপনারায়ণও নানাপ্রকার উপহার প্রেরণ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া, বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ এই তিনটী পরগণা জমিদারীস্বত্বে প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে তাঁহার ছত্রনাজিরের নামে সুবেদারের নিকট কর পাঠাইতে হইত। পরিশেষে মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান হইলে, তাঁহাকে অনেক উপহার প্রদান করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন। রূপনারায়ণের স্থাপিত দেবমন্দিরাদি অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রূপনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণও কুলীখাঁর নিকটে উপহার পাঠাইতেন। ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্য হস্তী ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানা প্রকার দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। রত্নমাণিক্যের রাজত্বের প্রথম ভাগে সায়েস্তা খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করিয়া একবার তাঁহাকে বন্দী করেন, পরে তিনি পুনর্ব্বার ত্রিপুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রত্নমাণিক্য কুলী খাঁকে উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেওয়ান এই সমস্ত রাজাদিগের উপঢৌকন পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে খেলাত প্রদান

* রাজপ্রতিনিধিকে বড় ফুকন বলিত। তারিখ বাঙ্গলায় বাদলে ফুকন লিখিত আছে।

করিতেন। এই প্রকার উপঢৌকন ও খেলাতের বিনিময় অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এইরূপে জমিদারী বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়া কুলী খাঁকে সাজাদা ফরখ্‌সেরের সহিত কিছু কালের জন্য দিল্লী গমন করিতে হয়।

সেরবলন্দ খাঁ ও কোম্পানী।

ফরখ্‌সের ও মুর্শিদকুলী দিল্লী গমন করিলে সেরবলন্দ খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত কার্য্য-পরিচালনে নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলীর অনুপস্থিতিতে আপনাদিগের কার্য্যোদ্ধারের জন্য ইংরাজ কোম্পানী জন্ আয়ার ও প্যাটেল্‌কে প্রতিনিধিস্বরূপে সেরবলন্দ খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। সেরবলন্দ প্রথমতঃ ইংরাজদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া এইরূপ আদেশ দেন যে,যত দিন পর্য্যন্ত কোম্পানী নূতন সনন্দ না পান, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাণিজ্য কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে থাকিবে। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি রাজমহলে ইংরাজদিগের মালের নৌকা আটক করার আদেশ দিয়া বসেন। কোম্পানী তাঁহাকে ২ হাজার টাকা মূল্যের উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও সেরবলন্দ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ৪৫ হাজার টাকার দাবী করিলেন ও বর্ত্তমান দেওয়ান স্থায়ী হইলে, অথবা নূতন কেহ প্রেরিত হইলে, তিনি তাঁহার দ্বারা সনন্দ দেওয়াইতে প্রতিশ্রুত হন। ইংরাজেরা বিলম্ব করিলে, তিনি তাঁহাদের বাণিজ্য একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিবেন বলিয়াও ভয় প্রদর্শন করেন। মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীদিগকে ডাকাইয়া তাহারা কিরূপ মূল্যে ইংরাজদিগকে মালপত্র দিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়াও প্রকাশ করা হয়। সেরবলন্দ পরিশেষে এরূপ জ্ঞাপন করিলেন যে, সাজাদা ফরখ্‌সের গত বৎসর

পাটনার নৌকা হইতে ১৭ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন। ইংরাজেরা যদি তাহা দিতে না চাহেন, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন ইহাও ইংরাজেরা অবগত হইবেন। কলিকাতার কাউন্সিল অগত্যা প্যাটেলের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। প্যাটেল্ সের-বলন্দকে ৪৫ হাজার টাকা দিয়া, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার অবাধ বাণিজ্যের আদেশ লাভ করিলেন এবং হুগলী, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের জন্য বিশিষ্ট আদেশও লাভ করা হইল। বাদসাহের খাজানাখানার দারোগা ওয়ালী বেগ এই বিষয়ে প্যাটেলকে সাহায্য করার জন্য কলিকাতায় বিশেষরূপে অভ্যর্থিত ও সহস্র মুদ্রা মূল্যের উপহার প্রাপ্ত হইলেন। *

হুগলীর নূতন ফৌজদার জিয়া উদ্দীন খাঁ।

এই সময়ে মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্ট পিট্ সাহেব, বাহাদুর সাহের দরবারে ইংরাজ কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যাধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। পিট্ কলিকাতা কাউ-ন্সিলকে তাঁহার সহিত যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান, কিন্তু কাউন্সিল মুর্শিদাবাদ ও রাজমহলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় পিটের প্রস্তাবে মনোনিবেশ করেন নাই। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সেরবলন্দ খাঁ শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, ফরখ্সের আজিম ওশ্বানের প্রতিনিধি ও মুর্শিদকুলী খাঁ নায়েব নাজিম ও দেওয়ান নিযুক্ত হন। সেই সময়ে যিনি মুর্শিদকুলীর স্থানে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি কোম্পানীর সমস্ত মালপত্র ও নৌকা আটক করিয়া ২০ হাজার টাকা না পাইলে ছাড়িয়া দিবেন

* Wilson's Annals Vol. I.

না বলিয়া বসেন, কিন্তু কোম্পানী তাহা দিতে অসম্মত হন। তাহার পর উক্ত দেওয়ান ১৭১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নগদী পদাতিকগণের হস্তে নিহত হওয়ায়, ইংরাজেরা ১৭১০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালন করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে কাশীমবাজার কুঠী মেরামত করাও স্থির হয়। ইহার পর মুর্শিদকুলী খাঁ পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় আগমন করেন। '১৭১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীর ভাণ্ডারের দারোগা জিয়া উদ্দীন খাঁ হুগলীর ফৌজদার ও করমণ্ডল উপকূলের বন্দরসমূহের নৌসেনাপতি নিযুক্ত হইয়া মে মাসে হুগলীতে উপস্থিত হন। মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিট্ সাহেবের সহিত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিচয় ছিল এবং তিনি বরাবরই কোম্পানীর উপকারের জন্য যত্ন করিতেন। বাঙ্গলায়ও কোম্পানীর পক্ষাবলম্বনের জন্য তিনি প্রতিশ্রুত হন। কাউন্সিল প্রথমতঃ জনার্দ্দন শেঠ নামে তাঁহাদের জনৈক দালালকে হুগলীতে পাঠাইয়া দেন, পরে কোম্পানীর প্রতিনিধি চিঠি ও ব্লাউন্ট ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাণিজ্যসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসেন। পর্য্যায়ক্রমিক শাসনপ্রথার দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না দেখিয়া, কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এই সময়ে বাঙ্গলায় একজন প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন।' তদনুসারে মিষ্টার ওয়েল্ডেন্ বাঙ্গলার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া ১৭১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেপ্টেম্বর মাসে জিয়া উদ্দীন খাঁ কলিকাতায় আসিলে, তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা ও উপহার প্রদান করা হয়। জিয়া উদ্দীন দেওয়ানের আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র ভাবেই আপনার কার্য্য করিতেন। অক্টোবর মাসের শেষে তিনি কাউন্সিলকে লিখিয়া পাঠান যে, আজিম ওশ্বানের প্রতিনিধি যুবরাজ

ফরখ্‌সের রাজমহল হইতে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের আদেশ ও প্রেসিডেণ্টকে শিরোপা পাঠাইয়াছেন। নবেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারিবর্গ হুগলীতে গিয়া ফৌজদারের নিকট হইতে শিরোপা লইয়া আসিলেন। অতঃপর কোম্পানীর কার্য্য একরূপ শান্ত ভাবে চলিতে লাগিল।

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ ও ইংরাজ কোম্পানী।

১৭১০ খৃষ্টাব্দের শেষে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নায়েব নাজিম ও দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হন ও রাজ্যমধ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে রবার্ট হেজেস্‌ কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ এবং এডওয়ার্ড পেজ্‌, ষ্টকৃহাউস্‌ ও এজ্‌ তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, হেজেস্‌ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও কাশীমবাজার কুঠী মেরামত করিতে সচেষ্ট হন। সেই সময়ে অধ্যক্ষ ওয়েল্ডেন কার্য্য হইতে অপসৃত হওয়ায়, জন্‌ রসেল্‌ তাঁহার স্থলে অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হুগলীর ফৌজদার জিয়া উদ্দীনের নিকট আজিম ওশ্বান লিখিয়া পাঠান যে, অবাধ বাণিজ্যের ফার্ম্মানের জন্য কোম্পানী কি পরিমাণ অর্থ দিতে পারেন, তাহা তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ সুরাটের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহার উত্তর দিতে স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক ফার্ম্মানপ্রদানের পূর্ব্বে আজিম ওশ্বান কোম্পানীকে এক নিশান দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু দেওয়ান মুর্শিদকুলী এই সমস্ত বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। সেই সময়ে খাঁ জাহান বাহাদুরের বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান হওয়ার প্রস্তাব হয় এবং কোম্পানী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হন। তৎকালে

দিল্লীতে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আজিম ওশ্বান ফরখ্‌সেরকে তথায় আহ্বান করিয়া পাঠান এবং খাঁ জাহানের প্রতি উড়িষ্যার সুবেদারী ও বাঙ্গলার নায়েব নাজিমীর ভার অর্পিত হয়। তাহার পর বাদসাহ আজিম ওশ্বানকে বাঙ্গলার সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে, দেওয়ান তাঁহাকে ১২ শত সুবর্ণ মোহর নজর পাঠাইয়া দেন। ওলন্দাজেরাও তাঁহাকে ২ হাজার টাকার নজর পাঠান, কোম্পানীকেও অগত্যা তাহাই দিতে হয়। * হেজেস্‌ সাহেব দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সনন্দপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করেন। দেওয়ান প্রথমতঃ সনন্দের জন্য ৪৫ হাজার ও নিজের জন্য আরও ১৫ হাজার টাকা চাহেন, ক্রমে তিনি কোম্পানীর প্রতি আরও চাপ দিয়া বসেন। দেওয়ান স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, সাজাদাকে ৪৫ হাজার বাদসাহকে ১৫ হাজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীকে যথোপযুক্ত অর্থ প্রদান না করিলে,তিনি সনন্দের জন্য কোন রূপ চেষ্টা করিবেন না। এই সময়ে দেওয়ান ওলন্দাজদিগের ফার্ম্মান্‌ ও নিশান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের বাণিজ্য রোধ করিয়া ৩৩ হাজার টাকা দাবী করেন। কলিকাতার কাউন্সিলে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু দেওয়ান তাহাতে স্বীকৃত না হইলে ও কোম্পানীর নৌকা আটক করিয়া রাখিলে, কোম্পানীও মোগল নৌকা আটক করিয়া আজিম ওশ্বান ও বাদসাহকে সমস্ত বিষয় জানাইবেন বলিয়া দেওয়ানকে ভয় প্রদর্শন করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ আজিম ওশ্বানের নিকট হইতে ফার্ম্মান্‌ ও নিশান প্রাপ্তির ও দেওয়ানের ব্যবহার দিল্লীর দরবারে জানাইবার জন্য জিয়া উদ্দীন খাঁকে বারম্বার

* Wilson's Annal's vol. II. Summeries.

অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর আজিম ওশ্বান দেওয়ানকে ইংরাজদিগের বাণিজ্যরোধের নিষেধাজ্ঞা লিখিয়া পাঠান। কিন্তু দেওয়ান পরোক্ষভাবে কোম্পানীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কাশীমবাজারের কোন ব্যবসায়ী দেওয়ানের ভয়ে কোম্পানীকে মালপত্র দিতে সাহসী হইত না। অগত্যা কাশীমবাজারের কর্ম্মচারিবর্গ কুঠীর কার্য্য বন্ধ করিয়া সমস্ত মালপত্র নৌকায় বোঝাই দিয়া কলিকাতায় আসিতে প্রবৃত্ত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গকে কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, দেওয়ান কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের জন্য ফার্ম্মান্‌ ও নিশান দিতে অঙ্গীকার করেন এবং কোম্পানীর কোন প্রতিনিধিকে দিল্লীদরবারে যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠান। কিন্তু তাঁহার নিজের ছাড়পত্রের জন্য ৩০ হাজার টাকা ও ফার্ম্মানের জন্য সাড়ে বাইশ হাজার সিক্কা টাকার হুণ্ডী চাহিয়া বসেন। সেই সময়ে আবার জিয়া উদ্দীন খাঁ হুগলী হইতে অপসৃত হওয়ায় এবং হুগলী বন্দর প্রভৃতি দেওয়ানের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসায়,১৭১১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাউন্সিল অগত্যা দেওয়ানের প্রস্তাবে সম্মত হন। ঐ সময়ে রাজমহলে খাঁ জাহানকেও উপহার দিয়া নৌকা ছাড়ের পরওয়ানা লওয়া হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর নগরে বাহাদুরসাহ প্রাণত্যাগ করিলে, দিল্লীতে পুনর্ব্বার গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, দ্বিতীয় পুত্র আজিম ওশ্বান জ্যেষ্ঠ মৈজুদ্দীনের নিকট পরাজিত হইয়া কিরূপে নিহত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মৈজুদ্দীন পরিশেষে জাহান্দরসাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে আজিম ওশ্বানের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বাহাদুরসাহের মৃত্যুর পর তিনি আজিম ওশ্বানকে বাদসাহ স্বীকার করিয়া তাঁহার মুদ্রায় কি কথা অঙ্কিত হইবে, কর্ম্মচারী লহরীমালের দ্বারা তাহা নগরে ঘোষণা করিয়া দেন, এবং কেহ আজিম ওশ্বানের মৃত্যু সংবাদ লইয়া আলোচনা করিলে, তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রচার করেন। * কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সময়ে আজিম ওশ্বানের মৃত্যুই হইয়াছিল। ইহার পর জাহান্দরসাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাকেই সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন। আজিম ওশ্বান বাঙ্গলা পরিত্যাগ করার সময় ফরখ্‌সেরকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া যান। ফরখ্‌সের কয়েক বৎসর ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া, বাহাদুরসাহের রাজ্যাভিষেকের

ফরখ্‌সের ও মুর্শিদকুলী।

* Wilson's Annals vol. II,

পর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন ও লালবাগের প্রাসাদে কিছুদিন বাস করিয়া, * তথা হইতে রাজমহলে ও পরিশেষে পাটনায় গমন করেন। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তের প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাহাদুরসাহ ও আজিম ওশ্বানের মৃত্যুর পর ফরখ্‌সের পাটনায় সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলে, তিনি সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মুর্শিদকুলীকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান ও তাঁহার নিকট বাঙ্গলার রাজস্বের দাবী করেন। মুর্শিদকুলী তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া এইরূপ উত্তর দেন যে, যখন জাহান্দরসাহকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে কোন রূপ কার্য্য করিতে পারেন না। † কুলী খাঁর এইরূপ উক্তি শুনিয়া ফরখ্‌সের পাটনার শাসনকর্ত্তা নবাব সৈয়দ হোসেন আলিকে দেওয়ানের সমস্ত সম্পত্তি অথবা তাঁহার মস্তক আনিবার আদেশ দেন। কিন্তু হোসেন আলি যাইতে না পারায়, মির্জ্জা মহম্মদ রেজা ও মির্জ্জা জাফর প্রেরিত হন। সেই সময়ে ফরখ্‌সের ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ৪।৫ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বসেন ও পাটনার সকল লোকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন। ইংরাজেরা নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে আড়াই হাজার টাকা উপহার দিয়া কোন রূপে নিষ্কৃতিলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ‡ ফরখ্‌সেরের সৈন্যগণ মুর্শিদকুলীর নিকট হইতে

* Stewart.

† ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, এই সময়ে ফরখ্‌সের মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। বাস্তবিকই তিনি সে সময়ে পাটনায় ও তাহার পূর্ব্বে রাজমহলে ছিলেন।

‡ Wilson's Annals vol. II.

রাজস্ব আনয়ন করিতে গিয়া পরাজিত হইলে, সাজাদা পুনর্ব্বার ৫ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পাছে মুর্শিদকুলী পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লন, সেই জন্য দেওয়ানকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার জন্য ইংরাজদিগের প্রতি আদেশ দেন। এই সময়ে দেওয়ানের প্রেরিত বাদসাহের খাজানা ফরখ্‌সেরের পক্ষ হইতে এলাহাবাদে আটক করা হয়।

রসীদ খাঁ।

মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত গোলযোগ উপস্থিত হইলে, ফরখ্‌সেরের অনুচর মির্জা আজমীরী বা আক্রিসিয়ার খাঁর * ভ্রাতা রসীদ খাঁ সাজাদার নিকট হইতে বাঙ্গলা-শাসনের অনুমতি লইয়া তাঁহার সৈন্যসহিত মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি সসৈন্যে তিলিয়াগড্ডী ও শকরীগলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুলী খাঁ উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া নগর বাহিরে ২ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যকে শিবির সন্নিবেশের আদেশ প্রদান করিলেন। পরে সাধ্যানুসারে বহুসংখ্যক পদাতিক সংগ্রহ করিয়া কতিপয় কামানের সহিত রসীদ খাঁর আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রসীদ খাঁ মুর্শিদাবাদের তিন ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে, তিনি জৌনপুরবাসী সৈয়দ আনোয়ার ও মীর বাঙ্গালী নামক দুই ব্যক্তির উপর যুদ্ধের ভার অর্পণ করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আনোয়ার নিহত হইল এবং মীর বাঙ্গালী অগত্যা বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। কুলী খাঁ এই প্রকার বিপদের সংবাদ

* আক্রিসিয়ার খাঁর বীরত্বের কথা মুসল্‌মান লেখকগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ফরখ্‌সেরের রাজমহল হইতে যাওয়ার সময় মুলুক ময়দান নামে তোপ শকরীগলির নিকটে বসিয়া যাওয়ায়, আক্রিসিয়ার খাঁ তাহা নাকি উত্তোলন করিয়াছিলেন।

পাইয়া প্রথমতঃ মহম্মদ জান নামে নিজের এক জন অনুচরকে পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রাসাদরক্ষক প্রহরী ও কতিপয় সৈন্যের সহিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রসীদ খাঁর দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সময়ে রসীদ খাঁ মুর্শিদাবাদের নিকটেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুলী খাঁর আগমনে তাঁহার সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং দ্বিগুণ পরাক্রমের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিল।* তাহাদিগের আক্রমণে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ অস্থির হইয়া উঠিল। যখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময় বীর বাঙ্গালীর হস্ত হইতে একটী তীর রসীদ খাঁর ললাট বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে একেবারে ভূমিশায়ী করিয়া ফেলে। আপনাদিগের নায়কের দুর্দ্দশা অবগত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ধৃত ও বন্দী হয়। কুলী খাঁ জয় লাভ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং এই বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দিল্লীর পথে একটী স্তম্ভ স্থাপিত হইয়া তাহার প্রত্যেক কোণে রসীদ খাঁ ও তাঁহার অনুচরবর্গের মস্তক রক্ষিত হইল। রসীদ খাঁর মৃত্যুসংবাদে ফরখসের অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং সেই সময়ে সংবাদ আসে যে, খাঁ জাহান ও শকরীগলির দ্বার অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ে জাহান্দরের পুত্র এজুদ্দীন আগরার নিকটে উপস্থিত হওয়ায়, ফরখ্‌সের তাঁহার গতিরোধের জন্য আগরাভিমুখে যাত্রা করেন। গমনকালে তিনি ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ২ লক্ষ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের নিকট-

* মুসল্‌মান লেখকগণ বলেন যে, মুর্শিদকুলী সৈফী মন্ত্রের বলে বিপক্ষদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন!

(তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস সালাতীন)।

হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া লন। ইংরাজেরা ২২ হাজার টাকা দিয়া নিষ্কৃতিলাভে সক্ষম হন।

জিয়া উদ্দীন খাঁ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হুগলীর ফৌজদার জিয়া উদ্দীন খাঁ * স্বাধীন ভাবে আপনার কার্য্য পরিচালন করিতেন। কিন্তু তাহাতে নানাপ্রকার অসুবিধা হয় দেখিয়া মুর্শিদকুলী দেওয়ান ও নায়েব নাজিমস্বরূপে হুগলীর ফৌজদারী নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য সম্রাট বাহাদুরসাহের নিকট আবেদন করেন। সেই সময়ে ১৭১২ খৃঃ অব্দে জিয়া উদ্দীনের স্থানে আবুতালেব হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং মুর্শিদকুলী শুল্ক ও রাজস্বাদির বন্দোবস্তের জন্য ওয়ালীবেগকে আপনার নায়েব স্বরূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। প্রথমতঃ ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। জিয়া উদ্দীনও সহজে হুগলী পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নূতন ফৌজদারের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। আবুতালেব ইংরাজদিগকে তাঁহার সাহায্যের জন্য সংবাদ দিলে, তাঁহারা বণিক্, সুতরাং যুদ্ধকার্য্যে অক্ষম, এই কথা ফৌজদারকে লিখিয়া পাঠান। ইহার পর কুলী খাঁর নায়েব ওয়ালীবেগের সহিত ও ফৌজদারের কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাহার মীমাংসার জন্য কোম্পানীর পক্ষ হইতে হেজেস্ ও উইলিয়ম্সন হুগলী গমন করিয়াছিলেন। † নূতন ফৌজদারের অপেক্ষা পুরাতন ফৌজদার জিয়া উদ্দীনের সহিত ওয়ালীবেগের বিবাদ কিছু গুরুতর আকার ধারণ

* Stewart প্রভৃতি জিয়া উদ্দীনকে জৈনুদ্দীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Wilson's Annals vol. II.

করে। প্রথমতঃ হেজেস ও উইলিয়ম্‌সন পরে প্রেসিডেন্ট রসেল তাহার মীমাংসার জন্য হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোলযোগের নিষ্পত্তি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। * জিয়া উদ্দীনের পেস্কার কিঙ্কর সেনের নিকট ওয়ালীবেগ সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব চাওয়ায়, জিয়া উদ্দীন তাহা দিতে নিষেধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। জিয়া উদ্দীন ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের সাহায্যে ওয়ালীবেগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও নূতন ফৌজদার ওয়ালীবেগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মুর্শিদকুলীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইলে, কুলী খাঁ ওয়ালীবেগের সাহায্যের জন্য দলীপ সিংহ নামে † একজন কর্ম্মচারীকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। চন্দননগরের নিকট ‡ উভয় পক্ষের শিবির সন্নিবেশিত হয়। জিয়া উদ্দীনের নায়েব মোল্লা তর্সেম তুরানী ইউরোপীয় গোলন্দাজদিগের সাহায্যে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জিয়া উদ্দীনের পক্ষ হইতে একটী কৌশল প্রকাশ করা হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তিনি সন্ধিপ্রস্তাবের ছলে দলীপ সিংহের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূত লাল বর্ণের একখানি শাল মাথায় বাঁধিয়া যেই দলীপ সিংহের নিকট উপস্থিত হয়, অমনি

* তারিখ বাঙ্গলা, রিয়াজুস সালাতীন ও ষ্টুয়ার্টে এই যুদ্ধের বিষয় লিখিত আছে।

† তারিখ বাঙ্গলায় দিলপৎ ও রিয়াজে দিলীপ সিংহ আছে।

‡ তারিখে ও রিয়াজে দেবীদাসপুকুরের নিকট শিবিরসন্নিবেশের কথা দেখা যায়।

তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ দলীপ সিংহের উপর এক গোলা বর্ষণ করিলে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়, অথচ দূত অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। জিয়া উদ্দীন উক্ত গোলন্দাজকে পরে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। দলীপের মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যগণ হুগলী কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার পর জিয়া উদ্দীনও কিছুকাল হুগলীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরাজেরা ফৌজদার আবুতালেবকে জিয়া উদ্দীনের সহিত গোলযোগ মিটাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাকে মুর্শিদকুলী খাঁর শরণাপন্ন হইতে বলেন। কিন্তু জিয়া উদ্দীন কুলী খাঁকে পরম শত্রু বোধ করিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। ফরখ্‌সেরের সিংহাসন অধিরোহণের পরও তিনি কয়েক মাস হুগলীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মীর নাসিরকে হুগলীর ফৌজদার বলিয়া জানা যায়।* মধ্যে জিয়া উদ্দীন বাঙ্গলায় দেওয়ানী পাওয়ার আশা করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৭১৩ খৃঃ অব্দের জুন মাসে জিয়া উদ্দীন দিল্লী যাত্রা করেন।† দিল্লী গমন করার কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিঙ্কর সেনও জিয়া উদ্দীনের সহিত দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে কুলী খাঁ তাঁহাকে পুনর্ব্বার হুগলী বন্দরের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পর বৎসর তহবিলভঙ্গের অপরাধে কিঙ্কর কারারুদ্ধ হইয়া কারাগারেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। §

* Wilson's Annals vol. II. Summeries.

† Do.

§ মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ পূর্ব্ব

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অপরিসীম চেষ্টায় জাহান্দরসাহের নিধনের পর ১৭১৩ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরখ্‌সের দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজের চিরপ্রথামত বাদসাহকে নজর ও নানাবিধ দ্রব্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। যদিও ফরখ্‌সের সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির সাহায্য না করার জন্য পূর্ব্বে কুলী খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বরাবরই তাঁহাকে বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতেন। এক্ষণে তিনি মুর্শিদকুলীর নিকট হইতে নজর ও উপঢৌকনাদি পাইয়া তাঁহার কার্য্যদক্ষতা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবেদারী ও পূর্ব্বের ন্যায় তিন প্রদেশের দেওয়ানীও প্রদান করিলেন। বিহারের জন্য একজন স্বতন্ত্র সুবেদার নিযুক্ত হন। প্রথমে মীরজুম্লা পরে সেরবলন্দ পাটনার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াহইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ নাজিমী ও দেওয়ানী উভয় পদ

ফরখ্‌সেরের নিকট হইতে বাঙ্গলাশাসনের অনুমতিগ্রহণ।

ক্রোধের নিমিত্ত কিঙ্কর সেনের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য কৌশলক্রমে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কার্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। তারিখ বাঙ্গলায় লিখিত আছে যে, কিঙ্কর সেন দিল্লী হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাম হস্তে কুলী খাঁকে সেলাম করিলে, তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে কিঙ্কর এইরূপ উত্তর দেন যে, যে হস্তে বাদসাহকে সেলাম করিয়াছেন, সে হস্তে কুলী খাঁকে অভিবাদন করিতে পারেন না। কুলী খাঁ উত্তর করেন যে, কিঙ্কর ত চিরদিনই জুতার তলে থাকিবে। এই ব্যাপারে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া এবং পূর্ব্ব ক্রোধের প্রতিশোধের জন্য তাঁহাকে হুগলীর কার্য্য প্রদান করেন। পরে তহবিল তছরূপের ছল ধরিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া, তাঁহার পায়জামার মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দেন ও মহিষদুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহার উদরের পীড়া হওয়ায় তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কুলী খাঁর এইরূপ প্রকৃতি বিশ্বাস্য কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়।

প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে অপ্রতিহতপ্রভাবে বঙ্গরাজ্যের শাসন ও রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আপনার আত্মীয়বর্গের প্রতি এক একটী কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। তাঁহার জামাতা সুজা খাঁ উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ানীর সহিত নায়েব নাজিমীরও ভার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব নায়েব দেওয়ান সৈয়দ এক্রাম খাঁর মৃত্যু হইলে, কুলী খাঁর দৌহিত্রী নফিসা বেগমের স্বামী সৈয়দ রেজা খাঁকে প্রথমতঃ উক্ত পদ প্রদান করা হয়।* রেজা খাঁ জমীদারদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন বলিয়া কথিত আছে। অল্প কাল পরে রেজা খাঁর মৃত্যু হইলে তিনি স্বীয় দৌহিত্র মির্জ্জা আসাদ উল্লাকে নায়েব দেওয়ানী প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার সরফরাজ খাঁ উপাধি হয়। সরফরাজ মাতামহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ ইতিপূর্ব্বে আপনার একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়া পরিশেষে আপনার একমাত্র দৌহিত্র আসাদ উল্লার প্রতি অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া পড়েন। সেই সময়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, বাদসাহের কোন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে, সরকার তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতেন। এই জন্য তিনি আসাদ উল্লাকে মুর্শিদাবাদের জমিদারী প্রদান করার ইচ্ছায় চুণাখালির তালুকদার মহম্মদ আমীনের নিকট হইতে মৌজা ক্রয় করিয়া তাহার আসাদনগর নাম প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে কোন রূপ গোলযোগ না ঘটিতে পারে বলিয়া উক্ত ক্রয়ের বিষয় প্রথানুযায়ী কোষাধ্যক্ষের পুস্তকমধ্যে লিখিত হয়। তিনি তাঁহার আর এক দৌহিত্রীপতি লুৎফ উল্লাকে ঢাকার নায়েব নাজিমী প্রদান করেন। লুৎফ উল্লা পরিশেষে মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। নাজির

আহম্মদ নামে এক ব্যক্তি কুলী খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠায়, একজন সামান্য সৈনিক হইতে ক্রমে ক্রমে সে বহুসংখ্যক সৈন্যের নায়ক হইয়া উঠে। এই নাজির আহম্মদও জমীদারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত আমীর খাঁর বংশীয় ও বাদসাহের স্বসম্পর্কীয় সৈফ খাঁকে তিনি পূর্ণিয়ার ফৌজদারী পদ প্রদান করেন।* সৈফ খাঁ পূর্ণিয়ার অনেক রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সময় সৈয়দ হোসেন আলি নাসিরজঙ্গ উপাধি প্রার্থনা করায়, দুই জনের এক উপাধি থাকা সঙ্গত নহে বলিয়া বাদসাহ মুর্শিদকুলী খাঁকে নাসিরজঙ্গ উপাধির পরিবর্ত্তে অন্য একটী উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী বাদসাহ আরঙ্গজেবের প্রদত্ত উপাধির বিনিময়ে স্বীকৃত না হওয়ায়, বাদসাহ আর কোন আদেশ প্রদান করেন নাই। এইরূপ অনেক বিষয়ে মুর্শিদকুলী আপনার সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন।

জমীদারগণের প্রতি কঠোর ব্যবহার।

বাদসাহ ফরখ্‌সেরের নিকট হইতে নাজিম ও দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার জমীদারী বন্দোবস্তে বিশেষ রূপ মনোযোগ প্রদান করিলেন। তিনি দেওয়ানী কার্য্যের সময়ে বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাজিমী পদ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহার পক্ষে সকল প্রকার ক্ষমতাপ্রকাশের সুবিধা ঘটে নাই। এক্ষণে তাহার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি জমীদারী

* মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মুর্শিদকুলী সৈফ খাঁকে আমীর খাঁর পৌত্র ও উচ্চ বংশীয় জানিয়া দৌহিত্রী নফিসা খানমের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈফ খাঁ তাহাতে সম্মত হন নাই।

বন্দোবস্তে অত্যন্ত কঠোরতাপ্রকাশ আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অনেক জমীদারের হস্ত হইতে জমীদারী কাড়িয়া লইয়া তিনি তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আমীন নিযুক্ত করিতেন, এক্ষণে সেই আমীনের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উক্ত কার্য্যে হিন্দু বাঙ্গালীগণ নিযুক্ত হইতেন বলিয়া জানা যায়, তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতাই উক্ত পদে নিয়োগের কারণ বলিয়া বোধ হয়। * আমীন ব্যতীত অনেক জমীদারের হস্তেও নূতন নূতন জমীদারীর ভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা নবাব মুর্শিদকুলীর নিকট হইতে রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইতেন, সেই সমস্ত জমীদার বা আমীন রাজস্ব প্রদানে ক্রটি করিলে, তাঁহাদিগকে জীবনে অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। তাঁহারা অনেক সময়ে অনাহারে অনিদ্রায় কারাগারে বাস করিতে বাধ্য হইতেন। কেবল মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে বলিয়া নহে, তাহার পরও অনেক জমীদারকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ জমীদারদিগের কষ্টভোগের বিষয়ে যে সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে, মুর্শিদকুলী খাঁর জমীদারীবন্দোবস্ত যে ঘোর কলঙ্কময়.তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে অত্যাচারের কঠোরতা তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া যথাযথ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ঐতিহাসিকগণ

* মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুস্থানের অধিবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য সহজে দোষ স্বীকার করান, ও শাস্তিপ্রদানে বাধ্য করা যাইত বলিয়া কুলী খাঁ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। কার্য্যদক্ষ মুর্শিদ কুলীর পক্ষে কেবল এই কারণে আমীন নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

বলিয়া থাকেন যে, নবাবের নিকট জমীদারগণ সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় গণ্য হইতেন। তাঁহারা নবাবের সমক্ষে বহুমূল্য শিবিকাদি ব্যবহার করিতে পাইতেন না, সামান্য ডুলী বা চৌপালায় তাঁহাদিগকে আসিতে হইত। যে সমস্ত জমীদার বা আমীন রাজস্বপ্রদানে ত্রুটি করিতেন, কারাযন্ত্রণাভোগ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারা পানাহার করিতে পাইতেন না, কেবল জীবনরক্ষার জন্য যৎসামান্য আহার্য্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহাও অভক্ষ্য ও অপেয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিত। ইহাই নবাবের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জমীদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া লওয়ার জন্য যে সমস্ত লোক নিযুক্ত হইত, তাহাদের অত্যাচারসম্বন্ধে ঐতিহাসিক-গণের বিবরণ পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ প্রধান। নাজির আহম্মদ প্রথমতঃ একজন সামান্য সৈনিক মাত্র ছিল, কিন্তু ক্রমে সে দুই হাজার অশ্বারোহী ও চারি হাজার পদাতির নায়ক হইয়া জমীদার দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। জমীদারগণের মধ্যে যাঁহারা রাজস্ব প্রদানে ত্রুটি করিতেন, তাঁহাদিগকে ধৃত করার জন্য নাজিরের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইত। নাজির তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া, কখনও তেকাঠায় পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, কখনও বা কোড়াপ্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত। তদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে খাড়া ও শীত কালে নগ্ন গাত্রে শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়া আপনার কঠোরতা প্রকাশ করিত, তাহার পর ঐ সমস্ত জমীদার কারা-গারে প্রেরিত হইতেন। রেজা খাঁর অত্যাচার আরও ভয়াবহ ছিল। তিনি একটী খাদ খনন করিয়া নানাবিধ দুর্গন্ধযুক্ত আব-র্জ্জনার দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগকে

উপহাস করার জন্য তাহার 'বৈকুণ্ঠ' বা হিন্দু বেহেস্ত নাম প্রদান করেন। যে সমস্ত জমীদার কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াও রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন না, রেজাখাঁর আদেশে তাঁহারা রজ্জুবদ্ধ হস্তে বৈকুণ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইতেন। কখনও বা তাঁহাদের ঢিলা ইজারের মধ্যে মার্জ্জার প্রবেশ করান হইত এবং লবণমিশ্রিত গোদুগ্ধ বা মেষদুগ্ধ পান করার জন্য আদিষ্ট হইতেন। * বাস্তবিক মুর্শিদকুলী খাঁ যেরূপ ন্যায়পর নবাব ছিলেন, তিনি যে তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গের এই প্রকার লোমহর্ষণ অভিনয়ের অনুমোদন করিতেন ইহাতে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কিন্তু আমরা তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, তিনি রাজস্ব আদায়সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোরতা প্রকাশ করিতেন এবং সেই জন্য তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ যে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণগুলির সমস্তই যে প্রকৃত ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁহারা যে মুর্শিদকুলীর কর্ম্মচারীবর্গের অত্যাচার অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জমীদারদিগের প্রতি তাহাদের অত্যাচার একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তৎকালের শাস্তিবিধান কতকটা ঐরূপ প্রকারেরই ছিল এবং জমীদারেরা সামান্য দোষে যখন কারাবাস করিতে বাধ্য হইতেন, তখন যে, নাজির আহম্মদের ন্যায় কর্ম্মচারীর হস্তে কিছু কিছু অত্যাচার ভোগ করিয়া-

* নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁর অত্যাচারের কথা তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে। গ্রাণ্ট ও ষ্টুয়ার্ট ও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিলেন, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। নাজির আহম্মদের অত্যাচার যে ঘোর কঠোরতাপরিপূর্ণ হইয়াছিল, নবাব সুজা উদ্দীন কর্তৃক তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে তাহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। সুজা উদ্দীনের ন্যায় উদারহৃদয় নবাব যাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অত্যাচারের কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারিনা। আবার ইহা যে মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণের কল্পনাপ্রসূত, সে কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। তবে মুর্শিদকুলীর ন্যায় নবাব যে ঐরূপ ঘৃণিত ব্যাপারের অনুমোদন করিতেন, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? রেজা খাঁ কর্তৃক জমীদারগণের ভয়প্রদর্শনের জন্য বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি হইতে পারে, * কিন্তু জমীদারগণ বাস্তবিকই যে বৈকুণ্ঠবাস করিতে বাধ্য হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রেজা খাঁ ১৭১৭ খৃঃ অব্দের পর বাঙ্গলার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অব্দে এক্রাম খাঁকে কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাহার অল্প কাল পরেই রেজা খাঁর মৃত্যু হইলে আসাদউল্লা সরফরাজ খাঁ নায়েব দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সুতরাং বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব যে অধিক দিন ছিল না ইহাও বুঝা যাইতেছে। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণের জমীদারপীড়নের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও জমীদারীবন্দোবস্তে মুর্শিদকুলী খাঁ যে কঠোরতা প্রকাশ করিতেন, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

* এই বৈকুণ্ঠসম্বন্ধে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে প্রবাদও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মুর্শিদাবাদ নগরে তাহার স্থান নির্দ্দেশেরও চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্থাননির্দ্দেশ যে কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। সত্য ঘটনা না হইলেও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপারেরও স্থান নির্দ্দেশ এদেশে অসম্ভব নহে।

সৈফ খাঁ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সৈফ খাঁ নবাব মুর্শিদকুলী কর্ত্তৃক পূর্ণিয়ার ফৌজদারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে পূর্ণিয়া প্রদেশের অনেক রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তাঁহাকে সরকারের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রাজস্বমাত্রই দিতে হইত। বীরনগরের রাজা বীরসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায়, সৈফ খাঁ তাঁহাকে জমীদারী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন ও তাঁহার জমীদারী আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তিনি পূর্ণিয়ার অন্যান্য জমীদারদিগকেও বন্দী করিয়া উক্ত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেন। তৎপূর্ব্বে ১০।১১ লক্ষ মাত্র সংগৃহীত হইত। মোরঙ্গের পর্ব্বত আপনার অধিকারভুক্ত করার ইচ্ছায় তিনি প্রথমে তথাকার রাজার সহিত সদ্ভাব করেন, পরে ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিকাংশ ভূমির জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ করাইতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে সীমা লইয়া রাজার সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করেন। তজ্জন্য নবাবের নিকট হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। রাজা তাঁহার ভয়ে পর্ব্বতের উপর পলায়ন করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মোরঙ্গের অনেক ভূভাগ সৈফ খাঁর অধিকারভুক্ত হয়। রাজা অবশেষে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নজরস্বরূপ শিকারী পক্ষী পাঠাইয়া দিতেন।* পূর্ণিয়া প্রদেশে কৌশিকী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত ও মোরঙ্গের পর্ব্বত হইতে অবিরত জলধারা নিপতিত হওয়ায়, অনেক স্থান প্লাবিত হইয়া যাইত। কিন্তু অবশিষ্ট ভূভাগ সর্ব্বদা জলসিক্ত

* তারিখ বাঙ্গলা।

থাকায়, সেই সেই স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ধান্য, গোধূম, মুগ, কলায়, সর্ষপ ইত্যাদি শস্য জন্মিত ও সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। ঘৃত, হরিদ্রা এবং সোরাও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন মরিচ, এলাচ, বৃহৎ বৃহৎ শাল ও বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং আম্র, কাঁটাল, আনারস প্রভৃতি নানাবিধ ফলও উৎপন্ন হইত। এই সমস্ত দ্রব্য সৈফ খাঁর আদেশে পূর্ণিয়া প্রদেশ হইতে অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইতে পারিত না, উক্ত প্রদেশেই সঞ্চিত থাকিত। তজ্জন্য তথায় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। উক্ত প্রদেশের কাড়াগোলা নামক স্থান ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় অনেক সওদাগর বাস করিতেন। সৈফ খাঁ কর্ত্তৃক পূর্ণিয়ায় যে সমস্ত বন্দোবস্ত হইত, মুর্শিদকুলী তাহাতে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না, তিনি সৈফ খাঁকে মিত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। প্রতি বৎসর সৈফ খাঁ নবাব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিতেন এবং নবাবের কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ণিয়ায় প্রত্যাগমন করিতেন।

সীতারাম রায়।

মুর্শিদকুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্তে এইরূপ কঠোরতা প্রকাশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অশান্তি আনয়ন করিয়াছিল। সকল জমীদারই যে তাঁহার কঠোর নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন, এমন নহে। সেই জন্য আমরা দুই জন হিন্দু জমীদারকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে দেখি। তন্মধ্যে একজন ভূষণার জমীদার সীতারাম রায় ও দ্বিতীয় রাজসাহীর জমীদার রাজা উদয়নারায়ণ রায়। আমরা যথাযথ রূপে তাঁহাদিগের বিবরণ প্রদান করিতেছি। বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকগণের অন্যতম মুকুন্দরাম রায়ের ভূষণা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। ভূষণা সরকার মামুদাবাদের অন্তর্গত ছিল। মুকুন্দরামের অব-

সানের পর ভূষণায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ভূষণা ফৌজদারীর মধ্য দিয়া মধুমতী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইত। মধুমতী আজিও সমভাবে বহিয়া চলিয়াছে। উক্ত মধুমতীতীরে হরিহরনগরনামক গ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দার মধ্য ভাগে বিশ্বাস উপাধিধারী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের একটী শাখা বাস করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস মুর্শিদাবাদের কান্দী উপবিভাগের অন্তর্গত গয়েসপুর গ্রামে ছিল। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহারা হরিহরনগরে বাস করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসবংশে সুপ্রসিদ্ধ সীতারাম রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উদয়নারায়ণ রায়। ইহাদের জাতিগত উপাধি বিশ্বাস হইলেও, অনেক দিন হইতে তাঁহারা রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। রায়গণ প্রথমতঃ কতকগুলি মৌজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকের জমিদারী লাভ করেন। সীতারাম সেই যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ তাহারই পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হন। তিনি অশ্বারোহণে মাঠে মাঠে ভ্রমণ করিতেন এবং বাল্যকাল হইতে বাহুবলের জন্য সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার প্রবল হওয়ায়, উক্ত প্রদেশের অধিবাসিগণের বাহুবল শিক্ষার প্রয়োজন হইত। আপনার ক্ষুদ্র জমীদারী পরিদর্শন করিতে করিতে, সীতারামের ভূসম্পত্তিবৃদ্ধির কামনা প্রবল হইয়া উঠে; ক্রমে তিনি একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্যস্থাপনে প্রয়াসী হন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্ব্বল ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে যে সময়ে পশ্চিম বঙ্গে সভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময়ে সীতারামও আপনার

স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ তিনি বাদসাহ ও নবাবের সম্মতিক্রমে নিকটস্থ জমীদারবর্গের অনেক ভূভাগ আপনার জমীদারীভুক্ত করিয়া লন ও ক্রমে ভূষণা বিভাগের নলদী প্রভৃতি পরগণার অধীশ্বর হইয়া উঠেন। * এইরূপে অনেক জমীদারী করায়ত্ত করিয়া অবশেষে তিনি আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন ও আপনার রাজধানীস্থাপনে সচেষ্ট হন। রাজধানীনির্ম্মাণ শেষ হইলে পরে তিনি রাজ্য স্থাপন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হরিহরনগরের পর পারে মধুমতীর নিকটে সীতারামের রাজধানী স্থাপিত হয়। তথায়ও তাঁহার কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। ঐ স্থানে তিনি আপনার সৌভাগ্য-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাকে ভূগর্ভপ্রোথিত মন্দিরের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন † এবং সেই স্থানে এক জন সাধু ফকীরের বাস থাকায়, ফকীর সে স্থান পরিত্যাগ

* সীতারামসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি বার ভূঁইয়াদিগকে দমন করার জন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। পরে নিজে স্বাধীন হইয়া সরকারের রাজস্বপ্রদানে অস্বীকার করেন। কিন্তু সীতারামের বহু পূর্ব্বে দ্বাদশ ভৌমিকগণের অবসান ঘটিয়াছিল।

† এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সীতারাম এক দিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে এক স্থানে তাঁহার অশ্বের ক্ষুর প্রোথিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন। অশ্ব চলিতে অশক্ত হওয়ায়, সীতারাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বক্ষুর উত্তোলন করেন এবং কি কারণে তথায় অশ্বক্ষুর প্রোথিত হইল তাহার অনুসন্ধানের জন্য সেই স্থান খনন করাইতে করাইতে, প্রথমে একটী ত্রিশূল, পরে মন্দিরের চূড়া ও মন্দির দেখিতে পান। উক্ত মন্দির মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া সীতারামের সৌভাগ্যের সূচনা হয়।

করিতে অসম্মত হন। সীতারাম তাঁহাকে বিতাড়িত না করিয়া তাঁহারই নামানুসারে রাজধানীর মহম্মদপুর আখ্যা প্রদান করেন। মহম্মদপুর যদিও এক্ষণে জঙ্গলময় গ্রাম, তথাপি অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা যশোহরের একটী প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।* রাজধানীতে প্রথমে দুর্গনির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। এই দুর্গ মৃন্ময় ও চতুষ্কোণ, চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিলে এক ক্রোশ হইতে পারে। দুর্গের চারিদিকে পরিখা খনন করা হয় এবং তাহা হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকাস্তূপের দ্বারা দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হইয়া তদুপরে কামানশ্রেণী সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে প্রবেশ-দ্বার ছিল বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। এই প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে রামসাগরনামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হয়।† রামসাগর উত্তর দক্ষিণে ১৫ শত ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬শত হস্ত হইবে। তাহার পর সীতারাম আপনার প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করান ও দুর্গমধ্যে অনেক অস্ত্র শস্ত্র গোলা গুলি কামান

* মেজর রেনেল তাঁহার মানচিত্রে মহম্মদপুরকে একটী প্রধান নগর রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহম্মদপুরকে যশোহরের সদর করিবার কথা হইয়াছিল।

† রামসাগরখনন সম্বন্ধেও এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা বাস করিত, তাহার পুত্রের নামও সীতারাম ছিল। এক দিন সে পুত্রকে আহ্বান করায়, সীতারাম রায় তথায় উপস্থিত হন। বৃদ্ধা রাজাকে দেখিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। তাহার উপহার দেওয়ার কিছু না না থাকায় সীতারাম তাহার নিকট হইতে প্রাঙ্গণস্থিত একটী লাউ গাছ চাহিয়া লন এবং তাহার কোন প্রার্থনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, সে, একটী কূপ খননের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সীতারাম লাউ গাছের মূলে কূপ খননের আদেশ দিলে, তথা হইতে প্রচুর অর্থ বহির্গত হয়। পরে সেই অর্থে রামসাগর দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল।



লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির।

বন্দুকও সংগ্রহ করা হয়। দুর্গাভ্যন্তরে আর একটী দীর্ঘিকাও খনিত হইয়াছিল, উক্ত দীর্ঘিকা তাঁহার গুপ্ত কোষাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহাতে ধন রত্নাদি নিক্ষিপ্ত হইবে বলিয়া তাহা খনন করা হয়। এতদ্ভিন্ন দুর্গের বাহিরে সুখসাগর ও কৃষ্ণচন্দ্রজীর নামে উৎসর্গীকৃত কৃষ্ণসাগরও তাঁহার সুকীর্ত্তির পরিচায়ক। সীতারাম কেবল দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি স্বীয় ধর্ম্মানু-রাগের পরিচয় প্রদানের জন্য দুর্গের মধ্যে ও বাহিরে দেবমন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার গুপ্ত কোষাগারস্বরূপ দীর্ঘি-কার তীরে ১৬২১ শাক বা ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলাঘরের অনুকরণে দশভুজালয়, ১৬২৬ শাক বা ১৭০৪ খৃঃ অব্দে দুর্গা-ভ্যন্তরে তাঁহার সৌভাগ্য-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতল গৃহ ও দুর্গসংলগ্ন কানাই নগরে ১৬২৫ শাক বা ১৭০৩ খৃঃ অব্দে সমচতুষ্কোণ ও নানাকারুকার্য্যখচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের মন্দির নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। * এইরূপে আপনার রাজধানীর গঠন শেষ করিয়া সীতারাম স্বাধীন রাজ্যস্থাপনে প্রয়াসী হন। এই সময়ে

* দশভুজালয়ের প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিত ছিল.—

"মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী-শকে দশভুজালয়ম্।
অকারি শ্রীসীতারামরায়েণ ** মন্দিরম্॥"

লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহ-সংলগ্ন ফলকে এইরূপ লিখিত ছিল,—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরম্"॥

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরফলকে যাহা লিখিত আছে তাহার পাঠোদ্ধার করিলে এইরূপ হয়,—

তিনি একটী ক্ষুদ্র দল গঠন করেন, তাঁহার দলে অনেকে সৈনিক ও সেনানী রূপে প্রবিষ্ট হয়। যাহারা তাঁহার বিশিষ্ট অনুচর ছিল, তাহাদের মধ্যে মেনাহাতী, বক্তার খাঁ, মুচরাসিংহ ও গবরদালানের নাম প্রসিদ্ধ। মেনাহাতী সীতারামের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপের মৃত্যু।

যে সময়ে সীতারাম রাজধানীনির্ম্মাণে ও রাজ্যস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া জমীদার-দিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে যখন তিনি নাজিমীর ভার প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার কঠোরতার মাত্রা বৰ্দ্ধিত হওয়ায়, সীতারামকে তাহা স্পর্শ করার উপক্রম করে। সীতারাম পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি সরকারের করপ্রদানে অসম্মত হইলেন এবং ভূষণা ফৌজদারীর মধ্যে নানা প্রকার গোলযোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আবু তোরাপ নামে বাদসাহবংশের স্বসম্পর্কীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভূষণার ফৌজদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কার্য্যদক্ষতার জন্য সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি ছিল। আবু তোরাপ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতেন না। সীতারাম সেই সুযোগে দিন দিন আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি সরকারের

"বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাষোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ
অভ্রংলিহং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ" ॥

রাজস্ব না দেওয়ায় এবং আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করায়, ফৌজদার তাঁহাকে দমন করিতে সচেষ্ট হন। আবু তোরাপ প্রথমতঃ আপনার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সীতারামকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সীতারাম জঙ্গল ও নদীর আশ্রয়ে থাকায় এবং তজ্জন্য তাঁহার জমীদারী দুষ্প্রবেশ্য হওয়ায়, ফৌজদার তাঁহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। নবাব সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে না করিতে, সীতারামের প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠায়, আবু তোরাপ পীর খাঁ নামক এক জন জমাদারকে দুই শত অশ্বারোহীর সহিত সীতারামকে দমন করিতে নিযুক্ত করেন। সীতারাম লুক্কায়িত ভাবে পীর খাঁকে আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ফৌজদার শিকারের ইচ্ছায় আপনার দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সীতারামের লোকেরা তাঁহাকে পীর খাঁ ভ্রমে নিহত করিয়া ফেলে। সীতারাম আবু তোরাপের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হন, কারণ, ফৌজদারকে হত্যা করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ফৌজদারের মৃত দেহ ভূষণায় লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। আবু তোরাপ নিহত হইলে সীতারাম বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার নবাবের সহিত তাঁহার রীতিমত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া আপনার সৈন্যবল ও অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

সীতারামের পরাজয়।

আবু তোরাপের মৃত্যু সংবাদ নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। আবু তোরাপ বাদসাহের স্বসম্পর্কীয় হওয়াই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন সীতারামের

প্রবল ক্ষমতার জন্যও তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয়। যাহা হউক, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সীতারামের দমনের জন্য আপনার শ্যালীপতি বক্স আলি খাঁকে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া ভূষণায় পাঠাইয়া দিলেন। বক্স আলির অধীনে সংগ্রাম-সিংহ সুবেদারী সৈন্যের ভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কুলী খাঁর প্রিয় পাত্র রঘুনন্দনও প্রেরিত হন। এই রঘুনন্দনই নাটোরবংশের আদিপুরুষ। রঘুনন্দনের সহিত তাঁহার প্রভুভক্ত ও সাহসী কর্ম্মচারী বর্ত্তমান দীঘাপতিয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দয়ারামও গমন করিয়াছিলেন। বক্স আলি খাঁ ভূষণায় উপস্থিত হইয়া সীতারামকে সহজে পরাজিত করিতে পারিলেন না। সীতারাম তৎকালে ভূষণার অনেক স্থান আপনার অধিকারভুক্ত ও স্থানে স্থানে সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। মহম্মদপুরের দুর্গে অসংখ্য কামান বিপক্ষগণের ভীতি উৎপাদনের জন্য সংহারমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে ছিল। বক্স আলি রঘুনন্দন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া সংগ্রাম সিংহকে সসৈন্যে মহম্মদপুরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে দয়ারামও প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহম্মদপুরের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সীতারামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বিপক্ষগণের সংবাদ লইতেন। একদিন কুজ্ঝটিকাময় প্রত্যূষে তিনি যেমন বহির্গত হন, অমনি দয়ারামের পরামর্শক্রমে কতিপয় সুবেদারী সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহার পর তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয় *। মেনাহাতীর মৃত্যুসংবাদে

* নবাব সেই ছিন্ন মুণ্ড দর্শন করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন যে, তোমার



সীতারাম অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লন। তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিয়া ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া পড়ে। অবশেষে সুবেদারী সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতারামকে বন্দী করিয়া ফেলে ও তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যায়। মুর্শিদাবাদে গমন কালে সীতারাম কিছুদিন নাটোরেও বন্দী-অবস্থায় ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারামকে শূলে চড়াইয়া দেন। কিন্তু দেশীয় প্রবাদানুসারে তিনি বিষাক্ত দ্রব্য চুষিয়া পথিমধ্যে আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ফলতঃ সীতারামের পরাজয়ের পর তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ * কলিকাতায় পলায়ন করিয়া গোবিন্দপুরের পাটোয়ারী তাঁহাদের আত্মীয় রামনাথের আশ্রয় লন। মুর্শিদ-কুলী খাঁর আদেশে ইংরাজেরা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের প্রেরিত লোকের নিকট প্রদান করেন। † পরে সীতারামের পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়। নবাব তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ‡ তাঁহারা ভূষণায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া

ন্যায় বীরকে জীবিত অবস্থায় আনয়ন করিলে আমি সুখী হইতাম। এইরূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

* তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে একটী শিশু কন্যা, দুইটী শিশু পুত্র, ছয় জন স্ত্রীলোক ও চারি জন চাকর কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। (Wilson's Annals vol. II.)

† Wilson's Annals vol. II.

‡ মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, সীতারামের পরিবার-বর্গকে মহম্মদ পুরে চিরকারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তাঁহারা যে মুক্তি-লাভ করিয়া ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

হরিহরনগরে বাস করেন ও অনেক কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। * এইরূপে সীতারামের অবসান হয়। বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকগণের পর সীতারামের ন্যায় বীরপুরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভৌমিকগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়েও বাঙ্গালায় মুসলমানগণের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব না হওয়ায়, সীতারাম কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় যাঁহারা বাহুবলে স্বাধীনতা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় এই যে, মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্কন্ধে দস্যুতাপরাধ আরোপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সীতারামের ন্যায় বীরপুরুষ যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দুর্ল্লভ ইহা আমরা মনে করিয়া থাকি। সীতারামের ধ্বংসের পর তাঁহার ভূষণা জমীদারীর নলদী প্রভৃতি পরগণা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনকে প্রদান করা হয়।

রাজা উদয়নারায়ণ ও কুলী খাঁ

পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বিশাল পদ্মানদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বে রাজসাহী প্রভৃতি জেলা পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত জনপদ রাজসাহী প্রদেশ নামে অভিহিত হইত। মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীতীরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বড়নগর † এই বিস্তীর্ণ জনপদের রাজধানী ছিল।

* এক্ষণে সীতারামের বংশ নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বংশধরেরা অদ্যাপি হরিহরনগরে বাস করিতেছেন। পরিশিষ্টে সীতারামের বংশ-পত্র প্রদত্ত হইল। সীতারামবংশীয়েরা কিছু দিন নল ডাঙ্গার রাজাদের নিকট হইতে বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

† বড়নগর বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্রে বড়নগরকে একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাহাতে প্রাচীন রাজসাহী জমী-

লালা উপাধিধারী * শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ অনেক দিন হইতে রাজসাহীর জমীদারী ভোগ করিতেন। তাঁহারা রায় উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। এই রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণবংশে রাজা উদয়নারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদনামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজা উদয়নারায়ণের সময় বড়নগর রাজধানীর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গণকর গ্রামবাসী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ঘনশ্যাম রায়ের কন্যা শ্রীমতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে উদয়নারায়ণের সাহেবরাম নামে একটী পুত্রের জন্ম হয়। যে সময়ে মুর্শিদকুলী বাঙ্গলার দেওয়ান ও নবাবরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে উদয়নারায়ণ একজন উপযুক্ত জমীদার বলিয়া বিখ্যাত হন এবং যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ রাজসাহীর পূর্ব্ব আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া উদয়নারায়ণের প্রতিই তাহার রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। রাজার সাহায্যের জন্য কুলী খাঁ গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদারের অধীন দুই শত অশ্বারোহী সৈন্যও প্রদান

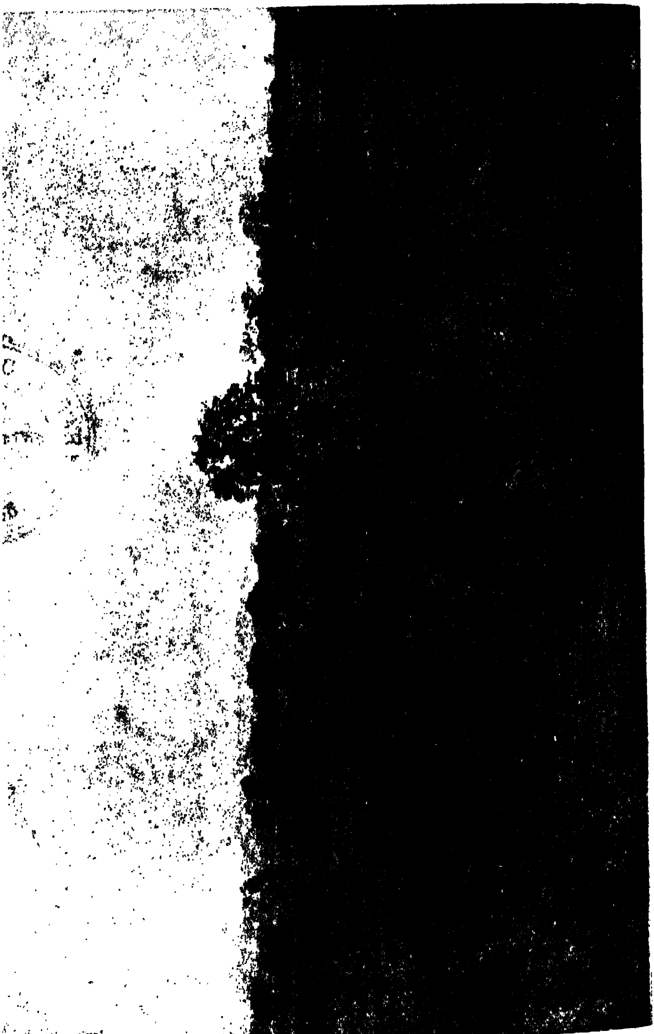
দারীও চিত্রিত করা আছে। অদ্যাপি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে রাজসাহী নামে একটী পরগণা দৃষ্ট হয়। রাজসাহী জমিদারী পরে নাটোরবংশের হস্তে আসায়, মুর্শিদাবাদে বড়নগরই তাঁহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। বড়নগর রাণী ভবানীর প্রিয় স্থান ছিল। তথায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মুর্শিদাবাদ কাহিনীর 'বড় নগর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* এই লালা উপাধির জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে কায়স্থ বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। উদয় নারায়ণের শ্বশুর বংশ অদ্যাপি গণকরে বাস করিতেছেন। পরিশিষ্টে তাঁহাদের বংশ-পত্র প্রদত্ত হইল।

করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ তাহাদের সাহায্যে আপনার জমীদারীর মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজস্বসংগ্রহের কার্য্য উত্তম রূপেই পরিচালন করিতেছিলেন। এই সময়ে মুর্শিদকুলী নাজিমী পদ প্রাপ্ত হইয়া যখন জমীদারীবন্দোবস্তে কঠোরতা প্রকাশ আরম্ভ করেন, তখন উদয়নারায়ণের সহিত ক্রমশঃ তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উদয়নারায়ণ নবাবের কঠোর নীতির অনুমোদনে প্রস্তুত ছিলেন না। তৎকালে রাজসাহী সমস্ত জমীদারীর প্রধান থাকায় এবং উদয়নারায়ণ তাহার উপযুক্ত জমীদার হওয়ায়, মুর্শিদকুলী সহজে তাঁহাকে বশে আনিতে পারিলেন না। সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজস্বসংগ্রহে সাহায্য করায় গোলাম মহম্মদ রাজা উদয়-নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ অনেক দিন হইতে বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায়, প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। উদয়নারায়ণ তাহার প্রতিকার করিতে না করিতে সে কথা নবাবের কর্ণগোচর হইল এবং সেই সময়ে রাজসাহী প্রদেশের রাজস্ব অনাদায় থাকায়, নবাব উদয়নারায়ণের দমনের ইচ্ছায় এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

বীরকিটীর যুদ্ধ ও উদয়নারায়ণের পরিণাম।

রাজা উদয়নারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার শাসনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিলে জমীদারী বন্দোবস্তের কঠোরতা তাঁহাকে পদে পদে ভোগ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে, তিনি নবাবের অধীনতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সীতারামের নির্য্যাতন হইয়াছিল, তথাপি নবাবের



কঠোরতা অসহ্য বোধ করিয়া উদয়নারায়ণ স্বাধীন হইতে ইচ্ছুক হইলেন। বাঙ্গালা ১১২১ সালের প্রথমে বা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বড়নগর পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় জমীদারীর মধ্যস্থ সুল্‌তানাবাদ পরগণায় বীরকিটী নামক স্থানের গড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সুল্‌তানাবাদ পরগণার চারিদিকে পর্ব্বত ও জঙ্গল থাকায় তাহা দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার বীরকিটী ও দেবীনগরে রাজা উদয়নারায়ণ আপনার বাসভবন স্থাপন করেন। বীরকিটীর গড়বাড়ী একটী নাত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের নীচে পরিখা খনিত হইয়া তাহাকে দুর্গম করা হয়। * এই রাজবাড়ীর নিকটে বর্ত্তমান জগন্নাথপুর গ্রামে ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় একটী উচ্চ ডাঙ্গার উপরে তাঁহার দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গের মধ্যস্থলের ভূমি আরও উচ্চ। সেই উচ্চতর ভূভাগ প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে সৈন্যাধ্যক্ষগণের বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার নিম্নস্তরের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডও প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া সৈন্যগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই প্রাচীরের নীচেও সুগভীর খাদ পরিখারূপে খনিত হইয়াছিল। † রাজা উদয়-

* বীরকিটীর গড়বাড়ীর ক্ষুদ্র পাহাড় ও তাহার পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বীরকিটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনের মুরারই ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪৷৷০ ক্রোশ পশ্চিম ও সুল্‌তানাবাদের বর্ত্তমান রাজধানী মহেশপুরের নিকট অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্রে বীরকীটী একটী প্রধান নগররূপে অঙ্কিত আছে। বীরকিটী হইতে জগন্নাথপুরের গড় প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে ও দেবীনগর প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে। দেবীনগরের নিকট নারায়ণগড় নামক স্থানেও রাজার একটী গড় ছিল।

† জগন্নাথপুরের গড়ের পরিখাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যস্থলে সামন্দিন সাহেবের দরগা স্থাপিত হওয়ায়, এক্ষণে লোকে তাহাকে সামন্দিন সাহেবের গড় বলে।

নারায়ণ জগন্নাথপুরের গড়ে সৈন্য স্থাপন করিয়া নিজে সপরিবারে বীরকিটীর রাজবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদার সেই সময় অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জগন্নাথপুরের গড়ে অবস্থিতি করে। নবাবের সেনাপতি মহম্মদ জান ও লহরীমাল * সৈন্য লইয়া অনেক কষ্টে জঙ্গল ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া জগন্নাথপুরের গড়ের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম ও নাটোরের রঘুনন্দনও গমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। রঘুরামের পিতা রাজা রামজীবন রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। পুত্র রঘুরামও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। যোদ্ধা বলিয়া রঘুরামের খ্যাতি থাকায়, সাধারণে তাঁহাকে রঘুবীর বলিত। রঘুরাম নবাবের আদেশে লহরীমালের অনুবর্ত্তী হন এবং রঘুনন্দনও নবাব সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন। জগন্নাথপুরের গড়ের সমীপে একটী উচ্চ প্রশস্ত পার্ব্বত্য প্রান্তরের নিকট নবাবসৈন্যেরা শিবির সন্নিবেশ করে। নবাবসৈন্যের আগমন শুনিয়া গোলাম মহম্মদ সসৈন্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হয় এবং লহরীমালও নবাবসৈন্যের অগ্রণী হইয়া শিবিরসম্মুখস্থ প্রান্তরে গোলাম মহম্মদের সম্মুখীন

* তারিখ বাঙ্গলায় ও রিয়াজুস সালাতীনে কেবল মহম্মদ জানের ও ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবল লহরীমালের কথা আছে। লহরীমাল ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে হুগলীতে ছিলেন, কোম্পানীর কাগজ পত্র হইতে তাহা জানা যায়। তাহার পর তিনি 'মুর্শিদাবাদে আসিতেও পারেন। মহম্মদ জান প্রধান সেনাপতি হওয়ায় সম্ভবতঃ সেই জন্য মুসল্‌মান ঐতিহাসিগণ তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হওয়ায়, লহরীমালের কথা অবিশ্বাস করা যায় না।



হন। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সেই যুদ্ধে গোলাম মহম্মদকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। * রাজা উদয়-নারায়ণের পুত্র সাহেবরামও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে তিনিও পরাজিত হন। যে প্রান্তরে যুদ্ধ হইয়াছিল লোকে তাহাকে এক্ষণে মুণ্ডমালা বা মুড়মুড়ের ডাঙ্গা বলিয়া থাকে। † উদয়নারা-য়ণ ও সাহেবরাম সপরিবারে বীরকিটী হইতে পলায়ন করিয়া মহেশ-পুর, উদয়নগর-পাথরিয়া ও পরিশেষে দেবীনগরের বাসভবনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু নবাব সৈন্যেরা তাঁহাদের পশ্চা-দ্ধাবন করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে বন্দী-অবস্থায় মুর্শিদাবাদে লইয়া যায়। ‡ তথায় অনেক দিন তাঁহাদিগকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর সাহেবরাম সুল্‌তানাবাদ

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে, রঘুরামের প্রক্ষিপ্ত শর দ্বারা গোলাম মহম্মদ নিহত হয়। উক্ত পুস্তকে গোলাম মহম্মদের স্থলে আলি মহম্মদ লিখিত আছে। লহরীমাল বীরকিটীর নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া শিবির হইতে কিছু দূরে অগ্রসর হওয়ায় আলি মহম্মদও তাহার সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রঘুরামের সহিত যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। এমন সময়ে আলি মহম্মদ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে রঘুরাম তাহাকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলেন। আলি মহম্মদ জলপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলে, রঘুরাম জল আনিতে না আনিতে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

† এই প্রান্তরের নিকট লোকে এক্ষণে গুলি ও দগ্ধ কন্দুকাদি পাইয়া থাকে।

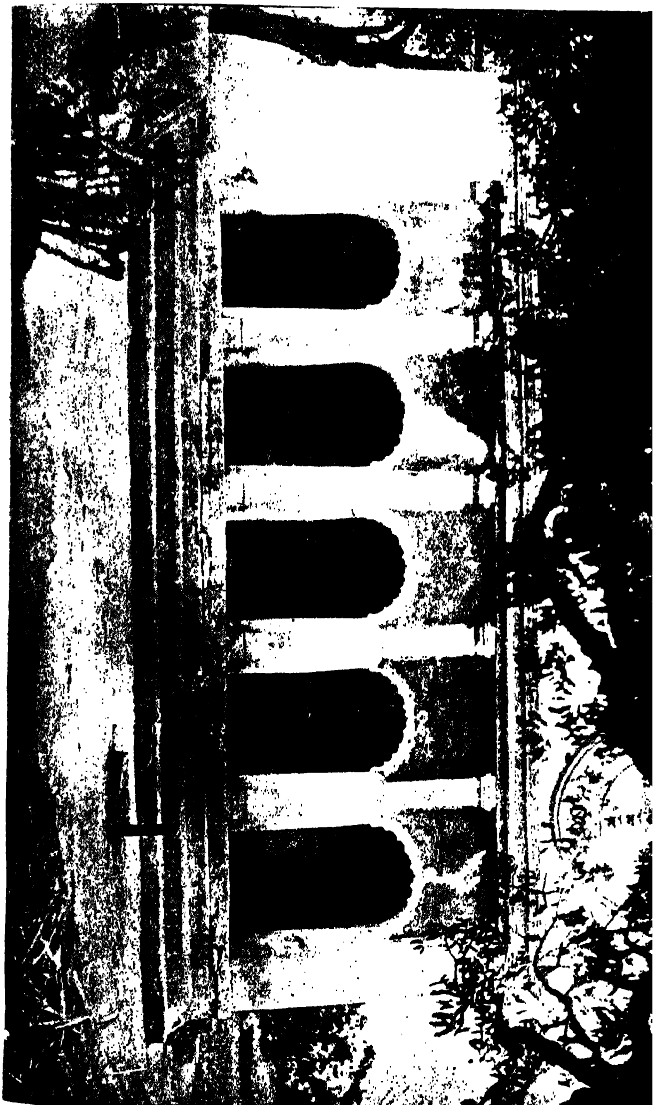
‡ মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণের মতে ও সাধারণ প্রবাদানুসারে রাজা উদয়-নারায়ণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমরা ১১৬৫ সালে জগন্নাথ শর্ম্মা ও রাজারামরায়ের মধ্যে একটী মোকর্দ্দমার ভাষা (আর্জি) ও জবোত্তর (জবাব) প্রাপ্ত হইয়াছি, পরিশিষ্টে তাহা মুদ্রিত হইল। রাজারাম উদয়নারায়ণের শ্যালকপুত্র।

পরগণার জমীদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্প কাল পরে তাহাও তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়। উদয়নারায়ণ ও তদ্বংশীয়দিগকে রাজসাহী জমীদারী হইতে বঞ্চিত করিয়া অবশেষে তাহা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনকে প্রদান করা হইয়াছিল। তদবধি নাটোর-বংশ রাজসাহীর রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ক্রমে সুল্‌তানাবাদ পরগণাও তাঁহাদের হস্তগত হয়। উদয়নারায়ণ একজন আদর্শ জমীদার ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জক, পরহিতরত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি অনেক সংকীর্ত্তি তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বীরকিটীর রাধাগোবিন্দ বননওগাঁ গ্রামের গিরিধারী প্রভৃতি মূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই স্থাপিত মদনগোপাল মূর্ত্তি অদ্যাপি বড়নগরে নাটোররাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। বীরভূম জেলার রামপুরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত কনকপুর গ্রামে অপরাজিতা নামে যে প্রাচীন দেবতা আছেন, রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহার মন্দিরাদির সংস্কার করিয়া দেবীর সেবার সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, অপরাজিতা ঐ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ দেবতা।

রঘুনন্দন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দুই এক স্থলে রঘুনন্দনের নামোল্লেখ করিয়াছি এবং তিনি যে মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই রঘুনন্দনই নাটোরবংশের আদিপুরুষ। রঘুনন্দন আপনার অসীম

উক্ত ভাষোত্তর পত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে আনা হইয়াছিল এবং তাঁহারা তথায় অনেক দিন বন্দী-অবস্থায় বাস করিয়াছিলেন। ভাষোত্তর পত্র হইতে রাজা উদয়নারায়ণের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।



প্রতিভা বলে তৎকালে বাঙ্গলার মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠেন ও বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া স্ববংশীয়দিগকে বাঙ্গলার জমীদারগণের শিরোমণি করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের পিতা কামদেব পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণের সময় তাঁহাদের জমীদারী বারইহাটীর তহশীলদার ছিলেন। তদুপলক্ষে রঘুনন্দন পুঁটিয়া রাজসংসারে প্রবিষ্ট হন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা; রামজীবন, রঘুনন্দন, ও বিষ্ণুরাম। রঘুনন্দন ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিচক্ষণ ও প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি পুঁটিয়া রাজসংসারে কিছুকাল সামান্য কর্ম্ম করিয়া * পরে রাজা দর্পনারায়ণের সময় লস্করপুর জমীদারীর উকীলস্বরূপে ঢাকায় প্রেরিত হন ও তথা হইতে মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। রঘুনন্দনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে প্রধান কাননগো বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের অধীনে নায়েব কাননগো নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুর্শিদকুলীর জমীদারী বন্দোবস্ত আরম্ভ হওয়ায়, রঘুনন্দন তৎপরতার সহিত তাহার হিসাব নিকাস ও কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া কুলী খাঁর

* এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রঘুনন্দন পুঁটিয়ার রাজ সংসারে পুষ্পচয়নের কার্য্য করিতেন। এক দিন নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার মস্তকোপরি সর্পের ফণা বিস্তার দেখিয়া, দর্পনারায়ণ তাঁহাকে বলেন যে, তুমি রাজা হইবে কিন্তু আমাদের জমিদারী কদাচ কাড়িয়া লইও না। তৎপরে তিনি রঘুনন্দনকে আপনার উকীল করিয়া ঢাকায় পাঠাইয়া দেন। এই প্রবাদ কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ, রঘুনন্দন যে অসাধারণ প্রতিভার জন্য সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বাল্যকালে তাহার কিছুই যে স্ফুরিত হয় নাই এবং তজ্জন্য তিনি যে একটী সামান্য লেখাপড়ার কাজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

অনুগ্রহদৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল। * ক্রমে রাজস্ব বন্দোবস্তে রঘুনন্দন কুলী খাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ইহার পর রঘুনন্দন নায়েব দেওয়ান এক্রাম খাঁর প্রধান মুৎসুদ্দী হইয়া শুল্ক বিভাগের বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হন। † তিনি দেওয়ানী বিভাগের অন্যান্য অনেক কার্য্যও করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিশেষরূপ উপকারের জন্য সচেষ্ট হন। সেই সময়ে অযোগ্য ও বিদ্রোহী জমীদারদিগের হস্ত হইতে যে সমস্ত জমীদারী বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, কুলী খাঁ রঘুনন্দনকে তৎসমুদায় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনন্দন ঐ সকল জমিদারী ভ্রাতা রামজীবন ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালিকাপ্রসাদ বা কালু কুমারের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটী প্রধান জমিদারীপ্রাপ্তির উল্লেখ করিতেছি। পরগণা বানগাছির জমীদার ভগবতী ও গণেশরাম বারম্বার রাজস্ব-

* কুলী খাঁর প্রিয় পাত্র হওয়া সম্বন্ধেও এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। যৎকালে প্রধান কাননগো দর্পনারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর কাগজে স্বাক্ষর ও মোহর করিতে অসম্মত হন. সেই সময়ে রঘুনন্দন তাঁহার সহকারী ও তাঁহারই নিকটে প্রধান কাননগোর মোহর থাকায় কুলী খাঁ কৌশলক্রমে রঘুনন্দনের দ্বারা প্রধান কাননগোর মোহর করাইয়া লন। তদবধি রঘুনন্দন কুলী খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কিন্তু এই প্রবাদের কোন মূল আছে বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় কাননগো জয়নারায়ণের মোহরের উপর নির্ভর করিয়াই কুলী খাঁ সমস্ত কাগজপত্র লইয়া বাদসাহের নিকট গমন করিয়াছিলেন, ইহাই সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

† কোম্পানীর পুরাতন কাগজপত্রে রঘুনন্দনকে মুৎসুদ্দী ও শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে কাশীমবাজারের ব্যবসায়ীদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে দেখা যায়।

Wilson's Annals Vol. ii.

প্রদানে অশক্ত হওয়ায়, রঘুনন্দন কুলী খাঁর আদেশে ১১১৩ সাল বা ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তাহা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। সাঁতোলরাজ রাজা রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী রাণী সর্ব্বাণী পরলোক-গতা হইলে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম বার্দ্ধক্যবশতঃ জমীদারী কার্য্যে অপটু হওয়ায়, মুর্শিদকুলী খাঁর অনুরোধক্রমে বাদসাহ সাহ আলম ১১২৩ হিজিরী বা ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রামজীবন ও কালুকোঁয়ারকে ভাতুড়িয়া জমীদারীর সনন্দ প্রদান করেন। তাহার পর ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সীতারামের উচ্ছেদের পর তাঁহার ভূষণা জমীদারীর নলদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা রঘুনন্দনের অনুরোধে রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ সময়ে উদয়নারায়ণের বিশাল রাজসাহী জমীদারীও তাঁহাদের সহিত বন্দোবস্ত হওয়ায়, তদবধি তাঁহারা রাজসাহীর জমীদার বা রাজা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। রাজসাহীর সুল্‌তানাবাদ পরগণা কিছুকাল উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরামের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, পরে তাহাও নাটোর-বংশের হস্তে আইসে। ইহার কয়েক বৎসর পরে সরকার মামুদা-বাদের অন্তর্গত টুঙ্গী-স্বরূপপুরের জমীদার আফগানবংশীয় সুজাৎ খাঁ ও নেজাবৎ খাঁ দুর্দ্দান্ত হইয়া নিকটস্থ জমীদারগণের জমী-দারীতে লুটপাট আরম্ভ করায় ও সরকারের ৬০ হাজার টাকা লুট করিয়া লওয়ায়, নবাব মুর্শিদকুলীর আদেশে হুগলীর ফৌজ-দার আসান উল্লা তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তথায় তাঁহারা চিরকারারুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জমিদারীও পরে রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। * অতঃপর ক্রমে ক্রমে আরও অনেক প্রসিদ্ধ পরগণার

* তারিখ বাঙ্গলা।

জমিদারী লাভ করিয়া * নাটোর রাজবংশ এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া উঠেন ও বাঙ্গালার জমীদারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের এক মাত্র প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা তাঁহাদের সেই সৌভাগ্যের মূল। এই নাটোর বংশ পরিশেষে এক প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার অজস্র সৎকীর্ত্তির জন্য সমগ্র ভারতে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই মহিলার নাম মহারাণী ভবানী। ভবানী বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে সাক্ষাৎ-দেবতাস্বরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন।

দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ।

প্রতি বৎসরের প্রথমে বৈশাখ মাসে পুণ্যাহ করিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ জমীদার ও আমীনদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। জমীদারগণ আপনাদিগের দেয় রাজস্ব দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারিগণের নিকট দিতেন। পরে শেঠগণ বাদসাহের পোদ্দার হইলে তাঁহারা জমীদারদিগের নিকট হইতে সমস্ত টাকা কড়ি বুঝিয়া লইয়া খালসা বা রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট জমা করিতেন। যে সমস্ত জমীদার তৎকালে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইতেন, শেঠগণ তাঁহাদের পক্ষ হইতে টাকা জমা দিয়া পরে স্থদ-সহ সেই সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইতেন। এই সকল রাজ-স্বের টাকা বাক্সবন্দী হইয়া দিল্লীতে উজীরের নিকট প্রেরিত হইত। দুই শত গো শকটে বোঝাই হইয়া তিন শত অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতিকের সহিত যাবতীয় খাজানা মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইয়া যাইত। তৎসঙ্গে খাজানাখানার দারোগাকেও থাকিতে

* পলাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণাও নাটোর রাজবংশের অধিকারে আইসে।

হইত। নবাব রাজস্বের সঙ্গে বাদসাহ, উজীর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর জন্য হস্ত।, পার্ব্বতীয় অশ্ব, আরণ্য মহিষ, কৃষ্ণসার মৃগ, শিকারী পক্ষী, গণ্ডারচর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনপাশী তরবারী, শ্রীহট্ট প্রদেশজাত শীতল পাটী, স্বর্ণ, রৌপ্য ও গজদন্ত নির্ম্মিত কারু-কার্য্য যুক্ত দ্রব্য, ঢাকাই আবরোঁয়া ও কাশীমবাজারের রেশমী বস্ত্র, এবং হুগলী বন্দরে প্রাপ্ত ইউরোপ হইতে আনীত নানাবিধ মনোরম দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইতেন। যখন বাঙ্গলার খাজানা মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইত, সে সময়ে নবাব প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত রাজধানী হইতে কিয়দ্দূর গমন করিতেন এবং রাজস্বপ্রেরণের বিষয় সরকারী বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়া রাখিতেন। বাঙ্গলা হইতে রাজস্ব বিহারে উপস্থিত হইলে, তথায় শকট ও সৈন্যের বদল হইত। তথাকার শাসনকর্ত্তা তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে শকট ও সৈন্যের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। এইরূপে এলাহাবাদ, আগরা প্রভৃতি স্থানে শকট ও সৈন্য বদল হইয়া অবশেষে তাহা দিল্লীতে পঁহুছিত। তৎসঙ্গে অন্যান্য সুবার রাজস্বও যুক্ত হইত। দিল্লীতে অর্থের বিশেষরূপ প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময়ে অন্য প্রকারেও রাজস্ব প্রেরণের কথা অবগত হওয়া যায়। সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ, দিল্লী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক স্থানে শেঠদিগের গদী থাকায় মুর্শিদাবাদের গদীতে বাঙ্গলার রাজস্ব প্রদান করিলে, শেঠগণ দিল্লীতে তাহার হুণ্ডী পাঠাইতেন এবং তথাকার গদীর অধ্যক্ষগণ সেই হুণ্ডী-অনুসারে দিল্লীর রাজকোষে টাকা জমা করিয়া দিতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজস্ব-প্রেরণে অনেক সময়ে অসুবিধা ঘটিত বলিয়া পরিশেষে শেষোক্ত প্রথাই অবলম্বনীয় হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১ কোটি

৩০ লক্ষ টাকা * বাঙ্গলার রাজস্বস্বরূপে দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন।

শেঠ মাণিকচাঁদ ও ফতে চাঁদ।

বাঙ্গলার রাজস্বের সহিত শেঠবংশীয়দিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শেঠবংশীয়গণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থে ও গৌরবে মুর্শিদাবাদের নবাবের অব্যবহিত পরেই আসন প্রাপ্ত হইতেন। মুর্শিদাবাদের বা বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, এরূপ অন্য কোন বংশের ছিল কি না সন্দেহ। জগৎশেঠের অগাধ অর্থের ও অপরিসীম গৌরবের কথা কাহারও অবিদিত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের তাঁহারাই মূল ছিলেন। আমরা শেঠদিগের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়া যথাস্থানে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিব। † এই ধনকুবেরগণের আদি নিবাস মাড়বারের অন্তর্গত নাগরনামক স্থানে ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হীরানন্দ সাহু অর্থের চেষ্টায় নাগর হইতে পাটনায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে পাটনা ব্যবসায়বাণিজ্যে একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠে এবং তথায় ইংরাজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণের কুঠী সংস্থাপিত হওয়ায় বাণিজ্যবিষয়ে তাহার গৌরব আরও বর্দ্ধিত

* তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস সালাতীনে ১ কোটি ৩ লক্ষ লিখিত আছে। ফারসী "সী" শব্দে ৩০ ও "সে" শব্দে ৩ বুঝায় সুতরাং "সী" স্থলে পরিশেষে "সে" লিখিত হইয়া থাকিবে।

† জগৎশেঠদিগের বিস্তৃত বিবরণ মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর 'জগৎশেঠ' নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। জগৎশেঠ নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রকাশিত হইবে।

হয়। হীরানন্দ ক্রমে ক্রমে সামান্য কর্ম্ম হইতে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া এবং প্রবাদানুসারে সহসা অনেক ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ায়, পাটনায় গদীর ব্যবসায় বা মহাজনের কারবার আরম্ভ করেন। ক্রমে তাহা হইতে যখন অধিক পরিমাণে ধন সঞ্চয় হয়, তখন তিনি তাঁহার সাত পুত্রকে সাতটী স্থানে গদী করিয়া দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ প্রথমে ঢাকায় গদী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিলে, দেওয়ানী কার্য্যালয়ের সহিত গদীর বিশেষরূপ সম্বন্ধ থাকায়, মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আগমন এবং তাহার মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার বাসস্থান ও গদী স্থাপন করেন। ঢাকায় অবস্থান কালেই মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদে আসিলে ক্রমে তাহা প্রগাঢ় হইয়া উঠে। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে যে টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা মাণিকচাঁদের পরামর্শক্রমে হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহিমাপুরের পরপারে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উক্ত টাঁকশাল স্থাপিত হয়। এক্ষণেও তাহার সামান্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কুলী খাঁ মাণিকচাঁদকে টাঁকশাল পরিদর্শনের ভার অর্পণ করেন। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল হইতে তৎকালে ইউরোপীয়গণও অনেক মুদ্রা মুদ্রিত করিয়া লইতেন, এই জন্য ক্রমে ক্রমে তাহার আয় বৃদ্ধি হয়। জমীদারগণের সহিতও মাণিকচাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল। যে সমস্ত জমীদার যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন না, তাঁহারা বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য শেঠদিগের শরণাপন্ন হইতেন। শেঠগণ ঐ সকল জমীদারের পক্ষ হইতে খালসা বিভাগে টাকা জমা করিয়া দিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা জমীদারদিগের

নিকট হইতে স্থদ প্রাপ্ত হইতেন। ইউরোপীয়গণও আপনাদিগের ব্যবসায়ের জন্য সময়ে সময়ে শেঠদিগের গদী হইতে টাকা লইতেন। তদ্ভিন্ন সরকারী কার্য্যের জন্য শেঠদিগকে টাকার সরবরাহ করিতে হইত। এইরূপে সরকারের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায়, নবাব মুর্শিদকুলীর অনুরোধক্রমে বাদসাহ ফরখ্‌সের হিজরী ১১২৭ বা ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথারীতি ফার্ম্মান প্রদান করেন। মাণিকচাঁদও আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাদসাহপরিবর্ত্তন কালে মুর্শিদকুলীর দেওয়ানী ও নাজিমী পদ স্থায়ী থাকার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ কুলী খাঁর এরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, নবাব সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুর্শিদকুলীর রাজস্ববন্দোবস্তের সহিতও মাণিকচাঁদের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। নবাব শেঠদিগকে এরূপ বিশ্বাস ও তাঁহাদের গদীকে এরূপ নিরাপদ মনে করিতেন যে, তথায় তাঁহার নিজের সমস্ত ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুকালে শেঠদিগের গদীতে তাঁহার ৫ কোটি টাকা মজুত ছিল বলিয়া শুনা যায়। এই টাকা পরে প্রত্যর্পিত না হওয়ায় সরফরাজ খাঁর সহিত শেঠদিগের বিবাদ ঘটার এক কথা প্রচলিত আছে। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান হওয়ায় স্বীয় ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আপনার গদীর গোমস্তা নিযুক্ত করেন। ফতেচাঁদের মাতার নাম ধনবাই ও পিতার নাম উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদ বারাণসীর একজন প্রধান শেঠ ছিলেন। ক্রমে মাণিকচাঁদ সমস্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদ গদীর কার্য্যপরিচালনে প্রবৃত্ত হন।

তিনি হিজরী ১১১৯ বা ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ ফরখ্‌সেরের নিকট হইতে শেঠ উপাধি ও ফার্ম্মান লাভ করেন। তৎপরে নবাব মুর্শিদ-কুলীর অনুরোধক্রমে ফতেচাঁদ বাদসাহদরবার হইতে বাঙ্গলার রাজস্বের পোদ্দারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি জমীদারদিগের নিকট হইতে সমস্ত টাকা কড়ি বুঝিয়া লইয়া খালসা বিভাগে জমা করিয়া দিতেন। মাণিকচাঁদের ন্যায় ফতেচাঁদও মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

কোম্পানীর অবস্থা।

মুর্শিদকুলী খাঁ কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের আশা প্রদান করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহার কোনই মীমাংসা হয় নাই। সেই সময়ে জাহান্দরসাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ায় ও কুলী খাঁ তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করায় ফরখ্‌সেরের সহিত তাঁহার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে কোম্পানীর সনন্দলাভের কোন রূপ আশা নাই দেখিয়া ইংরাজ প্রতিনিধি হেজেস্‌ সাহেব কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিয়া ১৭১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। কোম্পানীও জাহান্দর সাহকে বাদসাহ স্বীকার করিয়া নজরাদি পাঠাইয়া দেন। তৎপরে ফরখ্‌সের কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে ২২ হাজার টাকা প্রদান করিয়া কোন রূপে নিষ্কৃতিলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের বাণিজ্যের কোন রূপ বন্দোবস্ত না হওয়ায়, কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন।

* তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস্‌ সালাতীন।

সে সময়ে জিয়াউদ্দীন খাঁ হুগলীতে থাকায় তাঁহারা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে জাহান্দর নিহত ও ফরখ্‌সের দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে,কোম্পানী জিয়া-উদ্দীনের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে বাদসাহ স্বীকার করিয়া ১৯ মোহর ও উজীর প্রভৃতিকে ৮ মোহর নজর পাঠাইয়া দেন এবং বাদসাহকে মুর্শিদকুলীর ব্যবহার জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের প্রার্থনা করেন। কিন্তু বাদসাহদরবার হইতে কোন রূপ আশাজনক উত্তর শীঘ্র পঁহুছে নাই। এদিকে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের আদেশে শিবপ্রসাদ ক্রোরী আমীরাবাদ পরগণার অন্তর্গত সুতানুটি ও কলিকাতার এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ক্রোরী পাইকান পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের খাজানার জন্য কোম্পানীকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। ফরখ্‌সেরের সহিত গোলযোগের সময় হেজেস্‌ কাশীমবাজার পরিত্যাগ করায় এবং বাণিজ্যের সনন্দের জন্য কোম্পানী নবাবের নিকট অগ্রসর না হওয়ায়, মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরাজদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হন। ফরখ্‌সেরের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সুবেদারী ও দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া লহরীমালকে হুগলীর শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী করিয়া পাঠান ও তাঁহার প্রতি কোম্পানীর উপর দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দেওয়া হয়। লহরীমাল ইংরাজদিগের দস্তক অগ্রাহ্য করিয়া হুগলীতে তাঁহাদের ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন। * হেজেস ও উইলিয়ম্‌সন তাঁহাকে নিরস্ত করার জন্য প্রেরিত হন, এবং তিনি ক্ষান্ত না হইলে কোম্পানীও সরকারী নৌকা আটক করিবেন

* Wilson's Annals Vol. II.

বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপে চারিদিকে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, কোম্পানী দিল্লী-দরবারে দূত প্রেরণ করিয়া তথা হইতে সনন্দপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহাতে অনেক বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, আপাততঃ যাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্যের কোন রূপ বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য তাঁহারা অন্য কোন উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ আর্মেনীয় সওদাগর খোজা সরহদ্দের চেষ্টায় তাঁহারা কতকটা কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সরহদ্দ তাঁহার পরিচিত আজিম ওশ্বানের কর্ম্মচারী খোজা মানুস বা নজর খাঁর দ্বারা বাদসাহদরবার হইতে দুই খানি হজবলহুকুম বাহির করান, তাহার এক খানিতে কোম্পানী বাদসাহের জন্য যে উপহার পাঠাইতেছেন তাহা নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হওয়ার জন্য সুবেদারগণের প্রতি আদেশ ও অপর খানিতে যত দিন কোম্পানী ফার্ম্মান প্রাপ্ত না হন, তত দিন বাদসাহ আরঙ্গ জেবের সময়ের ন্যায় ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করার আদেশ লিখিত থাকে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি প্রদত্ত হজবলহুকুম কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা তাহার সম্মানার্থে তোপধ্বনি করেন। ইহার পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসে রসেল্ কার্য্যভার পরিত্যাগ করায় হেজেস তাঁহার স্থানে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছিলেন। তাহার পর উক্ত হজবলহুকুমের নকলে কাজীর দস্তখত করাইয়া উকীল রামচাঁদের দ্বারা দেওয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাশীমবাজারে প্রেরণ করা হয়। * এ দিকে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণকেও শান্ত করার প্রয়োজন হওয়ায় লহরীমাল প্রভৃতিকেও উপহার

* Wilson's Annals Vol. II.

প্রদান করা হইয়াছিল। এই সময়ে বাদসাহদরবার হইতে প্রেসিডেণ্টের জন্য স্বর্ণখচিত ও খোজা সরহদ্দের জন্য রৌপ্যখচিত, শিরোপা উপস্থিত হয়। হজবলহুকুম প্রাপ্ত হইয়া * যদিও মুর্শিদকুলী খাঁ প্রকাশ্য ভাবে তাহা অমান্য করেন নাই, তথাপি তিনি পরোক্ষভাবে কোম্পানীকে সমস্ত অধিকার প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাশীমবাজারের ব্যবসায়িগণ দেওয়ানের ভয়ে কোম্পানীকে রেশমাদির সরবরাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় ও তথায় নানা রূপ গোলযোগ ঘটায়, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলেট্, এজ ও হগার তাহার মীমাংসার জন্য কাশীমবাজারে প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁহারা বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেওয়ানের আদেশে কাশীমবাজারের শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে শুল্কের নাম করিয়া মাল ও টাকা আদায় করিয়া লওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া পড়েন। যদিও তাঁহারা শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তথাপি দেওয়ানের হস্তে তাঁহাদের নিষ্কৃতি ছিল না। সেই সময়ে ইউরোপে অধিক পরিমাণে মোটা রেশমের প্রয়োজন হওয়ায় কাশীমবাজার কুঠীর কার্য্য পুনঃ পরিচালনের আবশ্যক হইয়া উঠে এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সামুয়েল ফীক্ তাহার অধ্যক্ষ, এডওয়ার্ড ক্রিম্প তাঁহার প্রথম ও

* উক্ত হজবলহুকুমে মুর্শিদকুলী খাঁকে নায়েব সুবা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি ফরখ্‌সেরের নিকট হইতে নায়েব সুবা ও পরে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। কোম্পানীর কাগজপত্রে ইহার পর হইতে মুর্শিদকুলী খাঁকে নবাব জাফর খাঁ নামে লিখিত দেখা যায়, সুতরাং তিনি যে ফরখ্‌সেরের নিকট হইতে সুবেদারী পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এডওয়ার্ড এজ্ তাঁহার দ্বিতীয় সহকারী নিযুক্ত হন। ফীক্ কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যপরিচালন ও মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে মুদ্রা মুদ্রিত করার প্রার্থনা করেন। জাফর খাঁ প্রথমে সম্মত হন, পরে বলেন যে, যত দিন বাদসাহের ফার্ম্মান আগত না হয়, ততদিন তিনি টাঁকশালে মুদ্রা মুদ্রিত করার জন্য মৌখিক আদেশ প্রদান করিতে পারেন। বাণিজ্যবিষয়ে বিশেষ কোন বিঘ্ন হইবে না প্রকাশ করিলেও শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কাশীমবাজারের ব্যবসায়ীদিগের উপর পিয়াদা মহশীল দিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে কুলী খাঁকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া ফীক্ সাহেবের পরামর্শ ক্রমে কাউন্সিল ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে নবাব জাফর খাঁ ও দেওয়ান প্রভৃতিকে ২৫ হাজার টাকা * দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তাহার পর জাফর খাঁ কোম্পানীর সহিত মিত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও কোম্পানীর প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কোম্পানীর অসদ্ব্যবহার যে ইহার কতকটা কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাফর খাঁ আবার বলিয়া বসেন যে, বাদসাহের হুকুম না পাইলে কোম্পানী টাঁকশালে টাকা

* কোম্পানীর কাগজপত্রে উক্ত ২৫ হাজারের মধ্যে কাহাকে কত দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা এইরূপ লিখিত আছে,—

নবাব জাফর খাঁ	...	১৫০০০
দেওয়ান এক্রাম খাঁ	...	৫০০০
রঘুনন্দন প্রভৃতি মুৎসুদ্দী	..	৫০০০
		২৫০০০

Wilson's Annals Vol II.

মুদ্রিত করিয়া লইতে পারিবেন না এবং শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী রঘুনন্দন কাশীমবাজারের ব্যবসায়ীদিগের প্রতি পিয়াদা মহশীল দিতে আরম্ভ করেন। ফার্ম্মান না আসা পর্য্যন্ত কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ে এইরূপ গোলযোগ চলিতে লাগিল।

দিল্লীতে দূত প্রেরণ।

কোম্পানীর বাণিজ্যবিষয়ে যখন নানা রূপ অসুবিধা ঘটিতেছিল, তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ডিরেক্টরগণের আদেশক্রমে দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই দৌত্যব্যাপারে জন্ সর্ম্মান প্রধান ও তাঁহার সাহায্যের জন্য জন্ প্রাট ও এডওয়ার্ড ষ্টীফেন্সন্ সহকারী নিযুক্ত হন। ডাক্তার হ্যামিল্টন ও খোজা সরহদ্দও তাঁহাদের সহিত গমন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। খোজা সরহদ্দ যদিও কখন দিল্লীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি তাঁহার স্বজাতীয় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে তিনি দরবারের অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ দরবারের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়, কাউন্সিল সরহদ্দকে দ্বৈভাষিকের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে বাধ্য হন এবং তাঁহারই উপর সমস্ত বিষয় নির্ভর করিতে হইয়াছিল। * সর্ম্মান তৎকালে পাটনায় ছিলেন। সরহদ্দ ১৭১৪ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে জলপথে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৭১৫ খৃঃ অব্দের প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হন। পরে তথা হইতে সর্ম্মানকে সঙ্গে লইয়া উক্ত অব্দের এপ্রেল মাসে দিল্লী যাত্রা করেন। তাঁহারা বাদসাহের

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে, খোজা সরহদ্দ আপনার অনেক মালপত্র বিনা শুল্কে লইয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া দিল্লীগমনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

উপহারের জন্য নানা প্রকার মনোরম কাচের বাসন, ঘড়ী ও সুন্দর সুন্দর পশমী ও রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হন। সরহদ্দ তাহাকে ১০ লক্ষ টাকার দ্রব্য বলিয়া রটনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মে মাসে এলাহাবাদে ও জুন মাসে আগরায় পঁহুছিয়া ৮ই জুলাই তারিখে দিল্লী প্রবেশ করেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে দরবারে সংবাদ পাঠাইলে, ভিন্ন ভিন্ন সুবার নাজিমগণ তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়া দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। দূতগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দরবারের কোন্ কর্ম্মচারীর দ্বারা আপনাদিগের কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন, তাহাই বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় উজীর আবদুল্লা বা আমীর উল্ ওমরা হোসেন আলির প্রতি তাঁহারা নির্ভর করিতে সাহসী হইলেন না। কারণ, বাদসাহ সৈয়দদিগের চেষ্টায় সিংহাসন লাভ করিলেও মনে মনে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা বক্সী খোজা হাসেন বা খাঁ দুরানকে আপনাদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। হাসেন বাঙ্গলা হইতে ফরখ্সেরের অনুগমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাদসাহ অনেক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। খাঁ দুরান ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁও কোম্পানীর দূতপ্রেরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাহাতে তাঁহারা ফার্ম্মান পাইতে না পারেন, তজ্জন্য দরবারে অশেষবিধ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্য ইংরাজ দূতদিগকে অত্যন্ত গোলযোগে পড়িতে হয়। সহসা একটী দৈব ঘটনায় তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধারের সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭১৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে মাড়বাররাজ অজিত সিংহের

কন্যার সহিত ফরখ্‌সেরের বিবাহ সংঘটন হওয়া স্থির হয়। কিন্তু বাদসাহ একটী ব্রণে কাতর হইয়া পড়ায় বিবাহের বিলম্ব ঘটে। তাঁহার হাকিমগণের চিকিৎসায় যখন কোন ফললাভ হইল না, তখন বাদসাহ খাঁ দুরানের পরামর্শক্রমে কোম্পানীর ডাক্তার হ্যামিল্টনের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে সম্মত হন। হ্যামিল্টন অস্ত্র-চিকিৎসায় বাদসাহকে আরোগ্য করিলে, তিনি তাঁহাকে খেলাত, কল্‌গী, হীরক অঙ্গুরীয়, হস্তী, অশ্ব ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। খোজা সরহদ্দও খেলাত ও হস্তী পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পুরস্কারপ্রদানের পর বাদসাহ হ্যামিল্টনকে তাঁহার অন্য কিছু প্রার্থনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, স্বজাতিবৎসল হ্যামিল্টন নিজের জন্য কোন বিষয়ের প্রার্থনা না করিয়া কোম্পানীর আবেদনের বিষয় বাদসাহকে বিবেচনা করিতে বলেন। বাদসাহ তাঁহার স্বজাতিপ্রীতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহের পর সে বিষয়ে বিশেষ রূপ বিবেচনা করিবেন বলিয়া আপনার মত প্রকাশ করেন।

দরবারে কোম্পানীর আবেদন ও তাঁহাদের ফার্ম্মানপ্রাপ্তি।

তাহার পর অতি সমারোহের সহিত বিবাহব্যাপার সংসাধিত হইলে, ইংরাজ দূতগণ ১৭১৬ খৃঃ-ষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দরবারে আপনাদিগের আবেদন উপস্থিত করেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রার্থনা করিয়া বাঙ্গালা সম্বন্ধে এইরূপ আবেদন করা হয়। (১) কলিকাতার অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত দস্তক বা ছাড়-পত্র দেখিলে বাঙ্গালার সরকারী কর্ম্মচারিগণ কোন প্রকার ছল ধরিয়া উক্ত পত্রে উল্লিখিত দ্রব্যাদি আটক বা পরীক্ষা করিতে পারিবেন না। (২) মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের কর্ম্মচারিবর্গ প্রয়োজনানুসারে সপ্তাহে তিন দিবস

কোম্পানীকে মুদ্রা মুদ্রিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন। (৩) ইউরোপীয় অথবা দেশীয় কোন ব্যক্তি কোম্পানীর নিকট ঋণী বা দায়ী হইলে প্রার্থনামাত্রেই তাহাকে কলিকাতার অধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। (৪) সুল্‌তান আজিম ওশ্বানের আদেশানুসারে কোম্পানী যেরূপে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমীদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদের চারিপার্শ্বস্থ ৩৮ খানি গ্রামের জমীদারী তাঁহাদিগকে ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে। খাঁ দুরান যদিও কোম্পানীর পক্ষাবলম্বনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তথাপি দূতগণ যেন উজীরের উপর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করার জন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেন। বাদসাহও কোম্পানীর আবেদন গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইলেও কতকগুলি বিষয়ের বিবেচনার জন্য দরবারের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর উপর ভার প্রদান করেন। কাজেই প্রকারান্তরে সমস্ত বিষয়ে উজীরের উপর নির্ভর করিতে হয়। অনেক বাদানুবাদের পর উজীর কোম্পানীর আবেদনের মধ্যে কতকগুলি সামান্য বিষয়ের অনুমতি-পত্র দিতে স্বীকৃত হইলে দূতগণ বাদসাহের নিকট আরও দুইখানি আবেদনপত্র উপস্থিত করেন। অবশেষে উজীর তাঁহাদের সমস্ত আবেদন গ্রাহ্য করিয়া কোম্পানীকে সনন্দ প্রদান করিতে সম্মত হন। উক্ত সনন্দে কেবল উজীরের স্বাক্ষর ও মোহর থাকায়, দূতগণ পুনর্ব্বার গোলযোগে পড়িলেন। কারণ, রাজধানীর নিকটস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ উজীরের স্বাক্ষর গ্রাহ্য করিলেও দূরস্থ সুবেদারগণ যে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন না, ইহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে আবার কতিপয় কারণে

খোজা সরহদ্দের প্রতিও তাঁহাদের সন্দেহ জন্মে। যাহা হউক, ইংরাজ দূতগণ অবশেষে সেই সনন্দ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং যত দিন পর্য্যন্ত তাহাতে বাদসাহের মোহর অঙ্কিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার নবাবের প্রতিনিধিগণও সেই সময়ে নানা প্রকার বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে গোলযোগে পড়িয়া কোম্পানীর দূতগণকে আরও চৌদ্দ মাস দিল্লীতে অপেক্ষা করিতে হয়। অবশেষে তাঁহারা বাদসাহের প্রিয়পাত্র অন্তঃপুর-রক্ষক জনৈক খোজাকে উৎকোচ প্রদান করিয়া তাহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করেন এবং উজীর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীকে সন্তুষ্ট করিয়া ১৭১৭ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে বাদসাহের মোহরযুক্ত ফার্ম্মান প্রাপ্ত হন। * দূতগণ ৩৪ খানি আদেশ-পত্র গ্রহণ করিয়া জুন মাসে দিল্লী পরিত্যাগ করেন।

ফার্ম্মানপ্রাপ্তির পর কোম্পানী ও নবাব।

যে সময় ইংরাজ দূতগণ বাদসাহের মোহরযুক্ত ফার্ম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে ১৭১৭ খৃঃ অব্দের মে মাসে কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ আনন্দভোজ, তোপধ্বনি ও আতসবাজীতে কলিকাতা নগরীতে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিলেন।†

* ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মোগল কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর প্রতি শুল্কবৃদ্ধির অত্যাচার করায়, বোম্বাই অধ্যক্ষের আদেশে সুরাটের কুঠী উঠিয়া যায়, এবং সেই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কয়েক খানি যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিত হওয়ায়, গুজরাটের শাসনকর্ত্তা উক্ত খোজাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, কোম্পানীর প্রার্থনা মঞ্জুর না করিলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং উজীর ও বাদসাহকে তাহা বুঝাইয়া দিতে বলেন। সেই জন্য কোম্পানীর দূতগণ সত্বর ফার্ম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খাঁ দুরানের একজন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে দূতগণ নাকি এই সংবাদ পাইয়াছিলেন।

† Wilson's Annals Voll II.

উক্ত অব্দের শেষ ভাগে সর্ম্মান ও তাঁহার সঙ্গিগণ কলিকাতায় উপস্থিত হন। তৎপূর্ব্বেই কলিকাতার কর্ম্মচারিবর্গ ফার্ম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মুর্শিদকুলী খাঁর নিকটে ফার্ম্মান দেখাইলে যদিও নবাব তাহা অমান্য করিতে পারিলেন না, তথাপি তাহার কূট অর্থ করিয়া কোম্পানীর কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যদিও অধ্যক্ষের দস্তকানুসারে কোম্পানীর বাণিজ্যের কোন রূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না প্রকাশ করেন, তথাপি টাঁকশালের ব্যবহারে ও ৩৮ খানি গ্রামের জমীদারীক্রয়ের বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। অবকাশাভাব ও কোম্পানীর বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে টাঁকশালের নিকট অগ্রসর হইতে দিলেন না এবং কলিকাতার চারি পার্শ্বের জমীদারদিগকে কোম্পানীর নিকট জমীদারী বিক্রয় করিতে গোপনে নিষেধ করিলেন। তৎকালে জমীদারগণ কুলী খাঁর নামে কম্পিত হইতেন, কাজেই তাঁহারা আপনাদের জমীদারী বিক্রয় করিতে সাহসী হইলেন না। ইংরাজেরা যদি উক্ত ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভাগীরথীর উভয় তীরে পাঁচ ক্রোশ ব্যাপিয়া সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইত এবং তাঁহারা বুরুজাদি নির্ম্মাণ করিয়া নৌপথের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া উঠিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের জমীদারীর আয় হইতে সমস্ত বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিত। নীতিজ্ঞ কুলী খাঁ এ সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোম্পানীর পূর্ব্বাপর ব্যবহারে তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোম্পানী স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের চেষ্টা করিবেন, এবং সেই সময় হইতেই তাহার উদ্যোগ চলিতেছিল। বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সম্বন্ধে নবাব কেবল কোম্পানীকে যে সমস্ত মালপত্র সমুদ্র-পথে আমদানী

বা রপ্তানী হইতে পারে তাহাদেরই সম্বন্ধে আদেশ দিলেন। কারণ, ফার্ম্মানে তাহাই লিখিত ছিল বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু অন্তর্বাণিজ্যসম্বন্ধে ইংরাজেরা শুল্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। ইতিপূর্ব্বে লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতির অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর যে লাভ হইতেছিল, এক্ষণে তাহারও ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল। নবাব বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগকে বিনা শুল্কে অন্তর্বাণিজ্যের আদেশ দিলে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়ের একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। তাহাতে অন্যান্য ব্যবসায়ী ও সরকারের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বাদসাহের নিকট হইতে ফার্ম্মান লাভ করিয়াও যখন কোম্পানী নবাবের নিকট হইতে সমস্ত বিষয়ের অধিকার লাভে সক্ষম হইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইয়া উৎসাহের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিলেন এবং তদ্দ্বারাই দিন দিন তাঁহাদের উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে ১৭১৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে রবার্ট হেজেসের মৃত্যু হইলে, ফীক্ তাঁহার স্থানে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন ও এডওয়ার্ড পেজ কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন।

কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নতি ও কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি।

কোম্পানী নবাবের সহিত বাদানুবাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যেরূপ অধিকার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহাতেই সম্মত হওয়ায়, বাঙ্গলার বাণিজ্যব্যাপারে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। কোম্পানীর অনুমতি লইয়া অন্যান্য ইংরাজ বণিক্ এবং পর্টুগীজ, আর্ম্মেনীয়, মোগল ও হিন্দু ব্যবসায়িগণ দলে দলে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ইংরাজ নিশানের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের ব্যবসায় পরিচালনে

নিযুক্ত হইলেন। দিন দিন কলিকাতা বন্দরে অপর্য্যাপ্ত দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যে অনেকে ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ হইয়া উঠিল। তাহাতে কোম্পানীর কোন প্রকার ক্ষতি বা সরকারের কর্ম্মচারিগণের কোনরূপ বিরাগ উৎপন্ন হয় নাই। কলিকাতার অধ্যক্ষ মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার উপহার প্রদান করিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য স্থানের কুঠীর কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। কলিকাতার অধিবাসিগণ এক্ষণে অন্যান্য স্থানের প্রজা অপেক্ষাও স্বাধীনতা ও সুখভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইল এবং তাহার আকারও দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া শোভা ও সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সেই কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়া এক্ষণে বিদ্যুতালোকে প্রোজ্জ্বলিত শত শত মনোহারিণী ও নভশ্চুম্বিনী সৌধমালা বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ভাগীরথীবক্ষে আপনার অমরালাঞ্ছিত দিব্য কান্তি প্রতিবিম্বিত করিতেছে।

কুলী খাঁর বিহারের সুবেদারীপ্রাপ্তি।

সাজাদা আজিম ওশ্বানের সুবেদারী সময়ে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা তিন প্রদেশই তাঁহার অধীন ছিল। দিল্লীর বিপ্লব-সময়ে তিনি তথায় গমন করিলে, ফরখ্সের তাঁহার প্রতিনিধিরূপে অবস্থিতি করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলীর প্রতি তিন প্রদেশের দেওয়ানী ও বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী প্রদান করা হয়। বিহারে একজন স্বতন্ত্র নায়েব নাজিম ছিলেন। ফরখ্-সের যৎকালে পাটনায় অবস্থিতি করেন, সে সময়ে সৈয়দ হোসেন-আলিকে পাটনার নায়েব নাজিম দেখা যায়। ইহার পর ফরখ্সের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, বাঙ্গলায় বাদসাহবংশের কেহ প্রতিনিধি

না থাকায় নায়েব নাজিমগণের প্রতিই সুবেদারীর ভার প্রদান করা হয়। সৈয়দ হোসেন আলি বাদসাহের আমীর উল্‌ ওমরা হইলে, বিহারে একজন স্বতন্ত্র সুবেদার নিযুক্ত হন। প্রথমে খয়রাৎ খাঁকে বিহারের সুবেদার হইতে দেখা যায়।* তাহার পর মীরজুম্লা ও সের বলন্দ খাঁ পাটনার সুবেদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭১৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পাটনার সুবেদারী পদ শূন্য হওয়ায়, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ দরবার হইতে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন।† অনেক দিন হইতে তিনি বিহারের সুবেদারীপ্রাপ্তির আশা করিতেছিলেন, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে তিন প্রদেশের নাজিমী ও দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু বিহারের শাসন ভার অধিকদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদারের হস্তে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, নবাব সুজা উদ্দীনের সময় বাঙ্গলার নবাবের প্রতি পুনরায় বিহারশাসনের ভার অর্পিত হয়। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। কুলী খাঁর বিহারশাসনের ভারপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই দিল্লীতে আবার বিপ্লব উপস্থিত হয়। পর অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

---

* Wilson's Annals Vol II.

† Scott's History of the Dekkan.

সপ্তম অধ্যায়।

মুর্শিদকুলী খাঁ।

যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ফরখ্‌সের ভারতসাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, আবার তাঁহাদেরই নিগ্রহে তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হইলে, রফে-উল-দার্জৎ ও রফে-উদ্দৌলা নামক দুইজন বাদসাহ-বংশীয় যুবক সৈয়দগণের ক্রীড়নকস্বরূপে কিছু-কাল ময়ূর-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, উক্ত সৈয়দগণেরই অনুগ্রহে ১৭১৯ খৃঃ অব্দে রোসেন আক্তর ভারত সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন। এই রোসেন আক্তর মহম্মদ সাহ উপাধি ধারণ করিয়া ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার চিরন্তন প্রথানুসারে বাঙ্গলার রাজস্বের সহিত বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া নবীন বাদসাহের মনস্তুষ্টি করিলেন, ও দরবার হইতে তিন প্রদেশের সুবেদারী ও দেওয়ানী স্থায়ী করিয়া লইলেন। তাহার পর বাদসাহ কর্ত্তৃক সৈয়দগণের নিগ্রহ সংসাধিত হইলে, কুলী খাঁ পুনর্ব্বার বৎসরের রাজস্বের সহিত উপহার পাঠাইয়া বাদসাহের নিকট এক সহানুভূতিসূচক আবেদন প্রেরণ করেন। ইহাতে বাদসাহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন ও বৎসর বৎসর যথা-সময়ে রাজস্ব প্রেরণ করায় দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়া উঠে।

সম্রাট্ মহম্মদ সাহ ও তাঁহার নিকট হইতে কুলী খাঁর শাসনভার-প্রাপ্তি।

মুর্শিদকুলীর চাকলা-বিভাগের স্থচনা।

সম্রাট মহম্মদ সাহের নিকট হইতে স্থবেদারী ও দেওয়ানী পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার প্রিয় কার্য্য জমীদারীবন্দোবস্তে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলেন। এবার তিনি স্থায়িরূপে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। যদিও তাঁহার বন্দোবস্ত মধ্যে মধ্যে সংশোধিত হইয়াছিল, তথাপি নবাব মীর কাসেমের সময় পর্য্যন্ত তাহা একরূপ সমভাবেই প্রচলিত ছিল। তিনি জমীদারী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে প্রথমতঃ বাঙ্গলার প্রদেশবিভাগে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ১৫৮২ খৃঃ অব্দে রাজা তোড়রমল্ল বঙ্গদেশকে কতকগুলি সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করিয়া তাহার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাস্থজার সময়ে বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত কতক ভূভাগ বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভূত হওয়ায় এবং উড়িষ্যা হইতে কতক ভূমি খারিজ করিয়া, টাকশাল প্রভৃতির আয় লইয়া ও তোড়রমল্লের নির্দ্দিষ্ট জমার বৃদ্ধি করিয়া স্থজা বঙ্গরাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও তাহার অতিরিক্ত কয়েক পরগণা ও সরকারের গঠন করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সরকার বিভাগ অপেক্ষা আরও বৃহত্তর বিভাগের প্রয়োজন বোধ করিয়া সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে ত্রয়োদশ প্রদেশে বিভাগ করিয়াছিলেন। এই ত্রয়োদশ বিভাগ ১৩ চাকলা নামে অভিহিত হয়। চাকলা বিভাগ মুর্শিদকুলীর জমীদারীবন্দোবস্তের পূর্ব্বস্থচনা। সেই জন্য আমরা চাকলাবিভাগের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতেছি। দুই একটী সরকার লইয়া চাকলা বিভাগ হওয়ায়, পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য কি রূপ ভাবে সরকারে বিভক্ত ছিল তাহা বুঝিতে না পারিলে, চাকলা বিভাগ বুঝা দুষ্কর হইবে বিবেচনায়, আমরা সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে সরকারবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে চাকলা বিভাগের বিবরণ

প্রদান করিতেছি। প্রথমতঃ তোড়রমল্লের, পরে সাসুজার বন্দোবস্তের কথা বলা যাইতেছে।

রাজা তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত।

মোগলকেশরী আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্য আফগানগণের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মোগল সম্রাজ্যভুক্ত হইলে রাজা তোড়রমল্ল তাহার রাজস্ব বন্দোবস্তে নিযুক্ত হন। তোড়রমল্ল ১৫৮২ খৃঃ অব্দে সমস্ত বাঙ্গলার ভূমির বিবরণ ও পরিমাণ যথাসাধ্য জ্ঞাত হইয়া, তাহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া পরগণার সৃষ্টি ও কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হয়। এইরূপে সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে তোড়রমল্ল ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভাগ করিয়াছিলেন। বঙ্গরাজ্যের ভূমি সাধারণতঃ খালসা ও জায়গীর নামে অভিহিত হইত। যে সমস্ত জমীর আয় রাজকোষে আসিত তাহা খালসা ও যাহার আয় কর্ম্মচারিগণের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন হইত তাহাকে জায়গীর ভূমি বলিত। তোড়রমল্ল খালসা ভূমির ৬৩, ৪৪, ২৬০ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩, ৪৮, ৮৯২ টাকা মোট ১, ০৬, ৯৩, ২৬০ টাকা বঙ্গরাজ্যের জমা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জমাবন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাকে "আসল জমা তুমার" কহে। আমরা রাজা কর্ত্তৃক বিভক্ত সরকারগুলির অবস্থান ও তাহাদের পরগণার সংখ্যা ও খালসা ভূমির জমার উল্লেখ করিয়া পরে জায়গীর জমীর বিবরণ প্রদান করিতেছি।

১ সরকার জেন্নেতাবাদ। বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের নামানুসারে প্রথম সরকারের জেন্নেতাবাদ বা গৌড় নাম করা হয়। মালদহের নিকটে গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর তীরের ভূভাগ সরকার জেন্নেতাবাদের অন্তর্গত হইয়াছিল। সরকার জেন্নেতাবাদ ৬৬ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৪,৭১,১৭৪ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

২ পুর্ণিয়া। বর্ত্তমান পুর্ণিয়া প্রদেশের কতকাংশ লইয়া সরকার পুর্ণিয়ার সৃষ্টি হয়। কৌশিকী নদীর পূর্ব্ব ভাগের ভূভাগ দ্বারা সরকার পুর্ণিয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহার পরগণার সংখ্যা ৯ ও জমা ১,৬০,২১৯ টাকা।

৩ তেজপুর। উক্ত পূর্ণিয়া প্রদেশের আরও কতকাংশ লইয়া সরকার তেজপুর গঠিত হয়। তেজপুর পূর্ণিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তেই অবস্থিত ছিল। তেজপুরের পরগণার সংখ্যা ২৯ এবং ১,৬২,০৯৬ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হয়।

৪ পিঁজরা। হাবিলী বা কতকগুলি খাস দরকারী পরগণা লইয়া সরকার পিঁজরার উৎপত্তি হয়। ত্রিস্রোতা বা তিস্তার একটী শাখা নদীর তীরে বর্ত্তমান দিনাজপুর বিভাগে সরকার পিঁজরা অবস্থিত ছিল। ২১ পরগণায় বিভক্ত হইয়া পিঁজরার জমা ১,৪৫,০৮১ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়।

৫ ঘোড়াঘাট। ত্রিস্রোতা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এবং স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের দক্ষিণে ও বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রদেশের অধিকাংশ লইয়া সরকার ঘোড়াঘাট গঠিত হইয়াছিল। ঘোড়াঘাট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ও তাহার জমা ২,০৯, ৫৭৭ ধার্য্য হয়।

সরকার জেন্নেতাবাদের দক্ষিণ হইতে গঙ্গা বা পদ্মার উভয় তীর ব্যাপিয়া লস্করপুর বা পুঁটিয়া জমীদারী পর্য্যন্ত ৬
সরকার বার্ব্বাকাবাদের সীমা বিস্তৃত ছিল। বার্ব্বাকাবাদ।
বার্ব্বাকাবাদের পরগণার সংখ্যা ৩৮ ও ৪,৩৬,২৮৮ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

বার্ব্বাকাবাদ হইতে পূর্ব্ব মুখে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া শীল-হাট বা শ্রীহট্টের সীমা পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে ঢাকা ৭
বা জাহাঙ্গীরনগরকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সর- বাজুয়া।
কার বাজুয়া বিস্তৃত ছিল। বাজুয়া ৩২ পরগণায় বিভক্ত ও ৯,৮৭, ৯২১ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হয়।

বার্ব্বাকাবাদের সংলগ্ন ও সুর্ম্মানদীর দক্ষিণ বাঙ্গলার পূর্ব্ব সীমার শেষ পর্য্যন্ত কাছাড়ের প্রান্তলগ্ন ৮
ভূভাগ সরকার শীলহাট নামে অভিহিত শীলহাট।
হইত। উক্ত সরকারে ৮ পরগণা ও ১,৬৭,০৪০ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

সাধারণতঃ মেঘনার পূর্ব্ব তীর ব্যাপিয়া শীলহাটের দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম সরকার সোনার গাঁ অবস্থিত ৯
ছিল। সোনার গাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হয়। সোনার গাঁ।
তাহার জমার পরিমাণ ২,৫৮,২৮৩ টাকা।

মেঘনার পূর্ব্বতীরে সরকার সোনার গাঁর দক্ষিণ হইতে সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত ও সনদ্বীপ দক্ষিণ সাহবাজপুর ১০
প্রভৃতি দ্বীপশ্রেণী লইয়া সরকার ফতেয়াবাদ ফতেয়াবাদ।
গঠিত হইয়াছিল। ফতেয়াবাদে ৩১ পরগণা ও ১,৯৯,২৩৯ টাকা জমা দৃষ্ট হয়।

ফতেয়াবাদের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে ত্রিপুরার দক্ষিণ পর্য্যন্ত

১১ চাটগাঁ। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল ব্যাপিয়া সরকার চাটগাঁ বা চট্টগ্রাম বিস্তৃত ছিল। চট্টগ্রাম কেবল ৭টী পরগণায় বিভক্ত হয়, কিন্তু ২,৮৫,৬০৭ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বাঙ্গলার দ্বারস্বরূপ তিলিয়াগড্ডী ও শকরীগলি হইতে বর্ত্ত-

১২ ওড়ম্বর। মান রাজমহল প্রদেশ লইয়া ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত চূনাখালি পরগণা পর্য্যন্ত ভূখণ্ড সরকার ওড়ম্বর নামে অভিহিত হয়। ইহার মধ্যে গৌড়ের পরবর্ত্তী রাজধানী টাঁড়া ও রাজমহল স্থাপিত হওয়ায় ইহাকে সরকার টাঁড়া বা রাজমহলও বলিত। সরকার ওড়ম্বরের অন্তর্গত চূনাখালি পরগণায় মুর্শিদাবাদ নগর অবস্থিত। ওড়ম্বরে ৫২ পরগণা ও ৬,০১,৯৮৫ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

ওডম্বরের দক্ষিণ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান

১৩ সরীফাবাদ। নগর ও পরগণাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সরকার সরীফাবাদ বিস্তৃত হয়। সরীফাবাদকে ২৬ পরগণায় বিভাগ করিয়া ৫,৬২,২১৮ টাকা তাহার জমা ধার্য্য করা হয়।

সরীফাবাদ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র

১৪ সেলিমানাবাদ। পর্য্যন্ত ভূভাগ লইয়া সরকার সেলিমানাবাদ গঠিত হইয়াছিল। তাহাকে সাধারণতঃ সেলিমাবাদও বলিত। সেলিমাবাদে ৩১ পরগণা ও ৪,৪০,৭৪৯ টাকা জমা দৃষ্ট হয়।

সরীফাবাদ ও সেলিমাবাদের পশ্চিম সীমায় বীরভূম হইতে রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গমস্থলের নিকট ১৫
মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চ- মাদারুণ।
কোট বা পাচেট ও দক্ষিণে সুন্দরবনের ভাটি অবধি সরকার মাদারুণ বিস্তৃত ছিল। তাহার পরগণার সংখ্যা ১৬ ও জমার পরিমাণ ২,৩৫,০৮৫ টাকা।

বাঙ্গলার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের নামানুসারে পলাশী পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া মণ্ডল- ১৬
ঘাট পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভর তীর, বিশে- সাতগাঁ।
ষতঃ পূর্ব্ব তীরের অধিকাংশ ভূভাগ ব্যাপিয়া সরকার সাতগাঁর সৃষ্টি হয়। বন্দর সপ্তগ্রামও ইহার অন্তর্ভূত ছিল। সাতগাঁ ৪৩ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৪,১৮,১১৮ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

সরকার সাতগাঁর নিকট ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থ সুবৃহৎ 'ব' দ্বীপের উত্তর কোণে সরকার মামুদাবাদ ১৭
বা ভূষণা অবস্থিত ছিল। মামুদাবাদের পর- মামুদাবাদ।
গণার সংখ্যা ৮৮ ও জমার পরিমাণ ২,৯০,২৫৬ টাকা।

বাঙ্গলার 'ব' দ্বীপের অন্তর্গত সরকার মামুদাবাদের দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলে সুন্দরবন পর্য্যন্ত বহুনদীপরিপূর্ণ ১৮
সরকার খালিফিতাবাদ অবস্থিত ছিল। খালিফিতাবাদ।
তাহার সাধারণ নাম যশোহর। এই খালিফিতাবাদে ৩৫ পরগণা ও ১,৩৫,০৫৩ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

খালিফিতাবাদ বা যশোহরের পূর্ব্বে সাধারণতঃ পদ্মার পশ্চিম তীরে 'ব' দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, তাহার ১৯
সঙ্গমস্থলের নিকট রাবণাবাদ দ্বীপ ও দক্ষিণে বাকলা।

ভাটি পর্য্যন্ত ভূভাগ সরকার বাকলা নাম প্রাপ্ত হয়। বাকলা ৪টী পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ১,৭৮,২৬৬ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হয়।

এইরূপে সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া রাজা তোড়রমল্ল ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা তাহার খালসা ভূমির জমা নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তদ্ব্যতীত জায়গীর ভূমির জন্য স্বতন্ত্র জমা বন্দোবস্ত হয়। ঐ সমস্ত জায়গীর ভূমি সুবেদার, ফৌজদার, মনসবদার, সেনাপতি ও সরকারী অন্যান্য কর্ম্মচারীর ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সমগ্র জায়গীর ভূমির ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া খালসা জমাসমেত রাজা তোড়রমল্ল কর্ত্তৃক ১৫৮২ খৃঃঅব্দে সমগ্র বাঙ্গলার ১,০৬,৯৩,২৬০ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

তোড়রমল্লের জায়গীর বন্দোবস্ত।

বাদসাহ সাজাহানের রাজত্বসময়ে যৎকালে সুল্‌তান সুজা বাঙ্গলার সুবেদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে ১৬৫৮ খৃঃঅব্দে তিনি রাজা তোড়রমল্লের বন্দোবস্তের সংশোধন করিয়া সংশোধিত জমাতুমার প্রস্তুত করেন। তদবধি তাহা আসল জমাতুমারের ন্যায় প্রচলিত হয়। সুজার সময়ে বাঙ্গলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কতকাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং কতক ভূভাগ তিনি সুবা উড়িষ্যা হইতে খারিজ করিয়া লন। এই বর্দ্ধিত ভূখণ্ডের জমার সহিত টাঁকশাল প্রভৃতির আয় যোগ করিয়া তিনি বর্দ্ধিত রাজ্যকে অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৩০৭ পরগণায় বিভক্ত করেন ও তাহার জমা ১৪,৩৫,৫৯৩ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার পর তিনি তোড়রমল্লের নির্দ্দিষ্ট জমার উপর ৯,৮৭,১৬২ টাকা বৃদ্ধি ও সেই বর্দ্ধিত

সাসুজার বন্দোবস্ত।

আয়কে স্বতন্ত্র ভূসম্পত্তির ন্যায় গণ্য করিয়া তাহাকে ৩৬১ পরগণা বা মহালে বিভাগ করেন। * সুতরাং সুল্‌তান সুজার সময়ে বঙ্গরাজ্য অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৬৬৮ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ২৪,২২,৭৫৫ টাকা তাহার জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহা হইলে সুল্‌তান সুজার সময়ে সমস্ত বঙ্গরাজ্য ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত ও তাহার জমা ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা নিম্নে সেই অতিরিক্ত ১৫ সরকারের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

তমলুক ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পরগণা লইয়া কিসমৎ গোয়ালপাড়ার সৃষ্টি হয়। গোয়ালপাড়া একটী সম্পূর্ণ সরকার ছিল না, তাহা সরকারের কতকাংশ মাত্র, কিন্তু উহা একটী স্বতন্ত্র বিভাগ হয়। গোয়ালপাড়ায় ৩টী মাত্র পরগণা ও তাহার ১,১৪,৬০৯ টাকা জমা ছিল।

২০
গোয়ালপাড়া।

গোয়ালপাড়ার ন্যায় মালজেঠিয়াও একটী সরকারের কতকাংশ হওয়ায় তাহাও কিসমৎ মালজেঠিয়া নামে অভিহিত হয়। মালজেঠিয়ার মধ্যে নিমকমহালসমেত হিজলী, জালামুঠা, দরোহুমান, মহিষাদল প্রভৃতি পরগণা ছিল। পরগণার সংখ্যা ১৭, জমা ১,৮৯,৪৩২ টাকা।

২১
মালজেঠিয়া।

* রাজা তোড়রমল্লের সরকার ও পরগণা বিভাগ যেরূপ অনেক পরিমাণে ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়াছিল, সাসুজার সরকার ও পরগণা বিভাগ কতকটা সেইরূপ হইলেও, তিনি কতকগুলি নূতন ও বর্দ্ধিত আয়কে স্বতন্ত্র ভূসম্পত্তির ন্যায় গণ্য করিয়া তাহাদিগকে সরকার ও পরগণা আখ্যা প্রদান করেন। এই জন্য টাঁকশাল প্রভৃতি সরকার আখ্যা প্রাপ্ত ও তাঁহার সময়ের বর্দ্ধিত জমা প্রভৃতি পরগণায় বিভক্ত হয়।

বালেশ্বরের নিকটস্থ বালসী প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর-
২২ গণা লইয়া মস্‌কুরী কিসমতের সৃষ্টি হয়।
মস্‌কুরী। মস্‌কুরী কিসমতে ৪টী মাত্র পরগণা ছিল। সেই জন্য তাহার জমার পরিমাণও ২৫,২৮৫ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়।

সুবা উড়িষ্যার অন্তর্গত সরকার জলেশ্বরে যে সকল হাবিলী
২৩ বা খাস দরকারী পরগণা ছিল, সেই সমস্ত
জলেশ্বর। বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও তাহার সহিত বীরকুল প্রভৃতি পরগণা যোগ করিয়া সরকার জলেশ্বর নামকরণ করা হয়। এই নূতন জলেশ্বরে ৭টী পরগণা, ও ৫৩,৯০১ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করিয়া সুহেস্ত প্রভৃতি পরগণা লইয়া
২৪ সরকার রমনার সৃষ্টি হয়। সরকার রম-
রমনা। নায় ৩টী মাত্র পরগণা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং তাহার জমার পরিমাণ ২৩,২৭২ টাকা বন্দোবস্ত হয়।

বন্দর জলেশ্বরের সমীপস্থ ভূভাগ হইতে নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর
২৫ দক্ষিণ পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশ কিসমৎ বস্তা
বস্তা। নামে অভিহিত হয়। কিসমৎ বস্তায় ৪টী মাত্র পরগণা ছিল ও তাহার জমার পরিমাণ ১২, ৪২২ টাকা। এই সরকার কয়টী উড়িষ্যার খারিজী ভূভাগ হইতে গঠিত হয়।

বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তসীমায় যে সমস্ত ভূভাগ মোগল
২৬ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশ লইয়া
কোচবিহার। সরকার কোচবিহারের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রদেশের ও প্রাচীন ফকীরকুণ্ডী জমীদারীর অধিকাংশ

সরকার কোচবিহারের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কোচবিহাররাজ নারায়ণ-বংশীয়দিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই অংশ মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত করা হইয়াছিল। সরকার কোচবিহারে ২৪৬ পরগণা ও ৩,২৭,৭৯৪ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ এই দুই প্রসিদ্ধ পরগণা লইয়া সরকার
বাঙ্গালভূম গঠিত হইয়াছিল। রঙ্গপুর ও ব্রহ্ম ২৭
পুত্রের মধ্যে সরকার বাঙ্গালভূম অবস্থিত হয়। বাঙ্গালভূম।
পরগণা বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ পূর্ব্বে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উক্ত দুই পরগণা অদ্যাপি প্রায় সেই আকারেই বিদ্যমান আছে। ২ পরগণায় ১,৩৭,৭২৮ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে কড়াইবাড়ী প্রভৃতি পরগণাকে
অন্তর্ভুক্ত করিয়া সরকার দক্ষিণকোল অব- ২৮
স্থিত ছিল। সরকার দক্ষিণকোলে ৩টী মাত্র দক্ষিণকোল।
পরগণা ও ২৭, ৮২১ টাকা জমা ধার্য্য হইতে দেখা যায়।

দক্ষিণকোলের ন্যায় সরকার ধুবড়ী সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব-
তীরে বিস্তৃত ছিল। সরকার ধুবড়ী আসামের ২৯
প্রান্তসীমা গোয়ালপাড়ার নিকট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ধুবড়ী।
হয়। ধুবড়ীতে ২টী মাত্র পরগণা ও ৬,১২৬ টাকা মাত্র জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সরকার বাঙ্গালভূমের উত্তর, ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম ও উত্তর
তীরে ভুটান রাজ্যের পাদদেশে আসামের ৩০
প্রান্তসীমাস্থিত কুন্তাঘাট পর্য্যন্ত সরকার উত্তরকোল বা কামরূপ।
উত্তরকোল বা কামরূপ অবস্থিত ছিল। সরকার কামরূপ পরে রাঙ্গামাটী প্রদেশ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ৩টী মাত্র

পরগণা ও ৩১,৪৫১ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই কয়টী সরকার আসামরাজ্য হইতে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের পূর্ব্বে যে সমস্ত ভূভাগ আরাকান
৩১ রাজ্যের অধীনস্থ ভূপাল মাণিক্যবংশীয় ত্রিপুরা-
উদয়পুর। রাজের রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, তাহা লইয়া সরকার উদয়পুরের গঠন হয়। সরকার উদয়পুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও নবাব সুজাখাঁর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধীন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুজাখাঁর সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য পুনরাক্রান্ত হওয়ায়, ত্রিপুরারাজ সম্পূর্ণরূপে মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন। সরকার উদয়-পুরে ৪ পরগণা ও ৯৯,৮৬০ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সুন্দরবনের অনেক ভূভাগ জলমগ্ন থাকায় তাহা আবাদের
৩২ অনুপযুক্ত ছিল। যে সমস্ত ভূভাগ আবাদের
মোরাদখানি। উপযোগী হইতে পারিত, সেই সমস্ত ভূভাগে নীচ জাতিদিগকে সময়ে সময়ে বাস করাইয়া তাহা হইতে শস্যোৎপাদ-নের জন্য সরকার মোরাদখানি বা জেরাদখানির সৃষ্টি হয়। মোরাদখানিতে ২ পরগণা ও ৮,৪৫৪ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়া-ছিল।

উপরোক্ত সরকার কয়টী ভৌগলিক অবস্থানুসারে গঠিত হইয়া-
৩৩ ছিল। কিন্তু নিম্নের দুই সরকার কেবল আদায়ী
পেস্কস্। আয় হইতে গঠিত হয়। বাঙ্গালার পশ্চিম সীমায় সরকার মাদারুণের প্রান্তসংলগ্ন বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি ঝারখণ্ড বা ছোট নাগপুরের আরণ্য ও পার্ব্বত্য স্থানের রাজগণ পূর্ব্বে বিহাররাজের অধীন ছিলেন। সের সাহার

সময়ে বিহাররাজবংশের ধ্বংস হইলে, এই সমস্ত রাজা কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। পরে ক্রমে তাঁহারা মোগ-লের বশ্যতা স্বীকার করায়, মোগল সম্রাট্‌কে বার্ষিক কিছু কিছু নির্দ্দিষ্ট নজর প্রদান করিতেন। সেই আয় সরকার পেস্কস্ নামে অভিহিত হইয়া ৫ পরগণা বা মহালে বিভক্ত হয়। পেস্কস্ মহাল হইতে ৫৯,১৪৬ টাকা আদায় হইত।

৩৪
দার-উল্-জার্ব বা টাঁকশাল।

পেস্কস্ ব্যতীত টাঁকশালকে একটী স্বতন্ত্র সরকাররূপে গণ্য করা হইয়াছিল। বাদসাহ সাজাহানের রাজত্বকালে ও সুল্‌তান সুজার সুবেদারী সময়ে রাজমহল ও ঢাকা উভয় স্থানে রাজধানী থাকায়, সেই সেই স্থানে টাঁকশাল স্থাপিত ছিল। সেই টাঁকশালকে ২ মহাল বা পরগণারূপে গঠিত করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত ৩,২১,৩২২ টাকা আয়কে জমাস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

তোড়রমল্লের নির্দ্দিষ্ট জমার বৃদ্ধি।

উপরোক্ত ১৫ সরকার সুল্‌তান সুজা ৩০৭ পরগণায় বিভাগ করিয়া ১৪,৩৫,৫৯৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত করেন। তদ্ব্যতীত ১৫৮২ খৃঃ অব্দে রাজা তোড়রমল্ল বাঙ্গলার যে জমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার ৭৬ বৎসর পরে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সাসুজার বন্দোবস্ত হওয়ায়, তিনি রাজার নির্দ্দিষ্ট আয়ের বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হন। কিন্তু তিনি যে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, তিনি রাজা তোড়রমল্লের নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর ৯, ৮৭, ১৬২ টাকা জমা বৃদ্ধি করেন, এবং সেই জমাকে ভূসম্পত্তির ন্যায় গণ্য করিয়া তাহা ৩৬১ পরগণায় বিভাগ করা হয়। সুজা জায়গীর জমার কোন রূপ বৃদ্ধি করেন নাই। সুতরাং সাসুজার সময়ে

বঙ্গরাজ্য অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৬৬৮ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ২৪, ২২, ৭৫৫ টাকা তাহার জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহা হইলে সুল্‌তান সুজার সময়ে সমস্ত বঙ্গরাজ্য ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত হইয়া জায়গীর জমাসমেত যে তাহার ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সাসুজার সংশোধিত বন্দোবস্ত তাহার পর হইতে আসল জমা নামে অভিহিত হইত।

কুলীখাঁর চাকলা বিভাগ।

বাদসাহ আরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ সাসুজাকে বঙ্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে, মীরজুম্লা, সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি সুবেদার নিযুক্ত হন। সুবেদার মীরজুম্লার সময় কোচবিহার ও আসাম পুনরাক্রান্ত এবং সায়েস্তাখাঁর সময় চট্টগ্রাম একেবারে আরাকানরাজের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে মোগলসাম্রাজ্যেভুক্ত হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজস্বসম্বন্ধে কোনরূপ নূতন বন্দোবস্ত হয় নাই। কোন রূপে তাহার রাজস্বটী মাত্র রাজকোষে প্রেরিত হইত। এই সমস্ত কারণে বাঙ্গালার রাজস্বের বন্দোবস্তের জন্য সম্রাট্ আরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠান, এবং মুর্শিদকুলী কিরূপে নাজিমীর ব্যয় সংক্ষেপ, উড়িষ্যা প্রদেশে জায়গীর নির্দ্দেশ ও রাজস্বসংগ্রহের সুচারু রূপ বন্দোবস্তের জন্য আমীনসকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই, বা তাহা কোন স্থায়ী ভাবে পরিণত হয় নাই। সম্রাট্ মহম্মদ সাহের নিকট হইতে তিনি নাজিমী ও দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গলার রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে

সরকার অপেক্ষা বৃহত্তর বিভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত এক এক জমীদারের অধীনস্থ ভূভাগের জমা বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গলা যে ৩৪ সরকারে বিভক্ত ছিল, তিনি এক্ষণে ১১৩৫ হিজরী, বাঙ্গলা ১১২৮ সালে বা ১৭২২ খৃঃ অব্দে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর আকারে তাহাকে ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চাকলা নাম প্রদান করেন। চাকলা বিভাগ হইলেও সরকার বিভাগের একেবারে লোপ হয় নাই। যে যে চাকলার মধ্যে যে যে সরকার পড়িয়াছিল,তাহারা সেই সেই সরকার নামে বরাবরই অভিহিত হইত। উক্ত ত্রয়োদশ চাকলায় সমানসংখ্যক ফৌজদারী ও আমীলদারীর ব্যবস্থা করিয়া নাজিমী ও দেওয়ানী বা শাসন ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হয়। পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য যে ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত ছিল, এক্ষণে পরগণার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৬৬০ করা হইল। কতকগুলি পরগণা লইয়া জমাদারী বা এহতিমামবন্দী করা হয়। ঐ সমস্ত জমীদারী ভিন্ন ভিন্ন চাকলার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কুলী খাঁ সমস্ত বাঙ্গালার জায়গীর জমাসমেত ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা জমা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জমা বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা 'জমা-কামেল-তুমারী' নামে অভিহিত হয়। কিরূপ ভাবে তিনি চাকলা বিভাগ করিয়াছিলেন ও কোন্ চাকলার কত টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, প্রথমে তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার জমীদারী বন্দোবস্তের বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

সাজাহানের রাজত্বসময়ে উড়িষ্যা হইতে যে সমস্ত ভূভাগ খারিজ হইয়া বঙ্গরাজ্যভুক্ত হয় সাসুজা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত সরকারের মধ্যে রমনা, বস্তা, মস্কুরী

১ চাকলা বালেশ্বর।

এবং বালেশ্বর বন্দর ও তাহার নিকটস্থ ভূভাগ লইয়া চাকলা বন্দর বালেশ্বর গঠিত হয়। চাকলা বালেশ্বরে ১৭ পরগণা বা মহাল ও ১,০৮,৪৭৬ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

২ হিজলী।

মালজেঠিয়া, জলেশ্বর প্রভৃতি কিস্‌মৎ, সরকার মসকুরীর কতকাংশ এবং জালামুঠা, দরোদুমান, মহিষাদল প্রভৃতি পরগণার মিঠান ও লোনা জমী লইয়া চাকলা হিজলীর গঠন হয়। চাকলা হিজলীতে ৩৫ পরগণা ও ৪,১৮,৫৮৯ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়। এই দুই চাকলা উড়িষ্যার প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

৩ মুর্শিদাবাদ।

সরকার ওড়ম্বর, জেন্নেতাবাদ, বার্ব্বাকাবাদ, সরীফাবাদ ও মামুদাবাদ প্রভৃতির অধিকাংশ ভূভাগ, সাতগাঁর কয়েকটী পরগণা দার-উল-জার্ব বা টাঁকশালের আয় এবং চূণাখালির শুল্ক লইয়া চাকলা মুর্শিদাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। চাকলা মুর্শিদাবাদে রাজসাহী জমীদারীর কতকাংশ, কাশীমবাজার দ্বীপের উর্ব্বর ভূখণ্ড, বীরভূম ও উখড়া বা নদীয়া জমীদারীর কতকাংশ এবং ফতেসিংহ, আসাদনগর, সাত সইকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা ও রুকুনপুর, লস্করপুর, চাঁদলই প্রভৃতি জমীদারীরও অনেকাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। সমগ্র চাকলায় ১১৮ পরগণা ও ২৯,৯৯,১২৬ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

৪ বর্দ্ধমান।

সরকার সরীফাবাদের কতকাংশ, মাদারুণ, পেস্কস ও সেলিমাবাদের অধিকাংশ এবং সাতগাঁর কতকাংশ লইয়া চাকলা বর্দ্ধমান গঠিত হয়। চাকলা বর্দ্ধমানে বর্দ্ধমান, বীরভূম জমিদারীর কতকাংশ এবং বিষ্ণুপুর ও

পঞ্চকোট প্রভৃতি করদ রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সমগ্র চাকলায় ৬১ পরগণা ও ২২, ৪৪, ৮১২ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

সরকার সাতগাঁর অধিকাংশ,সেলিমাবাদ ও মাদারুণের অবশিষ্টাংশ, খালিফিতাবাদের কতকাংশ, সরকার গোয়াল ৫
পাড়া, তমলুক, ভাটি ও বক্সবন্দর বা হুগলীর সাতগাঁ বা হুগলী।
আয় লইয়া চাকলা সাতগাঁ বা হুগলীর উৎপত্তি হইয়াছিল। উক্ত চাকলায় উখড়া বা নদীয়া জমীদারীর অধিকাংশ, বর্দ্ধমান জমীদারীর কতকাংশ ও কোম্পানীর কলিকাতা জমীদারী অন্তর্নিবিষ্ট হয়। সাতগাঁ চাকলায় ১১৩ পরগণা ও ১৫,৩৯,০০৩ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

সরকার মামুদাবাদ ও ফতেয়াবাদের কতকাংশ লইয়া চাকলা ভূষণা গঠিত হয়। ভূষণা চাকলার মধ্যে ৬
নাটোরের নলদীপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা ভূষণা।
ও মামুদসাহী প্রভৃতি জমীদারী অবস্থিত ছিল। উক্ত চাকলায় ১১৫ পরগণা ও ৬, ৭৮, ৫৭৮ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

সরকার খালিফিতাবাদ, সাতগাঁর অবশিষ্টাংশ ও ফতেয়াবাদের কতকাংশ লইয়া চাকলা যশোহরের স্থষ্টি হইয়া- ৭
ছিল। এই চাকলায় ইসুফপুর, সৈয়দপুর যশোহর।
প্রভৃতি জমীদারী অন্তর্নিবিষ্ট হয়। চাকলা যশোহরের ৭৯ পরগণা ও ৩, ৫৩, ২৬৬ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে যশোহর পর্য্যন্ত পাঁচটী চাকলা পদ্মার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত হয়।

সরকার ওড়ম্বর ও জেন্নেতাবাদের অবশিষ্টাংশ, সমগ্র পূর্ণিয়া ও তেজপুর লইয়া চাকলা আকবরনগরের গঠন ৮
হয়। আকবরনগরে রাজমহল বা কাঁকজোল আকবরনগর।
জমীদারী, পিঁজরা বা দিনাজপুর জমীদারীর কতকাংশ ও অন্যান্য

কতকগুলি ক্ষুদ্র জমীদারী অবস্থিত ছিল। তাহার পরগণার সংখ্যা ১১৮ ও জমা ৯,২৬,২৬৬ টাকা ধার্য্য হয়।

৯ ঘোড়াঘাট।

সমগ্র সরকার ঘোড়াঘাট, পিঁজরা, কোচবিহার এবং বাজুয়া ও বার্ব্বাকাবাদের অধিকাংশ দ্বারা চাকলা ঘোড়াঘাট গঠিত হইয়াছিল। ঘোড়াঘাট চাকলায় নাটোরের ভাতুড়িয়া জমীদারী, দিনাজপুর জমীদারী অধিকাংশ, ইদ্রাক্‌পুর জমীদারী, ফকীরকুণ্ডী বা রঙ্গপুর জমীদারী ও সালবাড়ী, বড়বাজু, আটিয়া, কাগমারি প্রভৃতি পরগণা অন্তর্ভুক্ত হয়। সমগ্র চাকলায় ৪৫১ পরগণা ও ২১, ৮০, ৪১৫ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১০ কড়াইবাড়ী।

বাঙ্গালভূম, দক্ষিণকোল, ধুবড়ি, কামরূপ প্রভৃতি কোচবিহার ও আসাম হইতে জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরস্থ সরকার বাজুয়ার কতকাংশ লইয়া চাকলা কড়াইবাড়ীর সৃষ্টি হয়। সুসঙ্গ প্রভৃতি জমীদারী ও বাহিরবন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা কড়াইবাড়ী চাকলার অন্তর্গত ছিল। এই চাকলায় ২৫ পরগণা ও ২,০২,৭০৫ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

১১ জাহাঙ্গীরনগর।

সমগ্র সোণার গাঁ, বাকলা, উদয়পুর, মোরাদখানি এবং বাজুয়া ও ফতেয়াবাদের অবশিষ্টাংশ লইয়া চাকলা জাহাঙ্গীরনগর গঠিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারী অন্তর্নিবিষ্ট হয়, তন্মধ্যে জালালপুর প্রভৃতি প্রধান। চাকলা জাহাঙ্গীরনগরে ২৩৬ পরগণা ও ১৯,২৮, ২৯৪ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

সরকার শীলহাট ও তাহার নিকটস্থ আরও কতক ভূভাগ লইয়া চাকলা শীলহাটের উৎপত্তি হয়। চাকলা শীলহাটের মধ্যে সরাইল, তাড়াস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা অবস্থিত ছিল। শীলহাট চাকলায় ১৪৮ পরগণা ও ৫,৩১,৪৫৫ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। ১২ শীলহাট।

নবাব সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম অধিকারের পর চট্টগ্রাম প্রদেশ যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছিল, পুরাতন চাটগাঁ সরকারের সহিত সেই সমস্ত ভূভাগ লইয়া চাকলা ইস্‌লামাবাদের সৃষ্টি হয়। চাকলা ইস্‌লামাবাদে ১৪৪ পরগণা ও ১,৭৬,৭৯৫ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই ছয়টী চাকলা পদ্মার পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত হয়। উপরোক্ত ত্রয়োদশ চাকলা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুলী খাঁর সময়ে সমস্ত বঙ্গ-রাজ্যে ১৬৬০ পরগণা ও ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল। ১৩ ইস্‌লামাবাদ।

চাক্‌লা বিভাগ করিয়া, কুলী খাঁ চাক্‌লাসমূহের মধ্যে যে সমস্ত জমীদারী অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের জমা ধার্য্য করেন। সেই সমস্ত ধার্য্য জমা এক এক চাকলার নির্দ্দিষ্ট জমা বলিয়া গণ্য হয়। কুলী খাঁর এই স্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে আমরা মুসল্‌মান রাজত্বকালে সরকার জমীদার ও রায়ত বা প্রজার পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার আলোচনা করিয়া পরে উক্ত বন্দোবস্তের উল্লেখ করিতেছি। হিন্দু রাজত্ব কালে রাজা প্রজার নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ বা তাহার মূল্য করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। মুসল্‌মানবিজয়ের পর ভারতবর্ষে তাহার অনুপাত ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আলাউদ্দীন খিলিজীর সময়ে সরকার প্রজার নিকট হইতে অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে সরকার, জমীদার ও রায়ত।

আরম্ভ করেন। হিন্দু রাজত্বকালে বা মুসলমান শাসনের প্রথম অবস্থায় রাজা ও প্রজা বা সরকার ও রায়তের মধ্যে জমীদার নামে মধ্যবর্ত্তী কোন শ্রেণী ছিল বলিয়া জানা যায় না। বিশেষতঃ এক্ষণেও বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে প্রকৃত জমীদার নাই। তবে প্রাধন প্রধান রাজার অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজা থাকিতেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বাঙ্গলায় এরূপ জমীদারশ্রেণীর উৎপত্তি হইল কেন? আলোচনার দ্বারা এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, খিলিজীবংশের পর তোগলকবংশের বাদসাহী-কালে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গলা স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণ দ্বারা শাসিত হইতে আরব্ধ হয়। পাঠানেরা বাঙ্গলা জয় করিলেও ইহার সীমান্তপ্রদেশের রাজাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই। কোন কোন সময়ে তাঁহাদের রাজ্যের কতকাংশ পাঠান রাজ্যভুক্ত হইলেও, উক্ত রাজগণ সুযোগ পাইলেই তাহা পুনর্ব্বার স্ব স্ব রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতেন। তদ্ব্যতীত বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় তাহার এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় ও তৎকালে চলাচলের নানাপ্রকার অসুবিধা থাকায়, পাঠান নৃপতিগণ সরকার হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্ম্মচারিনিয়োগ তাদৃশ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গলায় কতকগুলি উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমস্ত ভূমি ছাড়িয়া দেন। এইরূপে ভূমির কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ ভৌমিক ও পরিশেষে জমীদার নামে অভিহিত হন। ভৌমিকগণ কেবল সরকারের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়া নির্ব্বিবাদে সমস্ত আয় উপভোগ করিতেন। এইরূপে সরকার অপেক্ষা তাঁহাদেরই

সহিত প্রজাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে। এই ভৌমিকগণ রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিয়া সীমান্তপ্রদেশের রাজাদিগকে বঙ্গরাজ্যের ভূমি স্বরাজ্যসাৎ করিতে দিতেন না, এবং ফিরিঙ্গী, মগ প্রভৃতি পরবর্ত্তী অত্যাচারী জাতিদিগকে দমন করিয়া দেশমধ্যে শান্তি রক্ষা করিতেন। তাঁহারা পাঠান রাজাদের একরূপ করদ রাজারূপেই গণ্য হইতেন। কেবল যে সময়ে তাঁহারা সরকারের করদানে অসম্মত হইয়া স্বাধীন হইবার প্রয়াস পাইতেন, সেই সময়ে কেবল তাঁহাদিগকে সরকার হইতে দমন করার চেষ্টা হইত। ভৌমিকগণ সরকার হইতে প্রায় উত্তরাধিকারীক্রমে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা আবার আপনাদিগের অধীনে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারও নিযুক্ত করিতেন, তাঁহারাও প্রায় উত্তরাধিকারী ক্রমে নিযুক্ত হইতেন। পরে এই মধ্যবর্ত্তী জমীদারগণ তালুকদার নামে অভিহিত হন। পাঠান রাজত্বের শেষ সময়ে বাঙ্গলায় বার জন ভৌমিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন, সেই জন্য বাঙ্গলাকে 'বারভূঁইয়ার মুলুক' বলিত। মোগলবিজয়ের প্রথমেও এই বারভূঁয়ার অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করায়, এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ায়, ক্রমে ভৌমিকী প্রথার লোপ হয়, এবং সেই সময়েই রাজা তোড়রমল্লের নূতন বন্দোবস্তের সূচনা। তোড়রমল্লের বন্দোবস্তের পরও ভৌমিকদিগকে দমন করিতে আরও কিছু কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। পাঠানরাজত্বকালে ভৌমিকগণ সরকারের নির্দ্দিষ্ট করমাত্র প্রদান করিতেন, কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে কিরূপ অনুপাতে রাজস্ব আদায় হইত, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে হইত কিনা তাহা জানা যায় না। ভৌমিক ব্যতীত ত্রিপুরা, কোচবিহার,

আসাম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি প্রদেশের রাজারা সময়ে সময়ে পাঠানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কিছু কিছু কর প্রদান করিলেও তাঁহারা স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তাঁহারা বঙ্গরাজ্যকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া, পাঠান রাজারা তাঁহাদের রাজ্য-শাসনের প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। ফলতঃ তাঁহারা স্বাধীন হইলেও নামে পাঠান রাজগণের করদরাজস্বরূপ গণ্য ছিলেন। এইরূপে বাঙ্গলায় প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর ভৌমিক বা জমীদারের সৃষ্টি হয়। তোড়রমল্লের বন্দোবস্তসময়ে প্রাচীন ভৌমিকী প্রথার লোপ করিয়া তিনি জমীদারী প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। অর্থাৎ ভৌমিকগণ যেরূপ পাঠান রাজত্বকালে একরূপ করদরাজারূপে গণ্য হইতেন, মোগল রাজত্বকালে জমীদারগণ আর সেরূপ ভাবে গণ্য হইতে পাইতেন না। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্তে অনেক পর-গণার ভূমি জমীদারীস্বরূপে প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা সরকারের সম্পূর্ণ অধীন ছিলেন। অর্থাৎ সরকারের কাননগো, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ জমীর পরিমাণ, নিরিখ প্রভৃতির হিসাবনিকাস রাখিয়া জমীদারদিগকে সরকারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে দিতেন না। তোড়রমল্লের সময় হইতে জমীদারগণ সম্পূর্ণরূপে খালসা বিভাগের অধীন হন, তাঁহারা খালসা বিভাগের একরূপ কর্ম্মচারীর ন্যায়ই গণ্য হইতেন। জমীদারগণ খালসার সম্পূর্ণ অধীন হইলেও প্রজা-দিগের সহিত তাঁহাদেরই সম্বন্ধ ছিল। তবে বন্দোবস্তের ভার খালসা বিভাগ নিজ হস্তে গ্রহণ করায়, জমীদারগণ প্রজাদিগের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে উক্ত হই-য়াছে যে, তোড়রমল্ল সমস্ত বঙ্গরাজ্যে খালসা ও জায়গীর জমীর জমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই জমা তিনি মৌজাওয়ারী হিসাবে

নির্দ্দেশ করেন ; অর্থাৎ এক একটী পরগণায় যতগুলি মৌজা বা গ্রাম ছিল, তাহাদের উপর একটা মোট জমা ধার্য্য করিয়া, সমস্ত পরগণা, জমীদারী ও সরকারের জমা ধার্য্য হয়, প্রত্যেক বিঘায় কোন জমা নির্দ্দেশ করেন নাই। এই জন্য মোট নির্দ্দিষ্ট জমা সরকারের রাজস্বরূপে গণ্য হইত। বাদসাহ আরঙ্গজেব তোড়রমল্লের বন্দোবস্তের কতক পরিবর্ত্তন করিয়া আলাউদ্দীন খিলিজীর সময়ের ন্যায় উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশই সরকারের প্রাপ্য স্থির করেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রাজস্ববন্দোবস্তের গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাহার নিবারণের জন্যই তিনি মুর্শিদকুলী খাঁকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। মুর্শিদকুলী খাঁ যে সময়ে বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হন, সেসময়ে সরকার, জমীদার, ও প্রজাদের কিরূপ অবস্থা এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিতেছি। মুর্শিদকুলী খাঁ যে সময়ে বাঙ্গলায় আগমন করেন, সে সময়ে বাদসাহ আরঙ্গজেব তোড়রমল্লের মৌজাওয়ারী বন্দোবস্তের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সরকারের জন্য উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশের ব্যবস্থা করিলেও সরকারকে বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব গ্রহণ করিতে হইত, এই রাজস্ব জমীদারগণ খালসায় প্রেরণ করিতেন। সেই সময়ে দেওয়ান, খালসা বিভাগের কর্ত্তা, এবং প্রধান কাননগো ও পরগণা-কাননগোগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। জমীদারদিগের প্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকিলেও সেই সময়ে জমীদারগণ রাজস্ব প্রদানে অবহেলা করিতেন, অথচ অনেকে প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ আদায়ের ত্রুটি করিতেন না। এই সময়ে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর জমীদার ছিলেন ; বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতির রাজগণ কেবল নির্দ্দিষ্ট

করমাত্র প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তাঁহাদের রাজ্যে খালসা বিভা-গের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ কোন রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমীদারগণের মধ্যে রাজসাহী, বর্দ্ধমান, দিনাজ-পুর, নদীয়া, পুঁটিয়া প্রভৃতির রাজগণ বিস্তৃত জমীদারী ভোগ করি-তেন, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতি অনেক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত রাজা-জমীদার ব্যতীত অনেক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারের হস্তেও অনেক জমীদারী প্রদত্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর রাজগণ চিরকাল ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে রাজা-জমীদারগণ প্রায়ই এবং অবশিষ্ট ক্ষুদ্র জমীদারগণ অধিকাংশ সময়েই ঐ সমস্ত রাজ্য বা জমীদারী উত্তরাধিকারিক্রমে প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু প্রত্যেককে তজ্জন্য নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইত, এবং তাঁহারা সরকারের বিনা আদেশে জমীদারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম শ্রেণীর রাজগণ ব্যতীত দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত জমীদারকে উত্তরা-ধিকারিক্রমে জমীদারী ভোগে বঞ্চিত করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে সরকারের হস্তে থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই উত্তরাধিকারিক্রমে জমীদারী ভোগ করিতেন। তবে বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত হইলে সরকারের ইচ্ছানুসারে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিত।* এই সকল

* মুসল্‌মান রাজত্বকালে জমীদারগণের কিরূপ অধিকার ছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট সাহেব বলেন যে, জমীদারেরা বার্ষিক ইজারদার মাত্র ছিলেন। কিন্তু বৌটন রোজ বলেন যে, জমীদারীতে জমীদারদিগের উত্তরাধিকারিক্রমে অধিকার ছিল। প্রকৃত পক্ষে জমীদারীতে জমীদারদিগের উত্তরাধিকারী ক্রমে অধিকার না থাকিলেও, ও সরকার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলেও, কার্য্যতঃ জমীদারগণ উত্তরা-

জমীদারদিগের অধীনে কোন কোন স্থলে আর এক শ্রেণী লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জমীদারদিগের পক্ষ হইতে প্রজা-দিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ তালুকদার নামে অভিহিত হইতেন। তালুকদারগণ জমীদার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী অধিকার প্রাপ্ত হন। যে যে স্থলে তালুকদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থলে জমীদার অপেক্ষা প্রজা-দিগের সহিত তাঁহাদেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন জায়গীরদার-গণের হস্তে জায়গীরভূমিসমূহ ন্যস্ত ছিল। প্রজাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর প্রজা দৃষ্ট হইত, প্রথম শ্রেণী লাখরাজ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, আয়মা বা চাকরানদার ও দ্বিতীয় শ্রেণী মালের প্রজা। প্রথম শ্রেণীর প্রজারা বিনা খাজনায় জমী পাইতেন। কোন কোন স্থলে সাধারণ প্রজাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অনেক অল্প কর দিতে হইত। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও মুসল্‌মান প্রজারা ঐরূপ অল্প করে জমী পাইতেন। কিন্তু বাদসাহ আরঙ্গজেব ব্রাহ্মণ দিগকে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল মুসল্‌মানদিগকে সামান্য কর দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। বাঙ্গলায় সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর প্রজারা বিনা খাজনায় জমী পাইতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজাদিগের মধ্যে আবার দুই প্রকারের প্রজা ছিল। প্রথম প্রকারকে স্বগ্রামবাসী বা খোদকস্ত ও দ্বিতীয় প্রকারকে ভিন্ন গ্রামবাসী বা পাইকস্ত বলিত। খোদকস্ত প্রজারা সেই স্থানের

ধিকারক্রমেই জমীদারী প্রাপ্ত হইতেন। তবে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে জমীদারীতে জমীদারদিগের সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেক পরিমাণে যে উত্তরাধিকারীক্রমে অধিকার বর্ত্তিয়া-ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

অধিবাসী হইয়া উত্তরাধিকারীক্রমে জমী চাষের অধিকার লাভ করিত। কিন্তু পাইকস্ত প্রজারা অন্য গ্রামে বাস করিয়া কেহ কেহ বহুকালের জন্য কেহ কেহ বা অল্প কালের জন্য জমীতে চাষ করিতে পাইত। খোদকস্ত প্রজার অধীনে আবার যে সমস্ত রায়ত চাষ করিত, তাহাদিগকে কোরফা বলিত। প্রজাগণ পরগণার নিরিখ অনুসারে অর্থাৎ যে পরগণায় বিঘা প্রতি যে নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তদনুসারে খাজনা দিত। তোড়রমল্লের সময় হইতে প্রাজারা ঐরূপ ভাবে খাজনা দেওয়ার অধিকার পাইয়াছিল। যদিও বাদসাহ আরঙ্গজেব প্রজাদিগের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ দাবী করিয়াছিলেন, তথাপি বঙ্গদেশে তোড়রমল্লের প্রথা একবারে লোপ পায় নাই। স্থায়ী প্রজারা যাহাতে রীতিমত জমী চাষ করে তাহার পরিদর্শনের জন্য সরকার হইতে চেষ্টা হইত। যাহাতে তাহারা সহজে পলাতক হইতে না পারিত তদ্বিষয়েও সরকারের কর্ম্মচারিগণ লক্ষ্য রাখিতেন। বাদসাহ আরঙ্গজেব এ সম্বন্ধে কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। প্রজাগণ রীতিমত চাষ না করিলে তাহাদের প্রতি ভয়প্রদর্শন এমন কি বল-প্রয়োগ ও বেত্রাঘাতেরও আদেশ প্রদত্ত হয়। জমী চাষের জন্য প্রজারা জমীদারদিগের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া কবুলতি প্রদান করিত। তাহারা আপনাপন জমী বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিত না। জমীদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজনা আদায় করিয়া আপনাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ ও সরকারকে নির্দ্দিষ্ট জমানুসারে আপনাপন দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করিয়াও সরকারকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতেন না। মুর্শিদ-

কুলী খাঁ বাঙ্গলায় আগমনের পর ঐ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাহার আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হন।

'জমা কামেল তুমারী' বা কুলী খাঁর স্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্ত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কুলী খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া আসার পরই অনেক জমীদারের হস্ত হইতে জমীদারী বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাজস্বসংগ্রহের জন্য কতকগুলি আমীন নিযুক্ত করেন ও বাঙ্গালার জায়গীরের সংখ্যা হ্রাস করিয়া উড়িষ্যার ভূমি তজ্জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আমীনগণের দ্বারা রাজস্ব আদায় হইয়া যখন তিনি বাঙ্গলার রাজস্বের তত্ত্ব অবগত হইলেন, তখন আমীনের সংখ্যা হ্রাস করিয়া কুলী খাঁ জমীদারদিগের সহিত জমীদারীর বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনিও জমীদারদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোপ না করিয়া সকলকেই যথোপযুক্ত অধিকার প্রদান করেন। তাঁহার সময়ে আমীনগণও কোন কোন স্থানে জমীদারদিগের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ চাকলায় যে ১৬৬০ পরগণা ও ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা জমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১,০৯,৬০, ৭০৯ টাকা খালসার ও ৩৩,২৭, ৪৭৭ টাকা জায়গীরের জমা বন্দোবস্ত করা হয়। সেই খালসার জমা ২৫ ভাগে এহতিমামবন্দী বা জমীদারীতে ও জায়গীর জমা ১৩ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সকারকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়া জমীদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে আপনাদের প্রাপ্য কেবল দশমাংশ গ্রহণে আদিষ্ট হন। কুলী খাঁর বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাকে 'জমা কামেল তুমারী' কহিয়া থাকে। নবাব সুজা খাঁ উক্ত ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা হইতে ৪২,৬২৫ টাকা নাজাই বাদ দিয়া ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা সংশোধিত জমা নির্দ্দেশ

করেন। সুজা খাঁর সংশোধিত জমা এক্ষণে বর্ত্তমান থাকায়, আমরা তাহারই উল্লেখকালে সমগ্র জমীদারী ও জায়গীর প্রভৃতির আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিব। সেই জন্য এস্থলে তাহাদের পৃথক্ উল্লেখ পরিত্যক্ত হইল। কুলী খাঁ এইরূপে খালসা ও জায়গীর ভূমি জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে স্ব স্ব জমীদারীর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলেন। জমীদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষমতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলী খাঁর পূর্ব্বেও তাঁহারা অনেক পরিমাণে সেইরূপ ক্ষমতা লাভ করিতেন। জমীদারগণ প্রজাদিগের মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদের বিচার করিতে পারিতেন, ও আপনাপন জমীদারীর মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতেন। চোর, ডাকাইত, বদমায়েস লোকদিগকে দমন করার ভারও কতক পরিমাণে তাঁহাদের প্রতি অর্পিত হইত। এক কথায় জমীদারদিগের প্রতি এক প্রকার পুলীশের ভারও প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহারা অপরাধীদিগকেও দণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন। কাহারও কাহারও প্রতি এক বা ততোধিক প্রাণদণ্ডবিধানের আদেশও প্রদত্ত হইত।* লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জমীদারেরা দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। এক্ষণে তাঁহারা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, তাহাতে যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। জমীদারদিগের ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য তাঁহারা যে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হন তাহা সত্য, কিন্তু আজকাল দেশমধ্যে যেরূপ দুষ্ট লোকের

* এইজন্য আমাদের দেশে "দশ খুন মাপ" "সাত খুন মাপ" ইত্যাদি কথা প্রচলিত আছে।

উপদ্রব বাড়িতেছে, তাহাতে জমীদারদিগের হস্তে কতক পরিমাণে শান্তিরক্ষার ক্ষমতা থাকা আমরা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি। তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতি গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন। এই রূপে জমীদারদিগকে রাজস্বসংগ্রহের সম্পূর্ণ ও শাসনসম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমতা প্রদান করিয়া কুলী খাঁ তাঁহাদিগকে আপনাপন জমীদারীতে স্থায়ী করার ইচ্ছা করেন। যদিও তিনি পূর্ব্বে অনেক জমীদারকে উত্তরাধিকারীসূত্রের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তথাপি এক্ষণে সে অধিকার কতক পরিমাণে সরকারের হস্তে রাখিয়াও যাহাতে কার্য্যতঃ জমীদারগণ উত্তরাধিকারীসূত্রে আপনাপন জমীদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন, শেষ দিকে তাঁহার যে এই রূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। কোম্পানী দেওয়ানীগ্রহণের পর প্রথমতঃ, বিশেষতঃ ওয়ারণ হেষ্টিংসের সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বন্দোবস্তের অনুসরণ করিয়া অনেক জমীদারকে উত্তরাধিকারীসূত্রের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিতেছিল দেখিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করেন। অবশ্য কর্ণওয়ালিসের পূর্ব্ব হইতেও কোম্পানী এ বিষয়ে বিবেচনা করিতেছিলেন। বর্ত্তমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মুর্শিদকুলী খাঁর স্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারেরা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার ও অতিরিক্ত কর আদায় করিতে নিষিদ্ধ হন। কিন্তু প্রজারা আপনাদের দেয় নির্দ্দিষ্ট খাজনা অপেক্ষা এক্ষণে আরও কিছু অধিক কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কুলী খাঁর স্থবেদারীর সময় হইতে আবওয়াব প্রথার উৎপত্তি হয়। এই আবওয়াবের অংশ পরগণার নিরিখের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, প্রজাদিগকে কিছু অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হইয়াছিল।

আবওয়াব স্থবেদারী, খাসনবিশী।

দেওয়ানীবিভাগ হইতে ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নবাব মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁ স্থবেদারস্বরূপে আবার কতকগুলি অতিরিক্ত করের সৃষ্টি করেন। তাহাই আবওয়াব স্থবেদারী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কুলী খাঁর পরবর্ত্তী স্থবেদারগণ উত্তরোত্তর আবওয়াবের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। জাফর খাঁর সময়ে যে আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর প্রচলিত হয় তাহার নাম আবওয়াব খাসনবিশী। প্রথমে জমীদারী বন্দোবস্ত হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। জমীদারগণ প্রতি বৎসরে আপনাদিগের জমীদারী বন্দোবস্তের নূতন সনন্দ গ্রহণকালে খালসার মুহুরীদিগের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কিছু কর দিতে বাধ্য হইতেন। সেই করই প্রথমতঃ আবওয়াব খাসনবিশী নামে অভিহিত হয়। খাসনবিশীর পরিমাণ প্রথমে ১,৯১,০৯৫, টাকা মাত্র ছিল। ক্রমে বাদসাহের সিংহাসনারোহণের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নাজিম কর্ত্তৃক দেয় নজরানা স্থবর্ণ মোহরের মূল্য স্বরূপ ৬৫,৫১১ টাকা কর ধার্য্য হইয়া খাসনবিশীর সহিত যুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর সায়র বা শুল্ক বিভাগ কর্ত্তৃক আর একটী কর ধার্য্য হয়। চুণাখালি হইতে যে সমস্ত বস্তাবন্দী দ্রব্যের রপ্তানী হইত, তাহার রস্থম বা করস্বরূপ ২,২৫২ টাকা যুক্ত হইয়া মোট খাসনবিশী আবওয়াবের পরিমাণ ২,৫৮,৮৫৭ টাকা হইয়া উঠে। জমীদারদিগের নিকট হইতে যে আবওয়াব আদায় হইত,

প্রজারা তাহার ভার বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সময়েও নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত আবওয়াবের প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আবগারী কর ও ইনকম্‌ট্যাক্স প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদিও গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আওয়াব বলিতে চাহেন না। মুসল্‌মান সুবেদারগণ এইরূপ আবওয়াবের সৃষ্টি করিয়া জমীদার ও প্রজাদিগকে করভারে অবনত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যে প্রশংসার যোগ্য নহেন, ইহা সত্য, কিন্তু সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুসারে এরূপ প্রথা প্রচলন করিতে যে কুণ্ঠিত হন না, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? আবার যে সকল ইংরাজ লেখক ভারত-রাজস্বের অনুশীলন করিয়া এই সমস্ত আবওয়াব প্রচলনকে যারপরনাই নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তসম্বন্ধে যে অন্ধ ও নীরব ইহা কি অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না?

মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা সুবাত্রয়ের দেওয়ানি ও পরিশেষে নাজিম নিযুক্ত হইলেও তিনি কেবল বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার ন্যায় উড়িষ্যা প্রদেশেরও সুচারু রূপ বন্দোবস্ত হয় নাই। যাহা হউক উড়িষ্যার কিছু কিছু বন্দোবস্ত করিলেও তিনি বিহারের কোন রূপ বন্দোবস্ত করেন নাই। সাহাজান ও আরঙ্গজেবের সময় বিহারের নূতন বন্দোবস্ত হওয়ায় এবং তাহার অধিকাংশ আয় জায়গীর ও ধর্ম্মার্থে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তিনি বিহারের বন্দোবস্তের প্রতি মনোযোগ করিতে পারেন নাই। বিহারে তাঁহার পূর্ব্বে দুই বার ও পরে এক বার বন্দোবস্ত হয়। আমরা তাঁহার পূর্ব্বে বিহারে কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করি- সুবা বিহার।

তেছি। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে রাজা তোড়রমল্ল কর্ত্তৃক বিহারের প্রথম বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় বিহারকে, বিহার, মুঙ্গের, রোটাস, ত্রিহুত, হাজীপুর, সারণ ও চম্পারণ এই সাত সরকার ও ২০০ পরগণায় বিভক্ত করিয়া ৫৫,৪৭,৯৮৪ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে ১৩৮ পরগণায় রীতিমত রাজস্ব আদায় হইত। তাহার পরিমাণ ৪৩,১৭,০৪৪ টাকা মাত্র ছিল। উক্ত রাজস্ব হইতে প্রায় পঞ্চমাংশ সরঞ্জামী খরচ বাদ দিয়া ৩৪, ৫৩, ৬৩৬ টাকা খালসা ও জায়গীরের প্রকৃত আয় হইত। ইহার পর সাজাহানের দস্তর-উল-আমীলের বন্দোবস্ত অনুসারে ও ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে বাদসাহ আরঙ্গজেব তাহাই স্থির রাখিলে, বিহারে সাহাবাদ-ভোজপুর নামে একটী সরকার বর্দ্ধিত হইয়া তাহা ৮ সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত ও ৮৫, ১৫,৬৮৩ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে অনাবাদী জমী প্রভৃতির জমা ও মফঃস্বলের খরচা বাদে ৫৫, ৯৭, ৪১৩ টাকা ইহার প্রকৃত রাজস্ব বলিয়া গৃহীত হইত। তন্মধ্যে আবার ৫১,৮২,৪১৩ টাকা জায়গীর ও ধর্ম্মার্থে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, কেবল ৪, ১৫,০০০ টাকা মাত্র রাজকোষে যাইত। মুর্শিদকুলী খাঁ এই রূপ বন্দোবস্তের প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কারণ বিহারে যে সমস্ত জায়গীরদার ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হওয়ায় ও আজিম ওশ্বান ও ফরখ্‌সের তথায় প্রতিনিয়ত বাস করায়, তিনি বিহারের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ বাদসাহ আরঙ্গজেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সাজাহানের দস্তর-উল-আমীলের বন্দোবস্ত স্থির রাখিয়াছিলেন। সুতরাং কুলী খাঁর সময়ে বিহারে পূর্ব্বের বন্দোবস্তই প্রচলিত থাকে। তাহার পর

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে রাজা জানকীরাম কর্ত্তৃক বিহারের নূতন বন্দোবস্ত হয়। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

সুবা উড়িষ্যা।

আকবর বাদসাহের সময় বঙ্গরাজ্য মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইলেও, উড়িষ্যা অনেক দিন পর্য্যন্ত আফগানদিগের হস্তে ছিল। রাজা মানসিংহ আফগানদিগকে দমন করিয়া উড়িষ্যা বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ বাঙ্গলার বন্দোবস্তের প্রায় দশ বৎসর পরে তাহার বন্দোবস্ত হয়। জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী এই ৫ সরকার ও ৯৯ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৪২,৬৮,৩৩০ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সময়ে সমস্ত বঙ্গরাজ্যের উড়িষ্যা সমেত ১,৪৯, ৬১,৪৮২ টাকা জমা ধার্য্য হয়। আকবরের সময় কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী উড়িষ্যার সরকাররূপে গণ্য হইলেও মোগলেরা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে আপনাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্য পরবর্ত্তী মোগল বাদসাহদিগের রাজত্বকালে উক্ত দুই সরকারকে সুবা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় না। সাজাহানের রাজত্বকালে ১৬২৭ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সুবায় পরিণত হয়। সেই সময়ে উক্ত সুবা কটক, বড়োয়া, যাজপুর, পাদশানগর, ভদ্রক, সেরাও, রমনা বস্তা, জলেশ্বর, মালজেঠিয়া, গোয়ালপাড়া ও মসকুরী এই ১২ সরকার ও ২৭৬ পরগণায় বিভক্ত ও ৪৯,৬১,৪৯৭ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত ধার্য্য জমার মধ্যে ৩২টী মহাল উড়িষ্যার রাজবংশের ও অন্যান্য রাজার হস্তে থাকায়, তাহাদের জমা মোট জমা হইতে বাদ যাইত। উক্ত ৩২ মহাল ৮,৭৩,৫১৮ জমা নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাহইলে প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র সুবা উড়িষ্যার মোট তক্-

শীশ জমা তুমারী ৪০,৮৭,৯৭৯ টাকা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে খালসা সেরিফায় কেবল ৬,৮৭,৮৯০ টাকা যাইত। অবশিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৩,১২,৭৯৪ টাকা জায়গীরের ও ২,১৩৬ টাকা মাদদ্মাস ও আয়মা প্রভৃতি ধর্ম্মার্থে দেয় বৃত্তির জন্য ধার্য্য হইয়া, শেষ ৩০,৪৫,১৫৯ টাকা বাদসাহবংশীয় কোন ব্যক্তির অথবা কোন এক জন বিশ্বাসী আমীরের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইত। সাসুজা ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে যে সময়ে বঙ্গরাজ্যের পুনর্বন্দোবস্ত করেন, সে সময়ে সুবা উড়িষ্যা হইতে ৩৮ পরগণা ৪,১৫,৯২১ টাকা জমা সমেত খারিজ হইয়া বঙ্গরাজ্যভুক্ত করা হয়। পরে তাহা আবার সুবা উড়িষ্যার অন্তর্গত হইয়া সেই ৪০,৮৭,৯৭৯ টাকাই তাহার জমারূপে গণ্য হইত। মুর্শিদ-কুলী খাঁ ফসলী ১১১২ সালে বা ১৭০৬-৭ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার বন্দো-বস্তকালে উড়িষ্যা হইতে হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি ৪০ পরগণা খারিজ করিয়া পুনর্ব্বার বঙ্গরাজ্যভুক্ত করায়, উড়িষ্যা হইতে ৪,১৫,৭২৪ টাকা আয় কমিয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে ১২টী পরগণা আবার বালেশ্বরের অধীন মহাল বলিয়া গণ্য হওয়ায়, তাহা-দের আয় ৭৪,৩৪০ টাকা বাদে বঙ্গরাজ্যভুক্ত প্রদেশের ৩,৪১,৩৮৪ টাকা আয় ও অন্যান্য প্রদেশের জমা সংশোধিত হইয়া ১,৩৯,৩৫০ টাকা আয় কম হওয়ায়, তৎকালে সুবা উড়িষ্যায় মোট জমা ৩৬,০৭,২৪৫ টাকা স্থির হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ বঙ্গদেশ হইতে অনেক জায়-গীর খাস করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে উড়িষ্যার ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই জন্য ক্রমে উড়িষ্যায় জায়গীর ভূমির বৃদ্ধি হয়। মুর্শিদকুলীর জামাতা সুজা উদ্দীন খাঁ প্রথমতঃ উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান পরে নায়েব নাজিমও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সুজা খাঁ মুর্শিদকুলীর পরে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় উড়িষ্যার অধিকাংশ ভূভাগ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়।

বঙ্গাধিকারী দর্প-নারায়ণ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে আসার অব্যবহিত পরেই আপনার সমস্ত কাগজ-পত্র লইয়া দাক্ষিণাত্যে বাদসাহ্ আরঙ্গজেবের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রধান কাননগো বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ আপনার রসুম তিন লক্ষ টাকা দাবী করিয়া দেওয়ানের কাগজে স্বাক্ষর করেন নাই। কুলী খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাহাতেও দর্পনারায়ণ সম্মত হন নাই। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কুলী খাঁ দর্পনারায়ণকে তজ্জন্য চিরদিনই বিদ্বেষচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু তাহা কত দূর সত্য বুঝিয়া উঠা যায় না। খালসার দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র গোলাপ রায়কে অনুপযুক্ত মনে করিয়া কুলী খাঁ দর্পনারায়ণকে খালসার পেস্কারী প্রদান করেন। ইহাতে আমরা বিদ্বেষের কোন কারণ দেখিতে পাই না। কিন্তু মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, দর্পনারায়ণের সর্ব্বনাশের জন্যই উক্ত পদ প্রদান করা হইয়াছিল। যাহা হউক খালাসা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া দর্পনারায়ণ রাজস্ববন্দোবস্তে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে কুলী খাঁর 'জমা কামেল তুমারী' প্রস্তুত হয়। দর্পনারায়ণই সেই বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই সেরেস্তা হইতে উক্ত কাগজ প্রস্তুত হয়, এবং কুলী খাঁ তাঁহারই পরামর্শ-ক্রমে বাঙ্গলার রাজস্ববন্দোবস্তে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। এই বন্দোবস্তের জন্য তিনি শেঠ মাণিকচাঁদেরও পরামর্শ

গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। উক্ত জমীদারীবন্দোবস্তে রঘুনন্দনও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, দর্পনারায়ণ সেই সময়ে খালসা বিভাগের কর্ত্তা থাকায় জমা কামেল তুমারীর জন্য তাঁহাকে যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জমা কামেল তুমারীর বন্দোবস্তে বাঙ্গলার রাজস্ব বর্দ্ধিত হওয়ায়, জমীদারগণ দর্পনারায়ণকে সমস্ত বন্দোবস্তের মূল বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ক্রমে রাজস্ব আদায়সম্বন্ধে নানা রূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ছল ধরিয়া, তাঁহারা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট দর্পনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কুলী খাঁ দর্পনারায়ণকে দোষী স্থির করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে খালসার সমস্ত কাগজপত্র গ্রহণ করার ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কুলী খাঁ পূর্ব্ব ক্রোধের প্রতিশোধের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ এত কাল ব্যাপিয়া যে আপনার পূর্ব্ব ক্রোধ পোষণ করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তবে তিনি যেরূপ কঠোর প্রভু ছিলেন তাহাতে খালসা বিভাগের কোন রূপ গোলযোগের আশঙ্কা করিয়া দর্পনারায়ণকে কারারুদ্ধ করিতে পারেন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর বাদসাহ মহম্মদ সাহের রাজত্বের ৮ম বর্ষে এবং সুজা খাঁর সুবেদারী সময়ে ১৭২৭ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র শিবনারায়ণ পিতার দেয় সমস্ত অর্থ ও দুই লক্ষ টাকা নজর প্রদান করিয়া বাদসাহের নিকট হইতে অর্দ্ধ সুবার কাননগো পদ লাভ করিয়াছিলেন।

* মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ শিব-

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যেরূপ বাঙ্গালার রাজস্ববিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, নাজিমী প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইহার শাসনকার্য্যেও সেইরূপ মনোযোগ প্রদান করেন। কুলী খাঁ দেশশাসনের জন্য অধিক সৈন্য রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না, এই জন্য তিনি সৈনিক বিভাগের ব্যয় লাঘব করেন। তাঁহার সময়ে দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক মাত্র ছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুলী খাঁ বঙ্গরাজ্যকে যে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন, তাহার প্রত্যেক চাকলায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ফৌজদারের সংখ্যা কিছু কম ছিল। এই ফৌজদারগণের প্রতিই শাসন কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ফৌজদারদিগের অধীনে নগরে নগরে কোতোয়ালগণ ও প্রধান প্রধান গ্রামে থানাদারগণ শান্তি-রক্ষায় নিযুক্ত হন। তদ্ভিন্ন জমীদারগণও আপন আপন জমীদারীতে শান্তিরক্ষার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কোতোয়াল ও থানাদার এবং জমীদারগণও কতক পরিমাণে বর্ত্তমান সময়ের পুলীশের ন্যায় কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহাদের হস্তে বিচার কার্য্যেরও কিছু কিছু ভার অর্পিত হইয়াছিল। দেশ মধ্যে যে সমস্ত জমীদার বা অন্য লোক লুঠপাটাদি করিত, নবাব তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন। টুঙ্গী-স্বরূপপুরের জমীদার সুজাত খাঁ ও নেজাবৎ খাঁ অন্য জমীদারীর মধ্যে লুঠপাঠ করায় ও সরকারে ৬০ হাজার টাকা

নবাবের শাসনপ্রথা ও দেশমধ্যে শান্তিরক্ষা।

নারায়ণকে দশ আনা ও জয়নারায়ণকে ছয় আনা কানুনগোর পদ প্রদান করেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। শিবনারায়ণের ফার্ম্মান হইতে জানিতে পারা যায় যে, সুজা উদ্দীনের সময়ে, তিনি বাদসাহের নিকট হইতে অর্দ্ধ সুবার কানুনগো পদের ফার্ম্মান পাইয়াছিলেন। উক্ত ফার্ম্মান অদ্যাপি বঙ্গাধিকারী গণের নিকটে আছে।

লুটিয়া লওয়ায়, হুগলীর ফৌজদার নবাবের আদেশে তাঁহাদিগকে বন্দী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলে, নবাব উক্ত জমীদারদ্বয়কে চিরকারারুদ্ধ থাকার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ তাঁহার রাজ্যমধ্যে যে স্থলে লুটতরাজ বা চুরিডাকাইতি হইত, তিনি তাহার শাসনের জন্য সম্যক্‌রূপে চেষ্টা করিতেন। ফৌজদার, কোতোয়াল, থানাদার ও জমীদারগণ অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার ও অত্যাচারীদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্য আদিষ্ট হইতেন, তাহার অন্যথা করিলে তাঁহাদিগকেই দণ্ডার্হ হইতে হইত। কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান ও জগন্নাথের বিস্তৃত পথে তিনি শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কাটোয়া-মুর্শিদগঞ্জে একটী থানা স্থাপিত হয়। নবাব রাজ্যমধ্যে চোর ডাকাইত শাসনের জন্য আপনার প্রিয়পাত্র মহম্মদজানকে নিযুক্ত করেন। মহম্মদজান পূর্ব্বস্থলীতে থানা বসাইয়া তাহাকে কাটোয়ার অন্তর্ভূত করেন, এবং তথা হইতে নদীয়া ও হুগলীর পথে চোর ডাকাইত ধরিয়া তাহাদিগকে দ্বিভাগ করিয়া অপরাপর অত্যাচারীদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষশাখায় লট্‌কাইয়া রাখিতেন। মহম্মদজানের অগ্রে অনেক তীরন্দাজ ও কুঠারধারী লোক যাইত বলিয়া তিনি “কুড়ালী” বা কুঠারী নামে অভিহিত হইতেন। নবাবের এই প্রকার শাসনে পথিকগণ পথিমধ্যে আপন আপন দ্রব্যসহ নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিত। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে চোর ডাকাইতের উপদ্রব নির্ম্মূল হইয়াছিল বলা যায়। রাজস্ব ও শাসনের সুচারু রূপ বন্দোবস্ত করিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বিচার প্রথার সংশোধনেও মনোযোগ প্রদান করেন।

মোগল শাসনের পূর্ব্বে প্রধান প্রধান স্থানে কাজীগণ শাসন ও বিচার উভয় বিধ কার্য্য করিতেন। কিন্তু মোগল শাসনকালে ফৌজদারী প্রথার সুচারু রূপ বন্দোবস্ত হওয়ায়, ফৌজদারগণ সাধারণতঃ শাসনকার্য্য ও কাজীগণ বিচারকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। ফৌজদার দিগকেও কোন কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইত। তদ্ভিন্ন নাজিমী ও দেওয়ানীর কর্ম্মচারিগণও কোন কোন বিষয়ের বিচার করিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বন্দোবস্ত ও শাসনপ্রথার সংশোধনের সহিত বিচারপ্রথারও সংশোধন করিয়া চারি প্রকার বিচার বিভাগেরও সুচারু রূপ বন্দোবস্ত ও সেই সেই বিভাগের বিচারালয় স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে নিজামত আদালত, দেওয়ানী আদালত কাজী আদালত ও ফৌজদারী আদালত এই চারি প্রকার আদালতের বিচারাদির সুন্দর বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। নিজামত আদালতে স্বয়ং নাজিম বিচার কার্য্য করিতেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য কাজী, মুফ্‌তী ও উলামাগণকে উপস্থিত থাকিতে হইত। নাজিমকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া, পরিশেষে নিজামত আদালতে একজন দারোগা নিযুক্ত হন। তিনি নাজিমের প্রতিনিধিস্বরূপে অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া আপনার মন্তব্যসহ সেই সমস্ত নাজিমের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কুলী খাঁ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন নিজামত আদালতে উপবেশন করিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিতেন। জমীদারদিগের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ, প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাদ ও হিন্দু মুসল্‌মানের ফৌজদারী বিচার এই আদালতে হইত। নরহত্যা, ডাকাইতি, রাহাদানী প্রভৃতির জন্য অপরাধীকে ধৃত করার পরওয়ানা বাহির হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়। নিকটস্থ

কুলীখাঁর বিচারপ্রথা।

প্রতিবাদী বা আসামীর নামে দারোগার মোহর ও স্বাক্ষারযুক্ত পরওয়ানা সেরেস্তা হইতে পদাতিকের দ্বারা গ্রামের মণ্ডলের নিকট পাঠান হইত। দূরস্থ ব্যক্তিগণকে উপস্থিত করার জন্য জমীদারদিগের উকীলেরা আদিষ্ট হইতেন। অসমর্থ হইলে এবরানামায় তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানাইতে হইত। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মণ্ডলগণের প্রতি তাহাদেরও পরওয়ানা যাইত। মণ্ডলেরা তাহাদিগকে ধার্য্য দিনে উপস্থিত করার জন্য জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিতেন। জটিল মোকর্দ্দমায় নাজিম কাজী, মুফতী প্রভৃতির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। নরহত্যার মোকর্দ্দমার ভার নাজিম স্বয়ংই লইতেন। অনেক মোকর্দ্দমা সালিসের হস্তেও অর্পিত হইত। বাদী প্রতিবাদীরা আপনাপন সাক্ষী লইয়া যাইত। কোন জমীদার বা তালুকদারকে জমীদারী হইতে বঞ্চিত করিতে হইলে নাজিম তজ্জন্য খালসার দেওয়ানের সহিত পরামর্শ করিতেন। মুর্শিদাবাদ ব্যতীত ঢাকা ও উড়িষ্যায় নায়েব নাজিমী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নিজামত আদালতের ন্যায় তথায়ও বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। নরহত্যা, ডাকাইতী, রাহাদানী প্রভৃতির জন্য প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ শূলে চড়াইয়া দেওয়া হইত। লোষ্ট্র ও তীর নিক্ষেপে বধ প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। কোন কোন অপরাধে অঙ্গহানি করাও হইত। নরহত্যা ব্যতীত কোন কোন অপরাধে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজী আইনেও প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল। জাল করার জন্য ফাঁসী দেওয়া তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেওয়ানী আদালতের বিচার ভার খালসার দেওয়ানের উপর নির্ভর করিত। পরে উক্ত আদালতে দারোগাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জমীদারগণের সীমা সরহদ্দ ও প্রজাদিগের বাকী খাজানা প্রভৃতির বিচার

সাধারণতঃ এই আদালতেই হইত। তদ্ভিন্ন সাধারণ হিন্দু প্রজার দায়ভাগ ও উত্তরাধিকারের নিষ্পত্তিও এই আদালত হইতে সম্পন্ন হইতে দেখা যাইত। দারোগা অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া দেওয়ানের নিকট মন্তব্য পাঠাইতেন, দেওয়ান শেষ আদেশ দিতেন। দায় ও উত্তরাধিকারসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ফতোয়া বা ব্যবস্থা লওয়া হইত। বাদী প্রতিবাদীকে উপস্থিত করার প্রথা নিজামত আদালতের ন্যায়ই ছিল। বাঙ্গলায় যে আর্জি দাখিল হইত, তাহাকে ভাষা ও তাহার জবাবকে ভাষোত্তর বলিত। জমীদার ও তালুকদারদিগের বিচারের শেষ নিষ্পত্তি বা আপীল দেওয়ানী আদালতেই হইত। কাজী আদালতে সদরস্ সদুর বা এক জন প্রধান কাজী বিচার করিতেন। মুসল্মান ধর্ম্ম ও মুসল্মানগণের উত্তরাধিকার, ওয়াসিয়ৎ (উইল), তৌলিয়ত (ন্যাস), হেবা বা দান, ক্রয়বিক্রয়, হস্তান্তর প্রভৃতির বিচার কাজীর আদালতে হইত। পূর্ব্বে কাজীর হস্তে ফৌজদারী বিচারেরও ভার ছিল, পরে নাজিম সে ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। মফঃস্বলেও স্থানে স্থানে কাজীর আদালত ছিল। ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারই বিচার করিতেন। চৌর্য্য, শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি সামান্য সামান্য ফৌজদারী মোকর্দ্দমা তাঁহাকে করিতে হইত। নরহত্যা প্রভৃতির গুরুতর অভিযোগ তিনি প্রথমে শ্রবণ করিয়া নিজামত আদালতে সোপর্দ্দ করিতেন। মফঃস্বলের ফৌজদারগণ নাজিমের আদেশে কখনও কখনও তাহারও বিচার করিতে পারিতেন। অপরাধীর প্রাণদণ্ডাদির বিধান ফৌজদারকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইত। ফৌজদারও কাজী, মুফতী প্রভৃতির পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। ফৌজদারী আদালত এক রূপ নিজামত আদালতেরই অধীন ছিল।

এই সমস্ত বিচারক ভিন্ন জমীদারেরাও সামান্য সামান্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করিতে আদিষ্ট হইতেন। ঐ সমস্ত আদালতে তাহার শেষ নিষ্পত্তি বা আপীল হইত। হিন্দু ও মুসল্মানগণের দায়, উত্তরাধিকার প্রভৃতি হিন্দু ও মুসল্মান শাস্ত্রানুসারে হইলেও সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই ফৌজদারী বিচার মুসল্মান আইনানুসারে নিষ্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই রূপ বিচারপ্রথা মুসল্মান রাজত্বের শেষ এমন কি কোম্পানীর সময়েও কিছু কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। এই রূপে রাজস্ববন্দোবস্ত এবং শাসন ও বিচারপ্রথার সংশোধন করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ বাদসাহদরবারে ও ভারতের সর্ব্বত্র আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন।

অষ্টম অধ্যায়

মুর্শিদকুলী খাঁ।

রাজধানী মুর্শিদাবাদের উন্নতি।

বঙ্গরাজ্যের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ স্বীয় নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী মুর্শিদাবাদকে শোভা ও সমৃদ্ধিশালী করিতে ত্রুটি করেন নাই। মুর্শিদাবাদ দিন দিন অসংখ্য সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া এক বিশাল মহানগরে পরিণত হয়। ক্রমে ভাগীরথীর উভয় তীরে ব্যাপ্ত হইয়া এই সুবৃহৎ নগর এক বিস্তৃত জনপদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে দক্ষিণে বর্ত্তমান মতিঝিলের নিকট হইতে উত্তরে সাধকবাগ অতিক্রম করিয়া ও পশ্চিম তীরে দক্ষিণে খোসবাগ হইতে উত্তরে বড়নগরের নিকট পর্য্যন্ত প্রায় চারি ক্রোশ দীর্ঘ ভূভাগ মুর্শিদাবাদ রাজধানীর অন্তর্নিবিষ্ট হয়, * এবং বঙ্গদেশে তাহা একমাত্র সহর নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে। অদ্যাপি বঙ্গদেশের অনেক স্থানের লোকের নিকট মুর্শিদাবাদই সহর নামে পরিচিত। এই বিশাল নগরে যে কত সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেখানে বর্ত্তমান নিজামত কেল্লা অবস্থিত, সেই স্থানে নবাব মুর্শিদ-

* ১৭৮০ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ নগরকে ঐ রূপেই অঙ্কিত করা হইয়াছে।

কুলী খাঁ আপনার প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহারই নিকটে মণিবেগমের নির্ম্মিত বর্ত্তমান সুবৃহৎ মসজীদের স্থানে তাঁহার চেহেল-সেতুন বা চত্বারিংশস্তম্ভযুক্ত দরবার-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারই নিকটে চক বা সহরের প্রসিদ্ধ বাজার অবস্থিত হয়। সেই সুবৃহৎ বাজারের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসিগণ অদ্যাপি নগর মুর্শিদাবাদকে চক নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক মসজীদ ও ভজনালয়ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। নবাবের প্রাসাদ ব্যতীত মহিমাপুরে জগৎশেঠদিগের ইন্দ্রপুরীতুল্য বাসভবন, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারিগণের বিশাল অট্টালিকা ও অন্যান্য আমীর ও সম্ভ্রান্ত জনগণের সৌধমালায় সজ্জিত হইয়া মুর্শিদাবাদ দিন দিন রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করে ও স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীবক্ষ প্রতিবিম্বিত করিয়া তুলে। বাঙ্গলার প্রধান প্রধান রাজা ও জমীদারগণ তথায় আপনাদিগের সাময়িক বাসস্থানও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ব্যবসায়ী, ধনী মহাজনগণও ক্রমে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন। পরবর্ত্তী নবাবগণের সময়ও মুর্শিদাবাদ রমণীয় অট্টালিকাদিতে ভূষিত ও ধনশালী সম্ভ্রান্ত জনগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হওয়ায়, ইহার শ্রীবৃদ্ধি ক্রমে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। পলাশীযুদ্ধের পর ক্লাইব মুর্শিদাবাদের কথা ইংলণ্ডে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, মুর্শিদাবাদ নগর লণ্ডনের ন্যায় সুবিস্তৃত, জনপরিপূর্ণ ও ধনশালী। এই উভয় নগরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ লণ্ডনের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অসীমসম্পত্তিশালী।* কিন্তু যে

* "The city of Murshidabad is as extensive populous and rich as the city of London, with this difference, that



মুর্শিদাবাদ একদিন সম্ভ্রান্ত জনগণের গগনস্পর্শিনী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া ভাগীরথীবক্ষে আপনার কমনীয় কান্তি প্রতিবিম্বিত করিত, এক্ষণে তাহা পরিত্যক্ত শ্মশান-ক্ষেত্রের ন্যায় বাঙ্গলার এক প্রান্তে অবস্থিতি করিতেছে।

তোপখানা ও জাহানকোষা।

বর্ত্তমান নিজামত কেল্লার অভ্যন্তরে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র দুর্গনির্ম্মাণে সচেষ্ট হন। তাহার নিকটে ভাগীরথীর একটী শাখানদী প্রবাহিত ছিল, অদ্যাপি তাহা আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাকে কোন স্থানে গোবরানালা ও কোন স্থানে ভাণ্ডারদহ বিল বলিয়া থাকে। যে স্থানে ইহার ভাণ্ডারদহ নাম হইয়াছে, সে স্থানে ইহার কলেবর প্রকৃত নদীরই ন্যায়। এই গোবরানালার উপরিস্থিত স্থান সুরক্ষিত করিয়া কুলী খাঁ তথায় আপনার অস্ত্রাগার স্থাপন করেন, তথায় নবাবের কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদিও রক্ষিত হইত। সেই জন্য এই স্থানকে সাধারণ লোকে তোপখানা বলিত, অদ্যাপি উহা সেই নামেই পরিচিত। বাঙ্গলার পূর্ব্ব রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ তোপ ও বন্দুক প্রভৃতি আনিয়া তথায় স্থাপন করা হইয়াছিল। কালক্রমে সেই সমস্ত কামান, বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নিজামত কেল্লার মধ্যে আনীত হয়। (কেবল একটি সুবৃহৎ তোপ অদ্যাপি তথায় অবস্থিত হইয়া মুর্শিদাবাদের একটী দর্শনীয় পদার্থ

there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city."

হইয়া উঠিয়াছে *। এই তোপের নাম "জাহানকোষা" বা জগজ্জয়ী। জাহানকোষা দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত হইবে, বেড় ৩ হস্তেরও অধিক, মুখের বেড়টী ১ হস্তেরও উপর, অগ্নিসংযোগ ছিদ্রের ব্যাস ১॥ ইঞ্চ হইবে। এই সুবিশাল কামানটী ঢাকা হইতে আনীত হইয়াছিল। তোপখানা হইতে অন্যান্য কামানবন্দুকাদি স্থানান্তরিত হইলে, জাহানকোষা অনেকদিন পর্য্যন্ত ভূতলে নিপতিত থাকে, পরে তাহার পার্শ্বে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়া ইহাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে কতকটা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে। জাহানকোষার গাত্রে ৯ খণ্ড পিত্তল ফলকে ফারসী ভাষায় ইহার বিবরণ লিখিত আছে। তন্মধ্যে ৩ খণ্ড বৃক্ষের কাণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট খণ্ডকয়খানির অক্ষরও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিত্তল ফলকে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাজাহানের রাজত্বকালে ও ইস্‌লাম খাঁর সুবেদারী সময়ে জাহাঙ্গীরনগরে দারোগা সের মহম্মদের অধীনে হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিজরী, ১১ই জমাদিয়সসানি মাসে নির্ম্মিত হইল। ইহার ওজন ২১২ মণ, ২৮ সের বারুদ লাগিয়া থাকে। জাহানকোষাকে সাধারণলোকে এক্ষণে পূজা করে। নিজামত কেল্লার অস্ত্রাগারে অনেক কামান, বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সুন্দর রূপে রক্ষিত আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া শুনা যায়।

* শুনা যাইতেছে জাহনকোষা তোপ কলিকাতার প্রস্তাবিত ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দিরে আনীত হইবে।

কাটরার মসজীদ।

নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায়, মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া একটী মস্জীদ ও তাহার নিকটে আপনার সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ ও একটী কাটরা বা গঞ্জ স্থাপন করার ইচ্ছা করেন। ইস্মাইল ফরাসের পুত্র মোরাদ ফরাসের প্রতি তাহার ভার অর্পিত হয়। মোরাদ ছয় মাসের মধ্যে মসজীদাদির নির্ম্মাণ শেষ করিবে বলিয়া প্রকাশ করে। কিরূপে ঐ মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের লিখিত তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা যথাবথ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মোরাদ জাফর খাঁর নিকট হইতে এইরূপ আদেশ লইয়াছিল যে, নবাব তাহার কোন বিষয়ে যেন হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে সে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সকল নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে না। কুলী খাঁ তাহার আবেদন গ্রাহ্য করিলে, মোরাদ মসজীদাদি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। সহরের পূর্ব্ব প্রান্তে তোপখানার নিকটে খাস তালুকের অন্তর্গত এক স্থানে সে কাটরা বা গঞ্জ স্থাপন এবং মসজীদ ও সমাধি নির্ম্মাণের ইচ্ছা করে। বাঙ্গলার জমীদারদিগের নিকট হইতে মিস্ত্রী, ছুতার, বেলদার, মজুর ও কারিকর প্রভৃতি তলব করিয়া পাঠায় ও হিন্দুদিগের দেবালয় ভাঙ্গিয়া ইষ্টক ও মসলা জমা করিতে আরম্ভ করে, এবং তদ্দ্বারা মসজীদ নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। যেখানে দেবালয়ের নাম শুনা যাইত, সেই স্থানে মোরাদের লোক গমন করিয়া তথাকার জমীদারের নিকট হইতে নৌকা, গাড়ী লইয়া মজুর দ্বারা দেবালয় ভাঙ্গিয়া তাহার ইষ্টকাদি বোঝাই দিয়া আনয়ন করিত। জমীদার ও মুৎসুদ্দীগণ দেবালয়ের পরিবর্ত্তে ইষ্টক, মসলা ও নজরানা দিতে চাহিলেও তাহাতে

সম্মত হইত না। মুর্শিদাবাদ হইতে ৪।৫ দিনের পথে নদীর তীর ব্যাপিয়া কোন স্থানে দেবালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিলনা। মোরাদের লোকজন মফঃস্বলে হিন্দুদিগের গৃহাদিও দেবালয় বলিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে, গৃহস্বামিগণ তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া নিরস্ত করিত। লোকজনের অভাব হইলে জমীদারদিগের শিবিকা-বাহকদিগকে ধরিয়া আনিয়া মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত, জমীদারেরা তাহাদের পরিবর্ত্তে মজুর ও পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া কোন রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। মোরাদ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিত না। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, জমীদার ও মুৎসুদ্দী মোরাদের নামে ভয়ে কম্পিত হইতেন। তাহার হুকুমমতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। এই রূপে মোরাদ এক বৎসরের মধ্যে মসজীদাদির নির্ম্মাণ শেষ করে। মোরাদের অত্যাচার লইয়া পরবর্ত্তী লেখকগণ নানা কথা বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাহার মন্দিরভঙ্গের ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান হন। মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ কিরীটেশ্বরী প্রভৃতি মন্দির ভগ্ন না হওয়ায়, মন্দিরভঙ্গব্যাপার সন্দেহমূলক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।* মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের বিবরণ যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। আমাদের

* মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব জজ বেভারিজ সাহেব প্রভৃতির ঐ মত। তারিখ বাঙ্গলায় এই মন্দিরভঙ্গের বিবরণ আছে, রিয়াজে তাহার উল্লেখ নাই। গ্লাডউইন কর্ত্তৃক তারিখ বাঙ্গলার ইংরাজী অনুবাদে ও ষ্টুয়ার্টেও মন্দিরভঙ্গের কথা আছে। ফলতঃ তারিখ বাঙ্গলার বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও মন্দির-ভঙ্গ একেবারে অমূলক বলা যায় না।

বিবেচনায় অতি সত্বর মসজীদাদির নির্ম্মাণ শেষ করিতে হইবে বলিয়া মোরাদ ফরাসের লোকেরা কতকগুলি দেবমন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছিল। কেবল দেবমন্দির বলিয়া নহে, অনেক গৃহস্থের বাটীও যে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়, তাহাও মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়। যে সমস্ত দেবমন্দির হিন্দুদিগের তীর্থ বা তীর্থস্বরূপ ছিল ও যাহা বাদসাহগণের ফার্ম্মানানুসারে চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইত, মোরাদ এমন কি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁও তাহাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সেই জন্য কিরীটেশ্বরী প্রভৃতি মন্দিরের কোনই অনিষ্ট হয় নাই। যাহাদের কোন দলিলাদি ছিলনা ও সাধারণ লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদেরই ধ্বংস হইয়া থাকিবে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের লাখরাজ আইনের সময় যে সমস্ত দেবোত্তর ভূমির কোন রূপ সনন্দ ছিলনা, তাহা মালভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং মোরাদ ফরাসের ন্যায় অশিক্ষিত লোক যে সেই রূপ কারণে কতকগুলি মন্দির ভূমিসাৎ করিবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও, মোরাদ ফরাসের অত্যাচার অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ, নবাব সুজা উদ্দীন তাহার অত্যাচারের অনুসন্ধান করিয়া মোরাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে, তাহার অত্যাচার যে অমূলক এরূপ ব্যক্ত করা অতি সাহসের কথা বলিয়াই বোধ হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ন্যায়পর নবাব হইলেও অল্প দিনের মধ্যে মসজীদনির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যকবোধে মোরাদের অত্যাচারের প্রতি সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেন নাই, এবং মোরাদও নবাবের নিকট হইতে পূর্ব্বে ঐ মর্ম্মে আদেশ লইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মোরাদ এক বৎসরের মধ্যে একটী কাটরা বা গঞ্জ বসাইয়া মক্কার মসজীদের অনুকরণে এক প্রকাণ্ড মসজীদ নির্ম্মাণ করে, এবং তাহার সোপানাবলীর নিম্নে মুর্শিদকুলী খাঁর সমাধিস্থান নির্ণীত হয়। মসজীদে অত্যুচ্চ মিনার, হাউজ, ইন্দারা, কূপ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। নানারূপ কারুকার্য্যে শোভিত হইয়া, সেই বিরাট্ মসজীদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ হইয়া উঠে।* ১১৩৭ হিজরী বা ১৭২৩ খৃঃ অব্দে মসজীদনির্ম্মাণ শেষ হয়। তাহার কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ফলকে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল যে, "আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব, যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাহার মস্তকে ধূলিবৃষ্টি হউক।" কাটরা বা গঞ্জের মধ্যস্থ মসজীদ বলিয়া এক্ষণে তাহার নাম কাটরার মসজীদ হইয়াছে। এই কাটরার মসজীদ এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। গত ভূমিকম্পে তাহার ভগ্নস্তূপের কলেবর আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ

১৭২২ খৃঃ অব্দে শেঠ মাণিকচাঁদ পরলোক গমন করেন। মহিমাপুরের পর পারে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। যে স্থানে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে দয়াবাগ বলিত। উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। মাণিকচাঁদের পরলোকগমনের পর ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদ গদীর উত্তরাধিকারী হইয়া দিন দিন তাহার উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে মুর্শিদাবাদ গদীর নাম বিঘোষিত হইয়া পড়ে। (কুলী খাঁ ফতেচাঁদকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। ধনসম্পত্তিতে ফতেচাঁদ ক্রমে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় হইয়া উঠায়, নবাব

* কাটরা মসজীদের বিস্তৃত বিবরণ মুর্শিদাবাদ-কাহিনীতে দ্রষ্টব্য।



বাদসাহদরবারে তাঁহার জন্য নূতন উপাধির প্রার্থনা করিলে, সম্রাট মহম্মদ সাহ তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে অর্থাৎ ১৭২৩ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রদান করিয়া, মতির কুণ্ডল ও হস্তী ও তাঁহার পুত্র আনন্দচাঁদকে শেঠ উপাধি ও কুণ্ডল পারিতোষিক এবং ইহার যথারীতি সনন্দ দান করিয়াছিলেন।* তদবধি মুর্শিদাবাদের শেঠগণ 'জগৎশেঠ' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। তৎকালীন সমস্ত পরিজ্ঞাত জগতের মধ্যে শেঠেরা ধনসম্পত্তিতে অদ্বিতীয় থাকায়, তাঁহাদিগকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করা হয়। ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) এই জগৎশেঠদিগের সহিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা উল্লিখিত হইবে।

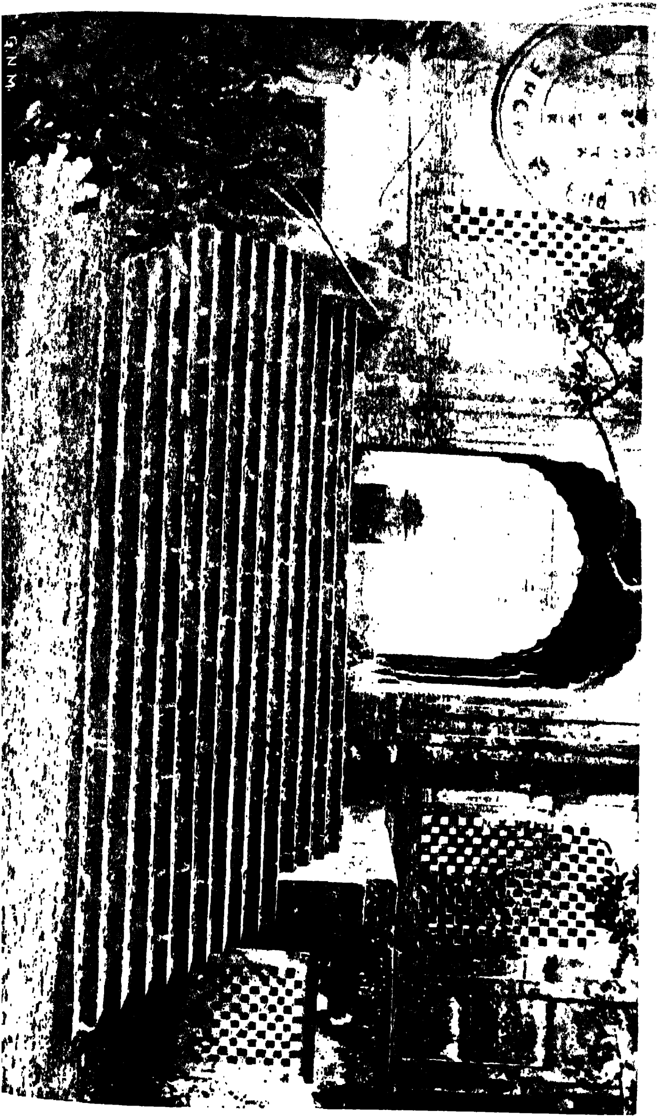
মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু।

আপনার অন্তিম সময় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া কুলী খাঁ তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি আপনার সমাধিস্থান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কুলী খাঁ স্বীয় পুত্রের প্রাণদণ্ডের পর হইতে দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এক্ষণে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া ১৭২৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদের নাজিমীর নিমিত্ত সরফরাজের জন্য দিল্লী দরবারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা ও সরফরাজের পিতা সুজা উদ্দীন নিজে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের প্রার্থী হওয়ায় ও দরবারের কর্ম্মচারিগণকে হস্তগত করায়, কুলী খাঁর উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

* উক্ত সনন্দ অদ্যাপি শেঠবংশীয়দিগের নিকটে বিদ্যমান আছে।

শ্বশুর জামাতার তাদৃশ সদ্ভাব ছিলনা, সেই জন্য কুলী খাঁ জামাতার জন্য স্থবেদারীর চেষ্টা না করিয়া দৌহিত্রের জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, অবশেষে সুজা উদ্দীন নিজেই মুর্শিদাবাদের সিংহাসন-লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কুলী খাঁ সরফরাজের জন্য সুবেদারীর চেষ্টা করিতে করিতেই গতাসু হন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি সরফ-রাজের হস্তে আপনার সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গকে ন্যায় ও করুণা-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাহার পরই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। এইরূপে হিজরী ১১৩৯ সাল বা ১৭২৫ খৃঃ অব্দে আপনার একমাত্র পত্নী নসেরুবাণু বেগম ও কন্যা জিন্নেতেন্নেসা* ও দৌহিত্র সরফরাজের নিকটে মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা, বাঙ্গলার কার্য্যদক্ষ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নবাব মুর্শিদকুলী জাফরখাঁ চিরদিনের জন্য নয়ন মুদিত করেন। তাঁহারই ইচ্ছানু-সারে কাটরার মসজীদের সোপানাবলীর নিম্নে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সাধুগণের পদধূলি তাঁহার সমাধির উপর সঞ্চিত থাকিবে বলিয়া তিনি তথায় সমাহিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আদ্যাপি কাটরার মসজীদের সোপানাবলীয় নিম্নে কুলী খাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে। এই সোপানাবলী ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষিত হইয়াছে, এবং কুলী খাঁর সমাধিরও মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইয়া থাকে। সাধারণ মুসল্মানগণ কুলী খাঁকে পীরের ন্যায় পূজা করে। সরফরাজ মাতা-মহের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে ও উড়িষ্যায় পিতার নিকট পাঠাইয়া সর-কারী দ্রব্যাদি ব্যতীত কুলী খাঁর সমস্ত সম্পত্তি কেল্লা হইতে আপনার

* আজম-উন্নেসা নামে কুলী খাঁর এক কন্যার নাম শ্রুত হওয়া যায়। আজম-উন্নেসা জিন্নেতেন্নেসার নামান্তর কিনা তাহাও জানা যায় না।


GNM

নেকৃটাখালির বাটীতে লইয়া যান। ইহার পর কিরূপে পিতাপুত্রের বিবাদের সূচনা হইয়া, পরে তাহার মীমাংসা হয় ও সুজা উদ্দীন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, পর অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইবে।

কুলী খাঁর চরিত্র।

আমরা মুর্শিদকুলী খাঁর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করা যাইতেছে। বাস্তবিক মুর্শিদকুলীর ন্যায় কার্য্যদক্ষ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়পর ও চরিত্রবান্ নবাবের সংখ্যা যে বাঙ্গলার সুবেদারদিগের মধ্যে অল্প, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার চরিত্রবলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, মুসল্মান বাদসাহনবাবগণের অনেকে নানা গুণে ভূষিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই বিলাসস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া চরিত্রহীন হইয়া পড়িতেন। কুলী খাঁ বিলাস-বিভ্রমকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার একমাত্র পত্নীর প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। আর তাঁহার অসীম কার্য্যদক্ষতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তাঁহার বিবরণের ছত্রে ছত্রে দৃষ্ট হইবে। ন্যায়ের জন্য তিনি আপনার একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদানেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার চরিত্র একেবারে দোষশূন্য ছিল না। আমরা এক্ষণে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া, প্রথমতঃ মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত কুলী খাঁর চরিত্রের বিবরণ প্রদান করিয়া তাহার সমালোচনাকালে আমাদের সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিব।

মুসলমান ঐতিহাসিক-গণের বর্ণিত নবাবের চরিত্র।

মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, সায়েস্তাখাঁ ব্যতীত বঙ্গদেশে এমন কি সমগ্র হিন্দুস্থানে এরূপ কোন আমীরের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, যে মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত যাঁহার তুলনা হইতে পারে। স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের ও প্রচারের অদম্য অধ্যবসায়ে, বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন ও বিধানের অপরিসীম জ্ঞানে, সম্ভ্রান্তবংশীয় ও বিখ্যাত লোকদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানের জন্য মুক্ত হস্ততায়, কঠোর ও অপক্ষপাতী বিচারে, বিপন্নের উদ্ধারে ও দুষ্কৃতের দমনে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। এক কথায় তাঁহার সমস্ত শাসনকাল মানবজাতির কল্যাণে ও স্থষ্টিকর্ত্তার গৌরবঘোষণায় অতিবাহিত হইয়াছিল। জগতের যে সমস্ত নরপতি ন্যায় বিচারের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, কুলী খাঁর বিচার তাঁহাদেরই ন্যায় সর্ব্বত্র সম্মানিত হইত। কুলী খাঁ তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।* তিনি অত্যন্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, কখনও কোন কার্য্যে তাঁহার বাক্যের অন্যথা হইত না। কুলী খাঁ ধর্ম্মকার্য্যে পরিশ্রমস্বীকার ও পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ প্রতিপালন করিতেন, তিন মাস রোজা রাখিতেন ও কোরাণপাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি অল্প ক্ষণ নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি কোরাণলিখনে ও প্রপীড়িতদিগের

* (কুলী খাঁর পুত্র কাহারও স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ করায়, তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই ঘটনা তাঁহার দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করা কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।)

বিচারে নিবিষ্ট থাকিতেন। ঐ সমস্ত কোরাণলিখন মক্কা, মদীনা, কারবোলা, বোগদাদ, খোরাসান, জেদ্দা, বসোরা, আজমীর, পাণ্ডুয়া, প্রভৃতি পবিত্র স্থানে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি যুদ্ধকার্য্যে সিপাহী নিযুক্ত করা অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্যের জন্য লোক নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর মনে করিতেন। এইজন্য তাঁহার সময়ে দুই সহস্র ব্যক্তি কোরাণ-পাঠের ও মালাজপের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। সাধু, ফকীর ও বিদ্বান্‌দিগের সেবা করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত জনগণ হইতে সামান্য দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া মজলিসে বসাইতেন ও তাঁহাদিগকে পানাহারে তৃপ্ত করিতেন। ভোজনের সময় নিজে বিনয়সহকারে সকলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। ঐ সময়ে ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে দক্ষিণে লালবাগ হইতে পশ্চিম তীরে উত্তরে মাহীনগর পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীর আলোক-মালায় ভূষিত হইত। মসজীদ, মিনার, বৃক্ষ, কোরাণের শ্লোক ও নানাবিধ কবিতা আলোকের মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিত। নাজির আহম্মদ আলোক প্রজ্বালিত করিবার জন্য প্রায় লক্ষ লোক নিযুক্ত করিত। সন্ধ্যার সময়ে একবার তোপধ্বনি হইবামাত্র যুগপৎ সমস্ত আলোক প্রজ্বালিত হইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়া তুলিত। খাজা খিজিরের উৎসব উপলক্ষে আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া কাগজনির্ম্মিতগৃহপরিশোভিত কদলী বৃক্ষের 'বেরা' ভাগীরথীবক্ষে ভাসমান হইত। * ফকীর ও দরিদ্রগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে

* (এই বেরা ভাসান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যে উৎসব হইয়া থাকে তাহার সাধারণ নাম বেরা বা ব্যারা। প্রতি বৎসরের ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতি

অন্ন পাইত। দুই সহস্র কারী (কোরাণ পাঠার্থী) ও তস্‌বী (মালাজপক) তাঁহার ভোজনাগারে নিত্য ভোজন করিত। তদ্ভিন্ন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গগণকেও তিনি ভোজন করাইতেন। যাহাতে রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, এবং যাহাতে শস্যের ব্যবসায় একচেটিয়া না হয় তদ্বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি বাজারদরের অনুসন্ধান লইতেন। কোন স্থানে অতিরিক্ত দরের কথা জানিতে পারিলে, নবাব বিক্রয়কারীর কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন, সাধারণতঃ তাহাকে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করান হইত। শস্যের আমদানী কম ও দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইলে, তিনি পল্লীগ্রামে দারোগা পঠাইয়া লোকদিগের গোলা ভঙ্গ করিয়া নগরে শস্যের আমদানী করাইতেন। কুলী খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদে টাকায় ৪।৫ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত।* লোকে মাসিক ১ টাকা ব্যয়ে প্রত্যহ পোলাও কালিয়া ভোজন করিতে পারিত। ইউরোপীয় সওদাগরেরা ব্যবসায়ের জন্য শস্যাদি জাহাজে বোঝাই দিতে পারিতেন না, অথবা কোন সওদাগরের গঞ্জ, গোলা প্রভৃতি রক্ষা করার আদেশ ছিল না। যাহাতে ইউরোপীয়গণ আহার্য্য শস্য ব্যতীত অতিরিক্ত শস্য জাহাজে বোঝাই করিতে না পারেন,

বারে এই উৎসব হয়। খাজা খিজিরের উপলক্ষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান। জ্ঞানী ইলায়াসকে মুসলমানেরা খিজির বলিয়া থাকেন। খিজির জীবন নির্ঝর পান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হন। এই উৎসব উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে বহু লোকের সমাগম হয়। পূর্ব্বে মহাসমারোহের সহিত এই উৎসব সম্পন্ন হইত। মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর 'ব্যারা' প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

* রিয়াজুস সালাতীনে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল বিক্রীত হইত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তজ্জন্য হুগলীর ফৌজদারের প্রতি কঠোর আদেশ প্রদত্ত ছিল। কুলী খাঁ বাদসাহের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি কখনও খাস বা বাদসাহী নৌকায় আরোহণ করিতেন না। বর্ষা কালে যখন ঢাকা হইতে বাদসাহী নৌকাশ্রেণী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইত, তখন তিনি তাহাদের নিকট গমন করিয়া নজর দিতেন ও আস্তানা চুম্বন করিতেন। হস্তিগণের মধ্যে পরস্পরের ক্রীড়া দরবার হইতে নিষিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার সম্মুখে সেরূপ ক্রীড়া হইতে পারিত না, কিন্তু ব্যাঘ্র বা অন্য জন্তুর সহিত হস্তীর ক্রীড়া তিনি দর্শন করিতেন। তিনি শিকার করা ভাল বাসিতেন না। কুলী খাঁ কখনও কোন রূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন না। নৃত্য, গীত ও বাদ্যে তাঁহার অনুরক্তি ছিল না। মুসলমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইত না। তিনি তাঁহার এক মাত্র বিবাহিতা পত্নীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক বা খোজা তাঁহার মহলসরা বা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। তিনি যাবতীয় ভোগবিলাস বিশেষতঃ বেশভূষার কোন রূপ আদর করিতেন না। কুলী খাঁ সকল রূপ গুরুপাক দ্রব্য, ঠাণ্ডা সরবৎ বা জমাট ক্ষীর ভোজনে বিরত ছিলেন। কেবল বরফ ও শিল ব্যবহার করিতেন। নাজির আহম্মদের নায়েব খিজির খাঁ শীত কালে রাজমহলের পাহাড়ে বরফ জমাইবার জন্য নিযুক্ত হইত, এবং অন্যান্য সময়ে তাহার জল সঞ্চয় করিয়া রাখিত। আমের সময় তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য আকবরনগর বা রাজমহলে এক জন দারোগা নিযুক্ত হইতেন। মালদহ, কোতোয়ালী, হোসেনপুর প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত উত্তম উত্তম আম্র বৃক্ষ ছিল, দারোগা ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাহার হিসাব রাখিতেন। কর্ম্মচারীরা যাহাতে লোকে আম চুরী না করে

তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন ও মুর্শিদাবাদে আম পাঠাইতেন। ইহার জন্য জমীদারদিগকে সাহায্য করিতে হইত। সরকারী আম গাছ জমীদারেরা কাটিতে পারিতেন না। জাফর খাঁ নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, এবং বিদ্বান্ ও সাধুগণের সম্মান করিতেন। তিনি ক্ষিপ্র হস্তে সুন্দর রূপে লিখিতে পারিতেন। লাল কালীতে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করার রীতি ছিল। গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তিনি নিজেই সমস্ত আয় ব্যয় পরিদর্শন করিতেন। তিনি দানে হাতেম ও বিচারে নসেরুয়াঁর সদৃশ ছিলেন। ন্যায়পর ও বিপন্নের ত্রাতা কুলী খাঁর রাজত্বকালে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত অন্যায় কার্য্য ও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম হইত। কুলী খাঁ বাদসাহের বা পূর্ব্ব সুবেদারগণের প্রদত্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতেন না। বরঞ্চ তাঁহার সময়ে তাহাদের বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কোন জমীদার বা আমীন প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া অব্যাহিত পাইতেন না। জমীদারদিগের উকীলেরা চেহেল-সেতুনের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। জমীদারদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগকারীকে দেখিতে পাইলে, যেরূপে হউক, তাঁহারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতেন, কারণ, কুলী খাঁর কর্ণে অভিযোগ পঁহুছিলে অত্যাচারীকে যার পর নাই শাস্তি ভোগ করিতে হইত। যদি কোন বিচারক পক্ষপাতবশতঃ অথবা কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সামান্য লোকের অভিযোগ শ্রবণে অবহেলা করিতেন, কুলী খাঁ জানিতে পারিলে নিজেই তাহার বিচার করিতেন ও উক্ত বিচারকের হাত কাটিয়া দিতেন। তাঁহার বিচারে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা স্নেহ প্রদর্শিত হইত না। ধনী ও দারিদ্র তাঁহার চক্ষে সমভাবে প্রতীত হইত। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে হুগলীর কোতোয়াল এমামুদ্দীন এক মোগলের কন্যাকে গৃহ

হইতে বহিষ্কৃত করায় ফৌজদার আসাদুল্লা * তাহার সুবিচার করেন নাই। মোগলের পক্ষ হইতে নবাবের নিকট অভিযোগ হইলে, তিনি বিচারে কোতোয়ালকে দোষী স্থির করিয়া কোরানের ব্যবস্থানুসারে অপরাধীকে প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ দেন। ফৌজদারের অনুনয়বিনয় নবাবকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বাদসাহ আলমগীর ও জাফর খাঁ জেন্দাপীরের রাজত্বসময়ে উৎকোচপ্রদানে কাজীর পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। ভদ্রবংশীয়, ধার্ম্মিক, বিশ্বাসী ও বিদ্বান্‌গণ কাজীর পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার দেওয়ানীসময়ে মহম্মদ সরফ্ কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ধার্ম্মিক, নিরপেক্ষ ও বিদ্বান্ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ঐ সময়ে চুণাখালির জনৈক তালুকদার বৃন্দাবন রায়ের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয়। এক জন মুসল্‌মান ফকীর বৃন্দাবনের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে, বৃন্দাবন তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ফকীরকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকীর বৃন্দাবনের বাটীর সম্মুখের পথে কতকগুলি ইষ্টক জমা করিয়া একটী প্রাচীর উত্তোলন করে, ও তাহাকে মসজীদ বলিয়া ঘোষণা করিয়া লোকদিগকে নমাজ করিবার জন্য তথায় আহ্বান করিতে থাকে। বৃন্দাবন সেই স্থান দিয়া গমন করিলে, সে উচ্চৈঃস্বরে আজান দিত। বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া তাহার কতকগুলি ইষ্টক ফেলিয়া দেন। ফকীর জাফর খাঁর আদালতে অভিযোগ করিলে, কাজী সরফ্ কতকগুলি মৌলবীর সাহায্যে বিচার করিয়া মুসল্‌মান শাস্ত্রানুসারে বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা স্থির করেন। মুর্শিদ-

* আসাদুল্লা কুলী খাঁর রাজত্বারম্ভের অনেক পরে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

কুলী খাঁ প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে পারে কি না কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলে, কাজী উত্তর করেন যে, অনুরোধ-কারীর প্রাণদণ্ড বিধান করিতে যতটুকু সময় লাগে, তত টুকু সময় পর্য্যন্ত অপরাধীর প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে। কুলী খাঁ বৃন্দা-বনের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। সাজাদা আজিম ওশ্বান ও বাদসাহ আরঙ্গ জেবের নিকট বৃন্দাবনের প্রাণ-রক্ষার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। কাজী স্বহস্তে শর বিদ্ধ করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণ নাশ করেন। বৃন্দাবনের হত্যার পর আজিম ওশ্বান বাদসাহ আলমগীরকে এইরূপ লেখেন যে, কাজী সরফ্ উন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবনকে অকারণে নিজ হস্তে বধ করিয়াছেন। বাদসাহ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে "কাজী সরফ্, খোদাকে তরফ," আরঙ্গ জেবের মৃত্যুর পর সরফ্ কাজীর পদ পরিত্যাগ করেন, এবং কুলী খাঁর অনেক অনুরোধসত্ত্বেও উক্ত পদে স্থায়ী থাকিতে সম্মত হন নাই।* নবাব জাফর খাঁর স্বধর্ম্মের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা ছিল যে, বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, তাঁহার অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া, তিনি একটী মসজীদ ও আপনার সমাধিস্থাননির্ম্মাণে ইচ্ছুক হন। তজ্জন্যই কাটরার মসজীদ ও তাহার সোপানাবলীর নিম্নে তাঁহার সমাধিস্থান নির্ম্মিত হয়। মৃত্যুর পর তিনি তথায় সমাহিত হইয়াছিলেন।

* বহরমপুরের পুর্ব্বে কাশীমবাজারের দক্ষিণে শিরডাঙ্গা নামক স্থানে কাজী সরফ্ বংশীয়দিগের এক মসজীদ আছে।

মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ এই রূপে কুলী খাঁর চরিত্র বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কুলী খাঁকে জেন্দাপীর বা মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক কুলী খাঁ যেরূপ অসংখ্য সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন, সেরূপ সদ্‌গুণাবলী সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্রবলে ও ন্যায়ানুষ্ঠানে তিনি মহাপুরুষতুল্যই ছিলেন। ধর্ম্মের ও বিদ্যার সমাদরের জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন, বিলাসবিভ্রমকে দূরে পরিহার করিতেন, এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট সকলকেই পরাজিত হইতে হইত। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণের সহিত আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায় চরিত্রবান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মচারী বাঙ্গলায় বা সমগ্র ভারতবর্ষে মুসল্‌মান রাজত্বকালের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে সকল বিষয়ে দোষশূন্য বলিয়া মনে করিনা, এবং সর্ব্ব বিষয়ে দোষশূন্যতা কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপরও হয় না। তিনি ন্যায়পর ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায়পরতা কারুণ্যের কোমল আবরণ অপেক্ষা কঠোরতার কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। ন্যায় কার্য্যে যেখানে কারুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, সেখানে কঠোরতার মাত্রা বৃদ্ধি করিলে যে প্রকৃত ন্যায়ানুষ্ঠান হয়, ইহা আমরা বিবেচনা করি না। অবশ্য ন্যায় কার্য্যে কোমলতাপ্রকাশ বিশেষ রূপ বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু যেখানে কোমলতা প্রকাশ করিলে ন্যায়ানুষ্ঠানের কোনই হানি হয় না, সেখানে অনর্থক কঠোরতাপ্রকাশে জগতের অকল্যাণ ব্যতীত কদাচ কল্যাণ সংসাধিত হয় না। জমীদারগণ নানা কারণে রাজস্ব প্রদান ত্রুটি করিতন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করা

চরিত্রসমালোচনা।

আমরা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া মনে করি না। কুলী খাঁ বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া সরকারের আয় বৃদ্ধি করা আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাদ্‌সাহদরবারে আপনার গৌরবপ্রচারের উদ্দেশ্য কি জড়িত ছিল না? কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য মানব জাতিকে কঠোরতার তীব্র অস্ত্রে জর্জ্জরিত করিলে, সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম জগতের পক্ষে কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্ত্তে অকল্যাণকরই হইয়া উঠে। এই জন্য কুলী খাঁর কঠোরতার জন্য তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গ দেশে জমীদারবিদ্রোহও উপস্থিত হইয়াছিল। জমীদারী বন্দোবস্তে তিনি যে পক্ষপাতশূন্য ছিলেন এরূপ বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গলার সাধারণ হিন্দু জমীদারের প্রতি তাঁহার যেরূপ কঠোর ব্যবহার ছিল, বীরভূমের মুসল্‌মান জমীদারের প্রতি তাহার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইত না। আবার সামান্য কারণে অনেক জমীদারকে জমীদারী হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের জমীদারী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও করিতেন। এই সমস্ত কার্য্য প্রকৃত ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া মনে করা যায় না। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ জমীদারগণের প্রতি তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের অত্যাচারের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিলেও তাহা যে কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে মুর্শিদকুলী খাঁ সাধারণ প্রজাকে অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন, অসংখ্য প্রজার পিতাস্বরূপ জমীদারগণের প্রতি তাঁহার কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার কি অত্যাচার বলিয়াই গণ্য ছিল না? কিন্তু তজ্জন্য তিনি কোন কর্ম্মচারীর প্রতি দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, সামান্য শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। অপর দিকে তাঁহার উদারহৃদয় জামাতা নবাব সুজা খাঁ সেই সমস্ত অত্যা-

চারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। যে জমীদারগণ স্মরণাতীতকাল হইতে বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিলেন, সামান্য অপরাধীর ন্যায় তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করা ন্যায় ও রাজনীতিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। জমীদারদিগের অপরাধ এক মাত্র রাজস্বপ্রদানে অবহেলা। অবশ্য জমীদারগণের মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বকও রাজস্বপ্রদানে ত্রুটি করিতেন সত্য, কিন্তু এই সমান্য অপরাধের জন্য বাঙ্গলার এক মাত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জনগণকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় নির্য্যাতন করিয়া কারাগারে টানিয়া লইয়া যাওয়া যে কুলী খাঁর ন্যায় ন্যায়পর নবাবের উপযুক্ত কার্য্য হইত, ইহা কদাচ বলা যায় না। সাধারণ হিন্দু-দিগের প্রতি তাঁহার কোন রূপ অত্যাচার ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শ প্রভু আরঙ্গ জেবের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া হিন্দু অপেক্ষা মুসল্মানগণকে যে অপেক্ষাকৃত প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করি-তেন তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। সুজা খাঁ বা আলিবর্দ্দীকে আমরা যেরূপ হিন্দু মুসল্মানকে এক চক্ষে নিরীক্ষণ করা দেখিতে পাই, জাফর খাঁকে সেরূপ ভাবে দেখিতে পাই না, তবে তিনি উপযুক্ত হিন্দুর কখনও যে অনাদর করিতেন না ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকদিগের সহিত ব্যবহারে তিনি অনেক পরিমাণে কূট বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া-ছেন। ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হইলে রাজনীতি অবলম্বন না করিলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হয় সত্য বটে, কিন্তু তজ্জন্য নজর উপহারাদি গ্রহণ যে প্রকৃত নীতিসম্মত ইহা বিবেচনা করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি যে. তিনি অনেক স্থলে অতিরিক্ত

নজর কেবল বাদসাহের জন্য নহে, নিজের জন্যও গ্রহণ করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিতেন। নবাব মুর্শিদকুলীর ন্যায় পুরুষের পক্ষে ইহা একটী বিশেষ দোষ বলিয়াই বোধ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সে সময়ে চারি দিকে উৎকোচের স্রোত কিরূপ খরতর বেগে প্রবাহিত হইত। মুর্শিদকুলীর ন্যায় উচ্চ চরিত্রের পুরুষ যাহার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহার বেগ না জানি কতই প্রবল ছিল। ফলতঃ তাঁহার চরিত্রে দুই একটী দোষ পরিলক্ষিত হইলেও তিনি যে, আদর্শ পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার চরিত্রবল মুসলমান নবাববাদসাহদিগের মধ্যে তাঁহাকে উচ্চতম আসনে স্থাপন করিয়াছে।



নবাব সুজাউদ্দীন

নবম অধ্যায়।

সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ।

সুজা উদ্দীনের পূর্ব্ব বিবরণ।

মুর্শিদকুলী খাঁর দেহত্যাগের পর তাঁহার জামাতা সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নবাব মুর্শিদকুলী স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে আপনার উত্তরাধিকারিত্ব দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুজা উদ্দীনের চেষ্টায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রথমতঃ সুজা উদ্দীনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা যথাযথরূপে উক্ত ঘটনার বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি। সুজা উদ্দীন খোরাসানাধিবাসী তুর্কজাতীয় আফসার-বংশসম্ভূত। আফসারগণ পারস্যমধ্যে আপনাদিগের যোদ্ধৃবিদ্যায় চিরপ্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বুরহানপুর নগরে সুজার জন্ম হয়। বুরহানপুরে মুর্শিদকুলী খাঁরও নিবাস ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ উক্ত নগরস্থ সম্ভ্রান্তগণের অন্যতম, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া সুজার বাল্যকাল হইতেই মুর্শিদ সুজাকে বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহও করিতেন। যৎকালে মুর্শিদকুলী হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার কন্যা জিন্নেতেন্নেসা বেগমের সহিত সুজা উদ্দীনের পরিণয় ব্যাপার সংসাধিত হয়। তৎপরে সম্রাট আরঙ্গজেবের অনুগ্রহে কুলী খাঁ বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার

দেওয়ানী ও পরে সুবেদারী প্রাপ্ত হইলে, স্বীয় জামাতা সুজা উদ্দীনকে উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ানী ও নায়েব নাজিমী, প্রদান করেন। কিন্তু এই সময় হইতেই শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে আরম্ভ হয়। উভয়ের মনোভাব বিভিন্ন থাকায় ও শাসনকার্য্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায়, এই মনোমালিন্য ঘটিয়া উঠে। সুজা সেই জন্য স্বীয় শ্বশুরের নিকট হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা করিয়া উড়িষ্যাতে আপনার আবাসস্থান স্থাপন করিলেন, এবং উক্ত প্রদেশের শাসনকার্য্যের জন্য তৎপ্রদেশে প্রতিনিয়ত থাকাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী জিন্নেতেন্নেসা আপনার পুত্র আসাতুল্লাকে (সরফরাজ খাঁ) লইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেবল পিতাপতির মনোমালিন্য তাঁহার নিবাসের কারণ নহে, তিনি স্বামীর চরিত্রদোষের জন্য তাঁহার উপর বিরাগবশতঃ উড়িষ্যায় যাইতে অভিলাষিণী হইলেন না।* সুজা উদ্দীন উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় ঔদার্য্যে ও সুবিচারে প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টি করিয়া নির্ব্বিবাদে তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মির্জা মহম্মদ ও তৎপুত্রদ্বয় হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দ্দী।

সুজার উড়িষ্যায় অবস্থানকালে মির্জা মহম্মদনামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। মির্জা আফসারবংশীয়া সুজার কোন আত্মীয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে দুইটী পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ হাজী আহম্মদ ও কনিষ্ঠ মির্জা মহম্মদ আলি, † এই মির্জা মহম্মদ আলি পরিশেষে আলিবর্দ্দী খাঁ নামে পরিচিত হইয়া বাঙ্গলার

* Mutaqherin, English Translation vol 1. p, 297. Stewart p. 260.
† তারিখ বাঙ্গলায় ও রিয়াজে মির্জা বন্দী লিখিত আছে।

ইতিহাসের একটী জ্বলন্ত নক্ষত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মির্জা মহম্মদ আজিম সাহের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রভুর মৃত্যুর পর কোন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকায়, দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিপতিত হন। তাঁহার পরিবারবর্গ পালন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা মহম্মদ আলির পরামর্শে তিনি দিল্লী হইতে আপনার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যায় সুজার নিকট উপস্থিত হন। সুজা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন করিয়া তাঁহাকে আপনার অধীনে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর মির্জা মহম্মদ আলিও উড়িষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতাবলে দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের কার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুজা তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন। অবশেষে মির্জা-মহম্মদ আলি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদকে সপরিবারে উড়িষ্যায় আসিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলে, হাজী আহম্মদও ১৭২২ খৃঃঅব্দে উড়িষ্যায় আসিয়া সরকারে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।* উভয় ভ্রাতার যশোগরিমা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

* হাজী দিল্লীতে সম্রাটের জহরতরক্ষক ছিলেন। কথিত আছে, কয়েকটী জহরত আত্মসাৎ করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য মক্কায় গমন করেন ও হাজী উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা সম্ভবযোগ্য নহে, কারণ তৎকালিক উজীর খাঁ দুরান উভয় ভ্রাতার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কটকে আসার সময় তাহা লইয়া আসেন। হাজী এরূপ অপকর্ম্ম করিলে খাঁ দুরান কদাচ প্রশংসাপত্র দিতেন না। (Holwells Historical Events Pt. I Page 59-60) তারিখ বাঙ্গলায়ও জহরতচুরির কথা আছে। কিন্তু হলওয়েল সাহেবের মন্তব্যই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। হলওয়েল সাহেব বলেন যে, হাজী প্রথমতঃ নবাব সুজা উদ্দীনের

মির্জা মহম্মদ আলি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা যোদ্ধৃকার্য্যে পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্বীয় মহিয়সী প্রতিভাবলে আপন পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হন।* এমন কি তৎকালে উড়িষ্যার দরবারে মির্জা মহম্মদ আলি অপেক্ষা কার্য্যতৎপর কেহই ছিলেন না। সুজা উদ্দীন তাঁহার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিবর্দ্দী খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। আমরা এক্ষণে তাঁহাকেই আলিবর্দ্দী বলিয়াই উল্লেখ করিব। হাজি আহম্মদও ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ লাভ করেন। †

কুলী খাঁ সুজা উদ্দীনের উপর অসন্তুষ্ট থাকায়, সরফরাজ খাঁকে আপনার মৃত্যুর পর বাঙ্গলার সুবেদারী পদ প্রদানের ইচ্ছা করিয়া

প্রধান খিতমতগার এবং আলীবর্দ্দী ছিলিমবর্দ্দার এবং পদাতিক নিযুক্ত হন। (Holwells Historical Events Pt 1. Pege 60) সুজা তাঁহাদিগকে এরূপ হীন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তারিখ বাঙ্গলায় তাঁহারা প্রথমতঃ মোসাহেবি করিতেন বলিয়া লিখিত আছে।

* Mutaqherin vol. 1. P. 299. কিন্তু তারিখ বাঙ্গলায় সুজার মুর্শিদাবাদের নবাবীপ্রাপ্তির পর, মির্জা মহম্মদ আলি, আলিবর্দ্দী খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

† হলওয়েল বলেন যে, আলিবর্দ্দী শীঘ্র জমাদার পদে উন্নীত হইয়া পরে অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ হন, হাজীও ক্রমে মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। Reflection নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন যে, হাজী আহম্মদ নিজের কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সুজা উদ্দীনকে বশীভূত করেন। সুজা উদ্দীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায়, হাজী সুজার ইন্দ্রিয়লালসার বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। এরূপ কথিত আছে যে, হাজী সুজার মনোরঞ্জনের জন্য আপনার কন্যাকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হলওয়েল বলেন যে, তাঁহারা এরূপ কথা কখনও শুনেন নাই। (Historical Events P. 61) তারিখ বাঙ্গলায়ও ঐরূপ ভাবের কথা আছে। বাস্তবিক উহা প্রবাদ ব্যতীত সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

দিল্লীতে আপনার প্রতিনিধিগণের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইহার জন্য অধিক পরিমাণে চেষ্টা করেন নাই, অল্প চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। যদি সুজা উদ্দীন সরফরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেন, তাহা হইলে মুর্শিদকুলী খাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত। সুজা খাঁ মুর্শিদের মনোগত ভাব অবগত হইয়া বাঙ্গলার সুবেদারীপ্রাপ্তির জন্য আলিবর্দ্দী ও হাজী আহম্মদের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন। উভয়ে তাঁহাকে দিল্লীতে বিচক্ষণ ও প্রগল্‌ভ দূত প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌, উজীর ও খাঁ দুরানকে আবশ্যকীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ-ক্রমে দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। এ দিকে অনেকগুলি সৈনিক কর্ম্মচারীকে নানাপ্রকার ছল করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হয়, এবং বর্ষা কাল উপস্থিত হওয়ায়, সুজা খাঁ আপনার সৈন্য সকল পাঠাইবার জন্য অনেক গুলি নৌকা সঙ্গে করিয়া কটক ও মুর্শিদা-বাদের পথে কুলী খাঁর স্বাস্থ্যানুসন্ধানের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। দিল্লী হইতে সংবাদ পাইবার জন্য দিল্লীর পথেও লোক নিযুক্ত হইল। অবশেষে যখন সংবাদ আসিল যে, ৫।৬ দিবসের মধ্যে জাফর খাঁর প্রাণবিয়োগ হইতে পারে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ আলি-বর্দ্দী খাঁকে সঙ্গে লইয়া কতিপয় অনুচর ও সৈন্যের সহিত মুর্শিদাবাদা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মহম্মদ তকী খাঁর * উপর উড়িষ্যার শাসনভার অর্পিত হইল।

সুজার বাঙ্গলার সুবেদারীপ্রাপ্তি।

* Holwell বলেন যে, মহম্মদ তকীও জাফর খাঁর কন্যার গর্ভসম্ভূত, তিনি জ্যেষ্ঠ। হলওয়েলের মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

মুর্শিদাবাভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে তাঁহারা মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহার দুই এক দিন পরে মেদিনীপুরের পথে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবেদারীর সনন্দ আসিয়া পঁহুছিল। যে স্থানে উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হন, তথায় ক্ষণ-কাল বিশ্রাম করিয়া ভবিষ্য মঙ্গলাশায় পুলকিত হইয়া সুজা উক্ত স্থানকে 'মোবারক-মঞ্জিল' অর্থাৎ মঙ্গলভূমি আখ্যা প্রদান করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াই মুর্শিদকুলী খাঁর নির্ম্মিত চেহেল সেতুনে গমন করেন, ও যাবতীয় কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে সনন্দ পাঠ করিতে অনুমতি দেন। তৎপরে মসনদে উপবিষ্ট হইয়া নাগরাবাদকদিগকে এই ঘটনা ঘোষণা করার জন্য আদেশ দিয়া, সকলের নিকট হইতে নজর ও উপহার লইতে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজ খাঁ এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি আপনাকে মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী ও প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য বিবেচনা করিয়া কেল্লা হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে স্বীয় ভবনে নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। নগরমধ্যে যে এইরূপ ঘটনা হইতেছে তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। নাগরার শব্দ কর্ণগোচর হওয়ায়, কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রধান প্রধান সভাসদকে উপায় স্থির করার জন্য অনুরোধ করায় সকলে তাঁহাকে পিতার বশ্যতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা সরফরাজকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যখন সুজা সিংহাসন, নগর ও রাজকোষ সমস্তই অধিকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার বশ্যতা, স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সরফরাজ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার পদ চুম্বন ও

তাঁহাকে নজর প্রদান করিলেন। পরে যাবতীয় বিদ্বেষ ভাব বিস্মৃত হইয়া পিতার সুবেদারী প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজ্যশাসনের বন্দোবস্ত।

সুজা উদ্দীন পুত্রের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া এবং স্বীয় প্রণয়িণীর সহিত পুনর্ব্বার মিলনের আশায় সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গলার দেওয়ানী পদে স্থায়ী রাখিলেন। উক্ত কার্য্য পরিচালনার্থ আয়ব্যয়সংক্রান্ত জ্ঞানেরও বিশেষ রূপ কার্য্য-তৎপরতার আবশ্যক থাকায়, রায় আলমচাঁদ নামক জনৈক হিন্দু সরফরাজের সহকারী নিযুক্ত হন। আমলচাঁদ পূর্ব্বে সুজার খাস দেওয়ানীর কার্য্য করিতেন, এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে নায়েব দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করায়, সরফরাজ আপন কার্য্যভার অনেক পরিমাণে লঘু বোধ করিতে লাগিলেন। নবাব সুজা খাঁও বাঙ্গলার দেওয়ানী কার্য্য উত্তম রূপে পরিচালিত হইবে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নবাব সুজা উদ্দীন বাঙ্গলার শাসনভার পরিচালনের জন্য একটী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাহাতে হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দ্দী খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় রায় আলম-চাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে মনোনীত করা হয়। আলমচাঁদ

* Mutaqherin vol. I. P. 302. পিতাপুত্রের মিলনসম্বন্ধে তারিখ বাঙ্গলায় আর এক প্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সরফরাজ খাঁ পূর্ব্ব হইতেই সুজা উদ্দীনের আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু স্বীয় মাতা ও মাতামহীর অনুরোধে বাঙ্গলার দেওয়ানীতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া, অগ্রসর হইয়া পিতাকে নগরমধ্যে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসাদের ভারার্পণ করিয়া আপন আবাস স্থান নেক্‌টাখালিতে বাস করিতে লাগিলেন. এবং তদবধি পিতার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

ও ফতেচাঁদ অত্যন্ত কার্য্যতৎপর ও রাজস্বসংক্রান্ত জ্ঞানে দেশ-বিখ্যাত ছিলেন। আলমচাঁদের রাজস্বসংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য সুজা খাঁর অনুরোধে বাদসাহ তাঁহাকে 'রায়রয়ান' উপাধি প্রদান করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের কোন কর্ম্মচারী উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।* নবাববংশীয়েরা ক্রমে দেওয়ানী পরিত্যাগ করিলে, রায়রায়ানগণই দেওয়ান ও রাজস্ব বিষয়ে প্রধান হইয়া উঠেন। আলমচাঁদই প্রথমে নায়েব দেওয়ান হইতে প্রধান দেওয়ানের পদ লাভ করেন। কোম্পানীর সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত রায়রায়ানের পদ প্রচলিত ছিল। এই প্রকারে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া সুজা উদ্দীন ন্যায়সহকারে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকার্য্যে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র রাজ্যমধ্যে তাঁহার সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য জমীদারগণকে কারামুক্ত করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে যে সকল জমীদার বন্দী অবস্থায় ছিলেন, সুজা প্রথমতঃ তাঁহাদের মধ্যে নিরপরাধদিগকে একেবারে মুক্ত করিয়া দেন। যাঁহাদিগকে কিছু দোষী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদিগকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া এই রূপ বলিয়া দেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা আপনাদের রাজস্বপ্রদানে ক্রটি করিলে তাঁহাদের জমীদারী অন্যকে দেওয়া হইবে। জমীদারদিগকে মুক্তি দিয়া তিনি তাঁহাদিগের কর ভারেরও লাঘব করেন, যদিও পরিশেষে অধিক পরিমাণে আবওয়াব প্রচলিত হওয়ায়, জমীদার ও প্রজা উভয়কেই ভারগ্রস্ত হইতে

* তারিখ বাঙ্গলা ও রিয়াজুস্ সালাতীন।

হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি এরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের জমীদারীর কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য যত্নবান হন, ও তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে আর তাঁহাদিগকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না, এবং ইহাও বলিয়া দেন যে, যেমন তাঁহারা নিজে অনেক দিন হইতে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেইরূপ কষ্ট যেন প্রজাবর্গকে দেওয়া না হয়। হাজী আহম্মদের পরামর্শক্রমে জমীদারদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। * জমীদারেরা তাঁহার কথায় প্রতিশ্রুত হইলে, সকলকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইল। পরে প্রত্যেককে আপনাপন মর্য্যাদানুসারে খেলাৎ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, এবং জগৎশেঠের দ্বারা তাঁহাদের রাজস্ব প্রদানের আদেশ দেওয়া হইল। এই রূপে সুজা উদ্দীনের রাজত্বকালে জমীদারগণ কষ্টভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। জমীদারগণকে কারামুক্ত করিয়া সুজা রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। সরফরাজ খাঁর উপর বাঙ্গলার দেওয়ানী ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মহম্মদ তকী খাঁ উড়িষ্যার ও নবাবের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁর উপর ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিমীর পদ প্রদত্ত হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দীন সেই পদে নিযুক্ত হন। আলিবর্দ্দীর আত্মীয়গণও তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যা-

* Holwell's Interesting Historical Events Part I. Chapt. II. Page 35.

ত্রয়ের পরিণয় সংঘটিত হইয়াছিল। নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহাদিগকেও এক একটী পদ প্রদান করিলেন। জ্যেষ্ঠ নওয়াজেস মহম্মদ বক্সীর পদে নিযুক্ত হইলেন। * দ্বিতীয় সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে রঙ্গপুরের ও কনিষ্ঠ জৈনুদ্দীনকে আলিবর্দ্দীর পরে রাজমহালের ফৌজদারী পদে নিযুক্ত করা হইল। সুজাকুলী খাঁ নামে তাঁহার এক পুরাতন কর্ম্মচারী হুগলীর ফৌজদারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপে সমুদায় প্রদেশে শাসনের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি সম্রাট মহম্মদ সাহের নিকট মুর্শিদকুলী খাঁর নিজ সম্পত্তির কতকাংশ † সহিত অনেক টাকা, কতিপয় হস্তী, অশ্ব ও অনেকানেক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া বাঙ্গলার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে সুদৃঢ় হইয়া সাতহাজারী মন্সবদারী ও তৎসঙ্গে মোতামিন উল মুল্ক, সুজা উদ্দৌলা সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ বাহাদুর আসদজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুজা উদ্দীন মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায় বৎসরের শেষে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। জগৎশেঠের দ্বারাই তাহা দিল্লীতে প্রেরিত হইত। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় সৈন্যসংখ্যা অল্প থাকায়, সুজা তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি রাজ্যের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়বিধ বাণিজ্যেরই উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয়দিগের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সেই জন্য তিনি রাজ্যমধ্যে চৌকী বা শুল্ক আদায়ের স্থানের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ‡

* তারিখ বাঙ্গালায় লিখিত আছে যে, নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ প্রথমে চবুতরার দারোগা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

† মুর্শিদকুলীর প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল।

‡ Holwell.

রাজ্যশাসনের নানা রূপ বন্দোবস্ত করিয়া সুজা খাঁ বঙ্গরাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্তের চেষ্টা করেন। তিনি জমীদারদিগকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাদের করভারের লাঘব করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি কুলী খাঁর জমা কামেল তুমারীর সংশোধন করিয়া বাঙ্গলার জমীদারী বন্দোবস্ত স্থায়ী করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যদিও তাঁহাকে খালসার রাজস্বের সামান্য পরিমাণে লাঘব করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি জায়গীর ভূমির রাজস্ব সমভাবে রাখিয়া ও আবওয়াবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কুলী খাঁর সময় অপেক্ষা বরঞ্চ বঙ্গরাজ্যের আয় বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। কুলী খাঁর সময়ে খালসার রাজস্ব ১,০৯, ৬০, ৭০৯ ও জায়গীর ভূমির ৩৩, ২৭, ৪৭৭ টাকা মাত্র ছিল। তাঁহার মোট রাজস্ব ১, ৪২, ৮৮, ১৮৬ টাকায় আবওয়াব খাসনবিসী ২,৫৮, ৮৫৭ টাকা যুক্ত হইয়া ১, ৪৫, ৪৭, ০৪৩ টাকা আয় নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু সুজা খাঁর খালসার রাজস্বের কেবল ৪২, ৬২৫ টাকা লাঘব করিয়া ১,০৯,১৮,০৮৪ টাকা খালসার ও কুলী খাঁর সময়ের ৩৩, ২৭, ৪৭৭ টাকা জায়গীর জমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ১, ৪২, ৪৫, ৫৬১ টাকা ভূমির রাজস্ব স্থির করেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে চারিটী আবওয়াব বৃদ্ধি হইয়া তাহা হইতে ১৯, ১৪, ০৯৫ টাকা আয় হইত। ইহার সহিত কুলী খাঁর খাসনবিসী যুক্ত হইয়া কেবল আবওয়াব হইতেই ২১, ৭২,৯৫২ টাকা আয় হইতে দেখা যায়। সুতরাং সুজা খাঁর সময়ে বঙ্গরাজ্যের সম্পূর্ণ আয় ১, ৬৪, ১৮, ৫১৩ টাকা হইয়া উঠে। তাহা হইলে কুলী খাঁর সসয় অপেক্ষা সুজা খাঁর সময়ে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা আয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। সুজা খাঁ আবওয়াবের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলেও তাঁহার সদ্ব্যবহারের

সুজা খাঁর রাজস্ব-বন্দোবস্ত।

জন্য জমীদার ও সাধারণ লোকে অসন্তুষ্ট হয় নাই। সুতরাং কঠোরতাপ্রকাশ অপেক্ষা সদ্ব্যবহারে যে অনেক সময়ে সুচারু রূপে কার্য্য সম্পন্ন হয়, কুলী খাঁর ও সুজা খাঁর দৃষ্টান্ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক্ষণে আমরা সুজা খাঁর রাজস্ববন্দোবস্তের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সংশোধিত জমীদারী বন্দোবস্ত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুলী খাঁ সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া, তাহাদিগকে ২৫ জমীদারী বা এহতিমামবন্দীতে ও ১৩ জায়গীরে বিভাগ করেন। তাহার মধ্যে ২৫ জমীদারীতে যত টাকা রাজস্ব খালসা সরিফার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুজা খাঁ তাহা অতিরিক্ত মনে করিয়া তাহা হইতে ৪২, ৬২৫ টাকা নাজাই বাদ দেন, এবং খালসার জন্য কেবল ১, ০৯, ১৮, ০৮৪ টাকা উক্ত ২৫ জমীদারীতে নির্দ্দেশ করেন। বাঙ্গলা ১১৩৫ সাল বা ১৭২৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার এই সংশোধিত জমা বন্দোবস্ত হয়। আমরা উক্ত ২৫ জমীদারীর ও তাহার অধিকারিগণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণসহ * প্রত্যেক জমীদারীতে কত টাকা সংশোধিত জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া জায়গীর ভূমির বিবরণ ও সুজা খাঁর সময়ে কিরূপ ভাবে আবওয়াব প্রচলিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতেছি।

* অধিকারিগণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বঙ্গদেশে জমীদারগণ কার্য্যতঃ উত্তরাধিকারীক্রমেই জমীদারীর অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। যদিও সরকার নিজ হস্তে সে অধিকারপ্রদানের ক্ষমতা রাখিয়াছিলেন।

প্রায় সমগ্র বৰ্দ্ধমান চাকলা ব্যাপিয়া, এবং হুগলী ও মুর্শিদাবাদের কোন কোন পরগণা লইয়া বৰ্দ্ধমান জমীদারী বিস্তৃত ছিল। এই প্রসিদ্ধ জমীদারীর উর্ব্বর ভূখণ্ডে ধান্য, তূলা, রেশম, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। বৰ্দ্ধমান, রূপী, রাধানগর, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি ইহার তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগর বলিয়া অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অবুরায় নামে একজন কপূর ক্ষত্রিয়বংশীয় পঞ্জাবী বৰ্দ্ধমানের কোতোয়াল ও তাহার নিকটবৰ্ত্তী কোন কোন স্থানের চৌধুরী বা রাজস্বসংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হন। এই আবুরায়ই বৰ্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র বাবুরায় বৰ্দ্ধমান এবং আরও তিনটী পরগণার জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাবুরায়ের পুত্র ঘনশ্যামও পৈতৃক জমীদারী লাভ করেন, পরে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরাম রায় বৰ্দ্ধমান জমীদারীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরায়ের সময় সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং কৃষ্ণরাম রায়কে তাহাতেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহাবসানে কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম রায় পৈতৃক জমীদারী ও বাদসাহ আলমগীরের নিকট হইতে ফার্ম্মান প্রাপ্ত হন। জগৎরামই বৰ্দ্ধমান রাজবংশের প্রথম রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। জগৎরামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কীৰ্ত্তিচন্দ্র বৰ্দ্ধমানেশ্বর হন। কীৰ্ত্তিচন্দ্রের গৌরব-কাহিনী সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রকোণা, বৰ্দ্দা, বালঘরা; এবং বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের অনেক ভূভাগ আপনার জমীদারীভুক্ত করিয়া লন। কীৰ্ত্তিচন্দ্রেরই সহিত ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বৰ্দ্ধমান জমীদারীর বন্দোবস্ত করেন। বৰ্দ্ধমান জমীদারীতে বৰ্দ্ধমান চাকলার বৰ্দ্ধমান, আজমসাহী, মজঃ-

১ বৰ্দ্ধমান।

ফরসাহী, জাহানাবাদ, বর্দ্ধা, চেতোয়া, সেরগড়, গোয়ালাভূম, হাবিলী সেলিমাবাদ, পাণ্ডুয়া, বেলিয়া-বসেন্দরী, ভূরস্থট, তিনহাটি, ও মুর্শিদাবাদ চাকলার মনোহরসাহী প্রভৃতি সমুদয়ে ৫৭ পরগণা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ২০, ৪৭, ৫০৬ টাকা সংশোধিত জমা বন্দোবস্ত হয়।

২ রাজসাহী।

মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, ভূষণা প্রভৃতি চাকলা ব্যাপিয়া বিস্তৃত রাজসাহী জমীদারী অবস্থিত ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে তৎকালে এরূপ সুবৃহৎ জমীদারী দৃষ্ট হইত না। উদয়নারায়ণের রাজসাহী, সীতারামের নলদী, সর্ব্বাণীর ভাতুড়িয়া প্রভৃতি লইয়া সাধারণতঃ এই জমীদারীর সৃষ্টি হয়। পরে বহুসংখ্যক পরগণা ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৭-২৫ খৃঃ অব্দে নাটোররাজ রামজীবনের সহিত রাজসাহীর নূতন বন্দোবস্ত হয়। কিরূপে রাজসাহী জমীদারী নাটোরবংশীয়দিগের হস্তে আইসে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিস্তৃত জমীদারীতে ধান্যাদি নানাবিধ শস্য, তূলা ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেশম এবং স্বভাবজাত ও শিল্পজাত অসংখ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইত। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে রেশমী বস্ত্র ও গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যই প্রধান। রাজধানী মুর্শিদাবাদ, চূণাখালি, কাশীমবাজার ভগবানগোলা, বোয়ালিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গ এই বিশাল জমীদারীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। রাজসাহী জমীদারীর রাজসাহী বিভাগে চাকলা মুর্শিদাবাদের আকবরসাহী, চূণাখালি, গোপীনাথপুর, ফতেজঙ্গপুর, গোয়াস, গয়সাবাদ, কুমারপ্রতাপ, বহুরুল, মহালন্দী, পাটকাবাড়ী, কিসমৎ পলাশী, রাজসাহী, রুকুনপুর, সুলতানাবাদ ইত্যাদি; ভাতুড়িয়া বিভাগে চাকলা ঘোড়াঘাট প্রভৃতির আমরুল,

আমীরাবাদ, ভাতুড়িয়া, চৌগ্রাম, গঙ্গারামপুর, হরিয়াল, মালঞ্চী, প্রতাপবাজু, সোনাবাজু, উজীরাবাদ, ভালুকা ইত্যাদি; নলদী বিভাগে ভূষণা চাকলার আমীরাবাদ, আরঙ্গাবাদ, বাজুরস্ত, মামুদ-সাহী, নলদী, নসারৎসাহী ইত্যাদি; এবং সেরপুর, কাশীমনগর প্রভৃতি খুচরা মহাল অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে ইহার আয়তন আরও বর্দ্ধিত হইয়া রাণী ভবানীর সময়ে রাজসাহী একটী বিস্তৃত রাজ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সুজা খাঁর সময়ে ইহার ১৩৯ পরগণায় ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

ও দিনাজপুর।

চাকলা ঘোড়াঘাটের অধিকাংশ ও আকবরনগরের অনেক ভূভাগ লইয়া দিনাজপুর বা হাবিলী পিঁজরা জমীদারী বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত জমী-দারীতে ধান্যাদি শস্য, তৈল, ঘৃত, মোটা রেশম, গুড়, আদা, লঙ্কা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত, এবং ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্যাদি শস্য, তৈল ও ঘৃত বিক্রয়ার্থে ভগবান-গোলার বাজারে আসিত। ইহাতেও অনেকগুলি আড়ঙ্গ অবস্থিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে দিনাজপুরের কালীমন্দিরে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ রাজা কংসবংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। এই কংস ইতিহাসে গণেশ নামে অভিহিত হন, এবং তিনি গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। উক্ত কালিকা দেবীর ও কালিয়া নামে কৃষ্ণ মূর্ত্তির হাবিলী পিঁজরায় অনেক সম্পত্তি ছিল। সেই সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় বিষ্ণুদত্ত নামক কাননগোর পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া উক্ত দেবদেবীর সেবায়ত হন। ক্রমে তিনিও অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত নায়েব

কাননগোর কার্য্যও করিতেন বলিয়া শুনা যায়। শ্রীমন্ত আপনার সম্পত্তি পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমভাগে বিভাগ করিয়া দেন, কিন্তু অল্প বয়সে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইলে দৌহিত্র শুকদেব ঘোষ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। শুকদেবের পিতা হরিরাম ঘোষ বর্দ্ধমানের মনোহরসাহীতে বাস করিতেন। যে সময়ে দিনাজপুরের জমীদারগণ প্রবল হইয়া উঠেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে ইদ্রাকপুর বা বর্দ্ধনকুঠীর জমীদারগণ উক্ত প্রদেশের প্রধান জমীদার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সময়ে প্রাচীন আরঙ্গাবাদ বা দিনাজপুর প্রদেশের অনেক ভূভাগ উভয় জমীদারীর অন্তর্নিবিষ্ট হয়। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাণনাথ কান্তনগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা রামনাথের সময় তাহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। কুলী খাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে রামনাথের সহিত দিনাজপুর জমীদারীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রামনাথ প্রচুর অর্থের অধীশ্বর ছিলেন। সময়ে সময়ে সরকারের প্রয়োজনানুসারে অর্থের সরবরাহ করিতেন বলিয়া, তাঁহার জমীদারী আমীন বা ক্রোকসাঁজোয়ালের হস্তে পড়ে নাই। দিনাজপুররাজ অন্যান্য জমীদার অপেক্ষা এই নূতন অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত হয় যে, রামনাথ ভূগর্ভে প্রোথিত বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় জমীদারীর সুবন্দোবস্ত ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিয়া প্রচুর সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। দিনাজপুর জমীদারী বিস্তৃত হইলেও, তাহাতে অনেক পতিত ও অনাবাদী জমী ছিল, রামনাথ সেই সমস্ত জমীর চাষের সুন্দর রূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার সময়ে দিনাজপুর জমীদারীর অত্যন্ত উন্নতি হয়।

দিনাজপুর জমীদারীতে চাকলা ঘোড়াঘাটের আপোল, বৃদ্দনগর, খিলাবাড়ী, হাবিলী পিঁজরা, ফতেজঙ্গপুর, পুরুষবন্দ, আঁধুয়া, বেরবেল্লা ইত্যাদি এবং চাকলা আকবরনগরের দেবহাট, মেকম্বুন, মেহেদীমাঠ প্রভৃতি পরগণা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পরগণার সংখ্যা ৮৯, ও ৪, ৬২, ৯৬৪ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হয়।

বৰ্দ্ধমান, হুগলী বা সাতগাঁ, যশোহর, ভূষণা ও ঘোড়াঘাট চাকলায় নদীয়া, উখড়া, বা কৃষ্ণনগর জমীদারী অবস্থিত ছিল। এই জমীদারী হইতে ধান্য, নানা প্রকার কলায়, তুলা, গুড়, লঙ্কা, প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। শান্তিপুর, নদীয়া, বুড়ন প্রভৃতি ইহার প্রধান স্থান ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণনগর এই জমীদারীর রাজধানী। কৃষ্ণনগর রাজবংশীয়েরা রাজা আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আগত ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণের বংশধর। ভট্টনারায়ণের সময় হইতে তাঁহারা ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার আয়তন বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলেন। নদীয়া রাজবংশ তাঁহাদের আদিপুরুষ দুর্গাদাস সমদ্দার বা ভবানন্দ মজুমদার হইতে দেশ মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। দুর্গাদাস কাননগোর কার্য্য করিয়া ভবানন্দ মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ মজুমদার যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য রাজা মানসিংহকে অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়া মহৎপুর, নদীয়া, মারূপদহ প্রভৃতি ১৪ পরগণার জমীদারী প্রাপ্ত হন। তাহার কয়েক বর্ষ পরে আবার বাদসাহের অনুগ্রহে উখড়া, ভালুকা, ইস্মাইলপুর, ইস্লামপুর প্রভৃতি পরগণার জমীদারী পাইয়াছিলেন। ক্রমে নদীয়া জমীদারীর আয়তন বৰ্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। ভবানন্দের পৌত্র রাঘব রেউই গ্রামে আপনা-

৪ নদীয়া।

দের আবাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন ; রাঘবের পুত্র রুদ্র তাহার কৃষ্ণনগর নাম প্রদান করেন। এই কৃষ্ণনগরে অদ্যাপি নদীয়া রাজ-বংশীয়েরা অবস্থিতি করিতেছেন। রুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র, পরে তৎসহোদর রামজীবন রাজা হন। সুবেদার ও হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে রামজীবনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও ঢাকার কারাগারে প্রেরণ করিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নদীয়ার জমীদারী লাভ করেন। এই রামকৃষ্ণের সময় সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। রাজস্বপ্রদানে অশক্ত হওয়ায় রামকৃষ্ণ ঢাকায় বন্দী হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার ভ্রাতা রামজীবন কারা-মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৈতৃক জমীদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজস্ব-প্রদানের ত্রুটির জন্য তাঁহাকেও দ্বিতীয়বার মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হয়। সেই সময়ে তাঁহার পুত্র রঘুরাম রাজসাহীর উদয়-নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কুলী খাঁর নিকটে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। রামজীবনের পর রঘুরাম কৃষ্ণনগর জমীদারী প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহাকেও রাজস্বপ্রদানের অশক্ততার জন্য অনেক বার কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রঘুরামের সহিতই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নদীয়া জমীদারীর বন্দোবস্ত করেন। রাজা রঘুরামের পুত্রই দেশপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। নদীয়া জমীদারীর মধ্যে চাকলা হুগলীর অন্তর্গত উখড়া, এঙ্গুরিয়া, ইস্‌লামপুর, ঘাটিয়া, কিসমৎ কলিকাতা, মাগুরাগড়, পাঁচপুর, নদীয়া, সুল্‌তানপুর ইত্যাদি, চাকলা যশোহরের অন্তর্গত বাঘমারা, ধুলিয়াপুর, চার-ঘাট ইত্যাদি, চাকলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলগাঁ, বহুরুল ইত্যাদি, চাকলা ভূষণার অন্তর্গত হুলদা, চণ্ডিয়া, জগন্নাথপুর প্রভৃতি ও চাকলা বর্দ্ধমানের কুতুবপুর ইত্যাদি, এবং ঘোড়াঘাটের ইসুফসাহী

প্রভৃতি ৭৩ পরগণা অবস্থিত ছিল। তাহার জমার পরিমাণ ৫,৯৪, ৮৪৬ টাকা।

বীরভূম।

চাকলা মুর্শিদাবাদ ও চাকলা বৰ্দ্ধমান ব্যাপিয়া এই বৃহৎ মুসল্মান জমীদারী বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গলার সমস্ত মুসল্মান জমীদারীর মধ্যে বীরভূমই বৃহত্তম ও সৰ্ব্বপ্রধান। বীরভূম জমীদারী হইতে রেশম, লাক্ষা, ধান্য, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। নগর ও ইলামবাজার ইহার প্রধান স্থান ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে যৎকালে বাঙ্গলায় পাঠান-প্রাধান্যের একেবারে বিলোপসাধন হয় নাই, অথচ তাঁহাদের ক্ষমতা ক্রমশঃ খৰ্ব্ব হইতেছিল, সেই সময়ে আসাহুল্লা ও জোনাদ খাঁ নামে ভ্রাতৃদ্বয় বীরভূমের হিন্দু রাজার অধীনে সামান্য রূপ কৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বীরভূম জমীদারী হস্তগত করেন। সেই সময় নগর বা রাজনগর বীরভূমের রাজধানী ছিল। জোনাদ খাঁর পুত্র বাহাদুর বা রণমস্ত খাঁ বীরভূম জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া মোগল বাদসাহের অধীনে ঝারখণ্ড প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশের রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গ-রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য আদিষ্ট হন, এবং সৈন্য প্রভৃতি রক্ষার জন্য বীরভূম প্রদেশ এক রূপ জায়গীরস্বরূপে লাভ করেন। সেই-জন্য তাঁহাদিগকে বীরভূম জমীদারীর অতি সামান্য মাত্র কর প্রদান করিতে হইত। রণমস্ত খাঁর পৌত্র আসাহুল্লা খাঁ অত্যন্ত সাধু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারই সহিত মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে বীরভূমের বন্দোবস্ত করেন। আসাহুল্লার পুত্র বদ্য-উল-জমন খাঁর সহিত ইহার নূতন বন্দোবস্ত হয়। বীরভুম জমীদারীতে চাকলা মুর্শিদা-বাদের আকবরসাহী, কিসমৎ বাৰ্ব্বাক সিং, ভূরকুণ্ড, স্বরূপসিংহ, মল্লেশ্বর, ও চাকলা বৰ্দ্ধমানের বীরভূম, সেনভূম প্রভৃতি পরগণা

অবস্থিত ছিল। ২২ পরগণায় ৩, ৬৬, ৫০৯ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুতানটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও তাহার নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারগণের কতকগুলি তালুক লইয়া কলিকাতা জমীদারীর বন্দোবস্ত হয়। চাকলা হুগলী বা সাতগাঁর মধ্যে এই জমীদারী অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই সমগ্র জমীদারীর ২৪টী পরগণা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে আইসে, এবং লর্ড ক্লাইবের জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কলিকাতা, মদনমল, মাগুরা, মুড়াগাছা, গড়িয়াগড়, পাইকান, কিসমৎ আমীরাবাদ প্রভৃতি পরগণা এই জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। ২৭ পরগণায় ২,২২,৯৫৮ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

৬
কলিকাতা।

বিষ্ণুপুর জমীদারী বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্গত ছিল। বিষ্ণুপুর-রাজগণ এক রূপ স্বাধীন ভাবেই অবস্থিতি করিতেন। কেবল মোগল বাদসাহদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে সামান্য নজরানা বা পেস্কশ মাত্র প্রদান করিতে হইত। মুসল্মান-বিজয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা আপনাদিগের রাজ্যের স্বাধীন অধীশ্বর ছিলেন। পাঠানেরা কখনও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বশে আনয়ন করিতে পারেন নাই, মোগলেরাও কখন তাঁহাদের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ রূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশীয় রঘুনাথ বা আদিমল্ল এই বংশের আদিপুরুষ। তিনি মুসল্মান-অধিকারের প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্য্যের উপদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৭
বিষ্ণুপুর।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ সিংহ প্রথমে সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্য অধিকৃত হইলে, ক্রমে বিষ্ণুপুররাজগণ মোগলের বশ্যতা স্বীকার ও সাম্রাজার সময় হইতে তাঁহারা সামান্য রূপ নজরানা বা পেস্কশ যথা-রীতি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদকুলীর রাজত্বের প্রারম্ভে রাজা দুর্জ্জন সিংহ বর্ত্তমান ছিলেন। কুলী খাঁ তাঁহারই সহিত প্রথমে বিষ্ণুপুরের বন্দোবস্ত করেন, এবং ফসলী ১১১২ বা ১৭০৭-৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার নাম প্রথমে খালসা সেরেস্তায় লিখিত হইয়াছিল। দুর্জ্জন সিংহের পুত্র গোপাল সিংহের সহিত ইহার নূতন বন্দোবস্ত হয়। বিষ্ণুপুর ও সেরপুর ২ পরগণার ১, ২৯, ৮০৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

৮ ইসুফপুর।

ইসুফপুর বা যশোহর জমীদারীর অধিকাংশ যশোহর চাকলায় ও কতকাংশ হুগলী চাকলায় অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশীয় ভবেশ্বর রায় দিল্লীর সেনাপতির অধীনে সেনানীর কার্য্য করিয়া সৈদপুর প্রভৃতি পরগণার জমীদারী লাভ করেন। ভবে-শ্বরের পুত্র মহাতপ রায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মহাতপের প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম রায়কে কুলী খাঁ ইসুফ-পুর বা যশোহর জমীদারীর সনন্দ প্রদান করেন। ইসুফপুরের জমীদারেরা এক্ষণে চাঁচড়ার রাজা নামে প্রসিদ্ধ। ইসুফপুর জমীদারীতে যশোহর চাকলার সৈদপুর, ইসুফপুর, নলদী, জাগুলিয়া, দাঁতিয়া, বাজিতপুর, ভেলা প্রভৃতি ও হুগলী চাকলার ধূলিয়াপুর প্রভৃতি পরগণা অন্তর্নিবিষ্ট হয়। তাহার ২৩ পরগণায় ১, ৮৭, ৭৫৪ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

রাজসাহী জমীদারীসংলগ্ন, এবং কাশীমবাজার দ্বীপের পর পারেও তাহার অন্তর্গত কতক ভূখণ্ড লইয়া

৯ লস্করপুর।

চাকলা মুর্শিদাবাদ, আকবরনগর ও ঘোড়াঘাটের মধ্যে লস্করপুর বা পুঁটিয়া জমীদারী বর্ত্তমান ছিল। এই জমীদারীর আয়তন কথঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইলেও ইহার উর্ব্বর ভূমিতে নানাবিধ শস্য ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত। লস্করপুর প্রথমে লস্কর খাঁ নামে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরে বৎসরাচার্য্য নামে কোন সন্ন্যাসী সরকারের সাহায্য করায় উক্ত জমীদারী জায়গীরস্বরূপে প্রাপ্ত হন। এই বৎসরাচার্য্যই পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৎসরাচার্য্য বিষয়কার্য্যে অনুরক্ত না থাকায় তাঁহার পুত্র পীতাম্বর লস্করপুর জমীদারীর ভার গ্রহণ করেন। পুঁটিয়ার জমীদারগণ দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। পীতাম্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ প্রথমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার পুত্র রতিকান্ত ঠাকুর উপাধি লাভ করেন। উক্ত বংশের নরনারায়ণ ও দর্পনারায়ণের সময় নাটোরের কামদেব ও রঘুনন্দন তাঁহাদের সরকারে তহশীলদার প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন পরিশেষে পুঁটিয়ার উকীলও নিযুক্ত হন। রাজা অনুপনারায়ণের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁ লস্করপুর জমীদারীর বন্দোবস্ত করেন। লস্করপুর জমীদারীতে চাকলা মুর্শিদাবাদের লস্করপুর, মির্জ্জাপুর, ইস্‌লামপুর প্রভৃতি; চাকলা ঘোড়াঘাটের কাজীহাটী, তাহেরপুর ইত্যাদি ও চাকলা আকবরনগরের কোতোয়ালী, জেন্নেতাবাদ প্রভৃতি পরগণা অবস্থিত ছিল। ১৫ পরগণায় ১, ২৫, ৫১৬ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জমীদারীর কিছু কিছু ভূমি লইয়া রুকুণপুর জমীদারী গঠিত হইয়াছিল। এই ১০
জন্য বাঙ্গালার বহুদূর ব্যাপিয়া ইহা বিস্তৃত হয়। রুকুণপুর।
ইহার আয়তনও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, এবং সমগ্র জমীদারীই উর্ব্বর ভূখণ্ডে পরিপূর্ণ ছিল। বাঙ্গালার প্রধান ও প্রথম কাননগোগণকে রস্থমস্বরূপ এই জমীদারী প্রদান করা হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরডিহির উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মিত্রবংশসম্ভূত ভগবান রায় এই বংশের প্রথম কাননগো নিযুক্ত হন। এই কাননগোবংশীয়গণের মতে ভগবান আকবর বাদসাহের সময়ে কাননগো পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাস্থজার সময়ে তাঁহার নিয়োগ হয় বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। ভগবানের পর তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ, পরে ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণ কাননগোর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বাদসাহদরবার হইতে "বঙ্গাধিকারী" উপাধি লাভ করেন। হরিনারায়ণের সময়ে বাদসাহ আরঙ্গজেব এই কাননগো পদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ হরিনারায়ণকে ও অপরার্দ্ধাংশ দেবকীসিংহের পুত্র রামজীবনকে প্রদান করেন। তদবধি বঙ্গাধিকারিগণ অর্দ্ধাংশ কাননগোর পদ লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথম কাননগো বলিয়া অভিহিত হইতেন। হরিনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ কুলী খাঁর সময়ে প্রথম কাননগোর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে খালসার পেস্কারী পদ লাভ করিয়া কুলী খাঁর আদেশে বন্দী ও গতাসু হইলে, তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণকে রুকুণপুর জমীদারী প্রদান করা হয়। সুজা খাঁর সময়ে শিবনারায়ণ কাননগোর পদও লাভ করেন, এবং তাঁহার সহিত জমীদারীর রীতিমত বন্দোবস্ত

হয়। এই বৃহৎ জমীদারী বাঙ্গলার অনেক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া রুকুণপুর জমীদারীর আয়তনের পরিমাণ স্থির না হওয়ায়, ইহার কর অল্প পরিমাণে ধার্য্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ প্রধান কাননগো রাজস্ববিষয়ে এক রূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায়, তাঁহার জমীদারীর করবৃদ্ধির সম্ভাবনাও ছিল না। রুকুণপুর জমীদারীর পরগণাগুলির মধ্যে চাকলা মুর্শিদাবাদের চূণাখালি, ফেরোজপুর, চাঁদপুর, বহুরুল, বিল ভগবানপুর, মহলন্দী, রুকুণপুর, সেরসাবাদ; চাকলা বর্দ্ধমানের আরঙ্গাবাদ, বিনোদনগর; চাকলা হুগলীর মণ্ডলঘাট; চাকলা আকবরনগরের আকবরনগর, হাবিলী টাঁড়া, তেজপুর, দেরসার্ক; চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের সাগরদী, মোকেনাবাদ; চাকলা ভূষণার জাহাঙ্গীরাবাদ, পাই গাঁ, বাজুরস্ত; চাকলা ঘোড়াঘাটের আন্দেলগঞ্জ, সেরপুর, বার্ব্বাকপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমুদয় ৬২ পরগণায় ২, ৪২, ৯৪৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

১১ মামুদসাহী।

মামুদসাহী জমীদারী ভূষণা চাকলার মধ্যে অবস্থিত ছিল। সীতারাম রায় ইহার অধিকাংশেরই অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার উচ্ছেদের পর নলদী প্রভৃতি জমীদারী রাজসাহীর অন্তর্ভূত হইলে, মামুদসাহী জমীদারীর কতকাংশ নলডাঙ্গা রাজবংশীয়দের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত বন্দোবস্ত হয়। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে মামুদসাহীর কতকাংশের জমীদারী ভোগ করিতেন। উক্ত বংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুদেব হাজরা সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন; তিনি বাদসাহী সৈন্যের রসদ প্রদান করিয়া প্রথমে ৫ খানি গ্রামের জমীদারী লাভ করেন। তাহার পর শ্রীমন্ত রায় মামুদসাহীরও জমীদারী প্রাপ্ত হন। উক্ত বংশের চণ্ডীচরণ প্রথমে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীচরণের পর রামদেবের সহিত কুলী খাঁর বন্দোবস্ত হয়। মামুদ-সাহী জমীদারীর চাকলা ভূষণার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ, বাজুমাল, জাহাঙ্গীরাবাদ, মামুদসাহী, তারাডাঙ্গা প্রভৃতি পরগণাই প্রধান। ২৯ পরগণায় ১, ১০, ৬৩৩ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১২ ফতেসিংহ।

ফতেসিংহ জমীদারীর অধিকাংশই চাকলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ও তাহা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ রাজগণ পূর্ব্বে ইহার অধীশ্বর ছিলেন। রাজা মানসিংহের সময় জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ-বংশীয় সবিতা রায় ইহার অধিকার লাভ করেন। সবিতা রায়ের বংশধরগণের অনেক সৎকীর্ত্তিতে ফতেসিংহ পরিপূর্ণ। উক্ত বংশের ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র জগৎ, কালু প্রভৃতি সভা সিংহের বিদ্রোহে যোগ দান করায়, জমীদারী হইতে বঞ্চিতপ্রায় হইয়াছিলেন, পরে তদ্বংশীয়গণ অনেক কষ্টে জমীদারী পুনঃপ্রাপ্ত হন। সবিতা রায়ের বংশধর আনন্দচন্দ্র কুলী খাঁর সমসাময়িক। তিনি অপুত্রক প্রাণ ত্যাগ করিলে, সবিতাবংশীয়গণের অন্যতম বৈদ্যনাথের ভগিনীপতি সূর্য্যমণি চৌধুরী ফতেসিংহের জমীদারী লাভ করেন। এই সূর্য্যমণি বাঘডাঙ্গা রাজবংশের আদিপুরুষ, এবং সবিতার বংশধরগণই জেমোর রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সূর্য্যমণি আনন্দ-চন্দ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তদবধি ফতেসিংহ বাঘডাঙ্গার হস্তগত হয়। সূর্য্যমণির পুত্র হরিপ্রসাদের সহিতই কুলী খাঁ ফতে-সিংহ জমীদারীর নূতন বন্দোবস্ত করেন। কালক্রমে ফতেসিংহ পুনর্ব্বার সবিতাবংশীয়গণের হস্তে আসিয়া, পরে জেমো ও বাঘডাঙ্গা উভয় রাজবংশের মধ্যে বিভক্ত হয়। ফতেসিংহ জমিদারীর মধ্যে ফতেসিংহ, ইস্‌লামপুর, কীরিতপুর, গাঙ্গলা, চূণাখালি, প্রভৃতি

পরগণাই প্রধান। ১১ পরগণায় ১, ৮৬, ৪২১ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

চাকলা ঘোড়াঘাটের মধ্যে ইদ্রাকপুর জমীদারী অবস্থিত ছিল।

১৩ ইদ্রাকপুর। ইদ্রাকপুর ও দিনাজপুর এই উভয়কে পূর্ব্বে আরঙ্গাবাদ বলিত। ইদ্রাকপুরের জমীদারগণ সাধারণতঃ বৰ্দ্ধনকুঠীর জমীদার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহারা বারেন্দ্র কায়স্থবংশীয়। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইদ্রাকপুরের জমীদারগণের উল্লেখ দেখা যায়। রাজা রাজেন্দ্র এই বংশের প্রথম জমীদার। কিন্তু কোন্ সময়ে তিনি জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহার বহু পুরুষ পরে রাজা ভগবান্ ইদ্রাকপুরের জমীদারী লাভ করেন। * ভগবানের দেওয়ানের নামও ভগবান ছিল। রাজা ভগবানের সেরূপ বুদ্ধিমত্তা না থাকায়, দেওয়ান ভগবান ঢাকা হইতে আপনার নামে জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছু কাল গোলযোগের পর রাজা ভগবান জমিদারীর ৯ আনা ও দেওয়ান ৭ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। দেওয়ানের ৭ আনা পরে দিনাজপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। রাজা ভগবানের

* রাজেন্দ্র ও ভগবানের মধ্যে নিম্নলিখিত রাজগণের নাম পাওয়া যায়। ভগীরথ, নরোত্তম, কৃষ্ণদুলাল, নয়নকৃষ্ণ, শ্যামকৃষ্ণ, ভবানীকান্ত, দুর্গাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ, রামদুলাল, গোপীরমণ, অমরঘণ্ট, গৌরহরি, কৃষ্ণেন্দ্র ও এড়ম্বর। ভগবান উক্ত এড়ম্বরের পুত্র। ঘোড়াঘাটের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের বোর্ড অব রেভিনিউতে প্রেরিত ইদ্রাকপুরের রিপোর্ট হইতে ইদ্রাকপুর জমীদারীর বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কেহ কেহ ইদ্রাকপুরের জমীদারদিগকে দিনাজপুর রাজবংশের সংসৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে।

পুত্র মনোহর সাসুজার সুবেদারী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সময়ে মধু সিংহ নামে এক ব্যক্তি উক্ত ৯ আনার ৫ আনা অধিকার করে। মনোহর তাহার উদ্ধারের জন্য দিল্লী যাত্রা করিতে বাধ্য হন। পরে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ বাদসাহ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে তাঁহার রাজত্বের একাদশ বর্ষে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে সনন্দ লাভ করেন। উক্ত সনন্দে মধু সিংহের উচ্ছেদের ও রঘুনাথকে সমগ্র জমীদারী দেওয়ার কথা উল্লিখিত থাকে। সেই সময়ে কুণ্ডী, সেরপুর, পলাদশী প্রভৃতি পরগণা এই জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। রঘুনাথের পর তৎপুত্র রামনাথ জমীদার হন। রামনাথের পুত্র হরিনাথ বাদসাহ আরঙ্গজেবের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে আর এক সনন্দ লাভ করেন। তৎপুত্র বিশ্বনাথের সহিত ইদ্রাকপুর জমীদারীর নূতন বন্দোবস্ত হয়। বিশ্বনাথ সুজা খাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। প্রাচীন ঘোড়াঘাট নগর ইদ্রাকপুরের অন্তর্গত ছিল। বিশ্বনাথের পুত্র গৌরীনাথ কোম্পানীর সময়ের জমীদার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইদ্রাকপুর জমীদারীর মধ্যে চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইদ্রাকপুর, ইস্‌লামপুর, আলিগঞ্জ, বাজিতপুর, বাড়ী ঘোড়াঘাট, গাটনান, থেলশী, মুক্তিবপুর, বিন্দী, বেলঘাট, ভাঁয়েনকুণ্ড, সেরপুর-কানবালা, সেরপুর-নওয়াবাদ প্রভৃতি পরগণাই প্রধান। সমস্ত ৬০ পরগণায় ৮১, ৯৭৫ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

১৪
ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার রাজগণ প্রাচীন কাল হইতে স্বাধীন রাজ্যের নরপতি ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে আরাকানরাজ ও মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে সাজাহানের রাজত্বকালে সাসুজার সুবেদারী সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের কতকাংশ

মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া ৪ পরগণায় বিভক্ত ও সরকার উদয়পুর নামে অভিহিত হয়। ত্রিপুরারাজ রামমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নমাণিক্য মুর্শিদকুলী খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ধর্ম্মমাণিক্যের সহিত সুজা খাঁর সময়ে নূরনগর, মেহেরকুল প্রভৃতি ৪ পরগণায় ৯২,৯৯৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু জায়গীর ও হস্তীধরার খরচ ৪৫ হাজার টাকা বাদে খালসার জন্য ৪ পরগণায় ৪৭,৯৯৩ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল। সুজা খাঁর সময়েই ধর্ম্মমাণিক্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, মীর হাবীব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে উক্ত ৪ পরগণা * ২৪ পরগণায় বিভক্ত হইয়া চাকলা রোসেনাবাদ নাম ধারণ করে, ও ত্রিপুরারাজের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হয়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১৫
পঞ্চকোট।

বিষ্ণুপুরের ন্যায় পঞ্চকোট বা পাচেতও রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজগণের অধীন ছিল। ইঁহারা পূর্ব্বে বিহাররাজের অধীন ভূপতিরূপে গণ্য হইতেন। সেরসাহা কর্ত্তৃক বিহার রাজবংশের ধ্বংস হইলে, ইঁহারা পরিশেষে মোগল বাদসাহদিগকে পেস্কশ বা নজারানা মাত্র প্রদান করিতেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য মোগল বাদসাহ বা নবাবগণ ইঁহাদিগের রাজ্যের প্রতি বিশেষ কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজা গরুড়নারায়ণের সহিত প্রথমে পেস্কশের নূতন বন্দোবস্ত হয়।

* বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৪ পরগণার স্থলে নূরনগর, মেহেরকুল, বগাসাইর, তীক্ষা ও খণ্ডল এই ৫টী মূল পরগণা বলিতে চাহেন।
(রাজমালা ৫৭০ পৃ)

সুজা খাঁর সময়ে রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। পাঁচেত ও সেরগড় ২ পরগণার জন্য ১৮,২০৩ টাকা পেস্কশ দিতে হইত।

চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের অন্তর্গত সমস্ত ও ভূষণা, যশোহর ও ঘোড়াঘাটের কতক খালসা ভূভাগ লইয়া ১৬
জালালপুর প্রভৃতি জমীদারীর সৃষ্টি হয়। জালালপুর প্রভৃতি।
ইহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারী অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ছিল। জাফর খাঁর সময় হইতে ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে এক জন নায়েব নাজিম ও দেওয়ান থাকিতেন, এই সমস্ত জমীদারীর তত্ত্বাবধানের ভার সাধারণতঃ তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই ঢাকা বিভাগে পরে আলাপসিং, ময়মনসিংহ, সরাল, তাড়াস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণাও অন্তর্ভুক্ত হয়। জায়গীর বাদে সমস্ত বিভাগের ১৫৫ পরগণায় ৮, ৯৯, ৭৯০ টাকা খালসা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল।

পূর্ণিয়া বিভাগের অন্তর্গত যে সমস্ত জায়গীর ভূমি ছিল, তাহা বাদ দিয়া উক্ত বিভাগের সমস্ত খালসা ভূমি ১৭
লইয়া, সরকার পূর্ণিয়ার দুইটী প্রসিদ্ধ পরগণা সেরপুর-দোলমালপুর।
সেরপুর ও দোলমালপুরের নামানুসারে সেরপুর-দোলমালপুর জমীদারীর সৃষ্টি হয়। * উক্ত জমীদারী পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সৈফ খাঁর গোমস্তার অধীনে ছিল। জায়গীর বাদে ১৩ পরগণায় ৯৮,৬৬৪ টাকা খালসার জমা ধার্য্য হয়।

* এই দোলমালপুর 5th Report এর এক স্থলে Dulmapur বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে Dulmallpur দেখা যায়। গ্লাডউইন সাহেবের অনুবাদিত আইন আকবরীতে সরকার পূর্ণিয়ার মধ্যে Dulmallpur মহলের উল্লেখ আছে।

সাজাহানের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্য হইতে যে সমস্ত
১৮ ভূভাগ অধিকৃত হইয়া সরকার কোচবিহার
ফকীরকুণ্ডী। নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত ভূভাগ ও সরকার বাজুয়ার অন্তর্গত কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা লইয়া চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ফকীরকুণ্ডী বা রঙ্গপুর জমীদারী গঠিত হয়। এই জমীদারীতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। রঙ্গপুর প্রদেশে মোটা রেশম, অহিফেন, তামাক, গুড় ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হইত। জায়গীর বাদে ২৪৪ পরগণায় ২,৩৯,১২৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাজমহল ও তাহার প্রসিদ্ধ পরগণা কাঁক-
১৯ জোল লইয়া কাঁকজোল বা রাজমহল জমী-
কাঁকজোল। দারীর গঠন হইয়াছিল। বিহারের প্রান্তসীমাস্থিত তেলিয়াগড্ডী ও শকরীগলি প্রভৃতি বাঙ্গলার দ্বারস্বরূপ পার্ব্বত্য স্থান ইহার অন্তর্গত হওয়ায়, কাঁকজোল জমীদারী কথঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করে। রাজমহল বা আকবর-নগরের ফৌজদার ইহার প্রতি বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখিতেন। সুজা খাঁর সময় আলিবর্দ্দী খাঁ রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। কাঁকজোল জমীদারী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকে বিভক্ত ছিল। জায়গীর বাদে ১০ পরগণায় ৭৪,৩১৭ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

উড়িষ্যা হইতে খারিজী সরকার গোয়ালপাড়া এবং জালামুঠা
২০ দরোহমান্, সুজামুঠা, মহিষাদল প্রভৃতি পরগণা,
তমলুক। ও হিজলী বিভাগের সমস্ত খালসা ভূমি ও নিমক মহাল লইয়া জমীদারী তমলুকের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনার্দ্দন উপাধ্যায় প্রথমে মহিষাদল প্রভৃতির জমী-

দারী লাভ করেন। তৎপূর্ব্বে ইহা মহাপাত্রবংশীয়গণের অধিকারে ছিল, এবং তমলুক প্রাচীন তমলুক রাজগণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে দেখা যায়। জনার্দ্দনের পঞ্চম পুরুষ আনন্দলাল উপাধ্যায় নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁহার দূরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী গুরুপ্রসাদ গর্গ উক্ত মহিষাদলের জমীদারী প্রাপ্ত হন। জাফর খাঁ আনন্দলালের পিতা শুকলাল বা শুকদেবের সহিত তমলুক বা মহিষাদল জমীদারীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৬ পরগণার ১,৮৫,৭৬৫ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

বঙ্গরাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ও আরাকানরাজ্যের সংলগ্ন সরকার শীলহাট প্রভৃতি লইয়া যে চাকলা ২১
শীলহাটের গঠন হইয়াছিল, সেই চাকলা শীল শীলহাট।
হাটের জায়গীর ভূমি বাদ দিয়া সমস্ত খালসার জমী লইয়া শীলহাট জমীদারীর উৎপত্তি হয়। সরাল, তাড়াস, তিনসাহী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা এই জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত হয়। জায়গীর বাদে সমস্ত ৩৬ পরগণায় ৭০,০১৬ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বাদসাহ আরঙ্গজেবের সময় সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের অধিকারের পর পুরাতন সরকার চাটগাঁর সহিত ২২
যুক্ত হইয়া, উক্ত প্রদেশ ইস্‌লামাবাদ নামে ইস্‌লামাবাদ বা চাটগাঁ।
অভিহিত হয়। কুলী খাঁ তাহাকে একটী স্বতন্ত্র চাকলারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই চাকলার অন্তর্গত ৪টী বৃহৎ ও ১৪০টী ক্ষুদ্র পরগণা ভিন্ন ভিন্ন তালুকদারের সহিত বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু জাফর খাঁ তাহার সমস্তই জায়গীররূপে নির্দ্দেশ করায়, তাহার জমা হইতে খালসায় কোন রাজস্ব আসিত না। ইস্‌লামাবাদের জমা জায়গীর বন্দোবস্তের উল্লেখকালে প্রদর্শিত হইবে।

উড়িষ্যার প্রান্তভাগে চাকলা বন্দর বালেশ্বরের অন্তর্গত সুহেস্ত

২৩
সুহেস্ত প্রভৃতি।

প্রভৃতি কতিপয় পরগণায় ৯২,৮৭৫ টাকা ও আসামের প্রান্তস্থিত চাকলা কড়াইবাড়ীর অন্তর্গত কুস্তাঘাট প্রভৃতির জমা লইয়া সুহেস্ত প্রভৃতি একটী স্বতন্ত্র জমীদারীর সৃষ্টি হয়। উক্ত জমীদারীর ২৮ পরগণায় ১,২৯,৪৫০ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

ঢাকার সাবন্দর ব্যতীত অন্যান্য স্থানের শুল্ক প্রভৃতি হইতে যে

২৪
সায়র মহাল।

আয় হইত, তাহা সায়র জমা নামে অভিহিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে (১) চুণাখালি; মুর্শিদাবাদ সহরে ও তাহার নিকটে, তলস্থ জমীর খাজানা বাদে ঘর বাড়ী, দোকান, বাজার প্রভৃতির কর, আবকারীর আয় ও রেশম ও কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়ের শুল্কের ৩,১১,৬০৩ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়। বাঙ্গলা ১১৩০ সাল হইতে ঐ জমা ধার্য্য হইয়াছিল। (২) বক্স বন্দর বা হুগলী; চাকলা সাতগাঁর অন্তর্গত ইউরোপীয় কুঠীসমুহের নিকটস্থ ৩৭টী বাজার ও গঞ্জের জমীর খাজানা ও হুগলী বন্দর দিয়া যে সমস্ত মালপত্র যাতায়াত করিত, তাহার শুল্কের আয় ৩,৪২,৭০৮ টাকা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত কলিকাতার নির্দ্দিষ্ট আয় ৪৪,৭৬৭ টাকা বাদ দিয়া ২,৯৭,৯৪১ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়। (৩) মুর্শিদাবাদের টাঁকশালের আয় ৩,০৪,১০৩ টাকাও এই মহালের অন্তর্ভূত হইতে দেখা যায়। সমুদয় সায়র মহালে ৩ পরগণায় ৯,১৩,৬৪৭ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

এই কয়টী প্রধান মহাল ব্যতীত বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যে সমস্ত ক্ষুদ্র

২৫
মসকুরী তালুক।

ক্ষুদ্র পরগণা ভিন্ন ভিন্ন জমীদারের সহিত বন্দো-বস্ত ছিল, তাহাদিগকে ২১ ভাগ করিয়া মসকুরী

মহালের সৃষ্টি হয়। নিম্নে সেই ২১ ভাগের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। (১) বহুরুল; সরকার সরীফাবাদের অন্তর্গত এই জমীদারীর ১৩ পরগণা ১১৩৫ সালে রামকৃষ্ণের সহিত ২,৪১,৩৯৭ টাকায় বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু পরে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশই রাজসাহী জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। (২) মণ্ডলঘাট; সরকার সাতগাঁর মধ্যস্থ মণ্ডলঘাট জমীদারীর ৫ পরগণা ১,৪৬,২৬১ টাকায় রাধানাথের সহিত বন্দোবস্ত হয়, পরে তাহা বর্দ্ধমান জমীদারীর সহিত মিশিয়া যায়। (৩) আর্ষা; এই জমীদারীও সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত। ইহার কতকাংশ রঘুদেবের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ইহাও বর্দ্ধমান জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত হয়। ১১ পরগণায় ১,২৫,৩৫১ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল। (৪) চুণাখালি জমীদারী; ইহাতে সহর মুর্শিদাবাদ অবস্থিত ছিল। ইহার অধিকাংশ ভূভাগ পরে খাস তালুক হয়, ও কতকাংশ রাজসাহী জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। উক্ত জমীদারী পরিশেষে আনন্দচাঁদ, উদয়চাঁদ, গোলাপচাঁদ ও খোসালসিংহের মধ্যে বিভক্ত হয়; ৩ পরগণায় ৯৫,৪০৭ টাকা জমা বন্দোবস্ত দেখা যায়। (৫) আসাদনগর ও মহলন্দী প্রভৃতি; সরকার সরীফাবাদের অন্তর্গত এই জমীদারীর কতকাংশ রাজসাহীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ ৩ পরগণায় ৬২,৭৯৮ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। (৬) জাহাঙ্গীরপুর প্রভৃতি; এই জমীদারী চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে ইহারই জমীদারেরা দিনাজপুরের অন্তর্গত মহাদেবপুরের জমীদার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ কথিত হয় যে, ব্রাহ্মণবংশীয় নয়নচাঁদ চৌধুরী প্রথমে বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জাহাঙ্গীরপুরের জমীদারী লাভ করেন। ১১৩৫ সালে

রামদেবের সহিত ইহার বন্দোবস্ত হয়। পরে ইহা উক্তবংশীয় গোবিন্দ-দেব, শিবপ্রসাদ ও বীরেশ্বরের মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ১১ পরগণায় ৬৪,২৪৯ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (৭) আটিয়া, কাগ-মারী, বড়বাজু, হোসেনসাহী ; চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত এই জমীদারীগুলি ১০ পরগণায় ৬৭, ৮৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত জমীদারীসম্বন্ধে পরে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, আটিয়া, ক্ষুদু নওয়াজ, নবী ও সানওয়াজ নামে তিন জন ফকীরের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্দ্ধাংশের, ও অন্য দুই জন অপরার্দ্ধের উপস্বত্ব সমভাবে ভোগ করিতেন। কাগমারীতে রামনাথ ও চাঁদ নামে দুইজন জমীদারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বড়বাজু-হোসেনসাহীর বার আনা রজব আলি ও মহম্মদ সকতের ও অবশিষ্টাংশ হরিদেব ও রঘুরাম প্রভৃতির মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। (৮) সালবাড়ী ; ইহা সরকার বাজুয়ার অন্তর্গত। এই প্রসিদ্ধ পরগণাই একটী স্বতন্ত্র জমীদারীরূপে গণ্য হইয়া ১ পরগণায় ৫৭,৪২১ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল। ইহা পরে ১৬ জন ভিন্ন ভিন্ন জমীদারের মধ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে রজী উদ্দীন ও বদ্য-উল-জমান অর্দ্ধাংশ, আবুতোরাব ও মুরীরাম এক চতুর্থাংশ ও অবশিষ্ট গঙ্গা, লক্ষ্মীনারায়ণ, গোপাল. রুদ্ররাম, কুলপ্রসাদ প্রভৃতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। (৯) তাহিরপুর, বার্ব্বাকপুর ও মসেদহ ; ইহারা সরকার বার্ব্বাকাবাদ ও চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত, এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন জমীদারী ৩ পরগণায় ৫৫, ৭৯১ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। তাহিরপুর পরিশেষে রাঘবেন্দ্র ও নরেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে, বার্ব্বাকপুর শিবনাথ ও দুর্গানাথের মধ্যে বিভক্ত ও মসেদহ দত্তনাথের সহিত বন্দোবস্ত হইতে দেখা যায়। (১০)

চাঁদলাই প্রভৃতি জমীদারী; ইহা চাকলা মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, আকবরনগর ও জাহাঙ্গীরনগরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন তালুকে বিভক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এগুলি সরকারের কোন হিন্দু কর্ম্মচারীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ৭ পরগণায় ৫৫,৭২৯ টাকা জমা দেখা যায়। উহাদের মধ্যে চাঁদলাই তালুক মহানন্দা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলের নিকট অবস্থিত ছিল। চাঁদলাই পরে সত্রাজিৎ ও ভোলানাথের মধ্যে বিভক্ত হয়। (১১) পাতলেদহ ও কুণ্ডী; চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত এই দুই জমীরারীর ৭ পরগণায় ৬৬,৬৩২ টাকা বন্দোবস্ত হয়। পরে পাতলেদহ প্রভৃতি রাজসাহী জমীদারীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল। (১২) সন্তোষ প্রভৃতি; ইহারাও ঘোড়াঘাটের মধ্যস্থ,এই জমীদারী প্রথমে রঘুনাথের সহিত বন্দোবস্ত হয়, পরে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জমীদারীর সহিত মিশিয়া যায়। ২ পরগণায় ৯৪,৮০৭ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল। (১৩) আলাপসিং ও ময়মনসিং; পূর্ব্বে ঠিকৃরার মহম্মদ মেহেন্দীর সহিত ইহাদের বন্দোবস্ত ছিল, পরে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভূত হয়। ২ পরগণায় ৭৫,৭৫৫ টাকা জমা বন্দোবস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১৪) সাতসইকা; সরকার সেলিমাবাদ ও চাকলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত এই জমীদারী মহম্মদ এক্রাম চৌধুরীর সহিত ৩ পরগণায় ৫১,১৬৭ টাকায় জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। (১৫) মহম্মদ-আমীনপুর; সরকার ও চাকলা সাতগাঁর অন্তর্গত এই জমীদারী হুগলী হইতে কলিকাতার পর পার পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। কায়স্থবংশোদ্ভব রামেশ্বরের সহিত ইহার বন্দোবস্ত দৃষ্ট হয়। রামেশ্বরের পর তৎপুত্র রঘুদাস ও তৎপৌত্র গোবিন্দদাসকে মহম্মদ-আমীনপুরের জমীদার বলিয়া দেখা যায়। ১৪ পরগণায় ১,৪০,০৪৬ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। (১৬) পাত্তাস, খড়দহ

ও ফতেজঙ্গপুর ; ইহারা চাকলা ঘোড়াঘাটের মধ্যবর্ত্তী। প্রথমে এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন জমীদারী ছিল, পরে দিনাজপুর জমীদারীর অন্তর্গত হইয়া যায়। ৯ পরগণায় ১,০০,৪৮৩ টাকা জমা ধার্য্য হয়। (১৭) পুখুরিয়া ও জাফরসাহী ; এই জমীদারী সরকার বাজুয়ার অন্তর্গত ছিল। পরবর্ত্তী কালে প্রথমটী রাজসাহী ও দ্বিতীয়টী জালালপুর জমীদারীর অন্তর্নিবিষ্ট হয়। ৫ পরগণায় ৫৪,৫১৯ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। (১৮) মাইহাটী ; ইহা সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত, এই জমীদারী সতীরামের সহিত ১৫ পরগণায় ২৮,৮৩১ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে ইহার অন্তর্গত মাইহাটী পরগণা টাকী-শ্রীপুরের চৌধুরীগণের অধিকারে দেখা যায়। (১৯) হুজুরী তালুকদারান ; উপরোক্ত জমীদারী ব্যতীত চাকলা, মুর্শিদাবাদ ও সাতগাঁর অন্তর্গত যে ৯৮ জন ক্ষুদ্র তালুকদার খালসাতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে হুজুরী তালুকদারান বলিত। ঐ সমস্ত তালুকের মধ্যে ধাওয়া, ধামুম, কোব্বুয়া, আকবরপুর, আকবরসাহী, সরফরাজপুর, ছুটিপুর, গোপীনাথপুর, কাশীপুর, কাহিগঞ্জ, দাঁতিয়া, সেলিমপুর, কুতুবপুর, মকিমপুর, উজীরাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি প্রধান। ঐ সকল ক্ষুদ্র তালুকের মধ্যে সরফরাজপুর রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণের অধিকারভুক্ত ছিল। সরফরাজপুরের কতকাংশ কিসমৎ আমীরাবাদ নামে যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর দেওয়ান রামভদ্র রায়ের জমীদারী হয়। ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক ২ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৯৫,৮৫৫ টাকায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। (২০) আকবরনগর বা রাজমহলের শুল্ক প্রভৃতি ; ইহা ২ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৫৪,৪৩২ টাকায় বন্দোবস্ত হয়, পরিশেষে তাহা কাঁকজোল বা রাজমহল জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। (২১) খুচরা মহাল ;

ঐ সমস্ত জমীদারী তালুকদারী প্রভৃতি ব্যতীত সমগ্র সুবায় যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার অংশ ও মৌজা ছিল, তাহাদিগকে একত্র করিলে ৮ পরগণায় বিভক্ত হইতে পারিত, এবং তাহাদের মোট জমা ৪৮,৯৯২ টাকায় বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং সমগ্র মসকুরী মহালে ১৩৬ পরগণা ও ৭,৮৫,২০১ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা হইলে সুজা খাঁর সময়ে সমস্ত খালসা ভূমি ২৫ ভাগে এহতিমামবন্দী হইয়া ১২৫৬ পরগণায় বিভক্ত ও ১,০৯,১৮,০৮৪ টাকা তাহার জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। নিম্নে জায়গীর বন্দোবস্তের কথা উল্লিখিত হইতেছে।

জায়গীর বন্দোবস্ত।

পূর্ব্বোক্ত খালসা জমা ব্যতীত বঙ্গরাজ্যের স্থানে স্থানে জায়গীর ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার আয় হইতে নাজিমী, দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কিছু অধিক পরিমাণে জায়গীর ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কুলী খাঁ তাহার লাঘব করিয়া উড়িষ্যাতে অনেক জমী তজ্জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তথাপি বাঙ্গলায় তাঁহার সময়ে জায়গীর ভূমি হইতে ৩৩,২৭,৪৭৭ টাকা আয় হইত। উক্ত জায়গীর ভূমি ১৩ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সুজা খাঁ তাহার জমা সংশোধন না করিয়া কিছু কিছু নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৩ ভাগে বিভক্ত জায়গীরের জন্য ৪০৪ পরগণায় উক্ত ৩৩,২৭,৪৭৭ টাকাই জমা বন্দোবস্ত ছিল। কোন্ বিভাগে কত পরগণা ও জমা ছিল আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সরকার আলি।

বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিম বা সুবাদারের ও তাঁহার খাস কর্ম্মচারিবর্গের এবং নিজামত ১ আদালত প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সরকার

আলি জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নিজামতের সকল প্রকার, এমন কি নাজিমের নিজ গৌরবের জন্য যে সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষা করিতে হইত, তাহারও ব্যয় এই জায়গীর হইতে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গলার ৩৪ সরকারের মধ্যে ২১ সরকার, ২৯৬ পরগণা ও কিসমতে এই জায়গীর বিক্ষিপ্ত ছিল। ক্রমে ইহার পরগণার সংখ্যা হ্রাস করিয়া উর্ব্বর ভূখণ্ড সকল ইহার জন্য নির্দ্দেশ করা হয়। সেই কারণে ঢাকা ও হিজলীর মধ্যে ইহার অর্দ্ধাংশ ও অপরার্দ্ধাংশ যশোহর, রাজসাহী, কৃষ্ণনগর ও দিনাজপুরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানী কর্ত্তৃক দেওয়ানীগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জায়গীর ভূমিসমূহের বন্দোবস্তের ভার নিজামতবংশীয়দিগের হস্তে দেখা যায়। বাদসাহী সেরেস্তার রকমী জমায় ইহার আয় ১৬,০৫,৬৯৩ টাকা লিখিত থাকিলেও কুলী খাঁ ও সুজা খাঁর বন্দোবস্তে ইহার যথার্থ আয় ৬০ পরগণায় ১০,৭০,৪৬৫ টাকা ধার্য্য হয়।

২ বন্দেওয়ালা দরগা।

বাদসাহী দেওয়ানের নিজের ও কর্ম্মচারিগণের ব্যয়ের জন্য বন্দেওয়ালা দরগা জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার আয় হইতে দেওয়ানের গৌরবার্থে নিযুক্ত চারি হাজার সৈন্য ও আড়াই হাজার অশ্বারোহীর ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইত। বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, ও রঙ্গপুরের অনেক ভূভাগ এই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব্বে ৯৭ পরগণা ও কিসমতে ইহা বিস্তৃত ছিল, এবং বাদসাহী সেরেস্তার রকমী জমায় ২,৯২,৫০০ টাকা লিখিত হইত। কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে ২০ পরগণায় ১,৪৬,২৫০ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বাদসাহের বক্সী বা প্রধান সেনাপতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আমীর উল-ওমরা বক্সী জায়গীরের সৃষ্টি হইয়াছিল। ৩

আমীর উল-ওমরা বক্সী।

এই সময়ে সামসুল উদ্দৌলা খাঁ তুরান প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বঙ্গদেশস্থ প্রতিনিধি মোসাফের খাঁ ও আসরফ খাঁর প্রতি উক্ত জায়গীরের আয়গ্রহণের আদেশ ছিল। ৬,৫০০ সৈন্যের ও ২,৬৫০ অশ্বারোহীর ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গলার 'ব' দ্বীপে, ঢাকা, শীলহাট, কড়াইবাড়ী প্রভৃতি স্থানে এই জায়গীর অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে ৬৩ পরগণা বা কিসমত হইতে রকমী জমায় ৩,৩৭,৫০০ টাকা আয় দৃষ্ট হইত। কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে ১৮ পরগণায় ২,২৫,০০০ টাকা জমা স্থির হয়।

বাঙ্গলার ৫টী সীমান্ত প্রদেশের নিজামতের প্রতিনিধি নায়েব নাজিম ও ফৌজদারের ব্যয়ের জন্য জায়গীর ফৌজদারান্ নির্দ্দিষ্ট হয়। যথাক্রমে সেই ৫টী জায়গীরের উল্লেখ করা যাইতেছে। ৪

ফৌজদারান্।

(১) ঢাকার নায়েব সুবেদারী; নায়েব সুবেদারের প্রতি থানাজাত অর্থাৎ প্রাদেশিক দুর্গস্থিত সেনাগণের, তোপখানার গোলন্দাজ সৈন্যগণের ও নাওয়াড়া বা নৌ বিভাগের কর্ত্তৃত্বের ও অন্যান্য শাসনকার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। এই সময়ে সুজা উদ্দীনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বে ৬০ পরগণায় রকমী জমায় ২,৪০,৭৫০ টাকা লিখিত ছিল। কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে ১১ পরগণায় ১,০০,১৪৫ টাকা ধার্য্য হয়। (২) শীলহাটের ফৌজদারী; এই সময়ে সমসের খাঁ ও তাঁহার অধীনে আরও ৪ জন সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বে রকমী জমায় ৪,৩০,০০০ টাকা ইহার আয় লিখিত ছিল। কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে ৪৮ পরগণায় ১,৭৯,১৬৬ টাকা

স্থির হয়। (৩) পূর্ণিয়ার ফৌজদারী ; কুলী খাঁ ও সুজা খাঁর সময়ে সৈফ খাঁ পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ণিয়ার অধিকাংশই এই জায়গীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রকমী জমায় ২,৭০,২৮০ লিখিত থাকিলেও কুলী খাঁ ও সুজা খাঁর বন্দোবস্তে ৯ পরগণায় ১,৮০, ১৬৬ টাকা ধার্য্য হয়। (৪) ঘোড়াঘাটের ফৌজদারী ; ইহা ফৌজদার মনসুর খাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই জায়গীরকে রঙ্গপুরের মধ্যেই অবস্থিত দেখা যায়। তিন পরগণায় ১৬,৬৬৬ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়। (৫) রাজমহল ও তিলিয়াগড্ডীর ফৌজদারী; সুজা খাঁর সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত জায়গীরের ৪ পরগণায় ১৬,৬৭৬ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়। সমগ্র জায়গীর ফৌজদারান্ ৭৫ পরগণায় ৪,৯২,৮০০ টাকা জমা বন্দোবস্ত হয়।

৫
মনসবদারান্।

২১জন ভিন্ন ভিন্ন সেনানীর জন্য জায়গীর মনসবদারানের উৎপত্তি হয়। এই মনসবদারগণ সাধারণতঃ পঞ্চশতী আখ্যায় অভিহিত হইতেন। ইহাদিগকে কতকগুলি সৈন্য রক্ষা করিতে হইত, নাজিমের প্রয়োজন হইলে ইঁহারা সসৈন্যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনার্থে উপস্থিত হইতেন। এই জন্য ইঁহাদের বৃত্তিস্বরূপ উক্ত জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হয়। এই জায়গীর সাধারণতঃ শীলহাট, ঢাকা, হিজলী ও রাজমহালের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ২০ পরগণায় ১,১০,৮৫২ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

৬
জমীদারান্।

চারি জন সীমান্ত প্রদেশের জমীদারদিগকে জায়গীর জমীদারান্ প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা, মুচবা, সুসঙ্গ ও তিলিয়াগড্ডী দ্বারের জমীদারেরাই উক্ত জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাপন জমীদারীর মধ্যেই জায়গীর

ভোগ করিতেন। উক্ত চারি জন জমীদারের মধ্যে ত্রিপুরারাজের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুসঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজগণ অদ্যাপি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। পার্ব্বত্য গারো জাতিদিগকে তাঁহারা দমন করিতেন বলিয়া, সুসঙ্গের রাজাদিগকে জায়গীর প্রদান করা হয়। মোগল রাজত্বের পূর্ব্বে তাঁহারা এক রূপ স্বাধীন রাজাস্বরূপ ছিলেন। অপর দুই জন জমীদারের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। ২ পরগণায় ইহার ৪৯,৭৫০ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

৭ মদৎমাশ।

বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বৃত্তির জন্য এই জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্দ্ধমানে, রাজমহলে, পাণ্ডুয়ার মসজীদের নিকট ও পূর্ণিয়ার মধ্যে ইহার ভূমি সাধারণতঃ অবস্থিত ছিল। ৭ পরগণায় ২৫,৬৬৫ টাকা জমা স্থির হয়।

৮ সালিয়ান্দারান্।

শীলহাট প্রভৃতি প্রদেশের কতিপয় জমীদার ও অন্যান্য ব্যক্তির বার্ষিক বৃত্তির জন্য জায়গীর সালিয়ান্দারানের সৃষ্টি হয়। ঐ সমস্ত প্রদেশেই তাহার ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সমস্ত ভূমি ৯ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ২৫,৯২৭ টাকায় তাহার জমা বন্দোবস্ত হয়।

৯ ইনাম-আল-তঙ্গা।

মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ দুই জন মৌলবীর বৃত্তির জন্য জায়গীর ইনাম-আল-তঙ্গা নির্দ্দিষ্ট হয়। বাঙ্গলার মধ্যে কেবল এই জায়গীরই উত্তরাধিকারীক্রমে ভোগ করার নিয়ম ছিল। তাহার ভূমি ১ পরগণারূপে গণ্য হইয়া ২,১২৭ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

এক জনমাত্র মোল্লাকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের জন্য জায়গীর

১০ রুজিয়ান্‌দারান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই জায়গীর

রুজিয়ান্‌দারান্। একটী সামান্য তালুকমাত্র। লস্করপুর জমীদারীর মধ্যে ইহা অবস্থিত ছিল। ৩৩৭ টাকামাত্র ইহার জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

মগ ও অন্যান্য বিদেশীয় জলদস্যুগণের উপদ্রব হইতে উপকূল

১১ ভাগকে রক্ষা করার জন্য আমলে নাওয়াড়ার

আমলে নাওয়াড়া। সৃষ্টি হয়। ৭৬৮ খানি ছোট বড় নৌকা অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া সাধারণতঃ ঢাকায় অবস্থিতি করিত। উক্ত নৌকাসমূহের পরিচালনের জন্য ৯২৩ জন ফিরিঙ্গী নিযুক্ত ছিল। ইহাদের জন্য ২৯,২৮২ টাকা মাসিক ব্যয় হইত। ইহার সহিত নূতন নৌকা প্রস্তুতের ও পুরাতন নৌকার সংস্কারাদির ব্যয় যুক্ত হইয়া প্রথমে ৮,৪৩,৪৫২টাকা উক্ত বিভাগের বার্ষিক ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১১২টী পরগণা ও কিসমতের আয় হইতে ইহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে অর্থ গৃহীত হইত। তন্মধ্যে ৯৯টী পরগণা বা পঞ্চমাংশের চারি অংশ একমাত্র ঢাকা চাকলার মধ্যে অবস্থিত ছিল। অবশিষ্টাংশের প্রায় সমস্তই শীলহাট প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া জানা যায়। উক্ত প্রদেশদ্বয়ের উর্ব্বর ভূমিখণ্ডসমূহ এই জায়গীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার জমার মধ্যে ৫০,৪৩৩ টাকা সীমান্ত প্রদেশের জমীদার প্রভৃতির নিকট হইতে পেস্কশরূপে আদায় করা হইত। নূতন বন্দোবস্তে উক্ত জায়গীর ৫৫ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৭,৭৮,৯৪৫ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

বাঙ্গলার পূর্ব্বপ্রান্ত রক্ষার জন্য সৈন্যাবাস ও প্রহরী-

১২ শালাস্থিত ৮,১১২ জন সৈনিক, প্রহরী ও

আমলে আসাম। গোলন্দাজের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আমলে

আসাম জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে সীরাব বা ঢাকার নিম্নস্থ প্রদেশ ও উপকূল রক্ষার জন্য ঢাকা প্রদেশস্থিত ২,৮২০ জনের জন্য বৃহৎ ১৩ পরগণার ১,৩৫,০৬০ টাকা, ইস্‌লামাবাদ বা চট্টগ্রামের ৩,৫২২ জনের জন্য ১১৭ কিসমতে ১,৫০,২৫১ টাকা, রাঙ্গামাটী বা কামরূপ প্রদেশের ১,৪৭৮ জনের জন্য ৪ বৃহৎ পরগণায় ৬৩,০৪৫ টাকা ও শীলহাটের ২৮২ জনের জন্য ৪ পরগণায় ১০,৮২৪ টাকা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত পরগণাগুলি উক্ত প্রদেশ সমূহেরই অন্তর্গত। সমুদয়ে ৮,১১২ জন লোকের জন্য ১৩৮ পরগণায় ৩,৫৯,১৮০ টাকা জমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৩ খেদা-আ-ফিল।

তৎকালে সরকারের যুদ্ধাদি ও অন্যান্য অনেক কার্য্যের জন্য হস্তীর প্রয়োজন হইত। বঙ্গরাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ও শীলহাটের পর্ব্বতে ও অরণ্যে অনেক হস্তী বাস করিত। বর্ত্তমান সময়েও উক্ত প্রদেশে অনেক হস্তী থাকিতে দেখা যায়। ঐ সমস্ত হস্তী ধরার ব্যয়ের জন্য ত্রিপুরা ও শীলহাটে খেদা-আ-ফিল জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ৪০,১০১ টাকা তাহার জমা বন্দোবস্ত হয়। সুতরাং সুজা খাঁর সময়ে সমস্ত জায়গীর ভূমি ৪০৪ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৩৩,২৭,৪৭৭ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হয়। কুলী খাঁর সময়েও জায়গীর ভূমির উক্ত জমাই দেখা যায়।

১ আবওয়াব নজরানা মোকররী।

আমরা উপরোক্ত খালসা ও জায়গীর জমা হইতে জানিতে পারি যে, সুজা খাঁর সময়ে ১৬৬০ পরগণায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা জমা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার উপর ৪টী আবওয়াব বৃদ্ধি করিয়া ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আয় বৃদ্ধি করেন। তাহার

সহিত কুলী খাঁর খাসনবিশী আবওয়াব ২,৫৮,৪৫৭ টাকাও যুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আবওয়াবের বিবরণ প্রদান করিতেছি। সুজা খাঁর সময়ের প্রথম আবওয়াবের নাম নজরানা মোকররী। প্রথমতঃ জমীদারদিগকে সময়ে সময়ে খাজানা মখুব, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার অনুগ্রহপ্রদর্শন এবং আমীনের হস্ত হইতে জমীদারীপরিদর্শনের নিষ্কৃতিপ্রদানের জন্য এই আবওয়াব প্রচলিত হয়। জমীদারদিগকে যখন এই আবওয়াব প্রদান করিতে হইত, তখন তাঁহারা যে প্রজাদিগের নিকট হইতে ইহা আদায় করিতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। এই আবওয়াব পরিশেষে দুইটী প্রসিদ্ধ মুসল্‌মান পর্ব্ব ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে বাদসাহের নজরানাস্বরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইত। সমস্ত খালসা জমায় প্রায় শতকরা ৬৷৷ টাকা অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহার পরিমাণ ৬,৪৮,০৪০ টাকা স্থির হইয়াছিল।

২
জার-মাথট।

দ্বিতীয় আবওয়াবের নাম জার-মাথট, জার-মাথট শব্দে কোন মূল টাকার উপর আনুপাতিক বা হারাহারি বৃদ্ধি বুঝায়। সুজা খাঁ চারিটী বিষয়ের জন্য খালসা জমার উপর শতকরা প্রায় ১৷৷০ টাকা কর বৃদ্ধি করিয়া এই আবওয়াব প্রচলন করেন। (১) নজর পুণ্যাহ,—প্রতি বৎসর পুণ্যাহের দিবস জমীদারদিগকে আপনাপন জমীদারীতে স্থির থাকার জন্য খালসার কর্ম্মচারীদিগকে উপহারস্বরূপ কিছু কর প্রদান করিতে হইত। (২) ভায়-খেলাত.—উক্ত পুণ্যাহ দিবসে প্রধান প্রধান জমীদারদিগকে আপনাপন জমীদারীতে স্থির রাখার জন্য সরকার হইতে যে খেলাত বা পরিচ্ছদাদি প্রদত্ত হইত, তাহার মূল্যস্বরূপ উক্ত জমীদারেরা কিছু কিছু কর প্রদান করিতেন। (৩)

পোস্তাবন্দী,—লালবাগ ও নিজামত কেল্লার নিকটে নদীতে পোস্তাবন্দীর জন্যও একটা কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (৪) রসুম নেজারত,—মফঃস্বল হইতে খাজানাদি আনয়নের জন্য নাজির বা প্রধান পদাতিকের খরচা বলিয়া একটা কর প্রচলিত হয়। তাহা পরিশেষে খালসা বিভাগে জমা হইত। এই চারিটী বিষয়ের জন্য ১,৫২, ৭৮৬ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

৩ মাথট-ফিলখানা।

নাজিম ও দেওয়ানের ফিলখানা বা হস্তিশালাস্থিত যাবতীয় হস্তীর খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যয়ের জন্য মাথট-ফিলখানা প্রচলিত হয়। রুকুনপুর জমীদারী ও পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত জালালপুর, ত্রিপুরা, শীলহাট, এবং উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম প্রান্তস্থিত, পূর্ণিয়া, রাজমহাল, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ও পঞ্চকোট, এই কয় জমীদারী ব্যতীত সমস্ত খালসার জমী হইতে উক্ত কর আদায় হইত। ঐ সমস্ত জমীদারীর আয় বাদ দিলে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা খালসা জমার শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ৩,২২,৬৩১ টাকা মাথট-ফিলখানার জন্য ধার্য্য হয়।

৪ আবওয়াব ফৌজদারী।

নাজিম বা সুবেদারের ন্যায় তাঁহার আদেশক্রমে ফৌজদারেরা কিছু কিছু কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত কর ফৌজদারী আবওয়াব নামে অভিহিত হয়। ঐ সমস্ত কর ফৌজদারেরা বিচারকস্বরূপে সাময়িক জরিমানার ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে আদায় করিতেন না; কিন্তু তাঁহারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাস্বরূপে জমীদারদিগের জমীর উপর চিরস্থায়ীরূপে উক্ত কর ধার্য্য করেন। ফৌজদারী আবওয়াব সকল স্থলে সমভাবে আদায় হইত না। যে স্থানের

ফৌজদারেরা যেরূপ মনে করিতেন, সেই খানে সেই রূপ ভাবেই তাহাই নির্দ্ধারিত হইত। কোন্ কোন্ স্থানে তাহা কিরূপ ভাবে ধার্য্য হইয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে (১) শীলহাট প্রভৃতির আবওয়াব ফৌজদারী,—(ক) শীলহাটে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি না থাকায় অল্প পরিমাণে তাহার ১,৫৯,৫৩৫ টাকা মাত্র আবওয়াব ধার্য্য হয়। (খ) পূর্ণিয়া হইতে নানা দ্রব্য উৎপন্ন ও বাণিজ্যাদিতে তাহার যথেষ্ট অর্থাগম, এবং সৈফ খাঁ ও আলিবর্দ্দীর দ্বারা তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইলেও, তাহার আবওয়াবও কিছু কম করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল। সমগ্র পূর্ণিয়ায় ২,৮৩,০২৭ টাকা ফৌজদারী আবওয়াব নির্দ্দিষ্ট হয়। (গ) ত্রিপুরা-রোসেনাবাদেও ঐরূপ বন্দোবস্ত হয়; তাহার পরিমাণ ১,৮৪,৭৫১ টাকা। (ঘ) নিখাস বা মুর্শিদাবাদ সহরে অশ্ব ও অন্যান্য পশুবিক্রয়ের রসুম বা শুল্কের জন্য ১১,৬৭৯ টাকা কর ধার্য্য হয়। (ঙ) থানাজাত; রাজ্যের যে যে স্থানে সৈন্যগণ অবস্থান করিত, তাহাদিগকে সাধারণতঃ থানা বলিত। ঐ সমস্ত থানার নিকটে সৈন্যদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহের জন্য এক একটী বাজার বসিত। সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে এক জন প্রহরী তাহার তত্ত্বাবধান ও শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত হইত। উক্ত বাজারে যে সমস্ত মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী হইত, তজ্জন্য শুল্ক প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে তাহা সরকারের কর্ম্মচারিগণের লভ্য ছিল, পরে তাহা সরকারের প্রাপ্যই স্থির হয়। উক্ত থানাদারী আবওয়াবের মধ্যে কাটোয়া হইতে ৪৮,০০০, রাঙ্গামাটী হইতে হাতী ধরার খরচ সমেত ২৪,০০০, ভূষণার নলদী থানা

হইতে ২৪,০২৫, মামুদসাহী হইতে ১০,৮৬০ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৯ থানা হইতে ৮,৮৪৩ মোট ১,১৫,৭২৮ টাকা আদায় হইত। সুতরাং শীলহাট প্রভৃতির সমগ্র ফৌজদারী আবওয়াব হইতে ৭,৫৪,৭২০ টাকা আয় দেখা যায়। (২) ঘোড়াঘাটের আবওয়াব ফৌজদারী,—উক্ত চাকলার প্রধান প্রধান জমীদারী ও পরগণা হইতে আবওয়াব ফৌজদারীর জন্য সামান্য পরিমাণে ১৯,২৭৯ টাকা আদায় হইত। (৩) মুর্শিদাবাদের আবওয়াব ফৌজদারী,—সমগ্র মুর্শিদাবাদ চাকলায় অন্যান্য ফৌজদারীর ন্যায় কর ও কোন কোন বিষয়ের জরিমানা ও শুল্ক প্রভৃতি লইয়া মুর্শিদাবাদের আবওয়াব ফৌজদারী ১৬,৬৩৯ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সমগ্র আবওয়াব ফৌজদারীর জন্য ফৌজদারগণ ৭,৯০,৬৩৮ টাকা আদায় করিতেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সুজা খাঁ ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আবওয়াব প্রচলন করেন এবং তাহার সহিত কুলীখাঁর খাসনবিশী ২,৫৮,৮৫৭ টাকা যুক্ত হইয়া সুজা খাঁর সময়ে ২১,৭২,৯৫২ টাকা আবওয়াব আদায় হইত। অবশ্য সুজা খাঁ খালসা জমার পরিমাণ কিছু অল্প করিয়া জমীদারদিগকে উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকারান্তরে এইরূপ অতিরিক্ত করভার জমীদার ও প্রজার উপর প্রদান করা তাঁহার ন্যায় উদারহৃদয় নবাবের পক্ষে উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, জমীদারেরা উৎপীড়নের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ায়, সুজা খাঁর করবৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হন নাই। তবে নিরীহ প্রজাগণকে অতিরিক্ত করভারের জন্য যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

অন্যান্য বন্দোবস্ত এবং নাজির আহম্মদ ও মোরাদ ফরাসের পরিণাম।

এই রূপে রাজস্ববিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া সুজা খাঁ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করেন। তাহাদের মধ্যে তাঁহার সৈনিক বিভাগের বন্দোবস্তই মুখ্যতম। মুর্শিদকুলী খাঁ সৈন্য সংখ্যার অনেক লাঘব করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি রাজস্বসংগ্রহের জন্য নাজির আহম্মদের অধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। সুজা খাঁ উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়া ২৫ হাজার সৈন্যের বন্দোবস্ত করেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধাংশ অশ্বারোহী ও অর্দ্ধাংশ পদাতি ছিল। পদাতিকেরা অন্যান্য অস্ত্রের সহিত বন্দুকও ধারণ করিত। এই সমস্ত বন্দোবস্তের সময় তিনি নাজির আহম্মদ ও মোরাদ ফরাসের অত্যাচারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালার একমাত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণী জমীদারগণ যে তাহাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, নবাব সুজা খাঁর নিকট যথেষ্ট পরিমাণে তাহার প্রমাণ উপস্থিত হয়। তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা নবাবের নিকট এরূপ কঠোর বোধ হইয়াছিল যে, তিনি বিচারশেষে নাজির আহম্মদ ও মোরাদ ফরাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান ও তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক জমিদারগণের উৎপীড়নের ব্যাপার যাঁহারা একেবারেই অস্বীকার করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে নাজির আহম্মদ ও মোরাদ ফরাসের শাস্তির বিষয় এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। নাজির আহম্মদ ও মোরাদ ফরাসের অত্যাচার অতি কঠোর না হইলে, নবাব সুজা উদ্দীনের ন্যায় হৃদয়বান নবাব কদাচ তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেন না।

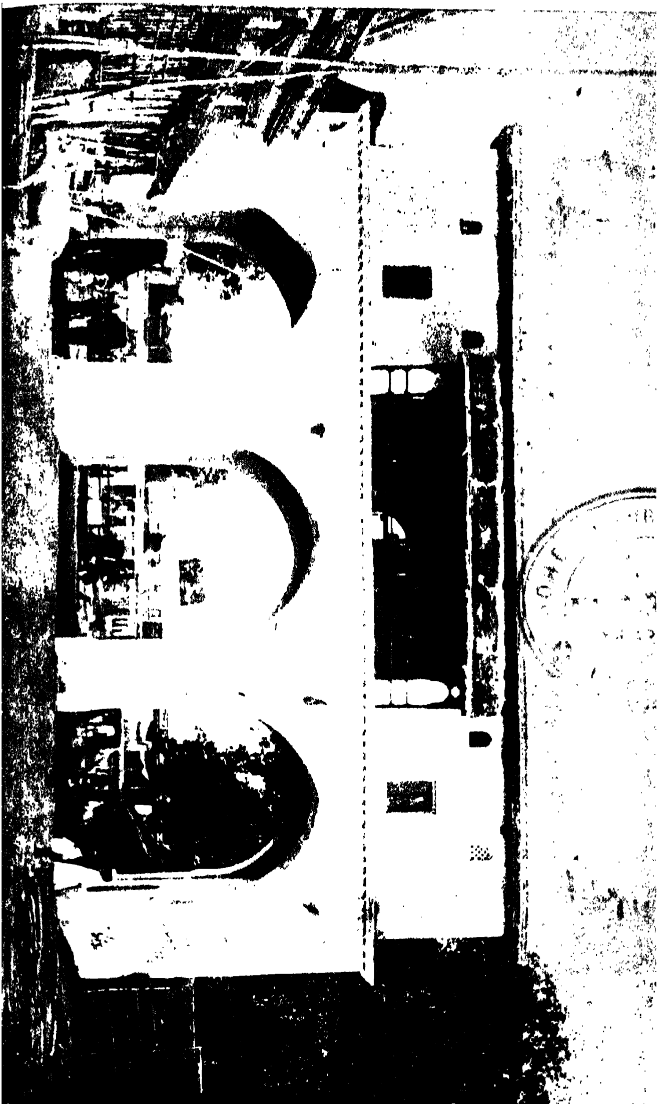
দশম অধ্যায়।

সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ।

সুজা উদ্দীনের আড়ম্বরপ্রিয়তা।

এই রূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া নবাব সুজা খাঁ আপনার রাজত্বকালকে নির্ব্বিঘ্ন মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদারতা, ন্যায়পরতা ও সুবিচারে জনসাধারণ এরূপ প্রীত হইয়াছিল যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় অপেক্ষা সুজা খাঁর রাজত্বকালে তাহাদিগের স্কন্ধে অধিক পরিমাণে করভার নিপতিত হইলেও তাহারা অবনত মস্তকে সুজা উদ্দীনের আদেশ প্রতিপালন ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিত। এই রূপে সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া সুজা উদ্দীন ক্রমে মন্ত্রিসভার প্রতি শাসনভার অর্পণ ও নিজে আমোদপ্রমোদে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করেন। তিনি দানকার্য্যে ও বিলাসিতায় অজস্র অর্থবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন ও অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় হইয়া উঠেন। ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌দিগকে তিনি অপরিমিত রূপে সাহায্য প্রদান করিতেন, এবং আপনার ভৃত্যবর্গেরপ্রতিও মুক্তহস্ত ছিলেন। জন্মদিবসে তুলা করিয়া স্বর্ণরৌপ্য বিতরণ করা হইত। নবাব হস্তিপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করিতেন ও সাধারণে অভিবাদন করিলে, তাঁহার

প্রত্যভিবাদন করার রীতি ছিল। দরিদ্রগণ ভিক্ষাপ্রার্থী হইলে তাহাদিগকে মোহর ও টাকা দেওয়া হইত। মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদ ও চেহেল-সেতুন তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, তিনি নূতন মহলসরা, চেহেল-সেতুন, নহবতখানা, ত্রিপলিয়া তোরণ-দ্বার, আয়নামহাল, বিশ্রামাগার, কাছারী, ফার্ম্মানবাড়ী, আস্তা-বল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত নহবত-খানাসমেত বিশাল ত্রিপলিয়া তোরণ-দ্বার অদ্যাপি মুর্শিদাবাদে বিদ্য-মান আছে। সেরূপ গগনস্পর্শী তোরণ-দ্বার বঙ্গদেশে বিরল। এই সমস্ত সৌধনির্ম্মাণ শেষ করিয়া তিনি প্রাসাদসজ্জার উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের আদেশ দেন, এবং বনাতের পর্দ্দা, স্বর্ণখচিত সামি-য়ানা, সুবর্ণনির্ম্মিত আসা, চাঁদা এবং নানা কারুকার্য্যযুক্ত তাম্বু, স্বর্ণ ও রেশমখচিত মখমলের মসনদ, দেশীয় ও বিলাতীয় গালিচা, সুবর্ণনির্ম্মিত পানদান, আতরদান, গোলাপপাশ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মুর্শিদাবাদের অন্য কোন নবাবের সময় এত অধিক দ্রব্য নির্ম্মিত হয় নাই। এই সমস্ত সৌধ ও দ্রব্যাদি ব্যতীত তিনি এক রমণীয় উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ নগরের পশ্চিম পারে ভাগীরথীতীরে ডাহাপাড়া নামক স্থানে নাজির আহম্মদ একটী উদ্যান ও মসজীদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রাণদণ্ডের পর নবাব মসজীদ নির্ম্মাণ শেষ করিয়া সেই উদ্যানটীকে সজ্জিত করিতে যত্নবান হন। তিনি তাহাকে নানাবিধ বৃক্ষে সুশোভিত করিয়া তাহার স্থানে স্থানে ফোয়ারা, চৌবাচ্চা ও লহর স্থাপন করেন। এই রমণীয় উদ্যানের নাম নবাব "ফর্হাবাগ" বা সুখ-কানন প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহার রমণীয়তার নিকট কাশ্মীরের উদ্যানাবলী লজ্জা পাইত ও



স্বর্গের উদ্যানও মলিন বোধ হইত।* নবাব বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সুন্দরী রমণীদিগের সহিত উদ্যানমধ্যে জলক্রীড়া ও অন্যান্য নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতেন। হিন্দুদিগের নৌরোজা বা নূতন বর্ষের দিনে তিনি রমণীগণের সহিত পীত বস্ত্রে ভূষিত হইতেন ও হোলি পর্ব্বে তাহাদের সহিত আবির-ক্রীড়া করিতেন। এইরূপে তিনি জীবনের অবশিষ্টাংশ ভোগবিলাসে ও আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বিহারশাসনের ভার-প্রাপ্তি ও আলিবর্দ্দীর নিয়োগ।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,সুজা উদ্দীন কেবল বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁহারই প্রতি বিহার প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়, কিন্তু কিছু কাল পরে বিহারে স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফকীর উদ্দৌলা নামক জনৈক ব্যক্তি উক্ত প্রদেশের শাসনদণ্ড ধারণ করিতেন। দিল্লীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অযথা অত্যাচারে ও নানা প্রকার কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে বিহার প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হন। পরে খাঁ দুরানের অভিপ্রায়ানুসারে সুজা উদ্দীনের উপর উক্ত প্রদেশের শাসন ভার অর্পিত হয়। সুজা উদ্দীন এক্ষণে তথায় আপনার প্রতিনিধি-

* মুসল্‌মান লেখকগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, ফর্হাবাগের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তথায় পরীরা আগমন করিত। নবাব তাহা জানিতে পারিয়া ধূলির দ্বারা তাহার শোভা মলিন করিয়া পরীদিগের আগমন বন্ধ করিয়া দেন। সুজা উদ্দৌলার ফর্হাবাগ এক্ষণে একটী প্রান্তরমাত্র, তথায় কোন চিহ্ন নাই। একটী দ্বারের সামান্য চিহ্ন মাত্র আছে, মসজীদটী কয়েক বৎসর হইল ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর রোশনীবাগ-ফর্হাবাগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নিয়োগের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে অন্যতরকে তথায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু জিন্নে-তেন্নেসা বেগম সরফরাজ খাঁকে তথায় পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি আপন সন্তানকে চক্ষের অন্তরাল করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং মহম্মদ তকী খাঁর তথায় গমনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পাছে মহম্মদ তকী সরফরাজ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকেও তথায় যাইতে বাধা দেন। সুজা উদ্দীন বেগমের অনুরোধে বাধ্য হইয়া মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ করিয়া, বিহারশাসনে আলিবর্দ্দী খাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করেন।* বিহার প্রদেশ অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বিরার ও আরঙ্গাবাদের সীমার সহিত সংলগ্ন থাকায়, তথাকার শাসনকর্ত্তাকে উক্ত সমুদয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত সর্ব্বদা নানা প্রকার বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে হইত। বিশে-ষতঃ বিহার প্রদেশের জমীদারগণ আপনাদিগকে একরূপ স্বাধীন বলিয়া জ্ঞান ও সময়ে সময়ে মোগল অধীনতা ছেদনের চেষ্টা করি-তেন; এইজন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে দমনেরও প্রয়োজন ছিল। এই সমস্ত কারণে আলিবর্দ্দী খাঁকে উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হয়।

* হলওয়েল বলেন যে, কেবল সরফরাজ খাঁ আলীবর্দ্দীর বিহার-শাসনকর্ত্তৃত্বনিয়োগে আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দ্দীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রকাশ্য দরবারে তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি দুইটী সর্প পুষিতেছেন, তাহারা পরিণামে আপনাকে ও আপনার বংশকে দংশন করিয়া ধ্বংস করিবে। সুজা খাঁ পুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে অনুমতি দেন, কিন্তু হাজীর কথায় নিরস্ত হন। হাজী আলিবর্দ্দীর নিয়োগের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Holwell's Historical Events) কিন্তু মুতাক্ষরীণ প্রভৃতিতে ইহার কোনই উল্লেখ নাই।

নবাব আলিবর্দ্দীকে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত ও বাদসাহ দরবারে বিশেষতঃ খাঁ দুরানের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহাকে 'মহবৎজঙ্গ বাহাদুর' (সমরে পরাক্রান্ত) উপাধি *, ৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মন্‌সবদারী, একখানি শিবিকা, নাগরা ও পতাকা উপহার প্রদান করাইলেন। জিন্নেতেন্নেসা বেগম আলিবর্দ্দী খাঁর নিয়োগে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার অন্তঃপুরদ্বারে আহ্বান করিয়া খেলাত প্রদান করেন। জিন্নেতেন্নেসা নিজেই যেন তাঁহাকে নায়েব নাজিমী প্রদান করিতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে নবাব তাঁহাকে নায়েব নাজিমীর খেলাত দিয়া আলিবর্দ্দীকে পাটনা বা আজিমাবাদে গমন করিতে অনুমতি দেন। †

মির্জা মহম্মদ সিরাজ উদ্দৌলার জন্ম।

এই স্থানে একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। যৎকালে আলিবর্দ্দী খাঁ আজিমাবাদের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন, তাহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা আমীনা বেগমের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ‡

* তারিখ বাঙ্গলার মতে বিহার শাসন করিয়া হাজীর পরামর্শে বাদসাহের খালসার দেওয়ান ইস্‌হাক খাঁর সাহায্যে সুজা খাঁর অজ্ঞাতে আলিবর্দ্দী মহবৎজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু মুতাক্ষরীণে বিহারে গমনের সময় তিনি উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। আমরা মুতাক্ষরীণের মতই গ্রহণ করিলাম।

† মুতাক্ষরীণের মতে ১১৪৪—৪৫ হিজরী বা ১৭৩২ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দী বিহারশাসনের ভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১১৪৩ হিজরী বা ১৭২৯—৩০ খৃঃ অব্দে তাহার সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১১৪৩ হিজরী কিন্তু ১৭৩০—৩১ বলিয়া স্থির হয়। এখানেও আমরা মুতাক্ষরীণকে অনুসরণ করিয়াছি।

‡ সিরাজের জন্মকাল লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আমীনা হাজী আহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র জৈনুদ্দীন আহম্মদের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। উক্ত পুত্রের জন্মের অব্যবহিত পরেই আলিবর্দীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায়,তিনি এই দৌহিত্রটীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মতে সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হিজরী ১১৪৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। Orme এবং Stewart সাহেব সিরাজের মৃত্যু সময়ে এইরূপ লিখিয়াছেন—"Thus perished Suraj Dowlah, in" the 20th year of his age and the 15th month of his reign (July 1757). Orme's Indostan Vol. II. P. 185, also Stewart's Bengal P. 329. ইহাতে সিরাজের ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম বুঝা যায়, কিন্তু সায়ের মুতাক্ষরীণকারের মতে সিরাজ ইহা অপেক্ষা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে আলিবর্দী খাঁর আজিমাবাদে নিয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজের জন্ম হয়,এবং হিজরী ১১৪৪—৪৫ বা খৃঃ ১৭৩২ অব্দে তিনি আজিমাবাদের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি "I am not informed which governors succeeded Nusret-yar qhan in the gorvernment of that province (Azimabad). I only know that in the year 1140 Fahr-Eddolah brother to Zafar qhan, having obtained the government of that province remained *five years* in it" * * * The minister who had already heard of it (Fahr-Eddolah's tyranical conduct), procured Fahr-Fddolah's dismission from his appointment, and having annexed the government of Azimabad to that of Bengala he sent the patents of it to Shudjah qhan. * * * Shudjah qhan reflected that such a post (governorship of Azimabad) could not be properly filled by any but by Aly-verdi-qhan. On his proposing him to his council. his choice was unanimously approved; The appointment being published, Shudjah-qhan resolved to decorate Aly-verdi-qhan with new titles, and new honours and dignities. * * * History ought to remark that a few

এবং তাহারই জন্ম তাঁহার সৌভাগ্যের সূচক বিবেচনা করিয়া আপনার পুত্রসন্তান না থাকায়, তাহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ ও আপনার নামানুসারে তাঁহার মির্জা মহম্মদ আখ্যা প্রদান করেন। এই মির্জা মহম্মদই ইতিহাসবিখ্যাত সিরাজ উদ্দৌলা। আলিবর্দ্দীর হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই বালকের জন্মই তাঁহার ভবিষ্যৎ মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির কারণ। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, এই হতভাগ্য হইতেই তাঁহার বংশ একেবারে নির্ম্মূল হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের গৌরবসূর্য্য অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে। তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার একমাত্র প্রিয়পাত্র বিশ্বাসঘাতকগণের চক্রান্তে নিপতিত হইয়া, পলাশীর সমরক্ষেত্রে রাজ্যধন বিসর্জ্জন দিয়া, দীনবেশে পথশ্রমে ক্লান্তি অনুভবের পর, রক্তলোলুপ নরঘাতকের ভীষণ তরবারি আঘাতে ছিন্নমস্তকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, এবং ইহাও জানিতে

days before this elevation, a grandson was born to Aly-verdi-qhan from his youngest daughter married to his youngest nephew Zein-eddin-ahmed-qhan, and as he had no son of his own, he called him Mirza-mohemed, after his own name, adopted him for his son ; and had him educated in his own house. "Mutaqherin p. p. 295—96, 305-6. ইহা দ্বারা বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে যে, হিজরী ১১৪৪-৪৫ অব্দে ইংরাজী ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্দৌলা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার না করিয়া আপনাদিগের কল্পনাপ্রসূত একটী সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেক স্থানে মুতাক্ষরীণের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। বিশেষতঃ Stewart সাহেব আপনার পুস্তকের অনেক স্থলে মুতাক্ষরীণকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সিরাজের জন্মসম্বন্ধে তাঁহারা কি কারণে

পারেন নাই যে, বাঙ্গালার সিংহাসন অচিরে মুসল্‌মানগণের হস্তচ্যুত হইয়া বৈদেশিক ইংরাজ জাতির করায়ত্ত হইবে। এ বিষয়ে এক্ষণে অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই, আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে এই সমস্ত বিশেষ রূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

আলিবর্দ্দী খাঁ ৫ হাজার সিপাহী ও পদাতিক এবং আপনার

আলিবর্দ্দীর বিহারশাসন।

দুইটী জামতা ও অন্যান্য কতিপয় আত্মীয়ের সহিত পাটনায় উপস্থিত হন, ও তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত বিহার প্রদেশে অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে। বাঞ্জারা নামক এক দল দস্যু শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রজাদিগের উপর অত্যাচার ও রাজস্বসংগ্রাহকগণের নিকট হইতে রাজস্ব লুণ্ঠন করিত। বেতিয়া, ভাওয়াড়া, চকওয়ার এবং ভোজপুরের জমীদারগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়া শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা অমান্য করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দী এই সমস্ত গোলযোগ দমনের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সমস্ত জমীদারগণের মধ্যে চকওয়ারের রাজা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। উক্ত প্রদেশের অধিবাসীরাও অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল। মুঙ্গেরের পর পারে তাহাদের রাজ্য সাম্মুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত

নূতন মতের সৃষ্টি করিলেন বলা যায় না। অথবা অর্ম্মে প্রভৃতি ইংরাজ লেখক সিরাজকে অল্পবয়স্ক যুবক বলিয়া বিশ্বাস করায় ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। আলিবর্দ্দীর আজিমাবাদের শাসনভারপ্রাপ্তির সময়ে সিরাজের জন্ম হইলে, ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতে ১৭২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সিরাজ উদ্দৌলার জন্ম হয়। কিন্তু আমরা মুতাক্ষরীণকেই এই বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

ছিল। চকওয়ারের রাজা বাঙ্গালার নবাবকে কর প্রদান করিতেন না, এবং দিল্লীর সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মুঙ্গেরের নিকট নদীপথ দিয়া যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য যাতায়াত করিত, রাজা তাহার শুল্ক গ্রহণ করিতেন। ইউরোপীয় বণিকেরা সেই কারণে পাটনার পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর জন্য বহু ব্যয় করিয়া শস্ত্রধারী প্রহরী রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি মেজর হণ্টের সহিত রাজার অনেক বার যুদ্ধ হয়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ রাজা প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার ১৭ বৎসরবয়স্ক পুত্র রাজ্য লাভ করেন। তিনি কিছু দিন আলিবর্দ্দীকে বাধা দিয়া পরে বিহারের অন্যান্য রাজার ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য এবং বার্ষিক করপ্রদানে স্বীকৃত হন। রাজা শম্ভু নদীর মোহানা হইতে ২॥ ক্রোশ ও চকওয়ারের রাজধানী হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরে একটী স্থানে, প্রতি বৎসর নবাবের কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর প্রদান করিবেন এইরূপ স্থির হয়। উভয় পক্ষ ৩০ জনের অধিক অনুচর রাখিতে নিষিদ্ধ হন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর উক্ত করপ্রদানের দিন ছিল। আলিবর্দ্দী খাঁ সেই সময়ে চকওয়ারের রাজার নিকট করগ্রহণের জন্য বিহারের ফৌজদারকে পাঠাইয়াছিলেন। ফৌজদার ৪০০ অস্ত্রধারী সৈন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটস্থ এক জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকিতে আদেশ দেন। রাজা যথারীতি কর প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ফৌজদারের সঙ্কেতানুসারে সেই অস্ত্রধারী সৈন্যগণ রাজা ও তাঁহার অনুচরদিগের উপর পতিত হইয়া তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করে, * পরে ফৌজদার

* হলওয়েল বলেন যে, সেই সমস্ত ছিন্ন মস্তকের মধ্যে ৫টী ঝোড়ায় রাজার কর্ম্মচারিগণের ও আর একটী স্বতন্ত্র ঝোড়ায় রাজার নিজের মস্তক

সসৈন্যে রাজার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং তাঁহার সৈন্য-গণ চকওয়ারের রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নি প্রদান করে। রাজার এক দল সৈন্য কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু ফৌজদার দরিয়াপুরস্থ নিজ শিবির হইতে অধিক সংখ্যক সৈন্য আনয়ন করায় তাহারা পরাজিত হয়, ও অবশেষে সমস্ত চকওয়ার প্রদেশ আলিবর্দ্দীর অধীনে আইসে। ভোজপুরের সুন্দর সিংহ ও নামদার খাঁ প্রভৃতি প্রথমে বিদ্রোহিতাচরণের চেষ্টা করিলেও পরিশেষে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সমস্ত ঘটনার পূর্ব্বে তিনি এক বার মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া নবাবকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করেন,এবং নবাব কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া আজিমাবাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমস্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হন। তিনি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রজাগণের অনুরাগ আকর্ষণ এবং বিদ্রোহী জমীদার ও অন্যান্য লোকদিগকে বশে আনয়ন করিয়া সমস্ত প্রদেশে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সমুদয় লোক যুদ্ধ-বিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল, তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে আবদুল করিম নামে এক জন রোহিলা আফগানের অধীন ১৫ শত আফগান সৈন্য ছিল। তৎকালে আবদুল করিমের ন্যায় বলবান ও ক্ষমতাশালী লোক বিহার প্রদেশে দৃষ্ট হইত না। আলিবর্দ্দী তাহাকে আপনার প্রধান সৈনিক কর্ম্ম-

বোঝাই করিয়া ফৌজদার পাটনায় আলিবর্দ্দী খাঁর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি হলকুম্ব সেই সমস্ত ঝোড়া দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তাহাতে মৎস্য বোঝাই মনে করেন, পরে প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়াছিলেন।

(Holwell's Historical Events Pt. I. Chapt. II.)

চারীর পদ প্রদান করেন, এবং তাহার অধীনস্থ আফগানগণ তাঁহার সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যায়। তিনি আবদুল করিমের সাহায্যে দস্যুগণকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে যাবতীয় লুণ্ঠিত দ্রব্য পুনর্গ্রহণ করেন। পরে জমীদারগণকে বশে আনয়ন করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত অনাদায়ী রাজস্ব গ্রহণ করিয়া নজরানা ও পেস্কশরূপে অনেক অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এই রূপে নানাবিধ উপায়ে তাঁহার রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং তাঁহার সৈন্যগণও লুণ্ঠন দ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করে। আলিবর্দ্দীর কার্য্যদক্ষতার জন্য নবাবের অনুরোধক্রমে বাদসাহ তাঁহাকে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করেন। বিহার প্রদেশে ক্রমে শান্তি সংস্থাপিত হইলে, আলিবর্দ্দী আবদুল করিমের বর্দ্ধিত প্রতাপে অত্যন্ত ভীত ও তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠেন। অবশেষে একটী ছল ধরিয়া তিনি আবদুল করিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সাধারণের নিকট এই রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আবদুল করিমের অবাধ্যতার জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়, কিন্তু তাহার ক্ষমতার জন্য তিনি যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া এই রূপ ঘৃণিত ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আলিবর্দ্দীচরিত্র এই রূপ আরও দুই একটী ঘটনায় কলঙ্কিত হইয়াছিল। আমরা যথা স্থানে তাহার উল্লেখ করিব। এই রূপে নিষ্কণ্টক হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ ক্রমে বিহারের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন।

অষ্টেণ্ড কোম্পানী।

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে কতিপয় অষ্ট্রীয় নেদারলণ্ডবাসী পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্যব্যাপারে লাভবান হওয়ার ইচ্ছায় দুই খানি জাহাজ ভারতবর্ষাভিমুখে প্রেরণ করেন। জাহাজ দুই খানি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই

ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া অন্যান্য বণিকগণও অষ্টেণ্ড নগরে একটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া বিয়েনা রাজদরবারে অনুমতি প্রার্থনা করেন। অষ্টেণ্ড বেলজিয়ম দেশস্থ একটী সুরক্ষিত নগর ও প্রধান বন্দর। উক্ত বণিকগণের আবেদনানুসারে জর্ম্মান সম্রাট ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুমতি-পত্রানুযায়ী উক্ত বণিকসম্প্রদায় "অষ্টেণ্ড কোম্পানী" নামে অভিহিত হয়। ইহার জন্য ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নাই। যে সময়ে অষ্টেণ্ড কোম্পানী সম্রাটের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক খানি গুপ্ত জাহাজ ভাগীরথী-বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং চন্দননগরস্থ ফরাসীগণের সাহায্যে তাহা পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ ইউরোপে যাত্রা করার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ অষ্টেণ্ড কোম্পানীর জন্য কুঠী নির্ম্মাণ করার ইচ্ছায় তদানীন্তন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট ভূমি প্রার্থনা করেন। নবাব মুর্শিদকুলী আপন রাজ্যমধ্যে যাহাতে বাণিজ্য বিস্তার হয়, তাহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং ইংরাজ-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে অভিলাষী হইয়া জর্ম্মান পোতাধ্যক্ষের প্রার্থনানুসারে কলিকাতা হইতে ৭।৮ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে কুঠী নির্ম্মাণের জন্য বাঁকিবাজার নামক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অষ্টেণ্ড কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার প্রথম বৎসরে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে "এম্পারার চার্লস্" নামক ত্রিংশৎ কামানবিশিষ্ট এক খানি অষ্টেণ্ড বাণিজ্যতরী বাঙ্গলায় উপস্থিত হয়। কিন্তু ভাগীরথীতে প্রবেশ করিতে না করিতে উহা বিনষ্ট হইয়া

যায়। উক্ত জাহাজস্থিত পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশ কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারী ও নাবিকগণ বাঁকিবাজারে আশ্রয় লইয়া বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, কিন্তু ঐ সকল গৃহ স্থায়ীরূপে নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে তিন খানি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-জাহাজ বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বাণিজ্যও প্রসারিত হইতে থাকে। অন্যান্য ইউরোপীয় অপেক্ষা তাঁহারা অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করায় অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের কুঠীর প্রশংসা ব্যপ্ত হয়। * সর্ব্ব প্রথমে উক্ত কুঠীর অধ্যক্ষগণ বংশ ও চাটাই নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান ও আপনাদিগের কুঠীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া প্রত্যেক কোণে বুরুজ নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা খনিত হইয়া ভাগীরথীর সহিত যুক্ত হয়। উক্ত পরিখার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, এক মাস্তুলবিশিষ্ট পোত, পণ্যদ্রব্যসহ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিত। এই প্রকারে অষ্টেণ্ড কোম্পানী ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তিনটী ইউরোপীয় জাতির তীব্র প্রতিবাদে জর্ম্মান সম্রাট অষ্টেণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে আপন অনুমতি-পত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন, এবং এই রূপ আদেশ প্রদান করেন যে, সাত বৎসরের জন্য অষ্ট্রীয় নেদারলণ্ড বাসী কোন প্রজার সহিত পূর্ব্ব ভারতীয় কাহারও সংস্রব

* তারিখ বাঙ্গলায় লিখিত আছে যে, তাঁহারা বনাত, মখমল প্রভৃতি চটের দরে বিক্রয় করিতেন।

থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এই কঠোর আদেশসত্ত্বেও কোন কোন জর্ম্মান বাণিজ্য-জাহাজ গুপ্ত ভাবে ভারতবর্ষে আগমন করিত, এবং বঙ্গদেশীয় বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ কার্য্যদক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় তিনি ঐ সমুদয় জাহাজ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেন। এই বাণিজ্যব্যাপার গুপ্ত ভাবে পরিচালিত হইলেও তাহা ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অগোচর ছিলনা। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ "ফোর্ডউইচ" নামক রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন গস্‌ফ্রাইটের অধীন এক দল নৌসেনা ভাগীরথীর পথাবরোধের জন্য প্রেরণ করেন। গস্‌ফ্রাইট যুদ্ধ-জাহাজসহ অগ্রসর হইয়া জানিতে পারিলেন যে, দুই খানি জর্ম্মান জাহাজ কলিকাতা ও বাঁকিবাজারের মধ্যে নঙ্গর করিয়া আছে। তিনি আপন অধীনস্থ দুই দল নৌসেনা পাঠাইয়া দেন। প্রথম গোলাবৃষ্টিতে "সেন্টথেরেসা" নামক সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অষ্টেণ্ড জাহাজখানি জাতীয় পতাকা নিম্নমুখ করিলে, ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কলিকাতায় নীত হয়। কিন্তু বৃহৎ পোতখানি বাঁকিবাজার কুঠীর নিম্নে কামানের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরাজেরা উহা হস্তগত করার কোন প্রকার উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। তাহার পর সে জাহাজ খানি কোন রূপে পলায়ন করিয়া ইউরোপ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বাঁকিবাজার আক্রমণ।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে ওলন্দাজ ও ইংরাজগণ মিলিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে জর্ম্মান বাণিজ্য দূরীভূত করার ইচ্ছায় নবাবের মনোযোগ আকর্ষণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা হুগলীর ফৌজদারকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা নবাবের নিকট মিথ্যা বর্ণনা পাঠাইতে থাকেন। ফৌজদার নবাবকে জানাইলেন যে, বাঁকিবাজারস্থ জর্ম্মান কুঠী অত্যন্ত সুদৃঢ়

ও সুরক্ষিত, সরকারী বন্দরের অতি নিকটে বৈদেশিকগণকে এরূপ সুদৃঢ় দুর্গরক্ষার অনুমতি প্রদান করা কোন ক্রমে কল্যাণকর নহে। ফৌজদারের এই প্রকার আবেদনে নবাব সুজা উদ্দীন বাঁকিবাজারস্থ জর্ম্মান কুঠীকে ভূমিসাৎ করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। ইহার পর জর্ম্মান অধ্যক্ষ ও হুগলীর ফৌজদারের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ বাধিয়া উঠে। অবশেষে ফৌজদারের আদেশে মীরজাফর নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে বাঁকিবাজার আক্রমণার্থে হুগলী হইতে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। দুর্গের যে দিকে নদী ছিল না, সেই দিক হইতে মীরজাফর জর্ম্মানদিগকে আক্রমণ করিলেন। মীরজাফর আপন শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া অবরুদ্ধ জর্ম্মান সৈন্যগণের গোলাবৃষ্টি হইতে স্বীয় সৈন্যগণের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন। জর্ম্মানগণ এদিকে সম্পূর্ণ রূপে ভাগীরথী অধিকার করিয়া বসিলেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সমস্ত নৌকার গমনাগমনের বাধা দেন নাই, তাহারাই তৎকালে যাতায়াত করিতে পারিয়াছিল। চন্দননগরস্থ ফরাসীগণ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ দ্বারা জর্ম্মানদিগকে গুপ্ত ভাবে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রকাশ্যরূপে যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাঁহারা সেই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। খাজা ফজল কাশ্মীরী নামক হুগলীর জনৈক প্রধান মোগল ব্যবসায়ী এই বিবাদে মধ্যস্থ হইয়া আপনার পুত্র কাসেমকে কতকগুলি সংবাদ জানাইবার জন্য বাঁকিবাজারে প্রেরণ করেন। কিন্তু জর্ম্মানগণ নিরাপদ হওয়ার বাসনায় কুমতিবশতঃ কাসেমকে প্রতিভূস্বরূপ অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। ফৌজদার খাজা ফজলের প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহার পুত্রের জন্য কয়েক দিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। কাসেম জর্ম্মানদিগের হস্ত

হইতে মুক্তি লাভ করিলে, মীরজাফর নূতন উৎসাহের সহিত স্থলপথ ও জলপথ উভয় দিক দিয়া পুনর্ব্বার অবরোধক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বাঁকিবাজারে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হওয়ায়, যাবতীয় দেশীয়গণ উক্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল, কেবল ইউরোপীয়েরা দুর্গ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। ১৪ জন মাত্র ইউরোপীয় এরূপ অব্যর্থ ভাবে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল যে, মোগল সৈন্যের মধ্যে এক জনও পরিখার বাহিরে আসিতে সাহসী হইল না। অবশেষে দুর্ভাগ্যক্রমে একটী গোলার আঘাতে জর্ম্মান অধ্যক্ষের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হওয়ায়, তিনি রাত্রিযোগে আপন স্বজাতীয়গণের সহিত নৌকারোহণে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। ভাগীরথীর মুখের দিকে এক খানি জর্ম্মান জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, তাঁহারা তাহাতেই আরোহণ করিয়া ইউরোপাভিমুখে যাত্রা করেন। প্রাতঃকালে মোগল সৈন্যেরা জর্ম্মান কুঠী অধিকার করিয়া কোনও মূল্যবান্ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল কয়েকটী কামান ও যৎসামান্য গোলাগুলি মাত্র পতিত ছিল। মীরজাফর দুর্গটীকে ভূমিসাৎ করিলেন, এবং জমীদারের হস্তে বাঁকিবাজার অর্পণ করিয়া বিজয়দম্ভে হুগলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

* অষ্টেণ্ড কোম্পানীর সময়নির্দ্দেশসম্বন্ধে নানা প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। তারিখ বাঙ্গলার মতে মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বসময়ে জর্ম্মান বণিকগণসম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তারিখে তাঁহাদিগকে আলিমান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্ম্মে সাহেবের মতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে জর্ম্মান বণিকগণ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন। লং সাহেব তাঁহার Selections from the Unpublished Records of Government নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মানগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ রূপ চেষ্টা

ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ।

সুজা উদ্দীন আপন উদারতাপ্রযুক্ত সম্রাট ফরখ্‌সের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবগণের প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ইংরাজ ও ফরাসীদিগের অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই সময়ে ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যব্যাপারে বিশেষ লাভবান হইতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে ইংরাজদিগের সহিত একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদিগের ক্ষমতা প্রবল হইতেছিল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা কলিকাতায় মেয়র বা নগরবিচারকের পদ সৃষ্টি করেন এবং মান্দ্রাজের বিচারপ্রথার ন্যায় কলিকাতায়ও বিচারকার্য্য চলিতে থাকে। এক জন মেয়র ও কয়েক জন অল্ডারম্যান ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা সকলেই ইংরাজ।* এই রূপে যেমন কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল, বাঙ্গলায়ও ইংরাজদিগের ক্ষমতা সেই রূপ প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়। রেশমপরিপূর্ণ তাঁহাদের এক খানি নৌকা হুগলীর ফৌজদারকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে, কলিকাতা হইতে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়া ফৌজদারকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক রেশম ও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্যের উদ্ধার সাধন করে। এই ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইহাকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। অচিরাৎ দেশীয়গণের উপর এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইল যে,

করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজদিগের প্রবল প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু অষ্টেণ্ড কোম্পানীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের কুঠী বর্ত্তমান ছিল, ও ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের শেষ জাহাজ কয়েক খানি বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে। Stewart's Bengal p. p. 263-266.)

* Marshman's Bengal P. 98.

কলিকাতা বা তদধীনস্থ অন্য কোন ইংরাজ কুঠীতে কেহ শস্যাদি প্রদান করিতে পারিবে না। ইহাতে ইংরাজেরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা অবশেষে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া ও আপনাদিগের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, এই দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। * এই রূপে অব্যাহতি পাইয়া ইংরাজেরা অবাধ বাণিজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। যদিও এই সময়ে তাঁহাদের বাণিজ্য দিন দিন প্রসারিত হইতেছিল, তথাপি সুবন্দোবস্তের অভাবে তাঁহারা তাদৃশ লাভ করিতে পারিতেন না। ইংরাজেরা বৎসরে শতকরা ৮ টাকা হারে লাভ করিতেন, কিন্তু ওলন্দাজদিগের ২৫ টাকা হারে লাভ হইত। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ গুপ্ত ব্যবসায় পরিচালনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। যদিও কলিকাতার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ তিন শত টাকার অধিক বেতন পাইতেন না, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ বিলাসাড়ম্বরে সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহা উক্ত বেতনের দ্বারা সংকুলান হইত কি না সন্দেহ। গুপ্ত ব্যবসায়ের লাভ হইতে তাঁহাদের বিলাসলালসা পরিপূর্ণ হইত। মুসল্মান-রাজত্বে বাস করিয়া, চতুর্দ্দিকে বিলাসের স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া, তাঁহারা যে সে স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সম্রাট ফরখ্‌সেরের অনুগ্রহে তাঁহাদের হৃদয়ে বিপদের কিছু মাত্র আশঙ্কা ছিল না, আপনাদিগের সুখভোগের জন্য যাহা অভিলাষ করিতেন, কামদুঘা বঙ্গভূমি হইতে তাহা অনা-

* Stewart p. 260.

য়াসে সম্পন্ন হইত। কত কত সাগর, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে দূরে পরিহার করিয়া, একমাত্র অর্থান্বেষণের জন্য তাঁহারা এই ভারতবক্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যদি সুখভোগের জন্য সে অর্থ ব্যয়িত না হইল, তবে তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার কেন? এবং সেই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য যদি ক্ষীণপ্রাণ ভারতবাসিগণ বিপন্ন হয়, তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী হইতে পারেন না। অর্থোপার্জ্জন ও সুখস্বচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এবং তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহা প্রতিপালনের চেষ্টা করিতে ক্রটি করিতেন না। ফলতঃ এই সময়ে কলিকাতাস্থ ইংরাজগণ অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠেন। ইংরাজ কোম্পানীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ও তাঁহার অধীনস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও ষড়শ্বসংযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া ভাগীরথীতীরস্থ নব নগরী কলিকাতাহৃদয়ে সর্ব্বদা আতঙ্ক উপস্থিত করিতেন, এবং সঙ্গীতসুধায় কর্ণ শীতল করিতে করিতে তাঁহাদের ভোজনকাল অতিবাহিত হইত।* ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বিলাসের কথা ইংলণ্ডে রাষ্ট্র হইলে ডিরেক্টর-গণ তাঁহাদের উক্ত ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিয়া-ছিলেন কি না, সে বিষয়ে বিশেষ রূপ সন্দেহ আছে। ফরাসী বণিকগণ কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁহাদের বাণিজ্যকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে কার্য্যদক্ষ রাজনীতিবিশারদ সুচতুর ডিউপ্লের পরামর্শে কার্য্য করিতেন। ডিউপ্লে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪২ অব্দ পর্য্যন্ত চন্দননগরের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত

* Marshman p. 104.

ছিলেন। তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানকালে কিছু দিন তিনি মুর্শিদাবাদের নিকট সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। যৎকালে ডিউপ্লে চন্দননগরে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে ফরাসীদিগের বাণিজ্য-লক্ষ্মী দিন দিন সমৃদ্ধিশালিনী হইতেছিলেন। ডিউপ্লে শাসনকর্ত্তা হওয়ার পূর্ব্বে এক জন প্রধান বণিক ছিলেন, এবং তাঁহারই উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে চন্দননগরে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের বার খানির অধিক বাণিজ্য-জাহাজ ছিল না, কিন্তু তদ্দ্বারাই ফরাসীরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন। ডিউপ্লের শাসনসময়ে চন্দননগরে দুই সহস্র ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, এবং ফরাসীদিগের ক্ষমতা বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ক্রমে সেই ক্ষমতার বলে এক দিন তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে ক্ষমতা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইংরাজ বণিকদিগের ঈর্ষ্যাগ্নিতে তাঁহারা অচিরকালমধ্যে পতঙ্গপ্রায় ভস্মীভূত হইয়া যান।

মুর্শিদকুলী খাঁ ও মীর হাবীব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সুজা উদ্দীন স্বীয় জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁকে ঢাকার নায়েব নাজিমী পদ প্রদান করেন। মুর্শিদকুলী মীর হাবীব নামক জনৈক ব্যক্তিকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজে মীর হাবীবের জন্ম হয়। মীর হাবীব হুগলীতে সওদাগরগণের দালালী কার্য্য করিত। যদিও সে লেখাপড়া জানিত না, তথাপি অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই ব্যক্তি অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিত। নৌবিভাগ, তোপখানা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ব্যয় লাঘব করিয়া মীর হাবীব প্রতিপত্তি লাভ করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত করিয়া সে

মুর্শিদকুলী খাঁকে অনেক অর্থের উপায় করিয়া দেয়। এই মীর হাবীব একটী ভীষণ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল। মুরউল্লা নামক জালালপুরের জমীদার অত্যন্ত অর্থশালী ছিলেন। মীর হাবীব তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনে ও ঘাতকের দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করে। পরে তাঁহার ধন, জহরত এবং অন্যান্য সম্পত্তি অধিকার করিয়া মুর্শিদকুলীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ধনবান্ হইয়া উঠে।

ত্রিপুরাবিজয়।

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ত্রিপুরারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎরাম ঠাকুর বলদাখালের জমীদার আকা সাদেকের সাহায্যে মীর হাবীবের সহিত মিলিত হন। সেই সময়ে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, মীর হাবীব সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়া মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চেষ্টা করে। মীর হাবীব মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বারা নবাবের অনুমতি আনাইয়া এক দল সৈন্যসহ ত্রিপুরায় উপস্থিত হয়। জগৎরাম ঠাকুর তাহাদের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। কমিল্লার নিকট ত্রিপুরাসৈন্যের সহিত মীর হাবীবের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ধর্ম্মমাণিক্যের উজীর কমলনারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন।* ধর্ম্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর মীর হাবীব জগৎরাম ঠাকুরকে "রাজা জগৎমাণিক্য"

* মীর হাবীব কমিল্লার নিকটবর্ত্তী যোলনল গ্রামস্থিত কমলনারায়ণের বাসভবন লুণ্ঠন ও অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

আখ্যা প্রদান করিয়া ত্রিপুরার রাজা বলিয়া ঘোষণা করে।* মীর হাবীব ত্রিপুরা জয় করিলেও পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই। কেবল ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, এবং জগৎরাম তাহারই রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সুজা উদ্দীন ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রকে চাকলা রোসেনাবাদ আখ্যা প্রদান করিয়া রীতিমত তাহার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহার জায়গীর ও হস্তীধরার খরচ বাদে খালসার জমা নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজা জগৎরামমাণিক্যকে সাহায্য করার জন্য কমিল্লায় এক দল মোগল সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল, এবং আকা সাদেক ত্রিপুরার ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাহাদুর ও মীর হাবীব খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য এই রূপে লাঞ্ছিত হইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন ও জগৎশেঠের সাহায্যে নবাবের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে, নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহাকে চাকলা রোসেনাবাদ পুনঃপ্রদানের জন্য মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি আদেশ দেন, কিন্তু রাজা উক্ত চাকলার জন্য

* ত্রিপুরারাজবংশীয়দিগের রাজমালায় উক্ত বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"তদাসীৎ ত্রৈপুরে রাজা ধর্ম্মমাণিক্যনামকঃ।
মহাবলমদোন্মত্তো দিল্লীশে ন দদৌ করং॥
ততঃ সুজাখ্যযবনো দিল্লীশপ্রতিরূপকঃ।
জগন্মাণিক্যভূপালমসংখ্যৈঃ সহ সৈনিকৈঃ॥
মহাবলপরাক্রান্তৈস্ত্রৈপুরে সংন্তবোজয়ৎ॥
জগন্মাণিক্যভূপাল স্ত্রৈপুরে সমুপস্থিতঃ॥
অতীব তুমুলং কৃত্বা ধর্ম্মমাণিক্যভূপতিং।
পরাজিত্যাঽভবদ্রাজা ত্রৈপুরেশো মহাবলঃ।

বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা অতিরিক্ত রাজস্বপ্রদানে আদিষ্ট হন। তদবধি ত্রিপুরারাজগণ কেবল চাকলা রোসেনাবাদের জন্য বাঙ্গলার জমীদার শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার খর্ব্ব হয়। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরারাজ পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় স্বাধীন ও চাকলা রোসেনাবাদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধীন।

মহম্মদ তকী ও সরফরাজ খাঁ।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তকী উড়িষ্যা হইতে স্বীয় পিতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। তাঁহার মুর্শিদাবাদে অবস্থিতিসময়ে, সরফরাজ খাঁর সহিত অত্যন্ত বিবাদ ঘটিয়াছিল, এমন কি উভয়ের মধ্যে রীতি মত যুদ্ধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হয়, কিন্তু সুজা উদ্দীন ও বেগমগণের চেষ্টায় সে গোলযোগ মিটিয়া যায়। তাহার পর মহম্মদ তকী কটকে প্রত্যাগমন করেন, এবং পর বৎসরে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যায়।

মহম্মদ তকীর মৃত্যুর পর সুজা খাঁ মুর্শিদকুলী খাঁ বাহাদুরকে রস্তমজঙ্গ উপাধি প্রদান করিয়া উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। মুর্শিদ স্বীয় দেওয়ান মীর হাবীবকেও উড়িষ্যায় লইয়া যান। মীর হাবীবের যত্নে উড়িষ্যার রাজস্ব বৃদ্ধি ও ব্যয়ের লাঘব হইয়াছিল। মহম্মদ তকীর শাসনকালে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথদেবের বিগ্রহ লইয়া উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া চিল্কা হ্রদের পারে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরীর যাত্রীগণের নিকট হইতে অনেক কর আদায় হইত বলিয়া সেই সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশের প্রায় বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা আয়ের ক্ষতি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ ও মীর হাবীব প্রথমে পুরুষোত্তমের রাজাকে জগন্নাথের মূর্ত্তিসহ পুরী

আগমন করিতে ও পুরাতন দেব মন্দিরে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন, এবং তাঁহার প্রতি সকল প্রকার অত্যাচারনিবারণেরও চেষ্টা করেন। ইহাতে ও অন্যান্য বন্দোবস্তে ক্রমে ক্রমে উড়িষ্যা প্রদেশের আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঢাকা ও যশোবন্ত রায়।

মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা হইতে উড়িষ্যায় গমন করিলে সুজা উদ্দীন সরফরাজ খাঁকে ঢাকার কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সৈয়দ ঘলেব আলি খাঁ নামক পারস্যের সাহবংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে তাঁহার সহকারীরূপে ঢাকায় প্রেরণ করিতে আদেশ দেন। এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর মুন্সী ও সরফরাজের শিক্ষক যশোবন্ত রায়কে * ঢাকার দেওয়ান মনোনীত

* এই যশোবন্ত রায়কে কেহ কেহ মেদিনীপুরস্থ কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহ মনে করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহার অবতারণা করেন, ও পরে দেখিতেছি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু যশোবন্ত রায় ও যশোমন্ত সিংহ, এক ব্যক্তি কিনা তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই, একমাত্র প্রমাণ এই যে, উভয়ের নামের সামঞ্জস্য আছে ও উভয়ে সমসাময়িক, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। অপর দিকে তাঁহাদের বিভিন্নতাসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। কর্ণগড়াধিপতি রাজা যশোমন্ত সিংহ বহু পুরুষ হইতে মেদিনীপুর প্রদেশের রাজা ছিলেন। যশোমন্তের পিতা রামসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া কবিবর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন। ১৬৩৪ শাকে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্ত সিংহের রাজসভায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সুতরাং তৎকালে রাজা যশোমন্ত যে কর্ণগড়ে বিদ্যমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার সেই সময়ে আমরা দেখিতেছি যে, যশোবন্ত রায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মুন্সীর কার্য্য ও সরফরাজ খাঁর ওস্তাদী বা শিক্ষকতা করিতেছেন। যশোমন্ত সিংহেরা যেরূপ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে নবাবের মুন্সীগিরি বা নবাবদৌহিত্রের ওস্তাদী করিতে আসা কদাচ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কোন প্রদেশের সহকারী শাসন

করা হয়। যশোবন্তই প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। সরফরাজের ভগিনী নফিসা বেগমের অনুরোধে তাঁহার পুত্র ও সরফরাজের জামাতা মোরাদ আলির * প্রতি নাওয়াড়া বা নৌবিভাগের ভার অর্পিত হয়। এই সময়ে রাজবল্লভ নৌবিভাগের মোহরের ছিলেন, এই রাজবল্লভ পরে রাজা রাজবল্লভনামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। যশোবন্ত রায় নবাবের আদেশ-ক্রমে রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হন। যশো-বন্ত নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া ছিলেন, এবং আপনার সাধুতা, ন্যায়পরতা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাভাজন হন। তিনি রাজ্যের সুবিধা ও প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। যশোবন্ত মীর হাবীবের প্রচলিত একচেটিয়া বন্দোবস্ত ও শস্যের উপর অতিরিক্ত কর উঠাইয়া দেন। যৎকালে সায়েস্তা খাঁ ঢাকা হইতে দিল্লী যাত্রা করেন, সেই সময়ে তিনি ঢাকার মগরবী কেল্লার পশ্চিম তোরণ-দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে এইরূপ খোদিত করিয়াছিলেন যে, যদি কোন শাসনকর্ত্তা এক সের চাউলের মূল্য এক দামড়ী (পয়সায়) নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি এই দ্বার উন্মুক্ত

কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলে, আমরা দুজনের অভেদে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতে পারিতাম। বিশেষতঃ দুই জনের উপাধির সম্পূর্ণরূপ ও নামেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ঢাকাপরিত্যাগের পর যশোবন্ত রায় মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিতেন। সরফরাজ খাঁর রাজত্বকালে তাহাকে একবার রায়-রায়ানের পদপ্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল। ফলতঃ মেদিনীপুররাজ যশোবন্ত সিংহ যশোবন্ত রায় হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই আমাদের ধারণা।

* মোরাদ আলি সৈয়দ রেজা খাঁর পুত্র।

করিতে পারিবেন। সায়েস্তা খাঁর সময়ে উক্ত হারে চাউল বিক্রীত হইত। যশোবন্ত রায় সায়েস্তা খাঁর নির্দ্দেশানুযায়ী তাঁহার সময় অপেক্ষা এক সের চাউল টাকায় অধিক বিক্রয় করা নির্দ্দেশ করিয়া, উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দেন। এই রূপ সুবিবেচনার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালিত হওয়ায়, ঢাকা প্রদেশের যাবতীয় ভূভাগ কর্ষণোপযোগী হইয়া উঠিল। এবং অধিবাসিগণ অত্যন্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। সরফরাজ খাঁ ঘালেব আলি ও যশোবন্ত রায়ের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল. কিন্তু অধিক দিন এরূপ ভাবে অতিবাহিত হইতে পারিল না। নবাব বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হওয়ায়, সরফরাজের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, হাজী আহম্মদ ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে কার্য্য করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু সরফরাজ তাঁহার সে উপদেশে তাদৃশ মনোযোগ না করায়, হাজীর সহিত ক্রমশঃ তাঁহার মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি নিজের ইচ্ছামত যাবতীয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। স্বীয় ভগিনী নফিসা বেগমের অনুরোধক্রমে সরফরাজ ঘালেব আলিকে ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া. মোরাদ আলির হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন। মোরাদ রাজবল্লভকে নৌবিভাগের পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মোরাদ অত্যন্ত অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন। যশোবন্ত রায় পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করিয়া এক্ষণে দুর্নামের ভাগী হইতে অনিচ্ছুক হইয়া, কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। যশোবন্ত ঢাকা পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রদেশে যারপরনাই অত্যাচার উপস্থিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য ও ধ্বংস অগ্রসর হইয়া ঢাকাপ্রদেশে হাহাকার আনয়ন করে।

দিনাজপুর ও কোচবিহার।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হাজী আহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহম্মদ রঙ্গপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি রঙ্গপুর প্রদেশে অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দিনাজপুররাজ ও কোচবিহাররাজ সেই অত্যাচারের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দিনাজপুররাজ রামনাথ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে মধ্যে মধ্যে সরকারের সাহায্য করায়, তাঁহার জমীদারী ক্রোকসঁাজোয়ালের হস্তে পতিত হয় নাই। নবাব সুজা খাঁও তাঁহার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্রমে রামনাথ বাদসাহদরবার হইতে মহারাজা উপাধি ও খেলাত প্রাপ্ত হন। বাদসাহ ও নবাবের নিকট হইতে ঐরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া রামনাথ ফৌজদার সৈয়দ আহম্মদকে তাদৃশ গ্রাহ্য করিতেন না, এবং রামনাথের অপরিমিত ধনসম্পত্তির কথা শুনিয়া, সৈয়দ আহম্মদও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে দমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি নবাবের নিকট এই রূপ বলিয়া পাঠান যে, দিনাজপুররাজ নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। নবাব তাহা শুনিয়া হাজীর পরামর্শক্রমে রঙ্গপুরে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সৈয়দ আহম্মদ সহসা দিনাজপুর আক্রমণ করিয়া রাজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন। রামনাথ সপরিবারে গোবিন্দনগরে পলায়ন করিয়া কোন রূপে আত্মরক্ষা করেন। পরে গঙ্গাস্নানের ছলে মুর্শিদাবাদে গিয়া, নবাবকে সমস্ত কথা জ্ঞাত করাইলে, নবাব তাঁহাকে স্বরাজ্যে গমনের অনুমতি দেন, ও সৈয়দ আহম্মদকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। * রামনাথ দিনাজপুর গিয়া নবাবকে

* দিনাজপুররাজবংশের মতে রামনাথ মুর্শিদাবাদ হইতে সৈন্য আনা-

বহুমূল্য জহরতাদিসহ উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে সৈয়দ আহম্মদ কোচবিহারও আক্রমণ করিয়াছিলেন। কোচবিহার-রাজ উপেন্দ্রনারায়ণ অনেক দিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান থাকায়, তিনি দেওয়ানদেব সত্যনারায়ণের পুত্র দীননারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। দীননারায়ণকে রাজা যারপরনাই স্নেহ করিতেন। ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণদেবের পরামর্শে রাজার মৃত্যুর পর আপনাকে সমস্ত রাজ্য প্রদান করার জন্য দীননারায়ণ রাজার নিকট এক খানি সনন্দ প্রার্থনা করে। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে, দীননারায়ণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সৈয়দ আহম্মদের শরণাপন্ন হয়। * সৈয়দ আহম্মদ দীননারায়ণের প্ররোচনায় কোচবিহার আক্রমণে অগ্রসর হন। ঝাড়াসিংহেশ্বর নামক স্থানে উভয় পক্ষের সংগ্রাম হইয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ প্রথমতঃ জয় লাভ করিলেও, ভোটানরাজের সহায়-তায় উপেন্দ্রনারায়ণ মুসল্‌মান সৈন্যদিগকে দেশ হইতে পরিশেষে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কোচবিহার প্রথমে জয় করায় হাজীর অনুরোধে নবাব সৈয়দ আহম্মদকে খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

ইয়া সৈয়দ আহম্মদের প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষেও ইহা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হাজীর পুত্র সৈয়দ আহম্মদের প্রাণনাশ করা নবাব সুজা-উদ্দীনেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ফলতঃ সৈয়দ আহম্মদ তাহার পর ইতিহাসের অনেক ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছিলেন।

* সৈয়দ আহম্মদের স্থলে কেহ কেহ ইঁহাকে মহম্মদ আলি বলিয়াছেন। কোচবিহারের ইতিহাসলেখক ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুরের ফৌজ-দার সৈয়দ আহম্মদের পরিবর্ত্তে ঢাকার সুবেদার মহম্মদ আলি বলিয়া লিখিয়াছেন, তৎকালে ঢাকায় সুবেদার থাকিতেন না। নায়েব সুবেদারের নাম মোরাদ আলি ছিল। মোরাদ আলি সৈয়দ আহম্মদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ সৈয়দ আহম্মদ কর্ত্তৃকই কোচবিহারজয়ের কথা বলিয়া থাকেন।

বীরভূমের জমীদার বদ্য-উল-জমান জমীদারীবন্দোবস্তের সময় করপ্রদানে স্বীকৃত হইলেও আপনাদের জাতিগত ও বংশগত স্বাধীনতা প্রকাশে ইচ্ছুক হন। তিনি সমস্ত জমীদারীর আয় ফকীর ও ছাত্রদিগের সাহায্যে ও নৃত্যগীতাদি আমোদপ্রমোদে ব্যয় করিতেন। সেই জন্য সরকারের রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন না, ও তাহা প্রদান করিতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নিজে জমীদারীর কোন বিষয় পরিদর্শন করিতেন না। আজম খাঁ ও আলিকুলী খাঁ নামে ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার জমীদারীর ও সৈন্যগণের তত্ত্বাবধান করিত, এবং নহবৎ খাঁ দেওয়ানের প্রতি সমস্ত বিষয়ের ভার ন্যস্ত ছিল। বদ্য-উল-জমান নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, সুজা উদ্দীন সরফরাজ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সরফরাজ বদ্য-উল-জমানকে বশ্যতা স্বীকার করিতে লিখিয়া পাঠাইয়া, দ্বিতীয় বক্সী মীর সরফ উদ্দীন ও খাজা বসন্তকে সসৈন্যে বৰ্দ্ধমানের পথে প্রেরণ করেন। বদ্য-উল-জমান পরে বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়া, সরফ উদ্দীন ও বসন্তের নিকট স্বীকার-পত্র অর্পণ করেন। পরে নিজে মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাবকে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে বলেন, ও বৰ্দ্ধমানরাজ কীৰ্ত্তিচন্দ্রকে রাজস্বের জামিন দিয়া বীরভূমে ফিরিয়া যান।

বীরভূমের বদ্য-উল-জমান।

খৃষ্টীয় ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর রজনীযোগে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইয়া প্রশান্ত-সলিলা ভাগীরথীহৃদয় আলোড়ন করিয়া প্রলয়-কালের ন্যায় সংহারমূৰ্ত্তিতে বঙ্গভূমি ধ্বংস করিবার জন্য প্রায় শত

ভাগীরথীবক্ষে ভীষণ ঝটিকা।

ক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। নদীর উভয় তীরস্থ গ্রাম, নগরসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হয়। কত শত গৃহ, অট্টালিকা যে ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় নাই। কত শত দরিদ্র কৃষকের পর্ণকুটীর, কত শত গৃহপালিত পশু স্রোতে ভাসিয়া দিগ্-দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কেহই তাহার সংখ্যা করিতে পারে নাই। গগনস্পর্শী বৃক্ষসমূহ ঝটিকার আঘাতে বসুন্ধরাবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরে সলিলপ্রবাহে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়। রাশি রাশি শস্য-স্তূপ কেবল সলিলোদরমাত্রই পূর্ণ করিয়াছিল। ফলতঃ সেই ঝটিকান্দোলিত প্রবল সলিলপ্রবাহের মুখে যাহা কিছু পতিত হইয়াছিল, তাহাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া চিরদিনের জন্য বিলয়প্রাপ্ত হয়। যত দূর পর্য্যন্ত লোকের দৃষ্টি গিয়াছিল, তত দূর পর্য্যন্ত কেবল পর্ব্বতপ্রমাণ সলিলরাশি যেন বিশ্ব গ্রাস করিবার জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছিল। প্রাণিগণের আর্ত্তনাদে, ঝটিকার ভীষণশব্দে, সলিলপ্রবাহের প্রবল ধ্বনিতে, চতুর্দ্দিক শব্দায়মান হইয়া, যেন প্রলয়কালের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল। ফলতঃ এরূপ দুরন্ত ঝটিকার আঘাতে বঙ্গভূমি যে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ গ্রামসমূহ সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শস্যরাশি পৃথিবীবক্ষ হইতে একেবারে বিধৌত হইয়া যায়। লক্ষ লক্ষ প্রাণী সলিলোদরে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়াছিল। স্বাভাবিক নদীবক্ষ হইতে প্রায় ২৭।২৮ হাত উর্দ্ধে জলপ্রবাহ উত্থিত হইয়া গ্রামনগরাদির ধ্বংস আনয়ন করিয়াছিল। তিন লক্ষ লোক এই ঝটিকায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। বিংশতি সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ জাহাজ ও নৌকা ভাগীরথীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজদিগের ৯ খানি জাহাজের মধ্যে ৮ খানি প্রায় ক্রোশান্তে নিক্ষিপ্ত

হইয়া বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের অগ্রভাগে সংলগ্ন হইয়াছিল। কলিকাতার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ইংরাজদিগের নব নগরী কলিকাতা রাশি রাশি ভগ্ন গৃহস্তূপে অত্যন্ত দীন ভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই প্রবল ঝটিকার সময় আবার ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া প্রায় দুই শত অট্টালিকাকে বসুন্ধরাশায়ী করে। ইংরাজদিগের ভজনালয়ের বিরাট শীর্ষস্তম্ভ ভগ্ন না হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। এই রূপে কলিকাতা নানাপ্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। কলিকাতার ন্যায় অনেক নগর এই রূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। বৈদেশিক বণিকগণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আর হতভাগ্য বঙ্গবাসিগণের অবস্থা বর্ণনাতীত। নিঃস্ব অক্ষম বঙ্গবাসিগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ কবিতে পারে নাই। এই ঝটিকার প্রবল আঘাতে ও সলিলপ্রবাহের গগনস্পর্শী উচ্ছ্বাসে যাবতীয় শস্য বিনষ্ট হওয়ায়, পর বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বঙ্গভূমিতে হাহাকার আনয়ন করিয়াছিল। হতভাগ্য বঙ্গবাসিগণ অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া দিন দিন মৃতকল্প হইতে আরম্ভ হয়। লক্ষ লক্ষ প্রাণী ঝটিকায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, অবশিষ্টগুলি দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইয়া বঙ্গভূমিকে অধিবাসীহীন করিয়া বিরাট শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ কহিয়া থাকেন যে, কলিকাতার শাসনকর্ত্তা দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসিগণকে দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ প্রজাদের রাজস্ব গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু অনেক স্থলে তাগাবী প্রদান করিয়াছিলেন। চাউলের শুল্ক উঠাইয়া দিয়া, অনেক পরিমাণে চাউল বিতরিত হইয়াছিল। এই রূপে তাঁহারা দরিদ্র বঙ্গবাসিগণের সাহায্যের জন্য

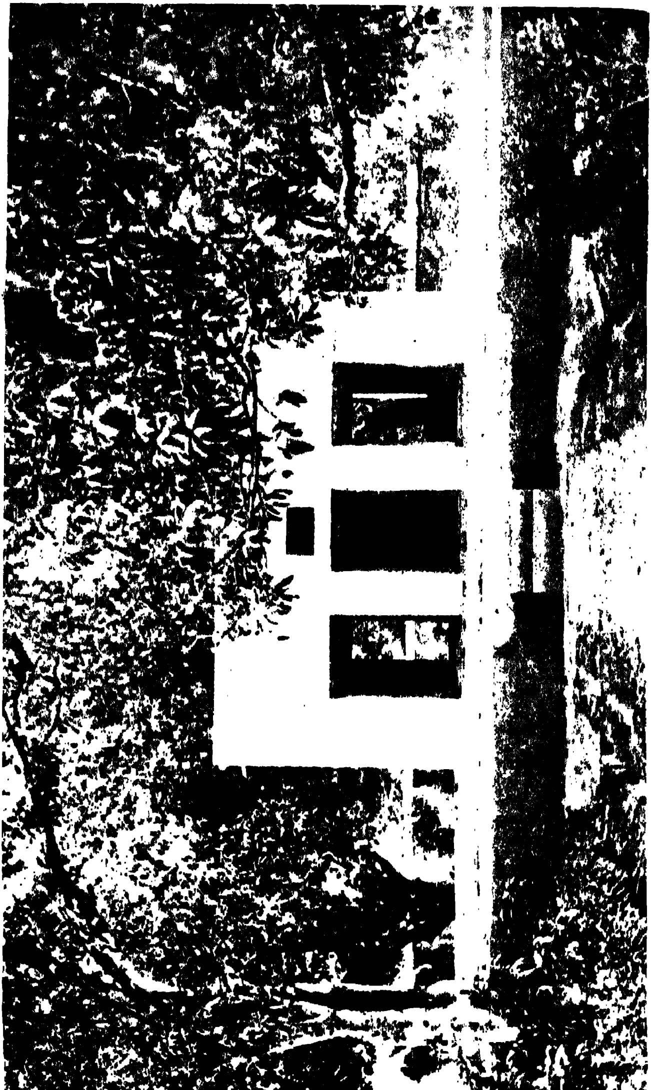
বিশেষ রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। * ফলতঃ সেই প্রবল ঝটিকায় ও ভীষণ দুর্ভিক্ষে বঙ্গভূমির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেক দিন বঙ্গবাসিগণ বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

আলিবর্দ্দীবংশীয়গণের স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা ও সুজার মৃত্যু।

সুজা উদ্দীন বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলে, হাজী আহম্মদের বংশ ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইবার প্রয়াস পাইতে থাকে। তাঁহাদের শত্রুপক্ষগণ আলিবর্দ্দী বংশীয়দিগের প্রতি নবাবের সম্মান ও অনুগ্রহের জন্য ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া এই রূপ প্রকাশ করে যে, তাঁহারা স্বাধীন হওয়ার জন্য, পাটনায় অর্থসঞ্চয় ও দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁকে পাটনার শাসনকর্ত্তা করার চেষ্টা করিতেছেন। আলিবর্দ্দীবংশীয়েরা তৎকালে কার্য্যতঃ ঐরূপ না করিলেও তাঁহাদের মনে যে সে প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, আলিবর্দ্দী সরফরাজ খাঁকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়েরই শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সুতরাং এক সময়ে তাঁহাদের যে ঐরূপ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহা অনুমিত হইতে পারে। † এই সময়ে

* Marshman p. 105.

† হলওয়েল বলেন যে, আলিবর্দ্দী ও হাজী পরামর্শ করিয়া স্বাধীন ভাবে পাটনাগ্রহণের চেষ্টা করিতেছিলেন, সুজা উদ্দীন জানিতে পারিয়া হাজীকে অবমানিত করিয়া কিছু দিন বন্দীভাবে রাখেন। পরে আলিবর্দ্দীর অনুনয়পূর্ণ পত্রে ও অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অনুরোধে মুক্ত হইয়া হাজী পুনর্ব্বার নবাবের কৃপা লাভ করেন। আলিবর্দ্দী ইহাতে নিশ্চিন্ত না হইয়া গোপনে খাঁ দুরানকে উৎকোচ প্রদান করিয়া সম্রাটদরবার হইতে বিহারশাসনের স্বতন্ত্র অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে সুজা অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।



নাদিরসাহা দিল্লী আক্রমণ করিয়া তথায় ভয়াবহ কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন। সুজা উদ্দীন আপনার অন্তিম সময় উপস্থিত জানিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর পত্নী দোর্দ্দানা বেগম ও তাঁহার পুত্র এহিয়াকে উড়িষ্যায় যাইতে অনুমতি দেন। সরফরাজের পরামর্শে তাঁহারা মুর্শিদকুলীর সদ্ব্যবহারের প্রতিভূস্বরূপ মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুজা উদ্দীন স্বীয় পুত্র সরফরাজকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া, হাজী আহম্মদ, রায়রায়ান ও জগৎশেঠের পরামর্শানুযায়ী রাজকার্য্যপরিচালনের উপদেশ প্রদান করেন। সরফরাজ যদিও তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তথাপি মুমূর্ষু পিতার অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় অগত্যা সুজা উদ্দীনের কথায় স্বীকৃত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে প্রজাহিতৈষী উদারহৃদয় নবাব সুজা উদ্দীন ১১৫১ হিজরীর ১৩ই জেলহজ্জ বা ১৭৩৯খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।* ডাহাপাড়ায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ঐ স্থানকে এক্ষণে রোশনীবাগ বলিয়া থাকে। †

তিনি মনোভাব গোপন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানের অবসর দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সত্বর তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, হাজী অন্তঃপুর হইতে গোপনে এই সংবাদ জানিতে পারেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব আলিবর্দ্দীর উক্ত চেষ্টায় সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের নিকট তাহা প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না।

* সুজা উদ্দীনের সহসা মৃত্যু হওয়ায় তৎকালে অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, হাজীকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়।—Hollwell.

† মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর রোশনীবাগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সুজা উদ্দীন অত্যন্ত দয়ালু, ন্যায়বান ও লোকহিতপরায়ণ নবাব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদার-অন্তঃকরণের শাসনকর্ত্তা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদার-চরিতদিগের নিকট সমগ্র বসুন্ধরাই আত্মীয়স্বরূপ। আমরা সুজা-উদ্দীনের চরিত্র হইতে ইহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারি। পরদুঃখনিবারিণী দয়া পরিণীতা প্রণয়িনীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিত। লোকের উপকারের জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত থাকিতেন। আত্মীয় হউক, পর হউক, জানিত হউক, অজানিত হউক, যে তাঁহাকে বিপদের কথা জানাইত, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতীকারে বিশেষ রূপ যত্নবান হইতেন। কর্ম্মচারিগণকে তিনি আপন পরিবারের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাহাদের উপকারার্থে তিনি অবিরত মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পরোপকারসংক্রান্ত ঘটনা প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। তাঁহার শ্বশুর মুর্শিদকুলী খাঁর চরিত্র হইতে তাঁহার চরিত্র পৃথক ছিল। কুলী খাঁর চরিত্র কঠোরতাপ্রবণ ও সুজার চরিত্র কোমলতাপূর্ণ ছিল। মুর্শিদ-কুলী খাঁ যে হতভাগ্য জমীদারগণকে চিরকারারুদ্ধ করিয়া বঙ্গের রাজস্ববৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুজা উদ্দীন রাজ্য প্রাপ্ত হইবামাত্র প্রথমে তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করেন। কিন্তু তিনি যেরূপ জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও জমীদারদিগকে আশু করভার হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, তথাপি অতিরিক্ত আবওয়াবের সৃষ্টি করিয়া জমীদার ও প্রজাবর্গকে করভারে নিপীড়িত করা তাঁহার ন্যায় কোমলহৃদয় নবাবের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। আমরা এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার সদ্ব্যবহারে জমীদার ও প্রজারা অতিরিক্ত করপ্রদানেও অসন্তুষ্ট হইত না। জগতে সাধু

সুজা উদ্দীনের চরিত্র ও তৎসমালোচনা।

ব্যবহারে যে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়, সুজা উদ্দীন তাহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। তাঁহার উদার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার কার্য্যে পাছে কাহারও কোন ক্ষতি হয়, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। হিন্দু, মুসল্মান তাঁহার চক্ষে সমান ছিল। মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক হিন্দুদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া সুজা উদ্দীন তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত কঠোরহৃদয় ব্যক্তি হত-ভাগ্য হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বে কলঙ্ক প্রদান করিয়াছিল, যাহারা হিন্দুদিগের দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া নবাবের সমাধিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করে, সুজা তাহাদিগের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি মুসল্মান কর্ম্মচারীরা যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ রূপ দৃষ্টি ছিল। ফলতঃ তাঁহার চক্ষে হিন্দু মুসল্মানের কোনই পার্থক্য ছিল না। হিন্দু উপযুক্ত হইলে তাঁহার আদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত। তাঁহার মন্ত্রিসভাস্থ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদ উভয়ে হিন্দু ছিলেন, নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহাদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এমন কি, মৃত্যুসময়ে স্বীয় পুত্রকে তাঁহাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া যান। যশোবন্ত রায়কে উপযুক্ত জানিয়া তিনি ঢাকার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। সুজা উদ্দীনের উদার হৃদয়ের কথা মুতাক্ষরীণকার বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুজা উদ্দীনের যাবতীয় সদ্গুণের বিষয় উল্লেখ করা দুরূহ, এবং মুতাক্ষরীণের ন্যায় ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সুজা উদ্দীনের অধীনে এমন কোনও কর্ম্মচারী ছিল না যে, তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু অনুগ্রহ

প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সুজা উদ্দীন বিচার ও যুদ্ধসংক্রান্ত সকল কর্ম্মচারীকে দুই মাসের বেতন উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈন্য, গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ভৃত্য, এমন কি অন্তঃপুরস্থ সামান্য দাসী পর্য্যন্ত সে অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয় নাই, এবং মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট আপনার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুজা উদ্দীন এই প্রকার উদারহৃদয় ছিলেন যে, সাধারণে তাঁহার সহিত পরিচিত ও সকলেই তাঁহার অনুগ্রহভাজন ছিল। তাঁহার জন্মস্থান বুরহানপুরে যে সমস্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলেন, অথবা যাহাদের কথা স্মরণ বা শ্রবণ করিতেন, তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে যত্নবান হইতেন। যদি কোন ভদ্রলোক মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাহার পর সেই ভদ্রলোকের কোন আত্মীয় থাকিলে তাঁহার আবেদনে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ বা আংশিক রূপে পূরণ করিতেন। যদি কাহারও কোন আত্মীয় না থাকিত, তিনি নিজেই যেন তাহার আবেদন পাইয়াছেন. এই রূপ ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেন। যে সমুদয় কর্ম্মচারীর দ্বারা তিনি অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতেন, তাঁহারা গৃহীতার নিকট হইতে তাহার কণামাত্রও গ্রহণে চেষ্টা করিতেন না। এই সময়ে অনেক স্থলে গৃহীতাদের নিকট হইতে অত্যাচারপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করার নিয়ম অনেক স্থলে প্রচলিত ছিল। * কিন্তু সুজা উদ্দীনের

* মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক মনে করিয়াছেন যে, মুতাক্ষরীণকার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, যদিও ইংরাজদিগের অধিকবেতনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ এই রূপ অত্যাচারী

কর্ম্মচারিগণ সেরূপ অত্যাচার করিতে বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ ছিলেন। যদি কাহারও এই রূপ অত্যাচারের কথা প্রকাশ পাইত, তিনি জ্ঞাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া গৃহীতাকে অধিকতর সাহায্য করিতেন। সুজা খাঁ কর্ম্মচারিগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন বলিয়া তাঁহারা তাদৃশ লোভপরায়ণ ছিলেন না। যদি কোন আগন্তুক পদপ্রার্থী হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে তিনি প্রতিদিন, কাহাকেও দুই এক দিন অন্তর, কাহাকেও বা সপ্তাহে দুই দিন করিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিতেন। যাহাদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, ভদ্রই হউক অথবা অপ'র লোকই হউক, তাহাদিগের নাম তিনি হস্তীদন্তনির্ম্মিতপত্রসঙ্কুল আপন স্মারকপুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন, এবং প্রতিদিন শয়ন করিবার পূর্ব্বে সেই সমস্ত নাম পাঠ করিয়া যাহাকে যেরূপ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে,তাহা তাহাদের নামের পার্শ্বে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিতেন। সময়ে সময়ে সেই সাহায্যের পরিমাণ গুরুতরই হইয়া উঠিত। যে সমস্ত জমীদার রাজস্বপ্রদানে বিলম্ব করিতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধির নিকট সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিদিগকে তহশীলদাররূপে প্রেরণ করিয়া যে হারে তাহাদিগের কার্য্যের বেতন দিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। জমীদারেরা বিনা আপত্তিতে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেন। তাহার পর তিনি সেই তহশীলদারদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারা কিরূপ ভাবে কি প্রাপ্ত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেন।

ছিলেন, কিন্তু অনেক স্থলে মুসলমান কর্ম্মচারিগণ তদপেক্ষা আরও অধিক অত্যাচার করিতেন।

যে সরল ভাবে সমুদয় প্রকাশ করিত, তাহার উপর নবাব সন্তুষ্ট হইতেন, যে কিছু গোপনের প্রয়াস পাইত,সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইত,এবং অপর ব্যক্তি তাহার স্থান অধিকার করিত। তাঁহার সমস্ত জীবনই এই রূপ লোকহিতকর কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মুতাক্ষরীণকার এই রূপে তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সুজা উদ্দীন অত্যন্ত সুবিচারক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বিচারকার্য্যে তিনি কাহারও অনুরোধ উপরোধ শ্রবণ করিতেন না। যখন কোন বিচার উপস্থিত হইত, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া উভয় পক্ষকে আহ্বান করিতেন, পরে তাহাদিগের প্রত্যেক পক্ষের নিকট হইতে সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া ধীর ভাবে বিবেচনার পর আপনার আদেশ প্রকাশ করিতেন। কাহারও অনুরোধ বা নিকটস্থ আত্মীয়ের মিনতি তাঁহাকে ন্যায়পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। মুতাক্ষরীণকার তাঁহার বিচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি এরূপ ন্যায়বান ও সুবিচারক ছিলেন যে, নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার স্বীয় পুত্রের ন্যায় সমান ভাবে বিচার প্রাপ্ত হইত। শ্যেনভয়ে অভিভূত চটকপক্ষী তাঁহার বক্ষঃস্থলকে একমাত্র আশ্রয়স্থল বিবেচনা করিয়া, কেবল তাঁহার শরণাগতপ্রতিপালনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইত। তাঁহার প্রজাবর্গ নসেরুয়াঁর রাজ্যের ন্যায় * তাঁহার রাজ্যে বাস করিত। এই রূপ সুবিচারে, প্রজাবর্গের প্রতি উদার ব্যবহারে, সাধারণের প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে

* নসেরুয়াঁ পারস্যদেশের সাসেনীয়াবংশসম্ভূত, তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া কথিত ছিলেন। তিনি ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহারই রাজত্বসময়ে মহম্মদের জন্ম হয়।

তিনি সকলেরই সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলনা। কি হিন্দু, কি মুসল্মান, কি জমীদার, কি প্রজা, কি কর্ম্মচারী, কি সাধারণ, সকলেই একবাক্যে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিত। তাঁহার সাধু ব্যবহারে মোহিত হইয়া সকলেই তাঁহার আদেশপ্রতিপালনে প্রাণপণে যত্নবান হইত। সুজা উদ্দীন এই সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত হইয়া কেবল একটী মাত্র দোষের জন্য জনসমাজে নিন্দাভাজন হইয়া গিয়াছেন। মুসল্মান শাসনকর্ত্তৃগণ যে কলঙ্কের জন্য সভ্যজগতে ঘৃণিত, সুজা উদ্দীন সেই বিলাসিতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, জগতে পূর্ণ সাধুচরিত্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুজা উদ্দীনের ন্যায় মহৎ চরিত্রেও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা স্পর্শ করিয়াছিল। এই বিষয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিলাসিতা কিম্বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মুর্শিদকুলী খাঁকে স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু সুজা উদ্দীন তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহার এই দোষের জন্য স্বীয় প্রণয়িনী জিন্নেতেন্নেসা অনেক দিন তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। মুর্শিদাবাদের সুবেদারী গ্রহণ করিয়া জিন্নেতান্নেসার সহিত তাঁহার মিলন হইলেও তিনি বিলাসিতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। কিছু দিন রাজ্যশাসনের পর তিনি অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠেন, ও মন্ত্রিসভার উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, ভাগীরথীতীরস্থ ফর্হাবাগে সময় যাপন করিতেন। তথায় বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া কৃত্রিমনির্ঝরশিকরস্নাত মলয়সমীরণে স্নিগ্ধ হইয়া কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত রমণীস্বরে আনন্দ অনুভব করিতে করিতে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার চরিত্রে এই

দোষটী না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আদর্শ চরিত্র হইতে পারিতেন। যাহা হউক, সুজা উদ্দীনের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রবল থাকিলেও, তাঁহার ঔদার্য্যে, দাক্ষিণ্যে এবং সুবিচারে সকলে বিমোহিত হইয়া, উক্ত দোষ সরল ভাবে ক্ষমা করিত। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় লোকহিতকর নবাবের উল্লেখ দেখা যায় না।



সরফরাজ খাঁ।

PRINTED AT THE MOHILA PRESS, 41-B, PATALDANGA ST

একাদশ অধ্যায়।

আল্লাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ।

সরফরাজ খাঁর সিংহাসনারোহণ ও মাতামহ মুর্শিদকুলীর ধর্ম্মভাবের অনুকরণচেষ্টা।

নবাব সুজা উদ্দীনের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই সরফরাজ খাঁ পিতৃপরিত্যক্ত সুবাত্রয়ের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে তিনি আপনাকে চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যদিও মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের জন্য তৎকালে অপর কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই ভীত ও চকিত অবস্থায় কাল যাপন করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে এই রূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল যে, পিতার মৃতদেহের সংকারের সময় তিনি যোগদান করিতে সাহসী হন নাই। তিনি আপনার সুরক্ষিত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রকার সংকীর্ণ ভাবের জন্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল। যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শত্রু হইলেও প্রকাশ্য ভাবে কিছুই করিতে পারিত না, তাহারা তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া উৎসাহান্বিত হইয়া সুযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সুজা উদ্দীনের জীবদ্দশায় অনেকেই সরফরাজের শত্রু হইয়া উঠে। কেবল সুজার উদার ব্যবহারে ও তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহার পুত্রের অনিষ্টসাধনে

চেষ্টা করিতে পারে নাই, এক্ষণে সময় বুঝিয়া তাহারা আপনাদিগের বলবতী ইচ্ছাপূরণে বিশেষ যত্নবান হইল। যে কেহ সরফরাজের শত্রু ছিল, সুজার কথা মনে হইলে তাহারাও তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইত। সুজা উদ্দীনের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে, কিছু না কিছু সাহায্য নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং সরফরাজের ব্যবহারে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেও তাঁহার অনিষ্টসাধনে কেহই অগ্রসর হইতে পারিত না। এক্ষণে সুজার মৃত্যুর পরে সরফরাজের কাপুরুষতায় সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। পিতার আদেশমতে তিনি প্রথমতঃ হাজী আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের পরামর্শক্রমে কার্য্য করিতেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হওয়ায়, তিনি তাঁহাদিগকে অবমানিত করিয়া আপনার ঘোর শত্রু করিয়া তুলেন, অবশেষে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। সরফরাজ চারি দিকে বিপদবেষ্টিত দেখিয়া আপনার সুবেদারী দৃঢ় করিবার জন্য অনেক অর্থ ও উপঢৌকনের সহিত দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। এই রূপে কোন প্রকারে আপনাকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী পদে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া, চতুর্দ্দিকে বিপদসত্ত্বেও সরফরাজ স্বীয় মাতামহ মুর্শিদকুলী খাঁর ধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, রোজার সময় উপবাসী থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতেন, এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বহুসংখ্যক কোরাণ-পাঠক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ধর্ম্মসংক্রান্ত লোক তাঁহার ব্যয়ে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে বাহিক ধর্ম্মপালনে তাঁহার সময় অতিবাহিত

হইত। তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ রূপ মনোযোগ প্রদান করিতেন না। রাজার উপযুক্ত গুণ তাঁহাতে কিছুমাত্র ছিল না। সুবিচার, প্রজাপালন, রাজনৈতিক সূক্ষ্ম দর্শন প্রভৃতি যে সমুদয় গুণ না থাকিলে রাজা প্রকৃত রাজা বলিয়া কথিত হইতে পারেন না, সে সমস্ত কিছুই তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। যদিও মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায় তিনি অনেক বাহ্যিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, তথাপি তিনি বিলাসের ক্রীতদাস-স্বরূপ ছিলেন। রাজকার্য্য অবহেলা করিয়া কেবল আমোদ-প্রমোদেই তাঁহার সময় নষ্ট হইত। তাঁহার অন্তঃপুর প্রায় সার্দ্ধ সহস্র রমণীতে পরিপূর্ণ ছিল। নবাব সেই সমস্ত রমণীর সহিত অহর্নিশি নানাপ্রকার কৌতুকে ব্যাপৃত থাকিয়া হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। রমণীগণের তৃপ্তিসাধনকে প্রজাপালন, তাহাদিগের প্রার্থনাশ্রবণ অর্থীপ্রত্যর্থীর আবেদন ও তাহাদের আদেশকে মন্ত্রিসভার উপদেশ বিবেচনা করিতেন। ফলতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায়, তিনি দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিলেন। একে চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত, তাহার উপর বিলাসপরায়ণ হইয়া প্রতিনিয়ত রাজকার্য্যে অবহেলা করায়, তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রকৃতিবর্গের শ্রদ্ধা একেবারেই দূরে পলায়ন করিল। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বদা অত্যন্ত ধূমধামের সহিত থাকিতেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহার প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি প্রদর্শন করিত না। দুই সহস্র অশ্বারোহীর দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত হইয়া সরফরাজ আপনাকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেন। এই প্রকারে তিনি লোকের অপ্রিয় হইয়া অচির কাল মধ্যেই স্বীয় দোষের ফলভোগ করিতে বাধ্য হন। সময় মন্দ হইলে লোকে বুদ্ধিবিবেচনাহীন হইয়া উঠে, তাহার আত্মীয়-স্বজন দূরে পলায়ন করে, প্রকৃত মিত্রও শত্রুতে পরিণত হয়।

সরফরাজ খাঁর তাহাই ঘটিয়া উঠিল। তিনি কতক আপনার দোষে, কতক বা নিজের অবহেলায় এবং কতক বিপক্ষগণের প্রবঞ্চনায় অপরিহার্য্য বিপদে জড়িত হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা তাঁহার পিতার প্রধান সহায় ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলেন। অবশেষে হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দ্দী খাঁর ষড়যন্ত্রে তিনি রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়া আপনার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হন।

নাদির সাহের নিকট অর্থপ্রেরণ।

সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়ার অত্যল্প কাল পরে এবং তাঁহার বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারী-পদে দৃঢ় হওয়ার পূর্ব্বে উজীর কামার উদ্দীন খাঁ নাদির সাহের আগমন ঘোষণা করিয়া, নবাব সুজা উদ্দীনের নিকট তিন বৎসরের রাজস্ব চাহিয়া পাঠান। তখন নাদির সাহ দিল্লীতে আগমন করিলে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অনেক অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই অর্থসংগ্রহহেতু কতকগুলি লোক নিযুক্ত হন। বাঙ্গলার নবাবের উকীল বা প্রতিনিধি তাহার অন্যতম। সুজা-উদ্দীনের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করার জন্য মোরাদ খাঁ সরবলন্দ খাঁর ৫০ জন অশ্বারোহীসহ প্রেরিত হন। তাঁহাদের পথব্যয়ের জন্য মোরাদ খাঁকে সহস্র মুদ্রা ও অশ্বারোহীদিগকে ৩,২২০ মুদ্রা দিল্লীর রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়। তাঁহারা যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া অবগত হন যে, সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে। সরফরাজ খাঁ হাজী আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের পরামর্শক্রমে সমস্ত রাজস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর তিনি নাদির সাহের নামে মুদ্রাঙ্কণের ও ভজনালয়ে তাঁহার নামে মঙ্গলাচরণের অনুমতি প্রদান করেন। নাদির সাহের উদ্দেশে এই রূপ আগ্রহ প্রকাশ করায়, তাঁহার শত্রুবর্গ সম্রাট মহম্মদ সাহের নিকট উক্ত বিষয়ের উল্লেখ

করিয়া সরফরাজকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য প্রবৃত্ত হন। অদূরদর্শী নবাব নাদিরের মনোরঞ্জনের জন্য যত্ন করিতে গিয়া বাদসাহ মহম্মদ সাহের কুদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, নাদির সাহ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে, আবার মহম্মদ সাহই ভারতের একাধীশ্বর হইয়া উঠিবেন। ফলতঃ এই জন্য মহম্মদ সাহ সরফরাজের উপর বিশেষ রূপ অসন্তুষ্ট হন এবং যাহাতে তিনি মুর্শিদাবাদের সিংহাসন হইতে অপসারিত হন, তদ্বিষয়েও তাঁহার অনভিমত ছিল না।

আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সরফরাজ খাঁ অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁহার সেই ভয়ানক দোষ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ও শাসনকার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত অমনোযোগদর্শনে, রায়রায়ান আলমচাঁদ নবাবকে সতর্ক করার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলমচাঁদ নবাব সুজা উদ্দীনকে সর্ব্বদা সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন বলিয়া সুজা উদ্দীন বিলাসপরায়ণ ও মুক্তহস্ত হইয়াও রাজকোষ শূন্য করেন নাই। আলমচাঁদ সরফরাজকে সেই রূপ ভাবের উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করিলে, সরফরাজ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ আলমচাঁদকে যৎপরোনাস্তি অবমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। তদবধি আলমচাঁদ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নবাবের মঙ্গলের জন্য কোন রূপ চেষ্টা করিতেন না, অধিকন্তু তাঁহার বিপক্ষবর্গের সহিত যোগদান করিয়া সরফরাজকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য চেষ্টা করেন। এই সময়ে জগৎশেঠের সহিতও নবাবের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। এই মনোমালিন্যের বিষয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এই রূপ বলিয়া থাকেন। একটী পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত জগৎশেঠের পৌত্র মহাতাব রায়ের

মহাসমারোহে বিবাহ সংসাধিত হইয়াছিল। তৎকালে তাহার ন্যায় অসীমরূপশালিনী কন্যা এতদঞ্চলে দৃষ্ট হইত না। যৌবনের প্রারম্ভে তাহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে তাহা সরফরাজের কর্ণগোচর হয়। নবাব সেই অপ্সরাবিনিন্দিতরূপসুধা পান করিয়া, দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের জন্য ভয়ানক উৎসুক হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি জগৎশেঠকে মনে মনে ভয় করিতেন। নবাব জানিতেন যে, সম্রাট-দরবারে মুর্শিদাবাদের নবাব অপেক্ষা শেঠদিগের সম্মান কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সাধারণ লোকেও জগৎশেঠের বিশেষ রূপ বশীভূত ছিল, এবং তাঁহাদের অর্থবৃষ্টিতে এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহা সম্পন্ন হইতে না পারিত। নবাব অনেক দিন হইতে দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার তাহা দমন করারও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে সে অদম্য বেগ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সরফরাজ প্রথমে জগৎশেঠের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। জগৎশেঠ স্বীয় বংশের মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া তাহা অস্বীকার করায়, নবাব তাঁহার বাটী প্রহরিবেষ্টিত করিতে আদেশ দেন। জগৎশেঠ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সহস্র অনুনয়বিনয়েও নবাব নিরস্ত হইতেছেন না, তখন স্বীয় বংশের ভবিষ্যৎ সম্মানের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি অগত্যা নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হন। নবাব শিবিকা পাঠাইয়া, জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্মীকে নিজ ভবনে আনয়ন করেন, এবং প্রাণ ভরিয়া সেই পুণ্যের অখণ্ড ফলের ন্যায় তাহার রূপসুধা পান করিয়া তাহাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দেন। তিনি কেবল

দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করেন নাই। * শেঠবধূ গৃহে প্রত্যাগত হইলে বংশমর্য্যাদানুসারে তাঁহার স্বামী তাহাকে প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। স্বীয় কুলবধূকে

* ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ইহাতে আবার অলঙ্কারসংযোগও করিয়াছেন। হলওয়েল লিখিতেছেন,—

"He (Futtuaah chand) had about this time married his youngest grandson named Seet Mortab Roy, to a young creature of exqisite beauty, aged about eleven years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust (?) for possession of her ; and sending for Juggaut Seet demanded a sight of her—The old man (then complete four score) begged and entreated, that the Soubah would not stain the honour and credit of his house, nor load his last days with shame, by persisting in a demand which he knew the principles of his caste forbid a compliance with.

"Neither the tears nor remonstrances of the old man had any weight on the Soubah, who growing outrageous at his refusal ordered in his presence his house to be immediately surrounded with a body of horse, and swore on the khoran that if he complied in sending his granddaughter, that he might only see her he would instantly return her without any injury. The Seet reduced to this extremity, and judging from the Soubah's known impetuousity, that his persisting longer in a denial would only make his disgrace more public, at last consented ; and the young creature was carried with the greatest secrecy in the night to visit him. She was returned the same night, we will suppose (for the honour of that house) uninjured; be this as it may,

কৌশলে ও বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়ায়, জগৎশেঠ আপনাকে ঘোর অবমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত

the violence was of too delicate a nature to permit any future commerce between her and her husband.

The indignity was never forgiven by Juggauat Seet and that whole powerful family, consequently became inveterate, though, concealed enemies to the Soubah."

(Holwell's Inteiesting Historical Evens part, I. Chap 2 pp 76—77)

অৰ্ম্মে বলিতেছেন—"His (Juggut Seet's) eldest son, soon after the disgrace of Alumchand married a woman of exquisite beauty, the report of which alone inflamed the curiosity of the Nabab so much that he insisted on seeing her, although he knew the disgrace which would be fixed on the family, by showing a wife unveiled, to a stranger. Neither the remonstances of the father, nor his power to revenge the indignity, availed to divert the Nabab from this insolent and futile resolution. The young woman was sent to the palace in the evening; and after staying there a short space returned, unviolated indeed, but dishonoured to her husband." (Orme's Indostan, Madras reprint vol II. P. 30)

ইংরাজ লেখকগণের মতে যেন সরফরাজের সেই বালিকার জন্য ইন্দ্রিয়-লালসাও ছিল। কিন্তু দশম বা একাদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রতি এক জন প্রৌঢ়সীমাবর্ত্তী যুবকের ইন্দ্রিয় লালসা হওয়া কত দূর সম্ভব তাহা সাধারণে বিচার করিবেন। সুযোগ পাইলে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মুসল্‌মান শাসন-কর্ত্তাদের বিবরণ অতিরঞ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। মূলে এই ঘটনা সত্য কিনা তাহাই বলা যায় না। অৰ্ম্মে মহাতাব রায়কে জগৎশেঠের পুত্র বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। মহাতাব ফতে চাঁদের পুত্র নহেন, পৌত্র, তিনি ফতে চাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দচাঁদের পুত্র।

হইয়া উঠিল, এবং অচিরে সরফরাজকে পতঙ্গপ্রায় ভস্মীভূত করিবার জন্য আপনার যাবতীয় চেষ্টা সমবেত করিলেন। * কিন্তু

* ইংরাজলেখকগণের মতে সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠের বংশের উপর যে কলঙ্ক প্রদান করেন, অনেকে সরফরাজের পরিবর্ত্তে উক্ত ঘটনায় হতভাগ্য সিরাজের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সময় জগৎশেঠের উক্তিতে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।—

"বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার—
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।"

যদিও সরফরাজ বেগমের বেশ ধারণ করিয়া ফতেচাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার গৃহবধূকে (নবীন বাবুর বক্তা জগৎশেঠের বধূকে) স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি ব্যাপারটী প্রায় একই প্রকারের। সরফরাজ উক্ত দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সিরাজ তাহার জন্য তিরস্কৃত হইতেছেন! নবীন বাবুর পলাশীর যুদ্ধ কাব্য বলিয়া যদিও তাহার বর্ণনা উপেক্ষণীয়, তথাপি ইতিহাসমূলক কাব্যে অমূলক কথা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহা অতীব দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে যাঁহার যে দোষ ছিল, সমস্তই সিরাজ উদ্দৌলার স্কন্ধে বিন্যস্ত হইয়াছে। সিরাজকে এতদ্দেশে এক রূপ প্রবাদ মূলক অত্যাচারী বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহা হউক, সে কথা এক্ষণে বক্তব্য নহে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সরফরাজের সহিত কতিপয় বিষয়ে সিরাজের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় একের দোষ অপরের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। সরফরাজ ও সিরাজ উভয়ে মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হন। যদিও সরফরাজের পিতা কিছু দিন তাহা ভোগ করিয়াছিলেন, উভয়ের চরিত্র দূষিত ছিল, উভয়েই আপন আপন কর্ম্মচারী দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন এবং উভয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেই জগৎশেঠেরা বিশেষ রূপ সাহায্য করিয়াছিলেন এই সমস্ত কারণে সম্ভবতঃ সরফরাজের দোষ সিরাজের উপর অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু সিরাজের চরিত্র দূষিত হইলেও সিরাজ কখনও এরূপ কার্য্যের অবতারণা করেন নাই।

দেশীয় কোন গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না বলিয়া ইংরাজ লেখকগণের বিবরণ কত দূর সত্য বলা যায় না। পক্ষান্তরে জগৎশেঠের বংশধরেরা আপনাদিগের বংশের এই রূপ কলঙ্কের কথা স্বীকার না করিয়া নবাবের সহিত মনোমালিন্যের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদের নিকট সাত কোটি টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা কখনও প্রত্যর্পিত হয় নাই। সরফরাজ উক্ত সন্ধান অবগত হইয়া ফতেচাঁদকে মাতামহের গচ্ছিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য বারম্বার অনুরোধ করেন। ফতেচাঁদ ইতস্ততঃ করিতে থাকায় নবাব তাঁহাকে অবমানিত করায়, জগৎশেঠ নবাবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আলিবর্দ্দীর সহিত যোগ দেন।* এই রূপে রায় আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিলে হাজী আহম্মদের সহিতও সরফরাজের শত্রুতার সূচনা হইয়া উঠে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

হাজী আহম্মদের সহিত বিবাদের সূচনা।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ সুজা উদ্দীনের আদেশসত্ত্বেও হাজী আহম্মদ প্রভৃতিকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া অপর কতিপয় ব্যক্তিকে আপনার বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে হাজী লুৎফুল্লা, মর্দ্দান আলি খাঁ এবং মীর মর্ত্তেজা প্রধান। তাহারা নবাবের প্রিয়পাত্র হওয়ায়, যথায় তথায় বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়া হাজী আহম্মদকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহাকে কুৎসিত ভাবে চিত্রিত করিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার উপর নবাবের বিদ্বেষবৃদ্ধির চেষ্টা

* Statistical Account of Murshidabad. p. 255.

পাইতেন।* তাঁহাদের প্ররোচনায় ক্রমে ক্রমে নবাব হাজী আহম্মদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রধান দেওয়ান বা মন্ত্রীর পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া মীর মর্ত্তেজাকে উক্ত পদ প্রদান করেন। হাজী সুজা উদ্দীনের সময় হইতে যে পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষতাসহকারে অতীব সম্মানের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, সরফরাজ খাঁ কয়েকটী লোকের পরামর্শ ক্রমে আজ তাঁহাকে তৎপদ হইতে অপসৃত করিলেন। ইহাতে হাজী যে বিশেষ অবমানিত বোধ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পর নবাব হাজী আহম্মদের জামাতা আতা উল্লা খাঁর হস্ত হইতে রাজমহলের ফৌজদারী গ্রহণ করিয়া স্বীয় জামাতা হোসেন মহম্মদ খাঁকে প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সকল কারণে হাজী আহম্মদ নবাবের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নবাবের উপর বিরক্ত হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। হাজী মনে মনে সরফরাজকে শিক্ষা দেওয়ার উপায় স্থির করিয়াছিলেন। তিনি আলিবর্দ্দী খাঁকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন, অবশ্য তাহার মধ্যে অধিকাংশ অতিরঞ্জিত ছিল। হাজী আলিবর্দ্দীর দ্বারা প্রধানতঃ কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবকে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে পরামর্শ প্রদান করেন, কারণ তাহাতে অনেক ব্যয়লাঘবের সম্ভাবনা ছিল। এই রূপ বাহ্যিক সাধুতায় সরফরাজকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পাইতেন। নবাব তাঁহাকে বিশ্বাসী বিবেচনা করিয়া

* হাজী আহম্মদ সুজা উদ্দীনের জন্য অনেক রমণী সংগ্রহ করিতেন বলিয়া তাঁহারা এমন কি সরফরাজ খাঁ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কুৎসিত শব্দ প্রয়োগ করিতেন। (Mutaqherin vol I. p. 353

হাজীর শত্রুপক্ষীয়দিগের অনেক কথা প্রকাশ করিয়া দিতেন। হাজী আহম্মদের পুত্রদ্বয় জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ পাটনা হইতে ও সৈয়দ আহম্মদ খাঁ রঙ্গপুর হইতে উপস্থিত হইলে, মানকর খাঁ নামক এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্দী করার জন্য নবাবকে উপদেশ প্রদান করে, কিন্তু নবাব তাহা হাজী আহম্মদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। আবার কিছু দিন পরে নবাব হাজী আম্মহদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, এই রূপ কখনও তাঁহাকে অপমান ও কখনও সান্ত্বনা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে বিষম মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। একটী ঘটনা হইতে বিবাদ ঘনীভূত হইতে আরম্ভ হয়। হাজী আহম্মদের জামাতা আতা উল্লার কন্যার সহিত মির্জা মহম্মদের (সিরাজউদ্দৌলার) বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। বিবাহের পূর্ব্বের করণীয় অনেকগুলি বিষয় সম্পন্নও হইয়াছিল। নবাব সরফরাজ খাঁ কন্যাটীকে অত্যন্ত সুন্দরী জানিয়া উক্ত বিবাহ রহিত করেন এবং আপনার পুত্রের সহিত তাহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ইহার জন্য তিনি কাহারও পরামর্শের অপেক্ষা করেন নাই। আপনিই বলপূর্ব্বক উক্ত বিবাহ সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হন। স্বীয় বংশের এই রূপ অপমান হওয়ায়, হাজী আহম্মদ নবাবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অপমানের প্রতিশোধপ্রদানে যত্নবান হইলেন। এদিকে নবাবও তাঁহাদের বংশের উপর বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আজিমাবাদস্থ সমুদয় প্রকাশ্য অর্থের পরিদর্শন ও আলিবর্দ্দীকে সুজা উদ্দীনের প্রদত্ত যাবতীয় সৈন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সেই সমস্ত সৈন্যেরা আসিতে বিলম্ব করায়, তাহাদিগের যাবতীয় প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়।

হাজী আহম্মদ এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া অধিকতর প্রামাণ্য করিবার জন্য সৈয়দ আহম্মদের স্বাক্ষরসহ আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর আবার সরফরাজ খাঁ হাজী আহম্মদ ও তাঁহার পুত্রগণের সহিত মিত্রতা করিতে যত্নবান্ হন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে বিফল হয়। যদিও তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে নবাবের সহিত শত্রুতাচরণ করেন নাই, তথাপি আপনাদিগের প্রতি এই রূপ অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য তাঁহারা অবকাশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে হাজী আহম্মদ ও তৎপুত্রগণ নবাবকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

এই রূপে হাজী আহম্মদের ও তাঁহার বংশের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইল। জগৎশেঠ ও আলমচাঁদ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতেন না বলিয়া নবাব তাঁহাদিগকে তত দূর শত্রু বিবেচনা করিতে পারেন নাই। এমন কি আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আলমচাঁদ নবাবের কামান পরিচালনের ভার পর্য্যন্তও লইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই রূপে তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতে লাগিল। সকলে সরফরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দীকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনপ্রদানের জন্য যত্নবান হইলেন, দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। মহম্মদ সাহের মন্ত্রিবর্গকে উৎকোচ প্রদান করিয়া তাঁহারা সরফরাজের সর্ব্বনাশের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। নাদির সাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া সরফরাজ যে তাঁহার

নামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া সম্রাটের কর্ণগোচর করা হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা এক কোটি মুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া সরফরাজ খাঁর যত কোটি টাকার সম্পত্তি আছে সমুদয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত এবং মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বসময়ে যেরূপ সময়মত রাজস্ব প্রেরিত হইত, সেই রূপ প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এদিকে হাজী আহম্মদ ও জগৎশেঠ নবাবকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করার সাহায্য করিবেন, এই রূপ ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিয়া ব্যয়ের লাঘব করিতে উপদেশ প্রদান করেন। নবাব তাঁহাদের কথামত যতই সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে লাগিলেন, তাহারা ততই আলিবর্দ্দী খাঁর অধীনে নিযুক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের দিল্লীস্থ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রতিবিধানের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে বিহার হইতে প্রত্যাগমন ও তাঁহার বংশীয় যাবতীয় ব্যক্তিকে রাজকার্য্য হইতে বিচ্যুত করিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু হাজী আহম্মদ কোন ক্রমে নবাবের এই রূপ অভিলাষ অবগত হইয়া তাঁহাদের বিশ্বস্ততা ও কর্ত্তব্যপালনের উল্লেখ ও তাঁহাদের দ্বারা এরূপ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে প্রকাশ করিয়া, নবাবকে শান্ত হইতে এবং অন্ততঃ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। নবাব তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন বটে, কিন্তু এদিকে গুপ্ত ভাবে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ ও হাজী আহম্মদ তিন জনে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে থাকিতে, তাঁহাদের নিজের ও দেশের কোনও কুশল নাই। অতএব তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া যাহাতে আলিবর্দ্দীকে সিংহাসন

দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সেই রূপ চেষ্টা করিয়া আলিবর্দ্দীর সহিত পত্র লেখালেখি আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা নবাবের তোপখানার দারোগা ও অন্যান্য কয়েক জন কর্ম্মচারীকে অপনাদের পক্ষে আনয়ন করেন, এবং উৎসাহসহকারে ষড়যন্ত্রের আয়োজনে সচেষ্ট হন।

আলিবর্দ্দী খাঁর মুর্শিদাবাদের সিংহাসন-লাভের চেষ্টা।

আলিবর্দ্দী খাঁ বৃথা সময় নষ্ট করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া যাহাতে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপ উদ্যোগী হইলেন। এ বিষয়ে হাজী আহম্মদ ও জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ চলিতেছিল। দিল্লীতে ইস্‌হাক খাঁ নামক সম্রাটের কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ রূপ পরিচয় থাকায়, তিনি তাঁহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যথাযোগ্য উৎকোচ ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া তিনি সম্রাটের নিকটে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী প্রার্থনা করিলেন ও তদ্ব্যতীত সরফরাজ খাঁর হস্ত হইতে উক্ত সুবাত্রয় উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশও প্রার্থনা করা হয়। ইস্‌হাক খাঁর নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিয়া তিনি ভোজপুরের জমীদারগণকে শাসন করিতে গমন করিবেন, এই ছল করিয়া আপনার সৈন্যগণকে সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হন। উক্ত জমীদারগণ তাঁহার শাসনের অবমাননা করিয়া থাকে, এবং তাহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, তাহাদের বিরুদ্ধে রীতিমত সৈন্য প্রেরণ না করিলে তাহাদিগকে দমন করিবার অন্য উপায় নাই, এই মর্ম্মে মুর্শিদাবাদে নবাব সরফরাজ খাঁর নিকট এক পত্রও প্রেরিত হইল। এই রূপে প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া আলিবর্দ্দী চতুর্দ্দিকে সকলকে নিঃসন্দেহ করিলেন। কিন্তু গোপনে স্বীয় মনোগত

ইচ্ছা পূরণের জন্য অবকাশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সরফ-রাজ খাঁ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে! তিনি সময়ে সময়ে আলিবর্দ্দীবংশীয়গণের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিলেও আবার বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। বিশেষতঃ হাজী আহম্মদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ সুমিষ্ট কথায় তাঁহার যাবতীয় সংশয় অপসৃত হইত। যদি তাঁহাদিগের উপর তাঁহার বিদ্বেষ অবিচলিত হইত, তাহা হইলে হয়ত তিনি সাবধান হইতেও পারিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদের সুমিষ্ট বাক্যলহরীর দ্বারা তরঙ্গায়িত হইয়া তাঁহার হৃদয় হইতে যাবতীয় সন্দেহ বিধৌত হইয়া যাইত। যখন লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন ঘোর শত্রুকেও পরম মিত্র বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সরফরাজ হাজী আহম্মদবংশীয়দিগের ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় পতিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিস-র্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এদিকে আলিবর্দ্দী খাঁ দিল্লী হইতে আদেশের অপেক্ষায় অত্যন্ত
আলিবর্দ্দীর সরফরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা। ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, অবশেষে নাদির সাহের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের দশ মাস পরে ও সুজা উদ্দীনের মৃত্যুর ত্রয়োদশ মাস পরে তিনি সম্রাটের আদেশ প্রাপ্ত এবং সরফরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য সজ্জিত হইলেন। এক জ্যোতির্ব্বিৎ কর্ত্তৃক যাত্রার দিন স্থিরীকৃত হইল। আলিবর্দ্দী অনেক সময়ে সেই জ্যোতির্ব্বিদের পরামর্শে কার্য্য করিতেন ও তাঁহার উপর আলিবর্দ্দীর যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। মুর্শিদাবাদাভিমুখীন যাবতীয় পথিককে গমন করিতে নিষেধ করা হইল, এবং আলিবর্দ্দী যে দিবস যাত্রা করিবেন, তাহা জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে লিখিয়া পাঠান হয়। এক জন বিশ্বাসী লোক দ্বারা তাহা মুর্শিদাবাদে

প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই রূপে সমস্ত স্থির হইলে, আলিবর্দ্দী হিজরী ১১৫২ অব্দের জেলহজ্জ মাসের শেষ ভাগে ইংরাজী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভোজপুরাভিমুখে গমন করিবেন এই ছলে যাত্রা করিয়া, আজিমাবাদ হইতে কিয়দ্দূরে বরীশ খাঁর চৌবাচ্চার নিকট শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দীন আহম্মদকে আপনার প্রতিনিধি রূপে পাটনায় ও সৈয়দ হেদাৎ আলি খাঁ আসদজঙ্গকে * সেরসা ও কুটুম্বা প্রদেশ শাসনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দী খাঁ হেদাৎ আলি খাঁকে মুর্শিদাবাদযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, তিনি তাঁহার ও জৈনুদ্দীনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ও যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবে অতিবাহিত হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া আবশ্যকমত কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন। যাত্রার প্রাক্কালে প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীকে আলিবর্দ্দীর আহ্বানানুসারে হিন্দু মুসল্‌মান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক কর্ম্মচারিগণ সমবেত হইলে, তিনি তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জন ধার্ম্মিক মুসল্‌মান ও এক জন হিন্দুকে সকলের অগ্রভাগে স্থাপিত করিয়া মুসল্‌মানের হস্তে কোরান ও হিন্দুর হস্তে তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া মুসলমান্‌দিগকে কোরান দ্বারা ও হিন্দুদিগকে তুলসী ও গঙ্গাজল গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন ও তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "এক্ষণে আমি আমার আপন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তোমরা আমার বহু দিনের সঙ্গী

* সৈয়দ হেদাৎ আলি খাঁ, মুতাক্ষরীনকার গোলাম হোসেনের পিতা। Mutakherin vol-I. p. 356.

ও একমাত্র বিশ্বাসী, কেবল তোমাদেরই সাহায্যে আমি জয়লাভের আশা করিয়া থাকি। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, যদি তোমরা আমার ভাগ্যের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, আমি যদি গভীর জলমধ্যে অথবা ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে তোমরা কদাচ আমায় পরিত্যাগ করিবে না। আফ্রাসিয়ার কিম্বা রস্তম যে কেহই আমার শত্রু হউক না কেন, * তাহাদের সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ হইবে না। আমার বন্ধুদিগকে তোমাদের বন্ধু বলিয়া এবং আমার শত্রুদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আমার ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, তোমরা আপনাপন জীবন ও ভাগ্য উৎসর্গ করিয়া আমার নিকট অবস্থিতি করিতে ইতস্ততঃ করিবেনা।" † আলিবর্দ্দী খাঁর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুরাতন কর্ম্মচারিগণ যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তৎপরে নূতন কর্ম্মচারীরাও তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে বাধ্য, হইলেন। এই-রূপে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও একবাক্যে তাঁহার কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক দেখিয়া, আলিবর্দ্দী খাঁ আপন বংশের উপর সরফরাজ খাঁর যাবতীয় অত্যাচারের বিষয় বিবৃত করিয়া তাহার প্রতি-শোধের জন্য যাত্রা করিতেছেন, ইহা স্পষ্ট করিয়া সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে তিনি আপন পুরাতন ও বিশ্বস্ত সৈন্য-

* আফ্রিসিয়ার পারস্য জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। রস্তম পারস্যদেশস্থ সাবলস্তান প্রদেশের রাজা।

† Mutakherin vol I. P. 357.

সহ ও কার্য্যকুশল গোলন্দাজগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া অবিলম্বে সাবাদনামক স্থানে উপস্থিত হন। সাবাদে তৎকালে একটী দুর্গ ছিল, উক্ত দুর্গ পর্ব্বত ও গঙ্গার পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিত। আলিবর্দ্দী তথায় একটী উপত্যকায় সমস্ত সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়া মস্তাফা খাঁ নামক জনৈক দক্ষ ও সাহসী আফগান সৈন্যাধ্যক্ষকে এক শত অশ্বারোহী ও সরফরাজ খাঁদত্ত অনুমতি-পত্রসহ দুর্গ অধিকারে প্রেরণ করেন। সরফরাজ অপর এক সৈন্যাধ্যক্ষকে উক্ত অনুমতি-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী কোনও প্রকারে তাহা হস্তগত করিয়া মস্তাফা খাঁকে প্রদান করেন। মস্তাফা খাঁ অবগত হইলেন যে, উক্ত দুর্গমধ্যে কেবল দুই শত মাত্র বন্দুকধারী সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। তিনি এই উপায় অবলম্বন করিলেন যে, যখন তিনি দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কেত করিবেন, তখন অবশিষ্ট যাবতীয় সৈন্য যেন অগ্রসর হয়। পরে তিনি দুর্গের নিকট স্বীয় অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া অনুমতি-পত্র প্রদান করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও নাগরার ধ্বনি আরম্ভ করিলেন। তখন অবশিষ্ট সৈন্যকে যুদ্ধযাত্রায় অগ্রসর হইতে দেখিয়া, দুর্গরক্ষকেরা ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিল, এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু যখন মস্তাফা খাঁর নিকট হইতে অবগত হইল যে, যদি তাহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সামান্য চেষ্টামাত্রও করে, তাহা হইলে প্রত্যেককে শাণিত কৃপাণের পিপাসা মিটাইতে হইবে। তখন অগত্যা তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহার পর দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইলে, সকল সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইল।

যে দিবস উক্ত দুর্গ অধিকৃত হয়, সেই দিবস আলিবর্দ্দীর প্রেরিত পত্র জগৎশেঠের নিকট পঁহুছে। জগৎশেঠ পত্র পাঠ করিয়া স্থির করিলেন যে, আলিবর্দ্দী এত দিনে তেলিয়াগড্ডীর নিকট অবস্থিতি করিতেছেন, এবং ৫।৬ দিবস মধ্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সরফরাজ খাঁকে আলিবর্দ্দীর কথা জ্ঞাপন করাইয়া নবাবকেও যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও প্রদান করিয়া বলিলেন যে, আলিবর্দ্দী সম্ভবতঃ এত দিনে রাজমহালে উপস্থিত হইয়াছেন। সরফরাজ খাঁ স্বীয় পত্রে পাঠ করিলেন যে, আলিবর্দ্দীর বংশের উপর অত্যাচার হওয়ায়, তিনি স্ববংশীয়গণকে অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, এবং নবাব অনুগ্রহপূর্ব্বক হাজী আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আসিতে অনুমতি দিলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। তাঁহার অন্যকোন উদ্দেশ্য নাই, এবং তিনি চিরদিনই নবাবের আজ্ঞাকারী ভৃত্য। কখনও নবাবের আদেশ অন্যথা করিতে ইচ্ছুক নহেন। সরফরাজ খাঁ উক্ত পত্র পাঠ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সরফরাজ খাঁর পরামর্শ ও হাজী আহম্মদের আলিবর্দ্দীর সহিত যোগদান।

এই রূপ আন্দোলিত চিত্তে থাকা অনুচিত বিবেচনায় তিনি আপনার মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিলেন। দরবারগৃহে সকলে সমবেত হইলে, তিনি আলিবর্দ্দী খাঁর পত্রের কথা সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। পরে হাজী আহম্মদকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া নানাপ্রকার ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হাজী আহম্মদ আপনার ভবিষ্যৎ বিপদসঙ্কুল ভাবিয়া নানা প্রকার মিষ্ট

বাক্যে নবাবকে শান্ত করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে বলিলেন যে, যদিও আলিবর্দ্দী এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তথাপি যে মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে বিহারে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করিবেন। এক্ষণে হাজী আহম্মদের গমন লইয়া সকলের মধ্যে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইল। কেহ কেহ তাঁহাকে যাইতে দিতে ইচ্ছা করিলেন না, এবং অনেকে তাঁহার গমনে বিশেষ রূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করিলেন না। অবশেষে মহম্মদ গাওস খাঁ নামক এক জন পুরাতন কর্ম্মচারী হাজী আহম্মদের গমনের বিশেষ রূপ সমর্থন করিলেন। তাঁহার মতে যদি হাজী আহম্মদকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে আলিবর্দ্দীর সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা থাকিলে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি অবশ্য আসিবেনই আসিবেন। অন্যথা হাজী আহম্মদ যদি আলিবর্দ্দীর সহিত যোগদান করেন, তাহাতে আলিবর্দ্দীর বিশেষ কোন উপকার হইবে না, কারণ হাজী আহম্মদ একাকী, তাঁহার সহিত সৈন্যসামন্ত কিছুই নাই। নবাব আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে, হাজী আহম্মদের দ্বারা কোনই ক্ষতি হইবে না। মহম্মদ গাওস খাঁর বাক্যাবসানে সকলেই তাঁহার মত সমর্থন করিলেন। তখন হাজী আহম্মদ নবাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আলিবর্দ্দীর শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি গমনকালে বারম্বার নবাবকে লিখিয়াছিলেন যে, আলিবর্দ্দী কখনও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, তিনি স্বীয় অসুবিধা ও কষ্ট আবেদন করিবার জন্য নবাবের নিকট অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু নবাব যদি দুষ্ট লোকের পরামর্শে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন,

তাহা হইলে আত্মরক্ষার জন্য তিনি নবাবের অবাধ্য হইয়া পাছে ইহলোকে ও পরলোকে অযশস্বী হন, তজ্জন্য বিশেষ রূপ চিন্তিত আছেন। * অতএব নবাব যাহাতে যুদ্ধযাত্রা না করেন ইহাই তাঁহার অনুরোধ।

সরফরাজের যুদ্ধযাত্রা ও উভয় পক্ষের সন্ধির প্রস্তাব।

হাজী আহম্মদ প্রস্থান করিলে, আলিবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা লইয়া মন্ত্রিবর্গের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু মর্দ্দান আলি খাঁর প্ররোচনায় অবশেষে যুদ্ধযাত্রাই স্থির হইল। মর্দ্দান আলি হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দ্দীর পরম শত্রু ছিলেন। তিনি নবাবকে স্বীকৃত করিয়া আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হইল। নবাব সরফরাজ খাঁ যাবতীয় ফৌজদারদিগকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়া নিজেই সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্য অশ্বারোহী ও পদাতিকে প্রায় ত্রিশ সহস্র ছিল, কিন্তু তাহারা আলিবর্দ্দী খাঁর সৈন্যগণের ন্যায় শিক্ষিত ও সাহসী ছিল না। আলিবর্দ্দীর সৈন্য সংখ্যা নবাবের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র পাঠান যুদ্ধবিদ্যায় অতুলনীয় ছিল। † সাহাইয়ার নামক নবাবের গোলন্দাজ কর্ম্মচারী হাজী আহম্মদের আত্মীয় হওয়ায়, বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য নবাব তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া এণ্টনী ফিরিঙ্গীর পুত্র পাঁচু ফিরিঙ্গীকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত

* Mutakherin vol 1. P. 306.

† Orme vol 11. P. 31.

করেন। * এই সময়ে আলমচাঁদকে পদচ্যুত করিয়া যশোবন্ত রায়কে তৎপদপ্রদানের চেষ্টা করা হয়। এই রূপে যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া নবাব সরফরাজ খাঁ হিজরী ১১৫২ অব্দের ২২এ মহরম ইংরাজী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনে বামনিয়া, দ্বিতীয় দিনে দেওয়ান সরাই ও তৃতীয় দিনে থামরা † নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং শত্রুপক্ষের শিবির পর্য্যবেক্ষণের জন্য সন্নৎ নামক এক জন খোজা ও হুগলীর ফৌজদার সুজাকুলী খাঁকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহিত আলিবর্দ্দীর দূত হাকিম মহম্মদ আলি খাঁ নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁর বংশ হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সমস্ত স্বীকার করিয়া এই রূপ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, নবাবের বংশ দ্বারাই তিনি নীচ অবস্থা হইতে উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি নবাবের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রদর্শন ও সাধারণকে তাহা অবগত করার জন্য নবাবের নিকট দুইটী বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমতঃ তাঁহার মন্ত্রিসভা হইতে মর্দ্দান আলি খাঁ, মীর মর্ত্তেজা খাঁ, হাজী লুৎফ আলি খাঁ এবং মহম্মদ গাওস খাঁ প্রভৃতি কয়েক জনকে তাড়িত করিতে হইবে, কারণ তাহারা আলিবর্দ্দী ও তাঁহার বংশের পরম শত্রু এবং সুবিধামত তাহারা অপমান ও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না। তাহারা বিতাড়িত হইলে নবাবের স্বীয় ভৃত্য আলিবর্দ্দী

* Stewart P. 275. 475. (Second Edition)

† থামরা জঙ্গীপুর উপবিভাগের নিকট।

যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অবহেলা করিবে না। দ্বিতীয়তঃ যদি এই প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে নবাবের ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে তিনি মুর্শিদাবাদ-রাজধানীতে গমন করিয়া তথা হইতে উক্ত ব্যক্তিগণকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করুন। সেই যুদ্ধে যদি তাহারা জয়ী হয়, তাহা হইলে তাহাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আর যদি তাহারা পরাজিত হয়, তবে তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতে হইবে। তদনন্তর আলিবর্দ্দী নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণতলে মস্তক স্থাপন করিয়া আনন্দসহকারে স্বীয় প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিবেন। তিনি শপথপূর্ব্বক কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন এবং সেই কোরানও পাঠাইতেছেন। * মহম্মদ আলি নিজে উক্ত কোরান উপস্থিত করিয়াছিলেন, যদিও সরফরাজ ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের নিকট মহম্মদ আলি সম্মানীয় ছিলেন, তথাপি হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দ্দীর উপর সকলের বিদ্বেষ থাকায় তাঁহার কথা কাহারও কর্ণে স্থান পায় নাই। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ অনুসারে সে সময়ে যুদ্ধযাত্রা স্থগিত ছিল।

গিরিয়ার যুদ্ধ ও সরফরাজের মৃত্যু।

আলিবর্দ্দী শকরীগলি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, † এবং আতাউল্লা খাঁর পরামর্শে নবাবপক্ষীয় লোকের পথরোধ করেন। এদিকে হাজী আহম্মদ রাজমহলে আলিবর্দ্দীর সহিত

* আলিবর্দ্দীর প্রেরিত কোরান এক খানি ইষ্টকমাত্র, পুস্তকাকারে স্বর্ণখচিত বস্ত্রে মণ্ডিত ছিল। Stewart - Foot Note. P. 475.
Mutakherin Note vol 1. P. 362.

† হলওয়েল বলেন,—শকরীগলির নিকট অবস্থানকালে আলিবর্দ্দী এক বিপদে পতিত হন। তাঁহার যুদ্ধসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা প্রথমে আপনাদের বেতন

যোগদান করিলেন। তিনি নিজের প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য আলিবর্দ্দীকে কয়েক শত হস্ত পশ্চাদ্গামী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। পরে তথা হইতে রীতিমত যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করা হইল। রাজমহল হইতে ফরাক্কায়, পরে স্থতীর নিকট উপস্থিত হইয়া মর্ত্তেজা হিন্দের সমাধিস্থল হইতে বালিঘাটা পর্য্যন্ত শিবির সন্নিবেশ

যাহা বাঁকী ছিল, তদ্ব্যতীত আরও চারি মাসের অগ্রিম বেতন ও ৩ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিকের বন্দোবস্ত করিয়া বাঙ্গলার সীমায় পদার্পণ করিবে, এই অঙ্গীকারে আলিবর্দ্দীকে আবদ্ধ করে। শকরীগলিতে উপস্থিত হইয়া তাহারা আলিবর্দ্দীর নিকট তাহার দাবী করিলে, আলিবর্দ্দী মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি স্বীয় দেওয়ান চিন্তামণির সহিত পরামর্শ করিয়া জানিলেন যে, তাঁহাদের সহিত ৪৫ হাজার টাকার অধিক নাই, চিন্তামণি জগৎশেঠের নিকট টাকার জন্য লিখিতে বলিলেন। আলিবর্দ্দী তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা এবং বিলম্ব হইলে সমস্তই পণ্ড হইবে। এই সময়ে সহসা এক উপায় স্থির হইল। আমীরচাঁদ বা অমিচাঁদ এবং দীপচাঁদ নামে দুই ব্যবসায়ী পাটনায় থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত আলিবর্দ্দীর বিশেষ রূপ পরিচয় ছিল, অমিচাঁদ এই সময়ে তাঁহার শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমার নিকট ২০ হাজার টাকা আছে, এবং দেওয়ানকে তাঁহার ৪৫ হাজার টাকা দিতে বলিয়া সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের আপনাপন হিসাব লইয়া অমিচাঁদের নিকট হইতে টাকা লইতে আলিবর্দ্দীকে আদেশ দিতে বলেন। আলিবর্দ্দী দেওয়ানকে তাহাই করিতে আদেশ দেন। অমিচাঁদ তাহাদের হিসাব অনুসারে প্রথমে কয়েক জনকে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া, অন্যান্য সকলের সহিত হিসাব লইয়া গোল করিতে লাগিলেন। সমস্ত হিসাবের অষ্টম ভাগের গোল মিটিতে না মিটিতে আলিবর্দ্দী সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য নহবতে আঘাত করিতে অনুমতি দেন। নহবত বাজিলে যাহারা প্রাপ্য টাকা পাইয়াছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়, অন্যান্য সকলে পর দিন পাইবে এই ভরসায় অগ্রসর হইয়াছিল।

Holwell's Historical Events P. 94).

করা হয়। সরফরাজ খাঁ শত্রুপক্ষকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভাগীরথীতীরস্থ গিরিয়া নামক স্থানে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। * গিরিয়া তৎকালে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। মহম্মদ গাওস খাঁ শত্রুপক্ষের শিবির সন্নিবেশের বিষয় অবগত হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেন, সরফরাজ খাঁ পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সরফরাজের শিবির হইতে আলিবর্দ্দীর শিবির চারি ক্রোশ মাত্র ব্যবধান ছিল। † আলিবর্দ্দী ও সরফরাজের নিকট দূত যাতায়াত করিতে লাগিল। সরফরাজ খাঁ আলিবর্দ্দীর প্রতি পূর্ব্বের অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী পূর্ব্ব কথামত তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় বংশের শত্রুবর্গকে বিতাড়িত করার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, অথবা তাহাদিগকে আলিবর্দ্দীর হস্তে সমর্পণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। নবাব যদি তাহাতেও স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে

* হলওয়েল বলেন যে,—বাকর আলি খাঁ ও গাওস খাঁ আপনাদিগের চর দ্বারা আলিবর্দ্দীর সৈন্য সংখ্যা অবগত হইয়া নবাবকে বলেন যে, যদি আলিবর্দ্দী যেরূপ সৈন্য লইয়া আসিতেছেন, নবাবকে তদ্রূপ সৈন্য সমাবেশ করা উচিত। যদি আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সৈন্যেরা বাধা দিবে, যদি তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে তাহারা নীরব ভাবে অবস্থান করিবে। এই রূপ বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইয়া নবাব প্রস্তুত হইলেন, এবং গিরিয়ায় সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেকের ২০ হাজার পদাতিক ও ১০ হাজার অশ্বারোহী ও সরফরাজের ২০টী কামান ছিল। আলিবর্দ্দীর আদৌ কামান ছিল না। (Holwell's Historical Events vol I. P. 95). কিন্তু মুতাক্ষরীনে আলিবর্দ্দীর গোলন্দাজ সৈন্যেরও উল্লেখ আছে।

† সায়রে ৫।৬ ক্রোশ লেখা আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ৪ ক্রোশের অধিক হইবে না।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবির উত্তোলন করিয়া দূর হইতে উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শন করুন, এই রূপ প্রার্থনাও করা হয়। যদি আলিবর্দ্দী জয়ী হন, তাহা হইলে তিনি নবাবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন। যদি পরাজিত হন, তাহা হইলে নবাব যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই পালন করিবেন। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব কার্য্যকর হইল না। যখন উভয় পক্ষের মধ্যে এরূপ প্রস্তাব চলিতেছিল, জগৎশেঠ নবাব পক্ষের পরামর্শানুসারে আলিবর্দ্দী খাঁর সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট টিপ * প্রেরণ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁকে ধৃত ও সরফরাজের নিকট আনয়নের জন্য পত্রাদি প্রেরণ করিতেছিলেন। † মস্তাফা খাঁ এই রূপ কয়েক খানি টিপ পাইয়া অপর কয়েক জন কর্ম্মচারীর সহিত আলিবর্দ্দীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে অবগত করান এবং তাঁহাকে তৎপর দিবসই যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। অন্যথা নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ করেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার পরামর্শানুসারে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাঃ আপন সৈন্যদিগের মধ্যে বারুদ ও গোলাগুলি প্রদান করিতে আদেশ দিয়া সকলকে তৎপরদিবস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

* বর্ত্তমান নোট বা চেকের ন্যায় কাগজ। তাহাতে টাকা দিবার আদেশ লিখিত থাকিত; টিপ ব্যবসায়িগণের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল।

† মুতাক্ষরীনের অনুবাদক বলেন যে, আলিবর্দ্দী খাঁ নিজেই এই রূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া জগৎশেঠের দ্বারা সরফরাজের কর্ম্মচারিগণকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে মুর্শিদাবাদে এই রূপ কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। সরফরাজের এক জন কর্ম্মচারী প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি ৪ হাজার টাকার এক খানি টিপ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, সরফরাজের কর্ম্মচারীরা এই রূপ টিপ পাইয়া মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনা পূর্ণ করিয়া কামান ছাড়িয়াছিলেন। Stewart P. 275.

হইতে বলিলেন। সরফরাজের পক্ষে গাওস খাঁ ও সরফ উদ্দীন সেনাপতি এবং গজনফর খাঁ, হোসেন খাঁ মহম্মদ তকীর পুত্র হাসেন মহম্মদ, মীর মহম্মদ বাকর খাঁ, মির্জামহম্মদ ইরাজ খাঁ, মীর কামেল, মীর গদাই, মীর হায়দর খাঁ, মীর দেলার আলি, বিজয় সিংহ, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ, পঞ্চু ফিরিঙ্গী, শীলহাটের ফৌজদার সমসের খাঁ, হুগলীর ফৌজদার সুজাকুলী খাঁ, মীর হাবীব, মর্দ্দান আলি খাঁ ও কাহারও কাহারও মতে মুর্শিদকুলী খাঁ প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। নবাব রাজধানী হইতে যাত্রার সময় স্বীয় পুত্র হাফেজ উল্লা বা মির্জা আমানীকে ফৌজদার ইয়াসিন খাঁর সহিত কেল্লারক্ষার ভার প্রদান করিয়া আসেন। আলিবর্দ্দীর পক্ষে মস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ ওমার খাঁ, রহিম খাঁ, করিম খাঁ, সরন্দাজ খাঁ, সেখ মহম্মদ মাসুম, সেখ জাঁহাইয়ার খাঁ, মহম্মদ জলফখর খাঁ, ছেদন হাজারী বক্তার সিংহ ও নন্দলাল প্রভৃতি সেনাপতিগণের উল্লেখ দেখা যায়। আলিবর্দ্দী আপন সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী নন্দলালের উপর এক দলের ভার অর্পণ করিয়া, তাঁহার হস্তে আপনার পতাকা প্রদান করিলেন। নদীর যে পারে তাঁহাদের শিবির সন্নিবেশিত ছিল, নন্দলাল সেই পার হইতে মহম্মদ গাওস খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। অপর দুই দলের সহিত তিনি নদী পার হইয়া তাহার এক ভাগকে সরফরাজ খাঁর সৈন্যগণের পশ্চাতে যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা সম্মুখের ভাগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিলে, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে সরফরাজ খাঁকে আক্রমণ করিবে বলিয়া আদিষ্ট হয়। তাহারা রাত্রি প্রায় ১টার সময় ঘোর

অন্ধকারে যাত্রা করিয়া এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিল, এবং সাঙ্কেতিক কামানের শব্দশ্রবণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। উহা শ্রবণমাত্র যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা সরফরাজ খাঁর শিবির আক্রান্ত হইবে বলিয়া স্থির হইল। যাহারা পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে, তাহারা আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর অধীনে প্রেরিত হইয়াছিল, নওয়াজেস মহম্মদ আবদুল আলি খাঁ, মস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ এবং অপর কয়েক জন আফগান কর্ম্মচারীকে সহকারীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবে, আলিবর্দ্দী নিজে তাহাদের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পর দিন প্রভাত হইবামাত্র আলিবর্দ্দী সরফরাজের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং নন্দলালও তাহা হইতে কিছু দূরে ধীরে ধীরে গাওস খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। আলিবর্দ্দী সরফরাজের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলে, কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র পশ্চাদ্ভাগস্থিত তাঁহার সৈন্যেরা সরফারাজ খাঁর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। এদিকে নন্দলালও গাওস খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সরফরাজ খাঁ প্রাতরুপাসনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তিনি কামানের শব্দ শ্রবণমাত্র উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আলিবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দীর যে সমুদয় সৈন্য পশ্চাদ্দিকে ছিল, তাহারা সরফরাজের শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লুণ্ঠনক্রিয়া আরম্ভ করিল, তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে গিয়া নবাবের অনেক সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। মির্জা ইরাজ খাঁর পুত্র তাহাদের অন্যতম। সরফরাজ খাঁ হস্তিচালককে আলিবর্দ্দীর সম্মুখীন

হইতে আদেশ প্রদান করিলে, সে তাঁহাকে আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া বীরভূমাভিমুখে প্রস্থান করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। কারণ, বীরভূম প্রদেশ শত্রুবর্গের পক্ষে অগম্য ছিল, ও তাহার জমীদার অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। সরফরাজ খাঁ তথায় নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া আপন বন্ধুবর্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি হস্তিচালকের কথা কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত ক্রোধসহকারে তাহাকে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে গমন করার জন্য আদেশ দেন। হস্তিচালক তাঁহাকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, নাগরাখানা বা বাদ্যাগার পার হইয়া সৈন্যগণের অগ্রভাগে উপস্থিত হইবামাত্র একটী বন্দুকের গুলি আসিয়া সরফরাজের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবলীলার অবসান করিয়া দেয়। * তাঁহার সহিত কয়েকটী খ্যাতনামা কর্ম্মচারীও আপনাদিগের যথা সাধ্য পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মীর কামেল, মীর গদাই, মীর আমেদ, মীর ফরাজুদ্দীন হাজী লুৎফ আলি খাঁ ও কোর্ব্বান আলি খাঁ প্রধান। রায়রায়ান আলমচাঁদ ও মির্জা ইরাজ খাঁ আহত হইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, আলমচাঁদ নবাবের কামান পরিচালনের ভার লইয়া ছিলেন। † মহম্মদ গাওস খাঁ নন্দলালের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, এবং নন্দলাল এই যুদ্ধে নিহত হন। যৎকালে সরফরাজ খাঁর হস্তিচালক প্রভুর মৃতদেহ লইয়া মুর্শিদা-

* Mutakherin vol 1. P. 364.

† আলমচাঁদ গোলাশূন্য কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। Orme vol II. P. 31.

বাদাভিমুখে প্রস্থান করিতেছিল, গাওস খাঁ প্রভুকে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার জয়সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য এক জন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে প্রেরণ করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজকে মৃত জানিয়া আপনার সমুদয় সৈন্য সমবেত করিয়া গাওস খাঁকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত সৈন্য সমবেত করা তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল। যাহারা পশ্চাদ্দিক হইতে সরফরাজ খাঁর শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা শিবির হইতে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থানের চেষ্টা করিতেছিল। এ দিকে গাওস খাঁ স্বীয় প্রভুর মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন, পরে আলিবর্দ্দীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির অল্প আশা জানিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয় মহম্মদ কুতুব ও মহম্মদ পীরকে * আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তৎকালে গাওস খাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় পরাক্রমশালী যোদ্ধা অল্পই দৃষ্ট হইত। গাওস খাঁ আপন সৈন্যগণকে সমবেত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সরফরাজের মৃত্যুশ্রবণে মুর্শিদাবাদাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। গাওস খাঁ অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। আলিবর্দ্দীর সৈন্যেরা তাহাতে পলায়ন করিতে লাগিল। অবশেষে ছেদন হাজারীর বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া গাওস খাঁ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের চেষ্টা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে

* রিয়াজে পীরের স্থলে বাবর লিখিত আছে।

আরও দুইটী গুলির দ্বারা তিনি ভূতলশায়ী হইয়া পড়েন। * তাঁহার পুত্রদ্বয়ও অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন ও ছেদন হাজারীকে তরবারির আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মহম্মদ কুতুব অত্যন্ত বীরভাবে প্রাণত্যাগ করায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহার সমাধি হয়। মীর দিলার আলি খাঁ নামক সরফরাজের আর এক জন কর্ম্মচারীও বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ান মীর হাবীব উড়িষ্যা হইতে এক দল সৈন্য লইয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরফরাজের মৃত্যুর পর তিনি কটকাভিমুখে প্রস্থান করেন। † কেহ কেহ বলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ নিজেও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ‡ মীর সরফ উদ্দীন নামক সরফরাজের অপর এক

* হলওয়েল বলেন যে, গাওস খাঁ কতিপয় সাহসী সৈন্যের সহিত আলিবর্দ্দীর সম্মুখীন হইয়া নিজ হস্তে আলিবর্দ্দীকে প্রায় নিহত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই সময়ে ছেদন হাজারী মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং গাওস খাঁকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য করেন। তাহার পর আলিবর্দ্দীর সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া গাওস নিহত হন। (Holwell's Historical Events Pt. I Chapt II. p. 97).

† Stewart p. 276.

‡ হলওয়েল বলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবের শরীররক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নবাব তোপখানার দারোগার বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার প্রধান যোদ্ধাদ্বয় বাকর আলি ও গাওস খাঁর (হলওয়েল সাহেবের মতে সরফরাজের অগ্রে গাওস খাঁর মৃত্যু হয়,) মৃত্যু শুনিয়া মুর্শিদকুলীকে যুদ্ধস্থল হইতে গমন করিয়া উড়িষ্যারক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ নবাবের আদেশ গ্রহণ করিয়া কতিপয় সৈন্যসহ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন। (Holwell's Historical Events. Pt. I. Chapt. II. p. 97-98).

কর্ম্মচারী আলিবর্দ্দীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দুই শরের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত দুই শরের মধ্যে একটী আলিবর্দ্দী খাঁর হস্তস্থিত ধনুকে বিদ্ধ হয়, অপরটী তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে অল্পমাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে জয়ের কোন প্রকার আশা না দেখিয়া সরফ উদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করেন। রাজপুত বিজয় সিংহ থামরা শিবির হইতে এই সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া উৎসাহসহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, আলিবর্দ্দীর আদেশানুসারে দাওরকুলী খাঁ বন্দুকের গুলির আঘাতে তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলেন। তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহ পিতার মৃতদেহ রক্ষার জন্য নিস্কোষিত তরবারিহস্তে রণস্থলে দাঁড়াইলে, আলিবর্দ্দী সৈন্যদিগকে তাহার প্রতি আঘাত করিতে নিষেধ করেন, এবং পরে বিজয় সিংহের মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করিতে আদেশ দেন। * পাঁচু ফিরিঙ্গীর গোলন্দাজগণ পলায়ন করিলেও তিনি নিজে তোপ ছাড়িতে ত্রুটি করেন নাই। পরে সরফ উদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, আফগানেরা তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। আলমচাঁদ আহত হইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন, তথায় তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। † ফলতঃ সরফরাজের প্রত্যেক সেনাপতি ও কর্ম্মচারী অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা যেরূপ

* জালিম সিংহের বিবরণ মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর "একটী ক্ষুদ্র কাহিনী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† হলওয়েল বলেন যে, আলমচাঁদ গৃহে প্রত্যাগত হইলে, প্রভুদ্রোহিতার জন্য আপন স্ত্রীর নিকট তিরস্কৃত হন, তাঁহার স্ত্রী এরূপও বলিয়াছিলেন যে, তিনিও পরিশেষে আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক উচিত ফল পাইবেন।

প্রভুভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অম্লানবদনে বিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপন আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া যেরূপে প্রভুর উপকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত ও প্রশংসনীয়। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রভুর উপকারকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রভুভক্তি যে সাধারণের অনুকরণীয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে গাওস খাঁর প্রভুভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সেই অতুলনীয় প্রভুভক্তির জন্য গাওসখাঁ উক্ত অঞ্চলে পীর বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ প্রদেশের গ্রাম্য গীতি তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। * গিরিয়ার সমরক্ষেত্রের নিকট তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার গুরু ফকীর সা হায়দরী তাঁহার মৃতদেহ ভাগলপুরে লইয়া গিয়া পুনঃ সমাহিত করেন। তথাপি যে স্থানে তিনি সমাহিত হইয়া ছিলেন, অদ্যাপি তাহা গাওস খাঁর দরগা বলিয়া পূজিত হইতেছে।† পলাশীর যুদ্ধের পরই গিরিয়ার যুদ্ধ মুর্শিদাবাদবাসিগণের নিকট শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। হিজরী ১১৫৩ অব্দের সফর মাসের মধ্য ভাগে ইংরাজী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদবাসীদিগকে ও সরফরাজখাঁর পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিবার

আলমচাঁদ তজ্জন্য ঘৃণায় হীরা চুষিয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাসায়নিকগণের মতে হীরক বিষাক্ত নহে, তবে কোন কোন প্রস্তর বিষাক্ত হইতে পারে।

* মুর্শিদাবাদ কাহিনীর পরিশিষ্ট দেখ।

† মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর "গিরিয়া" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।



জন্য ও ধনরত্নাদির রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় ভ্রাতা হাজী আহম্মদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এদিকে সরফরাজের হস্তিচালক প্রভুর মৃতদেহ লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, নবাবের পুত্র মির্জ্জা আমানী গভীর রজনীতে গুপ্তভাবে নেকৃটাখালিতে পিতার মৃতদেহ সমাহিত করেন। সরফরাজের সমাধি এক্ষণে নগিনাবাগনামে এক নির্জ্জন উদ্যানমধ্যে বিরাজ করিতেছে। * মির্জা আমানী ফৌজদার ইয়াসিন খাঁর সাহায্যে নগর রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার সহিত যোগদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহারা আলিবর্দ্দীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। †

আলিবর্দ্দীর মুর্শিদাবাদে আগমন ও সিংহাসনে আরোহণ।

গিরিয়ার যুদ্ধের দুই দিবস পরে আলিবর্দ্দী মহাধূমধামের সহিত মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াই জিন্নেতেন্নেসা বেগমের নিকট গমন করেন, এবং ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক নত করিয়া তাঁহার দোষের ক্ষমা চাহেন, এবং এই জন্য যে, জগতে তাঁহার কলঙ্ক বিঘোষিত হইবে তাহাও প্রকাশ করিয়া বলেন। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, যদিও সরফরাজের মৃত্যুর জন্য তিনি ঘোরতর প্রভুদ্রোহিতাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। তথাপি যত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না। যাহাতে জিন্নেতেন্নেসা তাঁহার এই ভীষণ দোষ হইতে ক্ষমা করেন, তজ্জন্য বারংবার প্রার্থনা করা হয়।

* সম্প্রতি তাহা গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে।

† Stewart P. 276.

কিন্তু জিন্নেতেন্নেসা ইহাতে কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই।* আলিবর্দ্দী তদনন্তর নবাব সুজা খাঁর নির্ম্মিত নূতন চেহেল-সেতুন বা দরবারগৃহের মসনদে আরোহণ করিয়া, নাগারাধ্বনির দ্বারা স্বীয় রাজ্যগ্রহণের সংবাদ ঘোষণা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরে রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও মুর্শিদাবাদস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে নজর গ্রহণ করিয়া সকলকে আশ্বাসপ্রদ বাক্যে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত বাহ্যিক কার্য্য ব্যতীত তিনি যাহাতে সাধারণকে তুষ্ট করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ রূপ যত্নবান হইলেন। কারণ, তিনি স্বীয় একমাত্র উপকারক সুজা উদ্দীনের বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুদ্রোহিতার জন্য তিনি যে গুরুতর পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ রূপ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টাও বিফল হয় নাই। কারণ সরফরাজের রাজত্বকালে যাবতীয় লোক ঘোর অরাজকতা অনুভব করিতেছিল। এক্ষণে আলিবর্দ্দীর আশ্বাসপ্রদ বাক্যে ও সান্ত্বনায় সকলে তাঁহার প্রবল দোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এই রূপে আলিবর্দ্দী খাঁ অতীব বিচক্ষণতায় ও সাধু ব্যবহারে প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

* Mutakherin vol II. P. 36.

আলিবর্দ্দী খাঁর ঘোরতর ষড়যন্ত্রে নিপতিত হইয়া সরফরাজ খাঁ সর্ব্বস্ব ও জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া নেকৃটাখালিতে সমাহিত হইলেন। আমরা এক্ষণে তাঁহার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়া তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। সরফরাজ খাঁর বিবরণ পাঠ করিলেই তাঁহার চরিত্র অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তথাপি সংক্ষেপে এক স্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। সরফরাজ খাঁর হস্তে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার যে শাসনদণ্ড অর্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহার গুরুভার বহন করিতে সম্পূর্ণ রূপে অযোগ্য ছিলেন। কি প্রকারে প্রজাপালন করিতে হয়, অথবা কি প্রকারে রাজ্যশাসন করা উচিত, তাহার কণামাত্রও তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। সুবিচারের অভাবে তাঁহার রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত রাজনীতির জ্ঞান তাঁহার আদৌ ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয়না। কি প্রকারে স্বীয় রাজ্য মধ্যে প্রকৃতিবর্গকে শাসন করিতে হয়, অথবা অন্যান্য রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহার কিছু মাত্র জ্ঞান তাঁহার জড়ভাবাবৃত হৃদয়ে প্রতিভাত হইতনা। মুতাক্ষরীনকার বলিয়াছেন যে, তাঁহার কোন প্রকার শাসনজ্ঞান, এমন কি সামান্য কার্য্যদক্ষতা পর্য্যন্তও ছিলনা। তাঁহার মতে যদি আর কিছু দিন সরফরাজ খাঁ রাজত্ব করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যমধ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই হয়ত একেবারে সমস্ত বাঙ্গলাপ্রদেশ ধ্বংস হইয়া যাইত।* এই সময়ে মহা-

সরফরাজের চরিত্র-সমালোচনা।

* Mutakherin vol I. P. 369.

রাষ্ট্রীয়গণ যাবতীয় সমৃদ্ধিশালী প্রদেশের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বাঙ্গলাও তাঁহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিলনা। যদি সরফরাজের রাজত্বকালে তাঁহারা বাঙ্গলায় উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিত, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বঙ্গবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।* ফলতঃ সরফরাজ যে রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে অবমানিত করিয়া আরও অরাজকতার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সরফরাজ স্বীয় মাতামহ মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায় ধর্ম্মপালনের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহা বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হইত। ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য পালন করা তাঁহার ন্যায় সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তি পারিয়া উঠিতেন না। তিনি কেবল কোরানশ্রবণকেই ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন, কিন্তু কখনও তাহার উপদেশপালনে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার পিতার দাক্ষিণ্যে ও সুবিচারে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস অলঙ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অকর্ম্মণ্যতাই তাঁহাকে ঘোরতর কালিমামণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। পিতার কোন প্রকার সদ্গুণ তিনি অনুকরণ করিতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার বিলাসিতাদোষটী সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেই খানে সুন্দরী রমণী থাকিত, সরফরাজের কর্ণগোচর হইবামাত্র যে কোন উপায়ে হউক, সে আনীত হইয়া তৎক্ষণাৎ নবাবের অন্তঃপুরবাসিনী হইত। কথিত আছে যে, তাঁহার অন্তঃপুরে সার্দ্ধ সহস্র রমণী অবস্থান করিত। নবাব তাহাদিগের

* Mutakherin vol I. P. 369.

অপ্সরাবিনিন্দিত রূপসাগরে আপনার মনঃপ্রাণ নিমগ্ন করিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেন। তাহাদিগের সহিত কখন প্রমোদ-উদ্যানে বিহার, কখনও বা বিমল চন্দ্রিকাবিধৌত ভাগীরথীবক্ষে ময়ূরপঙ্খী-আরোহণে ভ্রমণ, কখনও বা বিশাল অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে নানা প্রকার পরিহাস করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। যিনি সার্দ্ধ সহস্র রমণীর মনোরঞ্জনে প্রয়াস পাইতেন, রাজ্যশাসনে সময় পাইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে যে অতীব দুর্ঘট ছিল, তাহা আনায়াসেই উপলব্ধি হয়। রমণীদিগের নিবেদনআবেদন এবং তাহাই রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে প্রজাপালন বলিয়া বোধ হইত। বিলাসিতা ও আড়ম্বর-পূর্ণতা তাঁহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। রমণীর রূপসুধা-পানের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইত। এই ভীষণ প্রবৃ-ত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্মীকে যেরূপে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য নবাব যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়ের শাসনভার পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার গুণের মধ্যে তিনি কখনও প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করেন নাই। তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে তিনি চেষ্টা করিতেন না, এবং যদিও ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণতাদোষে দূষিত ছিলেন, তথাপি মদ্যপান করিয়া কখন প্রাকৃত জনের ন্যায় নিজের গৌরব নষ্ট করেন নাই। * গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপ-স্থিত হইয়া তিনি সাহসিকতার পরিচয়ও দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের

* Stewart P. 271. কাহারও কাহারও মতে তিনি মদ্যপায়ীও ছিলেন। (Holwell's Historical Events pt. I Chapt. II P. 73.)

নবাবদিগের মধ্যেই তিনিই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সদ্‌গুণ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। সরফরাজ সুজা উদ্দীনের অযোগ্য পুত্র ও মুর্শিদকুলী খাঁর অযোগ্য দৌহিত্র ছিলেন। যদি তাঁহার নৈতিক অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার বল থাকিত, তাহা হইলে অপরে কথনও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিত না। একমাত্র তাঁহারই দোষে মুর্শিদকুলীর ও সুজা উদ্দীনের বংশ অপসৃত হইয়া তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকে মুর্শিদাবাদের রাজচ্ছত্র ধৃত হইয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থা।

বঙ্গসাহিত্য।

বঙ্গসাহিত্য আদিম অবস্থা অতিক্রম করিয়া যে সময়ে ধীরে ধীরে আপনার উজ্জ্বল কিরণ পরিব্যাপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে আমরা কৃত্তিবাসের ন্যায় মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও বঙ্গকবি আপনার স্বাতন্ত্র্য দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদে তখনও বাঙ্গলা ভাষা ও-সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিতেছিল। কিন্তু সে পুষ্টিতে বঙ্গ সাহিত্যের অস্থিমজ্জা সুদৃঢ় ও ঘন হইয়া উঠে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদে বঙ্গভাষার যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ক্রমে বঙ্গকবিগণ কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের প্রয়াস পাইতে থাকেন। এই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন ধর্ম্মবিষয়ে কলহ ও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গলার ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হইতে আমরা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাব দেখিতে পাই। তাহার পর আদিশূরের রাজত্বকাল হইতে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। এই দুই ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষণে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, কিন্তু গুপ্তভাবে আজিও হিন্দু

ধর্ম্মের সহিত অনেক স্থানে মিশিয়া রহিয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের এই সঙ্ঘর্ষণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অতি আদিম অবস্থায় ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহার বিশেষ রূপ বিবরণ পাওয়ার উপায় নাই। তবে হিন্দুধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইলে, যখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হইতে বঙ্গসাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রথমে শৈব ও শাক্ত মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে এই দুই মতের যাহা কিছু বিভিন্নতা ছিল, তাহা পরিশেষে এক হইয়া যায়, এবং আমরা পরবর্ত্তী কালে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ দেখিতে পাই। আজিও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। যে সময়ে বৈষ্ণবগণ শাক্তগণের উপর জয়লাভ করিয়া বাঙ্গলায় দুন্দুভিনিনাদ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে আমরা বঙ্গসাহিত্যের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি পদকর্ত্তা ইহার পথপ্রদর্শক এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অনুচরগণ ইহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্য এক নূতন পথে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ করে, ক্রমে তাহা অনন্তের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। এই লৌকিক ধর্ম্মশাখার সহিত অনুবাদশাখাও দিন দিন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধারণ লোকের ধর্ম্ম হইয়া উঠায়, বঙ্গসাহিত্যে তাহা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু শাক্ত ধর্ম্মও কোন কালে বঙ্গদেশে আপনার অস্তিত্ব হারায় নাই। বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীর বঙ্গবাসিগণের অধিকাংশই চিরদিনই শক্তি-উপাসক ছিলেন। এই শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-

গণ নেতা হওয়ায়, বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত ধর্ম্মের স্থান কিছু অল্প হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ তাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চাতেই নিবিষ্ট থাকিতেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আবার শক্তিমাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমরা বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কথাই বলিতেছি। সেই সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যের হ্রাস হইয়া শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্যই বিস্তৃত হইতেছে, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে তাহা বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের নিদর্শন ধর্ম্মপূজাও বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু শাক্ত বা শৈব ও বৈষ্ণবেরা তাহাকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ কোন স্থানে শিব ও কোন স্থানে বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেন, এবং অদ্যাপি হইতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মপূজার বিবরণ বিশেষ রূপে জানিতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা বৈষ্ণবসাহিত্যেরও যথেষ্ট প্রাধান্য দেখিতে পাই। এবং শাক্তসাহিত্যও যে দিন দিন তাহার উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও বুঝিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপূজাও সাহিত্যের একাংশ অধিকার করিতে ছাড়ে নাই। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের জীবনীর সহিত তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ হইতে উহা দেখাইতে চেষ্টা করিব, এবং সাধারণে তাহা হইতে ইহাও জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গসাহিত্য দিন দিন কিরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

অদ্ভুত আচার্য্য ও তাঁহার রামায়ণ।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা অদ্ভুত আচার্য্য-নামে ব্রাহ্মণকবির রামায়ণের পরিচয় প্রাপ্ত হই। অদ্ভুত আচার্য্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ, তাঁহার পিতার নাম শ্রীনিবাস ও পিতামহের নাম প্রচণ্ড। সোনা-রাজ্যে বড়বাড়ী গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই সোনারাজ্য কোথায় তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়া তিনি রামায়ণরচনায় প্রবৃত্ত হন।* নিত্যানন্দ উত্তম রূপে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, অথচ অল্প বয়সে রামায়ণ রচনা করায় অদ্ভুত আচার্য্য:উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণে অদ্ভুতরামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার অদ্ভুত আচার্য্য উপাধিও হইতে পারে। অদ্ভুতরামায়ণে রামমাহাত্ম্য অপেক্ষা সীতমাহাত্ম্যের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্ভুতরামায়ণে লিখিত আছে যে, রাবণনিধনের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে, ঋষিগণ সীতার নিকট হইতে সহস্রবদন রাবণের বিষয় শ্রবণ করেন। দশবদন ও সহস্রবদন উভয়েই বিশ্বশ্রবা ও কৈকসীর পুত্র। দশবদন লঙ্কার ও সহস্রবদন পুস্করদ্বীপের অধীশ্বর হন। রামচন্দ্রও সীতার নিকট হইতে সহস্রবদন রাবণের পরিচয় পাইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করেন। তিনি সহস্রবদন রাবণের সৈন্যসমূহ বিনাশ করিয়া, তাহার আক্রমণে মূর্চ্ছিত হইয়া পুষ্পকরথে শায়িত হইলে, সীতা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, ও কালিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রবদন রাবণকে নিধন

* অদ্ভুতআচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সপ্তম বর্ষে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ-বেশে দেখা দিয়া তাঁহাকে রামায়ণ লিখিতে অনুমতি দেন।

করেন। এই অদ্ভুতরামায়ণও বাল্মীকিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত। বাল্মীকি ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন যে, অসংখ্য রামায়ণের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থেই রামমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সীতা-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি সীতাকে মূল প্রকৃতি ও জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* ইহা শক্তিমাহাত্ম্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। অদ্ভুত আচার্য্য অদ্ভুতরামায়ণ অবলম্বন করিয়া সীতাকে কালিকারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে যে শক্তিমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রূপে শক্তিমাহাত্ম্য ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে।

* ভরদ্বাজের প্রতি বাল্মীকির উক্তি—

"শতকোটিপ্রবিস্তারে রামায়ণে মহার্ণবে।
রামস্য চরিতং সর্ব্বমাশ্চর্য্যং সম্যগীরিতং॥
পঞ্চবিংশতিসহস্রম্ নৃলোকে যৎপ্রতিষ্ঠিতং।
নৃণাংহি সদৃশং রামচরিতং বর্ণিতং ততঃ।
সীতামাহাত্ম্যসারং যদ্বিশেষাদত্র নোক্তবান্॥
শৃণুষ্বহিতো ব্রহ্মন্ কাকুৎস্থচরিতং মহৎ।
সীতায়া মূলভূতায়াঃ প্রকৃতশ্চরিতং মহৎ॥
জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা মহাগুণা।
তপঃসিদ্ধি স্বর্গসিদ্ধির্ভূতি র্ভূতিমতাং সতী॥
বিদ্যাবিদ্যা চ মহতী গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ঋদ্ধিঃ সিদ্ধির্গুণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতা সর্ব্বকারণকারণং।
প্রকৃতি র্বিকৃতির্দেবী চিন্ময়ী চিদ্বিলাসিনী॥"

(অদ্ভুতরামায়ণ)

কবি কৃষ্ণরাম ও বিদ্যাসুন্দর, কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক জন প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম। কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে ও বর্ত্তমান বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট নিমতাগ্রামে কায়স্থকুলে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। তাঁহাদের উপাধি দাস। কৃষ্ণরামের পিতার নাম ভগবতী দাস, নিমতা গ্রামে অদ্যাপি কৃষ্ণরামের ভিটা বিদ্যমান আছে। এই কৃষ্ণরাম হইতে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের সামান্য আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলায় বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর চারি বার বাঙ্গলায় ও এক বার উর্দ্দূতে রচিত হয়। বাঙ্গলায় প্রথম কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয় রামপ্রসাদ, তৃতীয় ভারতচন্দ্র ও চতুর্থ প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।* সুতরাং যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বাঙ্গলার গৃহে গৃহে প্রবাদকাহিনীর ন্যায় কথিত হইয়া থাকে, এবং যাহার জন্য ভারতচন্দ্র সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন, কবি কৃষ্ণরাম তাহাকেই বাঙ্গলা ভাষায় প্রথমে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সে বর্ণনাও সুললিত হওয়ায় তৎকালে লোকের মনোরঞ্জন করিত। সুতরাং

* "বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দর
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণরামের আসন নিতান্ত নিম্নে নহে। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। উহা ভারতচন্দ্রেরই সৃষ্টি। কেন তাঁহার সৃষ্টি হইল, তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব। কৃষ্ণরাম বীরসিংহপুরমাত্র বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গল নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর উক্ত কালিকামঙ্গলেরই অন্তর্গত। এই কালিকামঙ্গলে কালিকামাহাত্ম্যই গীত হইয়াছে, এবং তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরকেও দেবীভক্ত বলিয়া জানা যায়।* সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শক্তিমাহাত্ম্য কেমন ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান স্থান অধিকার করিতেছিল, কবি কৃষ্ণরামের কাব্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। কৃষ্ণরামের প্রথম কাব্য রায়মঙ্গল, সুন্দরবনের দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার শিশু কালে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রায়মঙ্গল রচিত হয়। রায়মঙ্গলের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার কালিকামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল।

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কালিকামঙ্গলের বন্দনা হইতে চৈতন্যবন্দনার কিছু ঘটা দেখিয়া কৃষ্ণরামকে চৈতন্যোপাসক স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চৈতন্যোপাসকত্বসম্বন্ধে কেবল বন্দনার অংশটুকু আমাদের নিকট চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষান্তরে তাঁহার কালিকামঙ্গলরচনা ও বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরকে দেবীভক্ত দেখিয়া অন্য রূপ মনে হয়। কবিকঙ্কণও চৈতন্য বন্দনা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম চৈতন্যভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি চৈতন্যোপাসক ছিলেন কিনা সন্দেহ।

কবি কৃষ্ণরামের পর আমরা ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

ঘনরাম ও শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

বর্দ্ধমানের কৈয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর-গ্রামে ঘনরাম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়। শঙ্কর ও গৌরীকান্ত নামে ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র ছিলেন। এই গৌরীকান্তই ঘনরামের পিতা। তাঁহার মাতা সীতাদেবী কৌকুসাবীর রাজকুলোদ্ভূত গঙ্গাহরির কন্যা। ঘনরাম শৈশবে অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন। গৌরীকান্ত পুত্রের বিদ্যাভ্যাসের জন্য বর্দ্ধমানের তৎকালীন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চার স্থান রামপুরের চতুষ্পাঠীতে পুত্রকে পাঠাইয়া দেন। তথায় বিদ্যা-ভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ও সাধুসংসর্গে ঘনরামের কলহপ্রিয়তার দমন হওয়ায়, তিনি শিক্ষায় ও কবিত্বে মনোযোগ প্রদানে সক্ষম হন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া গুরু তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ঘনরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। বর্দ্ধমানেশ্বর মহারাজাধিরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের অনুগ্রহে পালিত হইয়া তিনি রাজার কল্যাণে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। * গ্রন্থের অনেক স্থানের ভণিতায় মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে ঘনরাম গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা তাঁহার স্মরণ

* "অখিলে অতুলকীর্ত্তি, মহারাজচক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিন্তি তাঁর জয়োন্নতি, কৃষ্ণপুরনিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রসগান॥"
ধর্ম্মমঙ্গল।

ছিল না, কিন্তু তাঁহার সমাপ্তিকাল তিনি সুস্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৬৩৩ শাকে বা ১৭১১ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। * ধর্ম্মমঙ্গল এক খানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ, ইহাতে নানা রসের নানা প্রকার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্ত ধৈর্য্যসহকারে পড়িয়া উঠা দুষ্কর। ঘনরামের কবিত্ব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও, তাঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতে কবির ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মরাজের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মরাজসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের গল্পাংশ পাঠে জানা যায় যে, ইন্দ্রের নর্ত্তকী অম্বুবতী অভয়ার শাপে মর্ত্ত্যে গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের শ্যালী রঞ্জাবতীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অজয়নদের নিকটস্থ ত্রিষষ্টীগড়ের রাজা কর্ণসেন ধর্ম্মপালের বন্ধু ছিলেন। সোমঘোষের পুত্র ইছাই

* ধর্ম্মমঙ্গলে এই রূপ লিখিত আছে—

> "সঙ্গীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।
> শুন সবে যেকালে হইল সমাপন॥
> শক লিখে রামগুণরসসুধাকর।
> মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
> সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
> যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

রামগুণরসসুধাকর অর্থে ৩৩৬১, অঙ্কের বামা গতি অনুসারে ১৬৩৩ শক হয়। কেহ কেহ রাম শব্দে ১ অর্থ করিয়া ইহার ১৬৩১ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতে রাম শব্দে ৩ বুঝায়। ঘনরাম যখন সংস্কৃতবিৎ ছিলেন, তখন তিনি রাম শব্দ ৩ অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। মুদিখানার রামেরাম তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার লিখিত কবিতা হইতে বুঝা যায় যে, ১৬৩৩ শাকের ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে ধর্ম্মমঙ্গল সমাপ্ত হয়।

ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিলে, তাঁহার রাণী .পুত্রশোকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়। ধর্ম্মপাল ইছাইকে দমন করিতে না পারায় রাজা কর্ণসেনকে ময়নাগড়ের অধিপতি করিয়া পাঠান। এই ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। ধর্ম্মপালের শ্যালক ও তাঁহার পাত্র মহামদ রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে বিবাহ হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ভগিনী ও ভগিনীপতির অনিষ্ট আচরণে প্রবৃত্ত হন। কর্ণসেনের পুত্র না হওয়ায়, মহামদ তজ্জন্য ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। সেই কারণে রঞ্জাবতী ক্ষোভে পুত্রকামনায় নানাবিধ ব্রতাদি আরম্ভ করেন। পরে তিনি ধর্ম্মরাজের সেবক সুপ্রসিদ্ধ রমাই পণ্ডিতের উপদেশে চাঁপাইনামক স্থানে শালে ভর দিয়া ধর্ম্মরাজের তপস্যা করিলে ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া রঞ্জাবতীকে পুত্র-লাভের বর প্রদান করেন। কাশ্যপনন্দন মর্ত্ত্যে ধর্ম্মরাজের মাহাত্ম্য-বিস্তারের জন্য রঞ্জাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া লাউসেন নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। লাউসেনের প্রতি তাঁহার মাতুল মহামদের ক্রোধ হওয়ায়, তিনি নানা উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্ম্মের কৃপায় ও হনুমানের সাহায্যে তিনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। লাউসেনের আর একটী ভ্রাতা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কর্পূর, তিনি ভগবানের মুখস্থিত কর্পূরচূর্ণ হইতে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম কর্পূর হয়। লাউসেন ও কর্পূর মল্লযুদ্ধে শিক্ষিত হইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, আপনাদের বীর্য্যবত্তার পরিচয়

দিয়াছিলেন। লাউসেন কলিঙ্গা, অমলা, বিমলা ও কানড়া নামে চারি রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি পিতৃশত্রু ইছাই-এর প্রাণবধ করিয়া পিতার অপমানের প্রতিশোধ লন। ইহার পর গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপূজার ইচ্ছা করিলে, গৌড়ে ধর্ম্মরাজের মাহাত্ম্য-বিস্তারের জন্য লাউসেন তপস্যা করিতে হাকন্দে গমন করেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি ধর্ম্মের অনুগ্রহলাভে ও ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যবিস্তারে সক্ষম হন। যৎকালে লাউসেন ধর্ম্মরাজের তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাতুল মহামদ ময়নাগড় অধিকার করার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। রাণী কলিঙ্গা সেই যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দেন। পরে রাণী কানড়ার যুদ্ধে মহামদ পরাস্ত হন। অবশেষে মহামদ নিজ পাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে একরূপ নির্ব্বংশ হইতে হইয়াছিল। মর্ত্ত্যে ধর্ম্মমাহাত্ম্যপ্রচারের পর লাউসেন দিব্যরথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। লাউসেনের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অনেক গুলি ধর্ম্মমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া যায়। রমাই পণ্ডি-তের পদ্ধতি, হাকন্দ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, সীতারাম, রামদাস, রূপরাম প্রভৃতির ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থ ঘনরামের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে ধর্ম্মমাহাত্ম্যও বিস্তৃত হইয়াছে। ঘনরাম ময়ূরভট্টের পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নায়ক নায়িকার আখ্যায়িকা রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী ও রূপ রামের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইছাই ঘোষ ও লাউ-সেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। বীরভূমের অজয় নদের

নিকটে এখনও ইছাই ঘোষের বাটীর ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। ময়নাগড়েও অদ্যাপি লাউসেনপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ ও তাঁহার মন্দির বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল বুঝিবার উপায় নাই। যে ধর্ম্মরাজের মাহাত্ম্য লইয়া অনেক দিন হইতে বহুসংখ্যক ধর্ম্মকাব্য রচিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মরাজ-সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মরাজ অদ্যাপি পশ্চিম বাঙ্গলায় পূজিত হইতেছেন। তিনি কোন স্থানে শিবরূপে এবং কোথাও বা বিষ্ণুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মঠাকুরের কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই। কোন স্থানে তিনি ঘটে, কোন স্থানে সিন্দুরলেপিত প্রস্তরখণ্ডে ও কোথায়ও বা তিনি প্রতিমাতে পূজিত হন। প্রতিমার আবার ভিন্ন ভিন্ন আকার দেখা যায়, কোথায় কচ্ছপাকার, কোথায় ঝিঁকের ন্যায় কোণাকার, এবং কোন স্থানে বা শিবলিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে মন্দিরে ও অনেক স্থানে বৃক্ষতলে তিনি অবস্থিত আছেন। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি সাধারণতঃ শিব অথবা বিষ্ণুরূপে পূজিত হন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই ধর্ম্মঠাকুর হিন্দুদেবতা নহেন। তিনি বৌদ্ধদেবতা। বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। পরে তাঁহাদের ধর্ম্মও ক্রমে আকারপ্রাপ্ত হন। এক্ষণে তিনি হিন্দুদেবতারূপে স্বীকৃত হইয়া শিব অথবা বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেছেন। ধর্ম্মের ধ্যান ও পূজাপদ্ধতি দেখিয়া এবং হাড়ি, ডোম, পোদ, বাইতি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির সাধারণতঃ উপাস্য দেবতা বলিয়া তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া

* Hunter's Annals of Rural Bengal.

থাকেন। ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ রমাইপণ্ডিত বাইতিজাতীয় ছিলেন। ধর্ম্মের ধ্যানে তাঁহাকে শূন্যমূর্ত্তিনিরঞ্জন বলা হইয়াছে। * বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী হওয়ায় শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজকে তাঁহারা বৌদ্ধদেবতা বলিয়া স্থির করেন, এবং হাড়ি, ডোম প্রভৃতি যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে হিন্দু ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, ধর্ম্মরাজ সাধারণতঃ তাহাদের উপাস্যদেবতা হওয়া উহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কত দূর প্রকৃত বলিতে পারি না, তবে বৌদ্ধেরা যে শূন্যবাদী ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ঘনরাম প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সেই শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জনকে আমাদের বেদান্তপ্রতি

* "ওঁ যস্যান্তং নাদিমধ্যং নচকরপদং নাস্তি কায়ো নির্ণাদং, নাকারং নাধিরূপং সকলদলগতং নচ ভয়মরণং, যস্য যোগিনং সংকল্পহীনং শূন্যমূর্ত্তি-নিরঞ্জনায় নমঃ।" ধর্ম্মঠাকুরের সংগৃহীত অসম্পূর্ণ ধ্যান হইতে এরূপ জানা যায়। রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে লিখিত আছে—

"নাই রেক, নাই রূপ, নাই ছিল বর্ণচিন,
রবিশশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন।" ইত্যাদি

* * * * *

ধর্ম্মের ধ্যানে যেরূপ লিখিত আছে, আমাদের ব্রহ্মের বিষয়েও সেই রূপ বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যরচিত নিরঞ্জনাষ্টক বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহাতে এই রূপ দেখা যায়।

"স্থানং ন মানং ন চ নাদবিন্দুঃ।
রূপং ন রেখা ন চ ধাতুবর্ণং॥
দ্রষ্টা ন দৃশ্যঃ শ্রবণং ন শ্রাব্যং
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায়।"

সুতরাং শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন ও ব্রহ্মনিরঞ্জনের একই প্রকার বর্ণনা দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালে শূন্যমূর্ত্তি ও ব্রহ্ম একই বলিয়া গোলযোগ হওয়ায় ঘনরামপ্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মকে ব্রহ্মনিরঞ্জন বলিয়াই বুঝা যায়।

পাপ্ত ব্রহ্ম বলিয়াই জানা যায়। * শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শূন্যবাদে আদিতে ও অন্তে কিছুই নাই, কিন্তু মধ্যে বিশ্বের আকস্মিক উৎপত্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবাদে আদি, মধ্য ও অন্তে সৎপদার্থ ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং বিশ্ব-জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। কিন্তু শূন্য ও ব্রহ্ম উভয়েই নিরঞ্জন হওয়ায়, ধর্ম্মপূজার পদ্ধতিতে হয় শূন্য ক্রমে ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ম ভ্রমক্রমে শূন্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। যাহা হউক, এই সমস্ত দার্শনিক বা প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারের এক্ষণে প্রয়োজন নাই। তবে ঘনরাম প্রভৃতির গ্রন্থে আমরা জানিতে পারি যে, শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন ব্রহ্মই বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সেই জন্য তাঁহাদিগকে হিন্দুদেবতার আকারে আনয়ন করা সহজ হইয়াছে। ঘনরামের গ্রন্থে ধর্ম্ম বিষ্ণুরূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর গ্রন্থে তাঁহাকে শিবরূপে দেখা যায়। লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত ময়নাগড়ের ধর্ম্ম-ঠাকুর অনন্তরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই পূজিত হইয়া থাকেন। ঠাকুর ময়নাগড় হইতে এক্ষণে বৃন্দাবনচকনামে গ্রামে গিয়াছেন। ঘন-রামের ধর্ম্মমঙ্গলে সাধারণতঃ ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে শক্তিমাহাত্ম্যও অল্প বুঝা যায় না। ইছাই, লাউসেন সকলেই শক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঘনরামের শক্তি

* "বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম, অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধার।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নিজ'-নিধান॥"

ধর্ম্মমঙ্গল
(ধর্ম্মের বন্দনা)

ও যোগাদ্যার বন্দনা হইতেও শক্তিমাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরাম চৈতন্যদেবেরও বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে তাঁহাকে রামোপাসক বলিয়া বোধ হয়, অথচ তাঁহার সকল দেবদেবীর প্রতি সমভাবেই ভক্তি ছিল। তাঁহার গ্রন্থে কোন রূপ সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরামরচিত এক খানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দৃষ্ট হয়। তাহাতে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। পুত্রগণের নাম ও তাঁহার রামোপাসকত্বেরও একটী প্রমাণ।

রামেশ্বর ও শিব-সঙ্কীর্ত্তন।

যে সময়ে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমানাধিপ মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের অনুগ্রহে পালিত হইয়া শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সময়ে আমরা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের সভায় বসিয়া রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যকে শিবসংকীর্ত্তন রচনা করিতে দেখিতে পাই। রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন ১৬৩৪ শক বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় বলিয়া জানা যায়।* এক্ষণে আমরা রামেশ্বর ও তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিতেছি। রামেশ্বর ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত। তাঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। শম্ভুরাম

* "শাকে হল চন্দ্রকলা রাম করতলে।
রাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল সারা।"
ইহার অর্থ ১৬৩৪ স্থির হইয়াছে। কিন্তু সহজে অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন।

ও সনাতন নামে তাঁহার দুই সহোদর ছিলেন। পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী নামে তাঁহার তিন ভগিনীর ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়েরও উল্লেখ আছে। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী নামে তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন। রামেশ্বর বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্দ্দা পরগণার যদুপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বর্দ্দা সভা সিংহের জমীদারী ছিল। যদুপুর রামেশ্বরের আদি বাসস্থান। সভা সিংহের বিদ্রোহের সময় তাঁহার ভ্রাতা হেম্মৎ সিংহের অত্যাচারে তিনি যদুপুর পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরস্থিত কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের আশ্রয় গ্রহণ ও অযোধ্যাবাড়নামক গ্রামে বাস করেন। কর্ণগড় মেদিনীপুর নগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। রাজা রামসিংহের পুত্র যশোমন্ত সিংহের সভাসদ্ হইয়া তিনি শিবসংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন।* রামেশ্বরের প্রসঙ্গে আমরা কর্ণগড় রাজবংশেরও একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের ইচ্ছা করিতেছি। কর্ণগড়রাজবংশীয়েরা জাতিতে সদ্গোপ। ইঁহাদের আদিপুরুষ লক্ষ্মণ সিংহ মেদিনীপুরের তদানীন্তন মাজি রাজা সুরত সিংহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যার কেশরিবংশীয় কোন

"মহারাজ রঘুবীর; রঘুনাথসম ধীর
ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে,
রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য পুত্র যশমন্ত, সিংহ সর্ব্বগুণবন্ত
শ্রীযুতঅজিতসিংহতাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে যবসতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
* * * * *

রাজার সাহায্যে সুরত সিংহের হস্ত হইতে মেদিনীপুরের অধিকার বিচ্ছিন্ন করিয়া লন, ও কর্ণগড়ে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষ্মণ সিংহের পর রাজা শ্যাম সিংহ ও ছত্র সিংহের উল্লেখ দেখা যায়। ছত্র সিংহের পর রঘুনাথ সিংহ কর্ণগড়ের রাজা হইয়া ছিলেন। এই রঘুনাথই রাজা রামসিংহের পিতা। রাজা রাম-সিংহের পুত্র রাজা যশোমন্ত সিংহই কবির প্রতিপালক, * এবং তৎপুত্র অজিত সিংহকেও কবির আশীর্ব্বাদভাজন বলিয়া দেখা যায়। অজিত সিংহের রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি নামে দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান হওয়ায়, ক্রমে কর্ণগড়ের সম্পত্তি

তস্য পৌষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর,
বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন।

অন্যত্র——

"ভট্টনারায়ণ মুনি, সন্তান কেশরকুনি
খতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ;
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন,
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ।
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর,
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী
অযোধ্যানগর নিকেতন।
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎ সিংহ পরকাশ
রাজা রাম সিংহ কৈল স্থিত.
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, রচিয়া পুরাণ পটে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।"

* এই যশোমন্ত সিংহকে রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রায় বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

তাঁহাদের আত্মীয় নাড়াজোলের খাঁবংশীয়দের হস্তগত হয়। অদ্যাপি নাড়াজোলবংশীয়েরা তাহা ভোগ করিতেছেন। রামেশ্বর যদুপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজা রামসিংহ কর্ত্তৃক অযোধ্যাবাড়ে প্রতিষ্ঠিত হন, ও যশোমন্ত সিংহের রাজত্বকালে তাঁহার সভাসদ হইয়া শিব-সঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন। শিবসঙ্কীর্ত্তনে অনেক স্থানে যশোমন্তের কল্যাণকামনা করা হইয়াছে। এই শিবসঙ্কীর্ত্তনকে শিবায়নও কহিয়া থাকে। শিবসঙ্কীর্ত্তনে দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টি প্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, গৌরীর জন্ম, মহাদেবের তপস্যাভঙ্গ, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, শিববিবাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এবং কৈলাসে শিব দুর্গার গার্হস্থ্য জীবনেরও সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। তদ্ভিন্ন রুক্মিণীব্রত, বাণ রাজার উপাখ্যান প্রভৃতিরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলাদি গ্রন্থে হরপার্ব্বতীর বিবরণও চিত্রসম্বন্ধে যেরূপ দেখা যায়, শিবায়নেও সেইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তবে রামেশ্বর ও ভারতের বর্ণনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গৌরীর বাল্যলীলা, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, গৌরীর শাঁখাপরা, অন্নপূর্ণার পতিপুত্রকে অন্নদান প্রভৃতি হইতে বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রামেশ্বরের রচনার মধ্যে অনুপ্রাসের ছটা কিছু অধিক, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হাস্যরস অনেক স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থে করুণ রসের নিতান্ত অভাব। শিবসঙ্কীর্ত্তনের স্থানে স্থানে কুমার-সম্ভবাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কালে শিবায়ন কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ন্যায় সাধারণের নিকট আদরের সামগ্রী ছিল। এই শিবায়নে সাধারণতঃ শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইলেও শক্তিপ্রাধান্য দেখান হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ন্যায় শিবায়ন হইতে শক্তিমাহাত্ম্যই বুঝিতে পারা যায়। রামেশ্বর ও

যশোমন্ত উভয়ে শক্তি-উপাসক ছিলেন, এবং তাঁহারা সাধক বলিয়া সকলের নিকট কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। গ্রন্থকার অন্যান্য দেব দেবীর সহিত চৈতন্যের বন্দনাও করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় শিবায়নও সাম্প্রদায়িক ভাবে দুষ্ট নহে। শিবসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত রামেশ্বরের প্রণীত সত্যপীরের কথা আছে। সত্যনারায়ণ সে কালে মুসল্মানের পীর ও হিন্দুর দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। যদুপুর বাসকালে তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কিরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তিমাহাত্ম্য বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ও চৈতন্যমাহাত্ম্যেরও প্রচার দেখিতে পাওয়া যাইত। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা চৈতন্যভক্ত দুই এক জন বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্ত্তার পরিচয় পাইয়া থাকি, বঙ্গসাহিত্য তাঁহাদের দ্বারাও পরিপুষ্ট হইয়াছে। সেই দুই এক জন আবার রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রবল থাকিলেও সেই সময় হইতে তাহা খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়, এবং উক্ত শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাণী-ভবানী ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তাহাকে অতিক্রম করিয়া শক্তিমাহাত্ম্যই বঙ্গে প্রাধান্য লাভ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। আমরা যথা স্থানে তাহার আলোচনা করিব। এক্ষণে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দুই জন বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা ও পদকর্ত্তার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা কেবল গ্রন্থকর্ত্তা বা পদকর্ত্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই, অন্যান্য গুণেও তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হইয়া দেশমধ্যে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

নরহরিদাস ও ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে দুই জন বৈষ্ণব মহাপুরুষ বৈষ্ণব সমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এক জনের নাম নরহরিদাস ও দ্বিতীয়ের নাম সুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুর। প্রথমে আমরা নরহরির বিষয়ই উল্লেখ করিতেছি। নরহরি মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ পানিশালা-নশীপুরনামক গ্রামের নিকট রেঁয়াপুরে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। জগন্নাথ গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট জগন্নাথ দীক্ষিত হন। গুরুর ইচ্ছায় ও লক্ষ্মণদাস নামে নিত্যানন্দ-বংশের শিষ্য জনৈক বৈষ্ণবের চেষ্টায় জগন্নাথ কিছু দিন গৃহে অব-স্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। জগন্নাথের গৃহে অবস্থানকালে নরহরির জন্ম হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নরহরির জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার আর এক নাম ঘনশ্যাম।* তাঁহার জন্মের কয়েক বৎসর

* "নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
নাজানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরিদাস আর দাসঘনশ্যাম॥"

(ভক্তিরত্নাকর)

"গৌড়দেশস্বরসরিত্তটে বিনিবাসঃ, বিপ্রকুলজাতসুজনকজগন্নাথপ্রিয় বৈষ্ণবদত্ত নামযুগনরহরিঘনশ্যাম ইতি প্রথিতঃ।"

গৌরচরিতচিন্তামণি।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পিতা জগন্নাথ অপ্রকট হন * নরহরি কখনও বিশ্বনাথকে দর্শন করেন নাই। † নরহরি আকৌমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি কাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কাহারও কাহারও মতে তিনি নরোত্তম পরিবারের শিষ্য। ‡ কিন্তু তিনি নরোত্তমপরিবার কি আচার্য্যপ্রভুপরিবারের শিষ্য ছিলেন তাহা বিশেষ রূপে বুঝা যায় না। নরহরি পিতৃগুরুর ও পিতার পথ অনুসরণ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও ভাষায় তাঁহার বিশেষ রূপ অধিকার ছিল। ভক্তিরত্নাকর, ছন্দঃসমুদ্র, পদ্ধতি প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে অসাধারণ জ্ঞান থাকায় এবং ভক্তি ও বৈরাগ্য সহচরী-সহচরের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাতে অবস্থিতি করায়, তিনি স্বীয় অমূল্য গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পর বৈষ্ণব সমাজে আর কেহ তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য-দ্যোতক সুবৃহৎ চরিত গ্রন্থ রচনা করেন নাই বলিয়া বোধ হয়।

* আমরা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বিবরণে দেখাইয়াছি যে, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভাগবতের টীকা সমাপ্ত হয়, সুতরাং তখনও পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, ইহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। নরহরি যে সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন সে সময়ে বিশ্বনাথ ও তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং আনুমানিক ১৭১৫।১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া থাকিবেন।

† নরহরি স্বপ্নে বিশ্বনাথকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

‡ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন তাঁহার সম্পাদিত নরোত্তমবিলাসের ভূমিকায় উহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

নরহরি সুন্দররূপে ভোগ রাঁধিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে রসুয়া নরহরিও বলিত।* তাঁহার যতগুলি গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকরই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের চরিত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবিত্বের জন্য ভক্তিরত্নাকরের বিশেষ কোন গৌরব আছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ইহাতে নরহরি আপনার শাস্ত্রজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার ক্ষমতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্রের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কিরূপে বঙ্গদেশে ভক্তিশাস্ত্র ও মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরে তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরের পর নরোত্তমবিলাস উল্লেখযোগ্য। নরোত্তমবিলাসে সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তমঠাকুরের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরের পর ইহা রচিত হয়। সেই জন্য ভক্তিরত্নাকরে যে

* নরহরি পূর্ব্বে রসুই করিতেন না, তিনি এক দিন মনে মনে ভোগ রাঁধিয়া গোবিন্দজীকে উৎসর্গ করায়, গোবিন্দজী প্রীত হইয়া তাঁহার হস্তের ভোগ পাইবার জন্য জয়পুরের মহারাজকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজ পরে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দিয়া গোবিন্দের ভোগ প্রস্তুত করিয়া সেই ভোগ উৎসর্গের পর তাহার প্রসাদ সমস্ত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার নাম রসুয়া নরহরি হয়। এই কথা বৈষ্ণব সমাজে প্রচারিত আছে। নরহরির বিশেষ বিবরণ আমার প্রিয়বন্ধু পরমবৈষ্ণব শ্রীমান্ গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রের পিতা পূজ্যপাদ স্বর্গীয় আনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণ কবিতায় রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে নরহরির জীবনীসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। উক্ত বিশেষ পরিচয় পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন তাঁহার সম্পাদিত নরোত্তমবিলাসের শেষে মুদ্রিত করিয়াছেন।

সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বাহুল্য ভয়ে নরোত্তমবিলাসে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করেন নাই। ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। ইহাতে যদিও বাহুল্য ভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি ভক্তিরত্নাকর অপেক্ষা ইহার রচনা অনেক পরিমাণে সুললিত হইয়াছে, এবং ভক্তিরত্নাকর অপেক্ষা নরোত্তমবিলাসের রচনা শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ গৌরচরিতচিন্তামণি। ইহাতে মহাপ্রভুর চরিত বর্ণনা করিয়াছেন। গৌরচরিত্রসম্বন্ধে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট না হওয়ায় গৌরচরিতচিন্তামণির সেরূপ আদর নাই। এই গ্রন্থে নবদ্বীপের সৌন্দর্য্যের যারপরনাই প্রশংসা করা হইয়াছে। গৌরচরিতচিন্তামণি হইতে তৎকালীন নবদ্বীপবাসীদিগের আচার ব্যবহারের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নবদ্বীপে অবস্থানকালে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। * গৌর-চরিতচিন্তামণি সম্ভবতঃ ভক্তিরত্নাকরের পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ গীতচন্দ্রোদয়, ইহা শেষ জীবনের গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়, কারণ, উক্ত গ্রন্থে তিনি গ্রন্থ খানি জীবদ্দশায় শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন কিনা বলিয়া বারংবার আশঙ্কা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য যখন শেষ জীবনে ভক্তির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই গীতচন্দ্রোদয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। গীতচন্দ্রোদয়ে তিনি কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

* "নরহরি ভণ অনুপম নদীয়পুর মাঝে।"

গৌরচরিত চিন্তামণি।

তাঁহার গীতরচনা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় না হইলেও গোবিন্দ দাস বা জ্ঞানদাসের অপেক্ষা ন্যূন নহে। নরহরি সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ছন্দঃ সমুদ্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতেও সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ছন্দঃসমুদ্রের গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে লিখিত হয়। নরহরি সংস্কৃত ভাষায় পদ্ধতিপ্রদীপ নামে বৈষ্ণবদিগের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অনুরাগবল্লী ও বহির্মুখপ্রকাশ নামে দুই খানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং নরহরি কর্ত্তৃক বৈষ্ণব সমাজের যে কত অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। নরহরির গ্রন্থে মহাপ্রভুর, বৈষ্ণবভক্তগণের ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত ও শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিও কটাক্ষ আছে। বৈষ্ণব কবিগণ তখনও পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

রাধামোহন ঠাকুর ও পদামৃতসমুদ্র।

নরহরির পর যে বৈষ্ণব মহাপুরুষের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি, তাঁহার নাম রাধামোহন ঠাকুর। রাধামোহন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র, মালিহাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। মালিহাটী এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী উপবিভাগের অন্তর্গত। আচার্য্যপ্রভুর পর তাঁহার বংশে রাধামোহনের ন্যায় কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য, ভক্তি, বৈরাগ্য ও তেজস্বিতা তাঁহাকে প্রকৃত মহাপুরুষ বলিয়াই কীর্ত্তিত করিয়া থাকে। তাঁহার শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে যে আচার্য্যপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া বন্দনা

করিয়াছেন * তাহা অত্যুক্তি নহে। রাধামোহন প্রকৃত প্রস্তাবেই আচার্য্যপ্রভুর উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের দুই পুত্র, জগদানন্দ ও মধুসূদন। জগদানন্দ মালিহাটীতে বাস করেন। রাধামোহন উক্ত জগদানন্দেরই পুত্র। তাঁহার আরও পাঁচ সহোদর ছিলেন। রাধামোহন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি নিঃসন্তান। রাধামোহন স্বীয় পিতৃদেব জগদানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। † খৃষ্টীয়

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
যাঁহার বিগ্রহে গৌরপ্রেমের নিবাস।
হেন শ্রী আচার্য্যপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥"

পদকল্পতরু।

শ্রীযুতং জগদানন্দং বিধুং বন্দে মহাপ্রভুং।
তং চৈতন্যতনুং মূর্দ্ধ্না রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহং॥
বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং।
গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া।
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবং॥
শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ব্বতঃ।
তৎপুত্রানাস্ত সর্ব্বেষাং পাদপদ্মমহর্ন্নিশং॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যবরং সভক্তং সনরোত্তমং।
সরামচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহমাশ্রয়ে॥"

"শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুবংশোদ্ভবতৎস্বরূপশ্রীমজ্জগদানন্দসংজ্ঞকশ্রীগুরোর্ব্বন্দনং কৃত্বা শব্দশ্লেষেণ তজ্জনকং শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদঠক্কুরং বন্দতে।"

পদামৃতসমুদ্র ও তট্টীকা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের সময় তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে, সম্ভবতঃ তখন তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় তাঁহারা মালিহাটী হইতে কিছু দিনের জন্য পদ্মাপারে পলায়ন করিয়াছিলেন, পরে পুনর্ব্বার মালিহাটীতে আগমন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সমাজে রাধামোহনের তুল্য বিখ্যাত পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। একটী বিখ্যাত ঘটনায় তাঁহার পাণ্ডিত্য সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আরঙ্গজেবের অত্যাচারে বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দজী জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। জয়পুররাজ সওয়ায় জয়সিংহ অত্যন্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি গোবিন্দজীর পরম ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সময়ে বৃন্দাবনধামে ও তাহার নিকটস্থ স্থানে অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাস করিতেন, তাঁহারা আপনাদিগের সম্প্রদায়ানুমোদিত পরকীয়ামতাবলম্বী ছিলেন।* কিন্তু পশ্চিম দেশস্থ বৈষ্ণবেরা স্বকীয়ামতের পক্ষপাতী হওয়ায় জয়সিংহের সভায় উভয় মতের বিচার হয়, সেই বিচারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরাস্ত হন, কিন্তু তাঁহারা গৌড়দেশস্থ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের সহিত এই বিচারের শেষ নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে জয়পুররাজ স্বীয় সভাসদ স্বকীয়ামত-

* পরস্ত্রীর ন্যায় ঈশ্বরকে প্রেম করা পরকীয়ামত, তাহাতে প্রেমের গাঢ়ত্ব হয় বলিয়া উক্তমতাবলম্বীরা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর স্বস্ত্রীর ন্যায় ঈশ্বরের উপাসনা স্বকীয়ামত। উভয়েই কান্ত ভাবের অন্তর্গত। স্বকীয় ভাবে উপাসনায় প্রেমের গাঢ়ত্ব হয় কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। উক্তমতাবলম্বী উপাসকগণ তাহার কথা বলিতে পারেন।

সংস্থাপক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে জনৈক মন্‌সবদারের সহিত বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। পরাজিত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ তাঁহাকে লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীস্থিত বৈষ্ণবগণ স্বকীয়ামতে স্বাক্ষর করেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কৃষ্ণদেব বিচারে জয় লাভ করিয়াছিলেন। অনেক বৈষ্ণব মহান্ত স্বকীয়া মত অবলম্বন করেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব শ্রীখণ্ড ও যাজিগ্রামে উপস্থিত হইলে, তথাকার বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বিনা বিচারে স্বকীয়ামত অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সেই সময়ে রাধামোহন পাণ্ডিত্যে বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর নিকট এই বিচারের প্রার্থনা করিলে, তিনি বিচারের অনুমতি দেন। নবদ্বীপ, সোনার গাঁ, উৎকল, কাশী প্রভৃতির কয়েক জন পণ্ডিত সভাসদ হন। কৃষ্ণদেব রাধামোহনের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া পরকীয়ামতাবলম্বী হন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। পরে পশ্চিম প্রদেশে গিয়া উক্ত মত স্থাপন করেন। বৃন্দাবনে আবার পরকীয়ামতের জয়পতাকা উড্ডীন হয়। বাঙ্গালা ১১২৫ ইংরাজী ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এই বিচার হইয়াছিল।* সুতরাং রাধামোহন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ

* এই বিচারের কথা মুর্শিদাবাদ প্রদেশে চিরদিন হইতে প্রচলিত আছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই বিচারসংক্রান্ত দুই খানি ইস্তফাপত্র সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে জয়পুরে পরাজিত হইয়া স্বকীয়ামত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাধামোহনের জয়লাভের পর "গৌড়ের পঞ্চ পরিবার হইতে আপনারা খারিজ হইলেন বলিয়া, উক্ত ইস্তফাপত্র প্রদান করেন। তাঁহার প্রথম ইস্তফাপত্র খানি ১৩০৬ সালের ফাল্গুন মাসে ও দ্বিতীয় খানি ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত দুই খানি পত্রের

যে গৌরবান্বিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার ভক্তি ও বৈরাগ্যসম্বন্ধে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পদামৃতসমুদ্রের রচিত তাঁহার অধিকাংশ পদে তাঁহার ভক্তি ও দৈন্য প্রকাশের উল্লেখ আছে। তাঁহার তেজস্বিতাসম্বন্ধে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি স্বীয় ইষ্টদেব রাধামোহনকে কোন বিশেষ কর্য্যোপলক্ষে আপনার ভদ্রপুরের বাটীতে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে স্বীয় এক দরিদ্র

অনেক পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম খানির তারিখ, বাঙ্গলা ১১২৫ সাল ৫ই ফাল্গুন. দ্বিতীয় খানির ১১৩৮ সাল বৈশাখ। স্বাক্ষরকারী ও সাক্ষীর নামেরও পার্থক্য আছে। এই উভয় পত্রই মূল পত্রের নকল, তন্মধ্যে প্রথম খানিই আমাদের নিকট মূলের যথার্থ অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। একটী বিষয়ের জন্য দ্বিতীয় খানিতে আমাদের সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় খানির সাক্ষীর নামের মধ্যে আমরা কাননগো দর্পনারায়ণের নাম দেখিতে পাই, এবং তাহার সময় ১১৩৮ সাল লিখিত আছে। ১১৩৮ ইংরাজী ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু আমরা তাহার পূর্ব্বে দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ মহম্মদ সাহের দস্ত তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণের ফার্ম্মানে দর্প-নারায়ণের মৃত্যুর উল্লেখ আছে। সুতরাং ১১৩৮ সাল বা ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে দর্পনারায়ণ জীবিত থাকিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ সুজা খাঁর রাজত্ব সময়, অথচ মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর সময় উক্ত বিচার হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন, এই সকল কারণে দ্বিতীয় পত্র খানি প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, রাধামোহন ঠাকুরের ৮০ বৎসর বয়সে ঐরূপ বিচার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের সময় তিনি জীবিত থাকিলে কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমারের মৃত্যু হয়। সুতরাং তখন তাঁহার জীবিত থাকা সম্ভব হয় না। আমরা উক্ত বিচার কালে তাঁহার ২০।২২ বৎসর বয়স অনুমান করিয়া থাকি।

শিষ্যকে দর্শন দেওয়ার জন্য তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিলম্ব করায়, নন্দকুমার একটু ক্ষুণ্ণ হন। রাধামোহন তাহা জানিতে পারিয়া নন্দকুমারকে বলেন যে, শিষ্য সকলেই সমান, গুরুর নিকট রাজা বা দরিদ্র শিষ্যের কোনই পার্থক্য নাই। তুমি যখন ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছ, তখন আমি আর তোমার বাটীতে পদার্পণ করিব না। তদবধি তিনি আর নন্দকুমারের বাটী গমন করেন নাই। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহনের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য ছিলেন। আচার্য্য-প্রভু কর্ত্তৃক সপার্ষদ মহাপ্রভুর যে তৈলচিত্রের পূজা হইত, রাধা-মোহন স্নেহবশতঃ নন্দকুমারকে সেই চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অত্মাপি নন্দকুমারের দৌহিত্রবংশীয় কুঞ্জঘাটার রাজবংশ কর্ত্তৃক তাহা প্রত্যহ পূজিত হইতেছে। রাধামোহন উক্ত কারণের জন্য আপনার প্রিয় শিষ্য নন্দকুমারকেও অগ্রাহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই-রূপ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি পদামৃতসমুদ্রও তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণব-কবিগণের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাবলী আহরণ, এবং তৎসঙ্গে আপনার অনেকগুলি গীত গ্রথিত করিয়া তাঁহার পদামৃতসমুদ্র রচিত হয়। পদামৃতসমুদ্রে ৮৫২টী গীত আছে, তন্মধ্যে ৪০০টীর অধিক তাঁহার স্বকৃত পদ। তাঁহার স্বকৃত পদাবলী হইতে তাঁহার কবিত্ব শক্তিরও বিশেষ রূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির তুল্য বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুদ্রের প্রথমেই জয়দেবের দশাবতারস্তোত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধামোহন পদামৃত-সমুদ্রের সংস্কৃত টীকা করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়া-ছেন। পদামৃতসমুদ্রের পূর্ব্বে আউল মনোহর দাস পদসমুদ্র নামক পদাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের পর

তাঁহার শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস পদামৃতসমুদ্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ পদকল্পতরুর প্রচার করেন। আমরা নরহরি ও রাধামোহনের জীবনী ও রচনা হইতে দেখাইলাম যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে ও বঙ্গসাহিত্যে আপনার অধিকার পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু দেশ-মধ্যে তাহা যেরূপ প্রবল ছিল, বঙ্গসাহিত্যের স্থান অধিকার করিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্যান্য কবিগণের রচনার তুলনায় তাহাদের স্থান তত উচ্চ ছিল না এবং উক্ত শতাব্দীর মধ্য ভাগে শক্তিমাহাত্ম্যই বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসে।

সংস্কৃত ও ফারসীর আলোচনা।

আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা করিলাম। কিন্তু সে সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চ্চাও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে ন্যায়শাস্ত্রের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রচলন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে দিন দিন তাহার আলোচনা প্রসারিত হইতেছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আবি-র্ভূত হইয়া স্ব স্ব বিস্তৃত টীকার দ্বারা রঘুনাথের মত প্রচার করিয়া যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বাঙ্গলার অনেক স্থানে সেই ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ রূপ আলোচনা হইত। রঘুনন্দনের স্মৃতির মত ক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার সঙ্কলন করিয়া তান্ত্রিক উপাসনা ও তন্ত্র আলোচনার যে পথ প্রশস্ত করিয়া যান, অনেকে তাহাতেও বিচরণ করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ মথুরেশ প্রভৃতিকে আমরা উক্ত

মতের পক্ষপাতী দেখিতে পাই। মথুরেশ শ্যামাকল্পলতিকা নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে ও গোস্বামিগণের রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থাদির অনুশীলনেও ক্ষান্ত ছিলেন না। তদ্ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মণসন্তান ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া রীতিমত সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন। তৎকালে বাঙ্গলার অনেক গ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে রীতিমত অধ্যাপনা হইত। বঙ্গদেশের রাজামহারাজগণও সংস্কৃতের আদর ও কেহ কেহ সংস্কৃত অধ্যয়নও করিতেন। সংস্কৃতের আলোচনা ব্যতীত তৎকালে ফারসী ও উর্দ্দ ভাষারও আলোচনা ছিল। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানগণ রীতিমত ফারসী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিতেন। কারণ, তখন তাহারা রাজভাষা ছিল। রাজভাষা না শিখিলে সে সময়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর হইত। এই রূপে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চার সহিত বঙ্গদেশে সংস্কৃত, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষারও বিশেষ রূপ আলোচনা হইত, এবং বঙ্গসাহিত্যেও সে আলোচনার যথেষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উড়িষ্যা সাহিত্য।

বঙ্গদেশের ন্যায় বিহার ও উড়িষ্যায় সংস্কৃত ও ফারসীর সহিত হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট আলোচনা ছিল। মিথিলা চিরদিনই সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিহারে হিন্দী ভাষার কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু উড়িষ্যায় তৎকালে অনেক গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক মথুরামঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা ভক্তচরণ কবি; কপটপাশা, ভারতসাবিত্রী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত বিষয়ের গ্রন্থকার

ধীবরজাতীয় ভীমকবি; সুদর্শনবিলাস, হংসদূতপ্রণেতা চন্দ্রমণি মহন্ত; রসকল্পলতাপ্রণেতা গদাধর পট্টনায়ক; কুঞ্জবিহারীপ্রণেতা কুঞ্জবিহারী পট্টনায়ক; খড়ীলীলাবতী রচয়িতা লোকনাথ নায়ক; রামচন্দ্রবিহারপ্রণেতা মাগুনি পট্টনায়ক; কৃষ্ণলীলামৃত ও পঞ্চশায়ক রচয়িতা হলদিয়ার রাজা নীলাম্বর ভঞ্জ; গীততালপ্রবন্ধপ্রণেতা পদ্মনাভ; নিস্তারতরঙ্গিণী, নামচিন্তামণি, প্রেমপঞ্চামৃত, যুগলরসামৃতলহরী, প্রেমতরঙ্গিণী, প্রেমলহরী প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক গ্রন্থপ্রণেতা সদানন্দ কবি সূর্য্যব্রহ্ম প্রভৃতি কবিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উড়িয়া সাহিত্যের আলোচনা করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত গুণ্ডিচাচম্পূ প্রণেতা চক্রপাণি পট্টনায়ক; হংসদূত, নৈষধ প্রভৃতির টীকাকার গোপীনাথ পট্টনায়ক; গুণ্ডিচাচম্পূ প্রণেতা ও নারায়ণাষ্টক প্রভৃতির টীকাকার পীতাম্বর মিশ্র; এবং বৈদ্যকল্পলতিকা, প্রায়শ্চিত্ততরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রণেতা ও অমরকোষ ও ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার সুবিখ্যাত রঘুনাথ দাস ও ব্যবস্থাশাস্ত্রসঙ্কলয়িতা শম্ভুকরবাজপেয়ী প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে উড়িষ্যায়ও বিশেষ রূপে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা হইত। সংস্কৃত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালে উড়িয়া সাহিত্যও উন্নত হইতেছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গরাজ্যে বঙ্গসাহিত্য প্রভৃতির যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা বর্ণিত হইল, এক্ষণে দেশের সাধারণ অবস্থাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। প্রথমতঃ রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। যাঁহারা মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাসারম্ভের সময় হইতে পূর্ব্ব অধ্যায়ের

শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তথাপি আমরা সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে এক স্থানে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতেছি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ভয়াবহ বিদ্রোহের অবসান হইলে, বঙ্গরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হয়। বাদসাহপৌত্র আজিম ওশ্বান বাঙ্গলার সুবেদারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তাহার অত্যল্প কাল পরে বঙ্গরাজ্যের রাজস্ববন্দোবস্তের জন্য দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলায় প্রেরিত হন। রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য দেওয়ান জমীদারদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমে ক্রমে কুলী খাঁ নায়েব নাজিম ও নবাব নাজিমের পদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে জমীদারেরা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া প্রতিনিয়ত বিবাদ হওয়ায়, বঙ্গরাজ্যেও মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হইত। কিন্তু সেই গোলযোগের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার পদকে স্থায়ী রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজেরা বঙ্গরাজ্যের বাণিজ্যের ছলে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু মুর্শিদকুলী বরাবরই তাহাতে বাধাপ্রদান করিয়াছিলেন। অবশেষে যদিও বাদসাহ ফরখ্‌সেরের অনুগ্রহে ইংরাজেরা বাণিজ্যবিষয়ে কতক পরিমাণে সুবিধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি মুর্শিদকুলী খাঁর তর্জ্জনীতাড়নে তাঁহারা জমীদারদিগের নিকট হইতে কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয় ব্যতীত অন্য এক খানি গ্রামও ক্রয় করিতে পারেন নাই। আরও কতকগুলি গ্রাম ক্রয় করিতে পারিলে তাঁহারা যে

একটী বিস্তৃত প্রদেশের অধীশ্বর হইয়া মোগলদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর চেষ্টায় তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ওলন্দাজ ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণ আপনাপন বাণিজ্য এক রূপ নির্ব্বিঘ্নে পরিচালন করিতেন, কিন্তু ক্রমে ইংরাজদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে একেবারে হতবল হইয়া পড়েন, ও কেহ কেহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হন। ইউরোপীয় বণিক্‌গণ ব্যতীত, আর্ম্মেনীয়, মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক সওদাগর ও দেশীয় ব্যবসায়ীরাও সরকার হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে রাজকার্য্যে মুসলমান কর্ম্মচারিগণই প্রাধান্য বিস্তার করিতেন। যদিও তাঁহার সময়ে উপযুক্ত হিন্দু কর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্যপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন না, তথাপি মুসলমান কর্ম্মচারিগণের প্রতিই তাঁহার সুদৃষ্টি ছিল। এই সময়ে অনেক বাঙ্গালী আমীনাদি কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে সরকারের নিকট বাঙ্গালী জাতিকে কার্য্যদক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বসময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীগণ অনেক বিভাগের কর্ত্তা এমন কি সেনাপতি ও কোন কোন প্রদেশের সহকারী শাসনকর্ত্তাও হইয়া উঠিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে বাঙ্গালীরা রাজপুরুষদিগের মধ্যে গণ্য হইতে আরম্ভ হইলেও, সে সময়ে তাঁহাদের সেরূপ ক্ষমতা বিস্তৃত হয় নাই। নবাব সুজা উদ্দীন হিন্দু ও বাঙ্গালীদিগকে ক্রমে উচ্চ পদ প্রদান করিতে প্রয়াসী হন, এবং তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরিশেষে

বাঙ্গালীদিগকে সর্ব্বোচ্চ পদ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে জমীদারদিগকে মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জমীদারীতে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করেন। সুজা উদ্দীন তাহা সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং আলিবর্দ্দীর সময় বাঙ্গালী রাজপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান করদ রাজ্যের রাজগণের ন্যায় বাঙ্গলার প্রধান প্রধান জমীদারেরাও দেশের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানী ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কে না অবগত আছে? কিন্তু এই সময় হইতে অধিক পরিমাণে আবওয়াব প্রচলিত হওয়ায় জমীদার ও প্রজারা কিছু অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত হইতে আরব্ধ হয়। রাজস্ববন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাসন ও বিচারের সংশোধন হয়, ভিন্ন ভিন্ন চাকলায় ফৌজদার, থানাদার নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য্যে ও নিজামত, দেওয়ানী ও কাজী আদালতের বিচারকগণ বিচার কার্য্যে বিশেষ রূপ মনোযোগ প্রদান করিতেন। মুর্শিদকুলী ও সুজা উদ্দীন উভয়েই সুবিচারক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। জমীদারগণের হস্তেও কোন কোন বিচারের ভার অর্পিত ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে দস্যু, চোর প্রভৃতির দমনের জন্য বিশেষ রূপ বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, জমীদারেরাও তাহার ভার গ্রহণ করিতেন। রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বিশেষ রূপ চেষ্টা করা হইত, এবং শস্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করার জন্য আইনও প্রচলিত হইয়াছিল। দ্রব্যাদি সুলভ হওয়ায় তৎকালে সাধারণ লোকের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিতেছি। নবাবেরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদিগের ধর্ম্মে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না, এবং নবাব সুজা উদ্দীনের ন্যায় নবাবকেও আমরা হিন্দুদিগের হোলি

উৎসব প্রভৃতিতেও আমোদপ্রমোদ করিতে দেখিতে পাই। ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইয়া বঙ্গে মুসল্‌মান রাজত্বের এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইতে না হইতে সেই নূতন রাজত্ব সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, এবং বঙ্গবাসিগণ তদপেক্ষা আরও কল্যাণপ্রদ রাজত্বের শাসননীতিতে পরিচালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্ব যে সর্ব্বাংশে কল্যাণকর ছিল, তাহা আমরা স্বীকার করি না, এবং তজ্জন্যই প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে স্বহস্তে ভারতশাসনের ভারগ্রহণ করিতে হয়।

সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, এক্ষণে সেই সময়ের সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থাসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা অধ্যায় শেষ করিতেছি। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গরাজ্যের অধিবাসীরা শান্ত ভাবেই আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই সময়ে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। * হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, উচ্চশ্রেণী; গন্ধবণিক, গোপ, কুম্ভকার, নাপিত, তামুলী, কর্ম্মকার, আগুরি, মোদক, বারুই, তাঁতী, তেলি, মালী প্রভৃতি মধ্যশ্রেণী; পল্লবগোপ, সুবর্ণবণিক, কলু, কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার, ছুতার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী ও হাড়ি, ডোম, শুঁড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক শ্রেণী

* অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গের সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থাসম্বন্ধে আমরা ইতিহাস ও বঙ্গ সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারা ন্যায়, স্মৃতি, ভক্তি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন, কেহ কেহ পৌরহিত্যাদি করিতেন, অনেকে গুরুপদবাচ্যও ছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর কোন কোন জাতিও গুরু হইতেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের অনেকে সরকারী ও বেসরকারী চাকরীর ও কেহ কেহ ব্রহ্মোত্তর বা জোতজমাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কায়স্থেরা সাধারণতঃ চাকরী করিতেন, এবং অনেকে জমীজমা লইয়াও ব্যাপৃত থাকিতেন। বৈদ্যেরা সাধারণতঃ চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। অন্যান্য জাতিরা স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত এবং কেহ কেহ দাস্যবৃত্তিও করিত। মুসল্মানগণের মধ্যে সৈয়দ, পাঠান, মোগল, সেখ ব্যতীত অসংখ্য নিম্নশ্রেণীরও উল্লেখ দেখা যাইত। উচ্চ শ্রেণীর মুসল্মানেরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতেন। অনেকে সৈনিক বিভাগেও প্রবেশ করিতেন, এবং কেহ কেহ জমীজমাতেও লিপ্ত থাকিতেন, নিম্ন শ্রেণীর মুসল্মানেরা কৃষি ও নানা প্রকার শিল্প কার্য্য করিত। তৎকালে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থ দিগের বাটীতে তিন চারি খানি ঘর ও মধ্যে আঙ্গিনা ছিল। বাটীর চারি দিকে প্রাচীর বা বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। ঘরে গবাক্ষ ও দ্বার এবং সদর ও খিড়কীর দুইটী দ্বার ছিল। সদর দ্বারের পার্শ্বে এক খানি চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত। বৈকালে মেয়েরা আঙ্গিনায় বসিয়া সুতা কাটিতেন ও গল্প করিতেন। শাশুড়ী বধূদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু ননদের সহিত তাহাদের শত্রুতা ঘটিত। বধূরা কলসী লইয়া নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন ও রন্ধন করিতেন। রাজামহারাজের গৃহের গৃহিণী ও বধূরাও রন্ধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পুরুষেরা কেহ কেহ চাকরী করিতে বিদেশে যাইতেন।

পুরুষেরা কপালে চন্দন ও তিলক পরিতেন, ও চাঁচর কেশে ফুলের মালা বাঁধিতেন। তাঁহারা গ্রীষ্ম কালে ধুতি ও দোবজা বা এক পাট্টা, শীতকালে কেহ বেনিয়ান্ মের্জাই, টুপী ও উষ্ণীষ পারিতেন, মধ্যবিত্ত প্রবীণগণ বনাত, রেজাই, হামাম, তরুণ বয়স্কেরা দোলাই এবং ধনী ও সম্ভ্রান্তজনগণ শাল, রুমাল জামিয়ার ব্যবহার করিতেন। দরবারে যাওয়ার সময় কর্ম্মচারী ও রাজামহারাজগণ চাপকান, আচকান, পাগড়ী প্রভৃতিও ব্যবহার করিতেন ও নাগরা জুতা পায়ে পরিতেন। স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুর ও চক্ষুতে কজ্জল দিতেন। তদ্ভিন্ন গোরচনা ও চন্দনের বিন্দুও পরিতেন। তাঁহারা চুলের অলকা বেণী ও খোঁপা বাঁধিতেন, কপালে সিঁথি; গলায় কণ্ঠমালা, সাত লহর বা পাঁচ লহর; নাকে বেশর ও নথ; কাণে কুণ্ডল; হাতে চুড়ি, কঙ্কন, তাড়, বাজুবন্দ, শাঁখা; কটিদেশে কিঙ্কীনী বা চন্দ্রহার; পায়ে গোটামল, পাতমল ও পাঁশুলি প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ের দুই চারি খানি স্বর্ণ অলঙ্কার পরিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ অলঙ্কারই রজতনির্ম্মিত ছিল। ধনীগৃহের রমণীরা অধিক পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কারই ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ কার্পাস শাটী পরিতেন, তাঁহাদের সাধারণ শাটী ঘন হইত। পাতলা শাটীর তখনও আদর হয় নাই। কোন কোন সময়ে তাঁহারা বালুচরী বা বারাণসী রেশমী বস্ত্র ও কাঁচুলী ব্যবহার করিতেন। রাজামহারাজঘরণীরা কখনও কখনও ঘাগরা, ওড়না প্রভৃতি হিন্দুস্থানী পোষাকও পরিতেন। ছোট ছোট মেয়েরা ঘুটিং, আঁটল বাটুল, পুতুলের বিবাহ, কৃত্রিম রন্ধন প্রভৃতি খেলা করিত। ছেলেরা দৌড়া দৌড়ি, কেহ কেহ কুস্তি প্রভৃতিও করিত। জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার রীতিমত

সম্পন্ন হইত। বৈষ্ণবেরা অন্নপ্রাশনে সন্তানের মুখে বিষ্ণুর প্রসাদ দিতেন। বিবাহকালে চন্দ্রাতপ টানাইয়া অধিবাস, স্ত্রীআচার, সাতপাক, মালাবদল, লাজহোম প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রচলিত ছিল, এবং সেই সমস্ত ক্রিয়ায় কুটুম্বগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। কৌলীন্যের মর্য্যাদা তখনও পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণার জন্য বিশেষ রূপ পীড়াপীড়ি করিতেন। কল্যাণকামনায় শিবার্চ্চনা, স্বস্ত্যয়ন, ব্রত উপবাসাদি করা হইত। সন্তান হইলে ভাট, নাপিত, রজক প্রভৃতি বিদায় করার রীতি ছিল, এবং তৈল, মৎস্য, দধি প্রভৃতি বিতরিত হইত। তৎকালে সহমরণ প্রথারও অভাব ছিল না। সে সময়ে শরতে দুর্গোৎসব ও বসন্তে হোলি-উৎসব এই দুটী প্রধান পর্ব্বের উল্লেখ দেখা যায়। দুর্গোৎসবের সময় সকলে নব বস্ত্র পরিধান করিত, ও প্রবাসিগণ দেশে সমাগত হইত। হোলি উৎসবে আবিরক্রীড়ার ধূম হইত। মুসলমানেরাও ইহাতে যোগ দিতেন। বাঙ্গলার নবাবদিগের কেহ কেহ হোলির সময় আমোদপ্রমোদ করিতেন। বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তনের উৎসব বিশেষ রূপে সম্পন্ন হইত। চন্দ্রাতপের নিম্নে বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া যথারীতি ভোগ হইত। তাহার নিকটে মহান্তগণ স্ব স্ব উপযুক্ত আসনে বসিতেন। মণ্ডপ কদলীবৃক্ষ, আম্রশাখা ও জলপূর্ণ কলসে সজ্জিত থাকিত। দিবারাত্রি সংকীর্ত্তন হইত। সঙ্কীর্ত্তনের শেষে দেবতাকে ভোগ অর্পণ করিয়া মহোৎসবের আয়োজন ও প্রসাদ বিতরণের উল্লেখ দেখা যায়। ঘৃতসিক্ত অন্ন ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন বৈষ্ণবেরা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের স্থাপিত দেবতাগণের প্রাতে মঙ্গল আরতি, দিবসে রীতিমত পূজা ও ভোগ এবং রাত্রিতে আরত্রিক হইত। রাত্রিতে গোধূম চূর্ণের পিষ্টক, দুগ্ধের নানা প্রকার দ্রব্য ও

ফল মূল ভোগ হওয়ার উল্লেখ আছে। সুবাসিত জল ও কর্পূরাদি-সহ তাম্বূলও দেবতাকে দেওয়ার রীতি ছিল। বৈষ্ণবেরা একাদশী দিবসে অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেন না। দেবতার প্রসাদাদি বিতরণ হইত। মঙ্গলক্রিয়াউপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করার রীতি ছিল। তৎকালে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিবাদ হইত। মধ্যে শাক্তগণের প্রভাব কিছু খর্ব্ব হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণার জাতির অনেকে চিরদিনই শাক্ত ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে অধিকাংশ শাক্ত হওয়ায়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম শাক্ত মতকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই। কিন্তু সাধারণ লোকে বৈষ্ণব হওয়ায় দেশ মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে আবার শাক্ত ধর্ম্মও প্রবল হইতে আরব্ধ হয়। শাক্তদিগের মধ্যে রঘুনন্দনাদির ব্যবস্থা-সম্মত বিশুদ্ধ শাক্ত মত ও মিশ্র তান্ত্রিক মত উভয়েই প্রচলিত ছিল। দেশমধ্যে রঘুনন্দনের স্মৃতির একাধিপত্য দেখা যাইত। বৈষ্ণবগণের স্মৃতি রঘুনন্দনের স্মৃতি হইতে কোন কোন বিষয়ে পৃথক ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবেরা আপনাদের সম্প্রদায়ানুমোদিত স্মৃতির উপর নির্ভর করিলেও একেবারে রঘুনন্দনের স্মৃতিকে অবহেলা করিতে পারিতেন না, এবং বৈষ্ণব গোস্বামিগণের সংখ্যা অপেক্ষা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সংখ্যা অনেক অধিক হওয়ায়, রঘুনন্দনের মতই বঙ্গে প্রবল হইয়া উঠে। রামায়ণ, চণ্ডী, শিবায়ন, ধর্ম্মমঙ্গল এই সমস্ত গীত হইত। বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে দেখা যায়। বৈষ্ণবেরা তুলসী চন্দন দিয়া ভাগবতের পূজা করিতেন। সত্যনারায়ণের পূজা ও কথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। সকলে আগ্রহ-সহকারে সত্যনারায়ণের কথা শুনিত ও প্রসাদ গ্রহণ করিত। সত্য-

নারায়ণ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দেবতা, হিন্দুর নিকট তিনি সত্যনারায়ণ ও মুসলমানের নিকট সত্যপীর ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে ধর্ম্মরাজের পূজাও বাহুল্যভাবে প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ এই সময়ে সেরূপ ছিলনা। উভয় ধর্ম্ম ও উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ এই সময়ে সরকারের অনেক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। দেশের মধ্যে জমীদারেরা সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কতক পরিমাণে শাসন ও বিচারের ভারও প্রাপ্ত হইতেন। ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর দান, পণ্ডিত ও কবিদিগকে প্রতিপালন, পুষ্করিণীখনন, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা এই সমস্ত হিতকর কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং সাধারণ গৃহস্থগণও যথাসাধ্য অতিথিসেবা ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সে সময়ে লোকেরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সময় অতিবাহিত করিত। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের যত্নে দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। সহর মুর্শিদাবাদে টাকায় চারি মণ চাউল ও ঢাকা প্রদেশে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইত। অন্যান্য শস্য, তৈল, ঘৃত প্রভৃতিরও মূল্য অতি সুলভ ছিল। এই রূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, লোকে মাসিক এক টাকা ব্যয়ে পোলাও কালিয়া খাইতে পারিত। চোর ডাকাতের তাদৃশ ভয় ছিলনা। বিচারকার্য্যও সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইত। প্রসিদ্ধ রাজপথ গুলির অবস্থা ভালই ছিল। তাহার স্থানে স্থানে থানা স্থাপিত হইয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। লোকে পদব্রজে, গোযানে ও জলপথে নৌকায় গতায়াত করিত। সম্ভ্রান্ত লোকেরা দোলা ও শিবিকা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। বাঙ্গালীরা ব্যায়ামক্রীড়া মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষাও করিত,

এবং যষ্টি ও তরবারিচালনা শিখিয়া পাইকশ্রেণীভুক্ত হইত। বাণিজ্য ও কৃষির অবস্থা ভাল ছিল। নবাবের আদেশে বিদেশে আহার্য্য দ্রব্যাদির রপ্তানী হইতে পারিত না। ইউরোপীয়, বিদেশীয় ও দেশীয় সওদাগরগণ অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেন, কেবল কতকগুলি সমুদ্র-বাহ্য দ্রব্যের তাঁহারা বহির্বাণিজ্য করিতে পারিতেন। দেশমধ্যে নানা দেশীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্যের জন্য লোকেরা অর্থশালীও হইয়া উঠিত। রেশম, মস্‌লিন, কার্পাসবস্ত্র, সুপারি, তামাক, সোরা, লবণ প্রভৃতির ব্যবসায়ই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে কৃষকগণের উপর জমীদারেরা অত্যাচার করিতে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের অবস্থাও ভাল ছিল। তবে আবওয়াব প্রচলিত হওয়ায় তাহাদিগকে কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে করভার বহন করিতে হইয়াছিল। লোকের পারিশ্রমিক অতি অল্প থাকায়, বহুল পরিমাণে পুষ্করিণী আদি খনিত এবং সম্ভ্রান্ত জনগণের অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইত। সে সময়ে স্থপতি বিদ্যারও সুন্দর রূপ পরিচয় পাওয়া যায়। কাটরার মসজীদ, ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার প্রভৃতি আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বালুচর প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্ম ও মুর্শিদা-বাদের অন্যান্য স্থানের রেশমী বস্ত্র, গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্য, বীরভূমের তসর, ঢাকার মসলিন্ ও ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি বাঙ্গালীগণের শিল্পোন্নতিরও পরিচয় দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোন কোন বিষয়ে সাধারণের কিছু কিছু অসুবিধা হইলেও লোকে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে সময় অতিবাহিত করিত। সে সময়ে বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের যে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট
(১)
জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ফার্মান
(মূল ফারসী)

باسمه سبحانه و تعالی شانه



شاه محمد ناصر الدین
ابو الفتح بادشاه غازی

درین زمان نصرت قرین مسرت اقتران حکم جهان مطاع آفتاب
شعاع عز نفاذ می یابد که شیٹه فتح چند از پیشگاه خلافت ابد پیوند بعطا
خطاب جگت سیٹه و مرحمت خلعت فاخره و فیل و گوشواره مروارید
و آنند چند پسرش بخطاب شیٹه و موهبت خلعت و گوشواره مروارید
سرمایه اعتبار و افتخار اندوخته اند باید که حکام و عمال و متصدیان حال
و استقبال ممالک محروسه مشار الیه را جگت سیٹه فتح چند و پسرش
را شیٹه آنند چند می نوشته باشند درین باب از جناب عظمت مآب
تاکید دانند۔

دوازدهم رجب سال چهارم از جلوس والا تحریر یافت۔

برسالت سیادت و نجابت و امارت منزلت دانای مدارج دین و دولت
شناسای مراتب ملک و ملت فرازنده لوای شوکت و حشمت طرازنده
بساط ابهت و عظمت اعتضاد خلافت فرمانروای اعتماد سلطنت و
کشورکشای گنجور اسرار پادشاهی واقف رموز ظل الٰهی خلاصه مخلصان
عزم دارودی درمان معرکه بزم ظفر پیرای معارک جهانستانی عیش
آرای محافل کامرانی وزیر صائب تدبیر مشیر روشن ضمیر زبدهٔ دولتخواهان
با فرهنگ عمده فدویان خاص یکرنگ واثق الارادة و الاخلاص
لازم الاعزاز و الاختصاص مرید لی ریو ورنگ نصرت شعار
ممالک مدار المهام نظام الملک بهادر فتح جنگ سپه‌سالار۔



বঙ্গানুবাদ।

ঈশ্বরের নাম

	পরমেশ্বরের নাম	
সাহ মহম্মদ নাসিরুদ্দীন আবুল ফতেহ বাদসাহ গাজী	সাহ আবুল ফতেহ নাসি-রুদ্দীন এবনে মহম্মদ জাহান সাহ বাহাদুর বাদসাহ গাজী সাহেব কেরাণ শানী।	এবনে সাহ আলম বাদসাহ এবনে আলম পীর বাদসাহ ইত্যাদি

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের সূর্য্যের কিরণস্বরূপ জগন্মান্য ও জগদ্বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা শেঠ ফতেচাঁদ বিশ্বস্ততা ও গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ জগৎশেঠ উপাধি এবং মতির গোশওয়ারা অর্থাৎ কাণবালা ও হস্তী এবং তাঁহার পুত্র আনন্দচাঁদ, শেঠ উপাধি ও মতির কাণবালা খেল্লত প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দি প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং তাহার পুত্রকে শেঠ আনন্দচাঁদ লেখেন, এবিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ৪ সাল জলুশ ১২ই রজব তারিখ।

যিনি রাজ্য ও রাজনীতির মহত্ব ও গৌরব অবগত আছেন, যিনি রাজধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী, ও সৈন্যগণের পরিচালক, উপযুক্ত পরামর্শদাতা, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, সুবন্দো-

বস্তকারী, নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই নেজাম-উল-মুল্ক ফতেজঙ্গ বাহাদুর সেপাসালার সেনানিবেশ-বরাবরেষু।

নেজাম-উল-মুল্‌ক

(২)

বাদসাহ ফরখ্‌সের প্রদত্ত কোম্পানীর ফার্ম্মান।

ইংরাজী অনুবাদ।

The Emperor Ferrakhsere's Phirmaund of Bengal, Bahar and Orixa.

A. D. 1717. A. H. 1129.

TO

All Governors and their Assistants, Intellegencers, Jaggerdars, Phousdars, Collectors, Guardians of the ways, Keepers of the Passages, and Zemeendars, that are at present or hereafter may come in the provinces of Bengal, Bahar, and Orixa, at the port of Hugly, &c. ports in the provinces aforesaid.

By these presents know ye, from the favour of the Imperial Majesty, that, at this time of conquest, and in this flourishing reign. Mr. Jhon Surman and Coja Surhaud,

gomashtahs (factors) of the English Company, have humbly presented their petition, setting forth that, according to Sultan Azzim Shah Bahauder, his, and former, Sunods, they are free of customs throughout the whole conquered empire, the port of Surat excepted ; and that they do annually pay into the treasury, at the port of Hugly, a pishcash of 3000 rupees, in lieu of customs ; they hope that according to the tenor of former Sunods, they may be favoured with a gracious Phirmanund confirming them. Commanded and ordered, that all their mercantile affairs, together with their gomastahs, have free liberty, in all Subahships, to pass and repass to and fro either by land or water, in any port or district throughout the several provinces abovesaid. And know, they are custom free, that they have full power and liberty to buy and sell all their will and pleasure, and that there yearly be received into the treasury a pishcash of 3000 rupees, as has been customary heretofore : that if in any place, or at any time, robberies are committed on their goods, they be assisted in the getting of them again, that the robbers be brought to justice, and the goods be delivered to the proprietors of them. In whatsoever place they have a mind to settle a factory, fairly to buy and sell goods in, they have liberty ; and be assisted. That on whomsoever, merchants, weavers, &c. they have any demands, on whatsoever account, let them be aided, and their debtors brought to a true and fair account, and be made to give their gomashtahs their right and just demands. That no persons be suffered to injure and molest their gomashtahs wrongfully and unjustly. And for customs on hired boats (Cutcarrah),

&c. belonging to them, that they be not in any manner molested or obstructed.

They further petition, that if the petty Duans of Subahships demand sight of the original Sunods and Perwannas, under the seals of the Duans and subahs the original sunods cannot possibly be produced in any place without a great deal of difficulty, they desire that a copy from under the seal of the Chief Cauzee be sufficient, sight of the original Sunods not being demanded, nor they forced to take Sunods and Perwannas under the Duan and Subah their Seals. That the rentings of Calcutta, Chuttanutty, and Gobindpore, in the Purgana at Ameirabaud, &c. in Bengal, were formerly granted them, and bought by consent from the Zemeendars of them, and are now in the Company's possession, for which they yearly pay the sum of 1195 R. 6 A. That thirty-eight towns more, amounting to 8121 R. 8 A. adjoining to the aforesaid towns, which they hope the renting of may be granted, and added to those they are already in possession of; that they will pay annually the same amount of them. Commanded, that the Copy under the Seal of the Chief Cauzee be regarded; that the old towns formerly brought by them remain in their hands as heretofore; and that they have the renting of the adjecent towns petitioned for, which they are to buy from the respective owners of them; and that the Duan and Subah give permission.

They still pitition, that from the reign of Aurengzebe, Madras coins were received into the Subahship's treasuries for undervalue, and are still, notwithstanding they are full as valuable as Surat rupees are; whereby,

they are great losers; they hope the Imperial order may be given for them to be received into the treasuries as Surat rupees are, in case they are as good. That any person, being servant to the company, eloping from them, from whom debts and accounts are due, they desire that whosoever so deserts be delivered back to the Chief of their Factory. That their gomashtahs and servants are molested and troubled for Phousdarry, (aboub mumnua) &c impositions which they request they may be exempted from. Commanded and ordered, that from the fifth year of this blessed reign, if Madras rupees are made the same goodness of Surat Siccas, there be no discount on them. That whosoever of the Company's servants being debtors, desert them, seize them, and deliver them to the Chief of their Factory. That they be not molested for phirmaushs and impositions.

They petition. That in Bengal, Bahar, and Orissa, the Company has Factories; and that in other places they likewise design to settle Factories they accordingly desire, that in any place where they have a mind to settle factories they may have forty begaes of ground given them for the same. That if often happens ships at sea meet with tempestuous winds, and are forced into ports, and are sometimes driven ashore and wrecked, the Governors of the ports injuriously seize on the cargoes of them, and in some places demand a quarter part Salvage. That in the island of Bombay, belonging to the English, European Siccas are current; they request that, according to the Custom of Madras, they may at Bombay coin Siccas. Commanded and ordered, that according to the custom of their Factories in other Subahships, execute, these

people having their factories in several parts of the kingdom, and commerce to the place of the royal residence, and have obtained very favourable Phirmans custom free. Let there be particular care taken that there be only assistance given them about goods and wrecks, on all occasions. On the island of Bombay, let there be the glorious stamp upon the Siccas coined there ; passing them current, as all other Siccas are throughout the whole empire. To all these render punctual obedience, observing and acting pursuant to the tenor of this gracious Phirman, and not contrary in any respect whatsoever ; nor demand yearly new sunods. Regard this particularly well.

Written the 27th. of the moon Mohurum, in the fifth year of this glorious and ever reign.

[East India Records, Book No 593.]

(৩)

জগন্নাথ শর্ম্মার ভাষা।

শ্রীশ্রীরামজী।

হকীকত শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মার নিবেদন আমার মাতামহ ৺শ্যামসুন্দর রায়ের ব্রহ্মোত্তর গড়বাড়ী পরগণে গণকরের তরফ লস্কাহারের মধ্যে আছে। ইস্তক লাগাইদ রায় মজুকুর ভোগ করিতেছিলেন। সন ১১৫৫ সালে তাঁহার ৺প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি অপুত্রক আমি তাঁহার দৌহিত্র। বালককালাবধি তাঁহার নিকট আছি। তাঁহার গার্হস্থালি এবং বিত্তবিথান যে আছে সকল দফার মালিক আমাকে

করিয়া গিয়াছেন। এবং মাতামহী ঠাকুরাণী অদ্যাবধি আমার নিকটে আছেন। আমার মাতামহ অবর্ত্তমানে আমি খাজানাপত্র লইতাম পরে আমার বর্দ্ধমান যাওয়া হইল। এমতে আমারদিগের সকলেই সেখানে গিয়াছিলেন। গড়বাড়ী শ্রীগৌরীকান্ত রায়ের জীম্মা করিয়া গিয়াছিলাম। তিন বৎসর বর্দ্ধমানে থাকা হইল। আমার মাতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজারাম রায় খামখা জোর করিয়া রাইয়তের স্থানে খাজানা লইয়াছেন। গৌরীরায়কে দখল দেন নাই। সন ১১৬২ সন ১১৬৩ দুই সনের খাজানা লইয়াছেন। তসরূফ যে যে করিয়াছেন তাহার ফর্দ্দ দৃষ্ট করিবেন। দুই সনের খাজানা লইলে পর গৌরীরায় আমার নিকট গেলেন কহিলেন তুমি গড়বাড়ী আমার জীম্মা রাখিয়াছিলা। রাজারাম রায়জী জোর করিয়া খাজানা লইলেন। তোমার বিত্ত তোমাকে কহিলাম আমি ফারগ। যে কর্ত্তব্য হয় করহ। ইহা শুনিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে আইলাম। আমার সহিত বিরোধ করিয়া কহেন তুমি কেহ নও। অতএব নিবেদন তজবীজ করিতে আজ্ঞা হইবেক। মাফিক তজবীজ যে হয় আমার এলাকা বুঝিয়া দেওয়ান নিবেদন ইতি সন ১১-৬৫।১৫ আষাঢ়।

(৪)

রাজারাম শর্ম্মার ভাষোত্তর।

লিখিতং শ্রীরাজারামদেবশর্ম্মণঃ ভাসোত্তরপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে গণকরের তরফ গণকরের মধ্যে মহীশ্বরবাটী ও তরফ

লক্ষাহার এই দুই তরফের আমেজে আমাদিগের পৈতৃক নিজ খনিত খড়সমেত খানা বাড়ী ও গোহাল বাড়ী মায় আমলা আছে। পিতামহ ঠাকুর ঘনশ্যাম রায় মহাশয় পরগণে গণকর ওগয়রহ চারি পরগণার জমিদারী বহীতে বহাল দৌলতে ৺গঙ্গাবাস কারণ করিয়াছিলা। বাড়ীর চৌগির্দ্দে গড় খনিত করিয়া পিতাঠাকুর উৎসর্গ আপুনি করিয়াছেন। গড় খোদাইতে কচ্চাবাড়ী বাশ ও গড়প্রতিষ্ঠা গয়রহতে ৮০০০ আট সহস্র টাকা খরচ পত্র সকল নিজ সরকারে। বাড়ী মজকুরে থাকিয়া প্রত্যহ ৺গঙ্গাস্নান ব্রাহ্মণভোজন পুরাণশ্রবণ এই সকল কার্য্য পরকালের করিতেন। গড়বাড়ীর জন্ম লালা উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর। তাহার বিবরণ যে কালে পিতামহী ঠাকুরাণী অন্তিম কালে ৺গঙ্গাতীরে লক্ষাহারে পাঁচু মণ্ডল নামে পুড়া জাতি চাষার বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন। তাহাতে সাহেবরায় মহাশয় আপন মাতা ঠাকুরাণীর সহিত বড়নগর হইতে আপন মাতামহীকে দেখিতে আসিয়াছিলা। তাহাতে অনেক লোকের জনতা স্থানাভাবে দুষ্‌খ হইল। তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে আপন মাতামহকে কহিলেন মহাশয়ের শেষকাল ৺গঙ্গাতীরে একখানি বাড়ী করিতে হয়, অভাব কি? তাহাতে পিতামহ ঠাকুর কহিলেন আমার সে মনস্থ আছে কিন্তু আমার নিজ তালুকের ভোম এথাতে নাই। সকল আপনকার খাস তালুক, তাহাতে কহিলেন আমার তালুক মহাশয়ের নয়? সকলি মহাশয়ের যে স্থান মনস্থ করেন সেইথানে দেওয়া যায়। তারপর আপনে সকল সমেত ঘোড়ায় সওয়ারী করিয়া খাড়া হইলা। ঠিকানা জন্তীপুর নামে বরজ ছিল উচ্চস্থান তিহি সেই স্থান মনস্থ করিলেন ৺গঙ্গাতীর হইতে ১৫০ দেড় [illegible] অন্তর। নাপ করিয়া বাড়ী চিহ্নিত করিয়া

দিয়া পর দিবস বড়নগর গেলা। তারপর গড় খনিত ও বাড়ী প্রস্তুত হইলে গড়প্রতিষ্ঠার কালে ৺ঠাকুর বড়নগর মোকামে কর্ত্তা উদয় নারায়ণ রায় মহাশয়কে সংবাদ জ্ঞাত করিলা। ৺গঙ্গাতীরে লঙ্কাহার গ্রাম সমীপে নাতি একখানি বাড়ী দিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে একখানি ধর্ম্ম কর্ম্ম করা উপস্থিত হইয়াছে। বাড়ীর চৌগির্দ্দে গড়খনিত হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হবেক। ভৌম মহাশয়ের আত্ম স্বত্ব উপাদান পরস্বত্ব ত্যাগ, ইহা নহিলে দান উৎসর্গের অধিকার হয় না। তাহা শুনিয়া কহিলেন জামাতা দৌহিত্র ইহার দ্রব্যে মহাশয়ের অধিকার নাই। ঠাকুরাণ আজ্ঞা হইতেছে। তাহাতে কইলেন কেবল বাস করা হইলে যে আজ্ঞা করিতেছেন সেই প্রমাণ, কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাতে এমত নহিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না। অতএব বাড়ীর প্রকৃত মূল্য লইয়া খরিদগি দিন। তাহাতে কহিলেন এমত বিষয় মহাশয়ের সহিত অনুচিত। সে বাড়ী মহাশয়ের খনিত গড় সমেত চতুঃসীমা সাবদে আমি আপন সত্তা ত্যাগ করিয়া দিল। মহাশয়ের সত্তা হইল। যে বাসনা হয় তাহা করুনগা। ১১১৫। পরে বড়নগর হইতে পিতামহ ঠাকুর আসিয়া গড় প্রতিষ্ঠা করিলেন। আপন জামাতা স্থানে প্রতিগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। এক দফা পৈত্রীকির এই বিবরণ মহাশয়েরা ৺স্বরূপ বিচার করিবেন। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চাঠিয্যা ভাষাতে লিখিয়েছেন আমার মাতামহ শ্যামসুন্দর রায় একখানি বাড়ী করিয়া গড় খোদাইয়াছিলা তাহা আপন পিতাকে দিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন। পিতার ধনে ঐশ্বর্য্যে এবং জমিদারী আদিতে উপষ্টম্ভ ছিল। তাহাতে পুত্র কর্ত্তা ছিলা কি পিতা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলা। পুত্রটী উপযুক্ত হইয়া তালুক চৌধুরাই ধন উপার্জ্জন করিয়া পিতার ভরণ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম করাইতেন ইহাতে বুঝায় পুত্রের

উপষ্টম্বে পিতা কর্ত্তা ছিলা। পুনশ্চ লিখিছেন তখন সকলে একত্রে ছিলা। আপনারা সুন্দর বিবেচনা করিবেন।

তদনন্তর সমাচার কয়েক বৎসর পরে সন ১১২০ সালের আখেরি সন ১১২১ একইশ সালের প্রথম লালা উদয়নারায়ণ রায় জাফর খাঁ সুবা সহিত পাতসাহিতে কমরবন্ধি করিয়া গলিম হইলা। সে জনিত তাহাদিগের রাজ্য গেল। আমার পিতামহ ঠাকুর তাহার শশুর নিগূড় কুটুম্বিতা সেমতে তিহ আত্মভয়ে গোষ্টীসমেত তালুক ভৌম গৃহ বাটি আদি সকল ছাড়িয়া সেই হঙ্গামে পলায়নপর হইয়া সুলতানাবাদের মহেশপুর অবধি একত্র ছিলা।

সাহেবরায় যুদ্ধে পরাজয় হইয়া গোষ্টী সহিত কয়েদ হইয়া গেলা আমরা উদয়নগর পাথরিয়া মোকাম হইতে কর্ত্তারদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া আমরা আত্মভয়ে পলাইয়া বনের পথে বিরভোম পাঠানের অধিকারে থাকিলাম। এথাতে জমিদারী তালুক নেস্ত বিত্ত আদি গোবৎস খনিত পুষ্করিণী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন রায় মহাশয়ের ভ্রাতা রাজা রামজীবন রায় মহাশয় নামে উদয়নারায়ণ রায়ের জমিদারী হইল। তাহার তরফ সিকদার পং গণকর গএরহ পাঁচ পরগণার সিকদার রামেশ্বর রায় হইলা। তিহ সকল দখল করিলেন। বিত্ত বেসাত বিক্রয় করিয়া রাজ সরকার দাখিল করিলেন। সকলের মৎস্য বিক্রয় করিয়া লইলেন। সেই অবধি সরকারে থাকিল। চতুর্দ্দিগ অগ্নিদাহ হইয়াছিল সে কারণ গড়বাড়ীর ঘর ভাঙ্গিয়াছিল। গড়বাড়ীতে আমলা গণকরের থানাবাড়ী সর্ব্বসাঝার। পিতামহভ্রাতারা পলাইয়াছিলা। তাহারা বিষয়েতে বেইলাকা সেমতে সম্বৎসর মধ্যে বাড়ী আসিয়াছিলা সেমতে বহাল থাকিল। গড়বাড়ী ও খনিত পুষ্করিণী আদিতে যে পিতামহ ঠাকুরের নিজ

দফা তাহাতে ভাইভগ্র সংকোচে মুজাহিম হইলা না। আমরা বিদেশস্থ থাকিলাম। গড়বাড়ীতে ফলকরা আদি আছে তাহা লস্কাহারের প্রজাস্থানে কর্ম্মচারীতে বিক্রয় করিয়া লইত। এই সকল ধারাতে কয়েক বৎসর গেল। অস্বামিক দ্রব্য থাকিলে রাজা ব্যতিরেকে কে লয়। আমরা দেশে ভৌমে সাক্ষাৎ থাকিতে কেহ লয় নাই। এবং বিক্রয় করিয়ে নাই। কোন দায়গ্রস্ত হইয়া কাহুকে দিয়ে নাই। তারপর কয়েক সন বাদে পিতামহ ঠাকুর ৺গঙ্গাস্নান করিতে গোপনিয়তে সহরের নিকট তক আইলা তথাতে অশ্বাস্তি হইলা। তথা পরামর্শ হইল রাজা বাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক বন্দোবস্ত করিয়া দেশে যাই। গড়বাড়ীতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ ইচ্ছা ভোজন করাইব। তথা হইতে যাত্রা করিয়া নৌকাতে আসিয়া ডাহাপাড়া পঁহুছিলা। বন্দোবস্তের পয়গাম হইতেছিল। ১১২৬। ইতমধ্যে তথা ৺তিরে স্বর্গীয় হইলা। এই তদবস্থ থাকিল। পুনশ্চ দিয়াড়া গ্রামে গিয়া কর্ম্ম হইল। পিতামহ ভ্রাতা তাহার জ্যেষ্ঠ শত্রুজিত রায় ঠাকুরবাড়িতে ছিলা খরচ পত্র পঠায়া দেওয়া গেলা তিহ এথা ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। তারপর কয়েক বৎসর পরে আমার পিতা ঠাকুর দুই ভ্রাতাতে রাজাদিগের সহিত সাক্ষ্যাত করিলা গোষ্টি গণকর বাড়ি আনিলেন। তারপর রাজা আজ্ঞা হইয়াছিল ইহারা আপন জমীদারী লইয়া সরবরাহ করিতে পারেন দেওগা; চাকলে রাজসাহির মুৎসুদ্দি তিহ কিশোর সিংহ সরকারকে কহিলেক সকল তালুকের খাস আমনত বন্ধ দিতে কয়েক বৎসরে কি বাকী ফর্দ্দ কর। তাহাতে বাকী মবলক হয় ইহারা হাল মালগুজারী কবুল করেন। এইরূপে কোন কিনারা পড়ে না। ইহারা ভোম লইবেন এই প্রত্যাশাতে বাড়ি পুষ্করণী আদি অস্ত চেষ্টা পান

না। কয়েক বৎসর এই আশ্বাসে গেল। ১১৩২। তারপর জাহার মুর্দ্দই তাহার সমকক্ষ লোক নন। মহারাজা সবল। দুর্ব্বলের বিষয় যাহাদিগের গণীভূত তাহাদিগের বদনামে কথু নালিষ করা জায় না। ইহাদিগের নিকটে কল কৌশল ব্যতিরেকে আপন কার্য্য লওয়া যায় না। তারপর রাজার মা পুষ্কর্ণী ও পিতামহী ঠাকুরাণীর পুষ্কর্ণী ও বাগিচা বাড়ী আদি সকল মৎস্য বিক্রয় করিয়া সরকারে লইয়াছিল। সে অবধি রাজসরকারে নিজ গ্রামের বিস্থ হালদার মৎস্য জিলাই করিত, তাহা আমার ঠাকুর রামেশ্বর রায় সিকদারকে লইয়া উদ্ধার করিয়াছেন। গড়বাড়ির দফা রামেশ্বর বাবত গীরি পদ্মলাভ সরকার সিকদার হইলা। তাহার আমলে তাহাকে সমাচার জ্ঞাত করিলেন। তিহ লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী আমিন তাহাকে কইলেন রায়জীরা কি কইতেছেন। চৌধুরী কইলেন ঘনশ্যাম রায় জীর ৷৵ স্থানের থানাবাড়ি ইহারা দেশে না থাকাতে ফলকরা কর্ম্ম-চারিতে বিক্রয় করিয়া লয়। এবং লঙ্কাহারের প্রজাতে বাড়ির দেওয়াল বাহির খানেক ওত দিয়া জমা কিঞ্চিত করিয়াছে তাহা খারিজ দিয়া বাড়ি দেন। এই চৌধুরী মজকুর সিকদারের দস্তখত সমেত লিখন করিয়া কর্ম্মচারিকে দিলেন, তাহার পাঠ এই উদয় নারায়ণী ভঙ্গিয়ানে রায় মজকুরেরা পলাইয়া বিদেশে ছিলা, সে মতে লঙ্কাহারের প্রজাতে কথোক স্থানে জমী করিয়া কিঞ্চিত জমা করি-য়াছে থানাবাড়িতে। অতএব সদর দখলে দাখিল হয় নাই। এমতে হস্তবুদে কমী লেখা যায় না। সে জমার এওজ নাএক জাবাত পতিত জমী অন্যত্র ঠাওরাইয়া দিবা, তাহা আবাদ করিয়া জমার মাল গুজারি করেন। খনিত গড় সমেত থানাবাড়ী মায় আমলা পূর্ব্বের মত ভোগ করিবেন। এই দখল হইল। তারপর পিতৃব্য ঠাকুর

লক্ষাহারে অন্য পলাতক প্রজার ডিহি বাড়ি বাশ বৃক্ষ ও জমি সমেত ২০।২৫ বিশ পচিশ টাকার জমা লইয়াছিলা। সেই সামিল গড় বাড়ির জমা এওজ জমী লইয়া মালগুজারি করিতেন তারপর দশ মাস পরে সে বৎসর আম্র সমূহ হইল তাহাতে দুষ্ট লোকে পুনশ্চ সিকদারকে কহিলেক বিশ পচিশ টাকার আম্র গড় বাড়িতে হইয়াছে। রায় মজকুরদিগরের দেশছাড়া অবধি কয়েক বৎসর খামারে বিক্রী হইতেছে বিনা বড়নগরের লিখনে কিরূপে ছাড়িয়া দিলা। এই সিকদার কহিলেন বড়নগরের একখানি লিখন আনিলে ভাল হয়। আমরা চাকর একখান আশ্রয় থাকে। পুনশ্চ দুষ্ট লোকের কথাতে এই আপত্য হইল। পরে আমার ঠাকুরেরা দুই ভ্রাতাতে পরামর্শ করিলেন। আমার ঠাকুর অশ্বাস্তি ছিলা। পিতৃব্য ঠাকুরকে কইলেন তুমি সহর গিয়া সাহেব রায়জী ফাটকে সংবাদ জ্ঞাত কর রাজা মহাশয় এতসথানাতে আছেন। তাহার সহিত অতি সৎভাব আচরণ হইয়াছে। তাহারা কহিয়া পাঠাইলে কার্য্য হইবেক। এই পিতৃব্য ঠাকুর সহর গিয়া উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়কে এবং সাহেব রায়জীকে জ্ঞাত করিলেন। সে বৎসর কালু কোঙর স্বর্গীয় হইলে নবাব রাজা মহাশয়কে নাটোর হইতে আনিয়াছেন এতসথানাতে থাকেন। নাজীর আহামদ ও গৌরাঙ্গ সিংহের বন্দোবস্তে রাজা সাক্ষাৎ হইল। পরে রায় মজকুরের ব্রাহ্মণ সদা রাজার নিকট বন্ধু থাকিত কিঙ্কর শর্ম্মা নামে। তাহাকে সঙ্গে দিয়া এতসথানাতে রাজার নিকট পাঠাইলেন উক্ত ব্রাহ্মণ কহিলেন মহারাজা ইহ সাহেব রায় ঠাকুরের মাতুল। এহারা সাবেক জমীদার। কর্ত্তারদিগের ভঙ্গিয়ানে পলাইয়া বিদেশে ছিলা সেমতে জমীদারী খাস আমল হইয়াছে। ৺গঙ্গাতীরে লক্ষাহার গ্রামের সমীপ খনিত গড় সমেত খানাবাড়ি

আছে তাহা মপষলের নায়েব দখল দেয় না। যেমত আজ্ঞা হয়। শুনিয়া কইলেন জমীদারের ভোম গেলে খানাবড়ি খনিত পুষ্কর্ণী আদি ইহা যায় না। ভাল আমি বিয়য় ওয়াকিফ হই। এই গণকরের আমিনকে তলব হইল ইত্তমধ্যে চাকলে রাজসাহীর আমিন শ্যাম সরকার দেওয়ানি কাচারিতে রুজু থাকিয়া কানুনগোই গৌরাঙ্গ সিংহ মজুমদারকে কাগজ দিতেছিলা। তাহার নিকট পরগণা হায়ের আমিন রুজু ছিল। গণকরের আমিন * * চৌধুরী তথা ছিলা। তাহাকে আনিতে পেয়াদা গেল। চৌধুরী মজকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিহ আবোহমান সকল সমাচার বিস্তারিত জ্ঞাত করিলেন। শুনিয়া কইলেন এই দণ্ডে লিখন দেও। ইহা-দিগের নিজ খনিত গড় সমেত মায় আমলা বাড়ির নিকট কেহু না যায়। এবং কইলেন উদয়নারায়ণ রায়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর আমিও বহাল রাখিল। ১১৩১। এই শ্যাম সরকারের স্বাক্ষরে মহারাজার সহি সমেত এই তথাকার সনন্দ হইল। লিখনের পৃষ্ঠে তফসিল আছে নিজ খনিত গড় পাহাড় ও জলসার খানাবাড়ি ও গোহিলবাড়ি। * * *

* * * * * *

অবিভক্ত সাধারণে আছে। আমার ঠাকুরেরা দুই ভ্রাতাতে নিরোপণ করিয়া লন নাই। জ্ঞাতি কুটুম্ব গ্রামিস্থ লোকে বাঁটোয়ারা করিয়া সম্মতি হইয়া লন নাই। সম্মত পত্র হয় নাই। আমি ব্রাহ্মণ নাহক পেরসান খরচান্ত হইতেছি। মহাশয় হাকিম ইন-সাফের কর্ত্তা। হুজুর তজবীজ করেন। কিম্বা মধ্যস্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। সেখানে উভয়তো রুজু থাকি। জথার্ত্ত ইনসাফকে পহুঁচিএ ইতি ১১৬৫। তাং ২৫ আষাঢ়।

(৫)

রাজা উদয়নারায়ণের শ্বশুর

ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী

- ঘনশ্যাম
  - শ্রীমতী (রাজা উদয়নারায়ণ লালার স্ত্রী)
    - সাহেব রায়।
  - কৃষ্ণপ্রসাদ
    - রাজারাম
      - গঙ্গাধর
        - হরিশঙ্কর
          - ব্রহ্মময়ী
            - রামরতন
              - দুর্গাদাস
                - বসন্তকুমার।
    - চন্দ্রনারায়ণ
  - শ্যামসুন্দর
    - কন্যা
      - জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
        - রামলোচন
          - মৃত্যুঞ্জয়

(৬)

রাজা সীতারাম রায়ের বংশপত্র।

নারায়ণচন্দ্র রায় *

- হরিশ্চন্দ্র রায়
  - উদয়নারায়ণ রায়
    - রাজা সীতারাম রায়
      - শ্যামসুন্দর
        - কীর্ত্তিচন্দ্র রায় (বংশ লোপ)
      - সুরনারায়ণ
      - বামদেব
      - জয়দেব
    - লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
      - নবনারায়ণ
        - নেহালচন্দ্র
          - কৃষ্ণকান্ত
            - চৈতন্যচরণ
              - দেবনাথ রায় (বর্ত্তমান) বাস হরিহরনগর যশোহর
- বাসুদেব রায়
  - কুলচন্দ্র
    - রসিকলাল
      - কীর্ত্তিচন্দ্র
        - বিশ্বনাথ
          - হরনারায়ণ
            - রামেশ্বর
              - সূর্য্যনারায়ণ
                - আশুতোষ
                - হরিমোহন
                - বিভূতিভূষণ

(তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান) বাস জালালপুর মুর্শিদাবাদ

* ইহারা বিশ্বাস উপাধিধারী [illegible] বাস উত্তররাঢ়ীয়

(১)

রাধামোহন ঠাকুরের বংশপত্র।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু

প্রথমা পত্নী শ্রীমতী পদ্মমুখী ঠাকুরাণী (বন্ধ্যা) – দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী

- বৃন্দাবন
- রাধাকৃষ্ণ
- গতিগোবিন্দ
  - কৃষ্ণপ্রসাদ
  - রাধামাধব (বুঁধুই পাড়া)
  - সুবলচন্দ্র (বুঁধুই পাড়া)
  - সুন্দরানন্দ (বিষ্ণুপুর)
  - হরিষানন্দ (বিষ্ণুপুর)
    - জগদানন্দ (মালিহাটী)
      - রাধামোহন (নিঃসন্তান)
      - মদনমোহন
      - ভুবনমোহন
      - গৌরমোহন (নিঃসন্তান)
      - শ্যামমোহন নিঃসন্তান
      - যাদবেন্দ্র (নবগ্রাম)
    - মধুসূদন (নবগ্রাম)

মদনমোহন, ভুবনমোহন ও যাদবেন্দ্রের ধারা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে

টিপ্পনী।

আমরা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর রাঢ়ের মহীপাল ও রাজেন্দ্র চোলদেব বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার হুল্‌জের মতে রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তদনুযায়ী সুহৃদ্বর নগেন্দ্রনাথ বসু উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে পাল-বংশের প্রথম মহীপাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হুল্‌জ কি রূপে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা তাঁহার South Indian Inscriptions নামক গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় না। তিরুমলয়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, হুল্‌জ মূল তামিলের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। "Hail! Prosperity! In the 12th year of (the reign of) Ko-Parakesari Varman, alias Udaiyár Sri Rajendra-Chola-Deva, who during his long life (which resembled that of) &c. conquered with (his) great and warlike army &c.... ইহা হইতে কেবল রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষ মাত্র অবগত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমরা তামিল কবি কম্বনের রামায়ণে ৮০৮ শকে রাজেন্দ্র চোলের বিদ্যমান থাকার বিষয় জানিতে পারি। সাগরদীঘীর শ্লোক হইতে জানা যায় যে, উত্তর রাঢ়ের মহীপাল ৮ম শকাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত শ্লোক হইতে একাদশ শতাব্দ স্থির করা যায় না। হুল্‌জ তিরুমলয়ের লিপির যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে মহীপালকে সুস্পষ্ট রূপে উত্তর রাঢ়ের রাজা বলিয়া বুঝা যায় না। তাঁহার অনুবাদ এইরূপ—

"Dandabutti (*i. e.* Danda-bhukti), in whose gardens bees abound, (and which he acquired) after having destroyed Dharmapala in a hot battle Takkanaládam (*i. e.* Dakshina-Lata), whose fame reaches (all) directions, (and which he occupied; after having forcibly attacked Ranasura ; Vangala-deśa, where the rain does not last (long), and from which Govindachandra, having lost his fortune, fled ; Elephants of rare strength, (which he took away) after having been pleased to frighten in a hot battle Mahipala of Sangu-kottam (?) which touches the sea ; the treasures of women (?) ; Uttiraladam (*i. e.* Uttara-Lata) on the great sea of Pearls ; and the Ganga, whose waters sprinkle tírthas on the bur..i ... nd ;—

ইহাতে মহীপালকে সাঙ্গুকোত্তমের রাজা বলিয়া জানা যায়। সাঙ্গুকোত্তম কোথায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। হুল্জ লাড়কে লাট স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহার ভ্রম, উহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তক্কন লাড়ম ও উত্তির লাড়ম যে দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় যাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গলায় (দিন বৃষ্টি থাকে না, উত্তর রাঢ় সমুদ্রের নিকট ইত্যাদিতে বুঝা যায় যে, হুল্জের পাঠ ও অনুবাদে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। মহীপাল কোন্ স্থানের রাজা স্পষ্ট না বুঝিলেও সেই সময়ে যখন উত্তর রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল বিদ্যমান ছিলেন, তখন রাজেন্দ্র চোলের মহীপাল যে উত্তর রাঢ়ের মহীপাল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং উপরোক্ত ধর্ম্মপাল সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপাল বলিয়াই বোধ হয়। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোলের সময় হইলে মহীপাল পালবংশের প্রথম মহীপাল হইতে পারেন, কিন্তু সাগরদীঘীর শ্লোক হইতে উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে ৮ম শকাব্দ বা ৯ম খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান থাকা বলিয়াই

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা.......................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূ
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসা
জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত
[illegible]	2 FEB 2006 ৫৫২		
8 AUG 2002 ৩৩৪			
2 DEC 2002 ২৯৭			